২৩ খণ্ড। { কৃষক—বৈশাখ, ১৩২৯ সাল } ১ম সংখ্যা।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন প্রায় সকল পুকুরই ভাগের হইয়া পড়িয়াছে। ষোল আনা পুকুর একজনের অধিকারে থাকা এখন কম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুকুরের অংশীদার.—একজনই ষোল আনা পুকুরের মালিক, এরূপ পুকুরের অবস্থা নিতান্ত অবনত নহে। যৌথ পুষ্করিণীর অবস্থা অনেক স্থলেই নিতান্ত অবনত। একত্র হইয়া কার্য্য করিতে বাঙ্গালী অনভ্যস্ত। এ কারণ বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত যৌথ কারবারে বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারে নাই। লোকে কথায় বলেন সাজার মা গঙ্গা পায় না।" সেইরূপ সাজারপুকুরের অবস্থাও শোচনীয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমরা যে সকল পুষ্করিণী একজনের অধিকারে থাকিতে দেখিয়াছি, এখন সে সকল সাজার পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। এ কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ অবনত হইয়াছে। পুরাতন মজিয়া যাওয়া পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া পাহাড়ে বাগান ও মৎস্য উৎপাদন করিতে পারিলে, খরচ বাদেও যে প্রচুর লাভ করিতে পারা যায়. সময়ান্তরে অন্য প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করিব বলিয়া ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বে সাজার পুকুর এত না থাকায় ও পুকুরে এত পানা না হওয়ায় এখনকার মত কৈবর্ত্তদিগকে পুকুরে ভাগে মাছ ফেলিতে দেওয়ার প্রথা প্রচলন ছিল না। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই সাজার পুকুরে অংশ মত টাকা দিয়া মৎস্য ফেলিত ও পানা তুলিত। এখন সকলে পরস্পর মিলিত হইয়া অংশ মত টাকা দিয়া পোনা ফেলা বা পুকুরের পানা তোলা হয় না বলিয়া প্রায় সকল সাজার পুকুরেই কৈবর্ত্তদিগকে মাছ ফেলিতে দেওয়া হয়। কৈবর্ত্তরা ভাগে মাছ না ফেলিলেও সকলেই তাহাদিগের দ্বারা মৎস্য ধরাইয়া তাহাদিগকে ধৃতমৎস্যের ⅓ একতৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হয়। কৈবর্ত্তদিগকে পুকুরে ভাগে মাছ

ফেলিতে দিলে, —তাহারা পুকুরে পোনা ফেলিবে, পানা তুলিবে ও মাছ ধরিবে; একারণ তাহারা ধৃত মৎস্যের অর্দ্ধাংশ পাইবে, বাকী অর্দ্ধাংশ পুকুরের মালিকগণ পাইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যস্থিত নাতি বৃহৎ নাতি গভীর পুষ্করিণীতেই কৈবর্ত্ত ভাগে মৎস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। কৈবর্ত্তগণ প্রায়ই পুকুরে বাছাই পোনা ফেলে না। ডিম পোনাই ফেলিয়া থাকে। ডিম পোনা শস্তা, অল্প মূল্যের ডিম পোনা ফেলিলে, হয়ত সেই ডিম পোনা ফুটিয়া এত অধিক মৎস্য জন্মে যে, একটু বড় হইলে সেই মৎস্য তুলিয়া বিক্রয় বা অন্য পুকুরে ফেলিতে হয়। এরূপ না করিলে পুকুরে বহুসংখ্যক মৎস্য থাকিলে মাছ মোটেই বাড়ে না অথবা মরিয়া যায়। সকল সময়ে ডিম পোনা হইতে এত অধিক মৎস্য জন্মে না। একবার ডিম পোনা ফেলিলে, অনেক সময়েই নিস্ফল হইয়া থাকে। তজ্জন্য দামোদর নদের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত প্রতি বন্যারই মাছের ডিম ফেলিতে হয়। দামোদর নদের ডিম পোনায় সকল বৎসর ভাল মৎস্য জন্মে না। দামোদর নদের ডিম পোনা অপেক্ষা গঙ্গার ডিম পোনায় মৎস্য অধিক জন্মে। দামোদরের ডিম পোনার সহিত রুই কাতলা প্রভৃতি জাতীয় মৎস্যের ডিম ভিন্ন বুয়াল, চেতল, প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্যের ডিম মিশ্রিত থাকে; হয়ত কোন বানে মোটেই জাতীয় মৎস্যের ডিম থাকেনা। মৎস্যের ডিম চিনিয়া লওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যাহারা বহুকাল নদীতে ডিম পোনা ধরিয়া থাকে, তাহারাও কোন ডিমে জাতীয় মৎস্য জন্মিবে ভাল করিয়া বলিতে পারে না। গঙ্গার ডিম পোনা আনিয়া ফেলিলে, প্রায়ই সেরূপ ঠকিতে হয় না। গঙ্গার ডিম পোনার যত অধিক জাতীয় মৎস্য জন্মে দামোদরের ডিম পোনায় এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। গঙ্গার ডিম পোনায় রুই, মৃগেল, কাতলা মাছই জন্মিয়া থাকে, অন্য মাছ জন্মিতে প্রায়ই দেখা যায় না। গঙ্গার ডিমে বাটা মাছ প্রায়ই হয় না, কিন্তু দামোদরের ডিমে বাটা মাছ বিস্তর জন্মে। আগে গঙ্গার ডিম পোনা খুব সুলভ ছিল, পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসের মধ্যে যখনই যাইত, তখনই এখানকার লোক গঙ্গার ডিম পোনা শস্তায় কিনিয়া আনিত। এখন আর সেরূপ পাওয়া যায় না, অনেক সময় শুধু ফিরিয়া আসিতে হয়। ২।৩বার গেলে এক বার পাওয়া যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে কৈবর্ত্তেরা মৎস্য ব্যবসায়ী। জাল দ্বারা ইহারা মৎস্য ধৃত করে বলিয়া ইহাদিগকে "জেলে" ও বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে পুকুরে ভাগে মৎস্য ফেলিতে বা পুকুর জমা করিয়া লইয়া মৎস্য ফেলিতে কম দেখা যাইত। তখন কেবল পুকুরের মৎস্য ধরাই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। কোন কোন কৈবর্ত্তের নিজেরও পুকুর ছিল, এখনও অনেক কৈবর্ত্তের নিজের পুকুর আছে। উহারা ঐ সকল পুকুরে মৎস্য ফেলিয়া সময়ে সময়ে ঐ সকল পুকুরের মৎস্য বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে পুষ্করিণীর স্বামী নিজেই পুকুরে মৎস্য ফেলাইতেন, নিজেই পুষ্করিণীর উন্নতি সাধন করিতেন। এখন অধিকাংশ পুষ্করিণীর অংশ হওয়ায় ও মজিয়া যাওয়ায় মালিকগণ কৈবর্ত্তদিগকে ভাগে মৎস্য ফেলিতে দিয়া থাকেন বা জমায় বিলি করিয়া থাকেন।

দুলে, এই জাতিও মৎস্যের ব্যবসা করিয়া থাকে। এই জাতির স্ত্রীলোকেরা মৎস্য ধরিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই জাতির স্ত্রীলোকেরা ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্যই ধৃত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এপ্রদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতেই ইহারা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে মৎস্য দিয়া মাসিক হিসাবে মৎস্যের মূল্য লইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কৈবর্ত্তের ন্যায় ইহারা পুকুরে ভাগে মৎস্য ও ফেলিয়া থাকে। এবং পুকুর জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াও মৎস্যের আবাদ করিয়া থাকে। কৈবর্ত্তেরা যেরূপ জাল ব্যবহার করে ইহারা সেরূপ জাল ব্যবহার করে না। ইহারা যে জাল ব্যবহার করে তাহাকে "ফেটা" জাল কহে।

ফেটা জাল গভীর জলে চালাইতে পারা যায় না। ফেটা জালের দুই পার্শ্বের বাঁশ দুই জনে ধরিয়া পুকুরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে টানিয়া লইয়া যায়। জালের নিম্ন ভাগ পুকুরের পাঁকের উপর দিয়া চলিতে হয়। এক একটী ফেটাজালের নিম্নভাগ ৬।৭ হাত লম্বা থাকে। উপরিভাগের উভয় বাঁশ একত্র মিলিত হওয়ায়. ফেটাজাল ত্রিভুজাকৃতি সুতরাং অনেকগুলি ফেটাজাল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পুকুরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইলে ফাঁক থাকার জন্য মৎস্য পলাইয়া যায়। ফেটাজাল সমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে পুকুরের একদিকে নামিয়া জাল টানিয়া লইয়া গিয়া অপরদিকে উঠিয়া থাকে। সাঁতার জলে জাল টানিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা হয় না। অনতি বৃহৎ গভীর পুষ্করিণীতেই ফেটাজাল দ্বারা মৎস্য ধরার সুবিধা হইয়া থাকে। পুকুরের কোন স্থানে ফাঁক না পড়ে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া ২।৪ বার ফেটাজাল টানিলে পুকুরের চুনা পুঁটী হইতে বৃহৎ মৎস্য পর্য্যন্ত সমস্তই ধৃত হইয়া থাকে। যদি ২।৪টা মৎস্য ধৃত হইতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পরিয়া দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে ও কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অধিকাংশ মরিয়া যায়। এই সকল কারণে যে সকল পুকুরে পোনা মাছ বেশী থাকে, সে পুকুরে ফেটাজাল দ্বারা কেহই মৎস্য ধরায় না।

ফেটাজাল ব্যতীত আর একপ্রকার জাল দ্বারা দুলেদের স্ত্রীলোকেরা চিংড়ি, চুনা, পুঁটী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। অধিকংশ সময়েই ইহাদের স্ত্রীলোকেরা এই জালে মৎস্য ধরিয়া থাকে।

ইহাদের পুরুষেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদেশের পাল্‌কী ও ডুলী বহন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ডুলীর বহুল প্রচলন ছিল। এখন আর ডুলীর প্রচলন নাই। তখন মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রীলোকেরাও ডুলীতে যাতায়াত করিতেন। বিশেষতঃ মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের যাতায়াত জন্য অধিক পরিমাণে ডুলী ব্যবহৃত হইত। ২৫।৩০ বৎসর হইতে আর ডুলীর ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই পাল্‌কীতে গমনাগমন করিতেন। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে যাহাদের অবস্থা উন্নত ছিল, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা পালকীতে গমনাগমন করিতেন। পুরুষেরা অনেকস্থলেই হাঁটিয়া গমনাগমন করিতেন।

এখন গরুর গাড়ির বহুল প্রচলন হওয়ায় পাল্‌কীর ব্যবহার খুব কম হইয়া গিয়াছে। বিবাহ দ্বিরাগমন ব্যতীত মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে এখন আর পাল্‌কীর ব্যবহার দেখা যায় না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশে রাস্তা ভাল ছিল না, রেলওয়ের বিস্তার ছিল না, এ কারণ অনেকেই পাল্‌কী ডুলীতে যাতায়াত করিতে হইত। এখন রাস্তা ভাল হওয়ায় অনেকস্থানেই ঘোড়ার গাড়ি চলিতেছে। লোকে হয় রেলে, না হয় গরুর বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। পাল্‌কীর ব্যবহার কমিয়া যাওয়ায়, বেহারাদের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেহারাদের পাল্‌কী বহন কার্য্য চলেনা বলিয়া অনেক স্থানের দুলে বেহারা পাল্‌কী বহন কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া চাষাদিতে মনোযোগী হইয়াছে দুলেরা সকল জাতিকে পাল্‌কী বা ডুলী দ্বারা বহন করেনা। জলাচরণীয় জাতি ব্যতীত দুলেরা অন্য-জাতিকে বহন করেনা। কিন্তু মুসলমানদিগকে বহন করিয়া থাকে। নীচ জাতিদের বিবাহাদিতে হাড়ি বেহারারা বর কন্যাকে পালকী বহন করিয়া থাকে। দুলে বেহারাও হাড়ি বেহারারাই বহুপূর্ব্বকাল হইতে পাল্‌কী ডুলীতে করিয়া আরোহী লইয়া যাইত। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তা থাকে নাই, রেলওয়েরও এত বহুল প্রচলন হয় নাই। তজ্জন্য তখন ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত লোকের অনেকেই পাল্‌কীতে যাতায়াত করিতেন। তখন বেহারাদের কার্য্য বেশ চলায়, তাহাতেই একপ্রকার গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টে স্বষ্টে চলিয়া যাইত ইহা ব্যতীত উহাঁদের স্ত্রীলোকেরা ও মৎস্য বিক্রয় করিয়া ও সংসারের অনেক সাহায্য করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। কিছু কিছু চাষও করিত। এখন ডুলীর প্রচলন আদৌ নাই। পাল্‌কী ব্যবহার ও খুব কমিয়া গিয়াছে, একারণ বেহারাদের কার্য্য খুব কমিয়া যাওয়ায়, অনেক স্থানের দুলেরা পাল্‌কী বহন কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে। বর্ষাকালে সকল স্থানে গরুর গাড়ির যাতায়াত কম থাকে; সে সময়ে ধনীদিগের ও মধ্যবিত্ত লোকের যাতায়াত জন্য এবং বিবাহাদিতে পাল্‌কী বেহারার বিশেষ আবশ্যক হয়।

সম্প্রতি এপ্রদেশের স্থানে স্থানে উড়ে বেহারা আসিয়া ঐ অভাব পূরণ করিতেছে। দুলে বেহারারা পূর্ব্বে যে পারিশ্রমিকে কার্য্য করিত, এখনও স্থানে স্থানে সে পারিশ্রমিকে কার্য্য করিয়া থাকে, উড়ে বেহারারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পারিশ্রমিক লইয়া থাকে। পূর্ব্বে দুলে বেহারারা যে পারিশ্রমিকে কার্য্য করিত, এখন উড়ে বেহারারা তাহা অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক পারিশ্রমিক লইয়া থাকে। সকল স্থানের দুলে বেহারা পাল্‌কী বহন কার্য্য ত্যাগ করে নাই। সময়ে সময়ে পালকীও বহন করে, তাহা ব্যতীত মজুরীও চাষ করিয়া থাকে। এখন দুলে বেহারারাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পারিশ্রমিক লইয়া থাকে। উড়ে বেহারারা সকল জাতিকেই বহন করিয়া থাকে। যে সকল জাতিকে দুলে বেহারারা বহন করেনা, সেই সকল জাতির বিবাহাদিতে হাড়ি বেহারারা কিম্বা উড়ে বেহারারা অত্যধিক পারিশ্রমিক লইয়া থাকে।

ছুলেরা অতিশয় মাদক প্রিয়। মদ তাড়ি না খাইলে থাকিতে পারেনা; তাহারা পাল্কী বহন করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার প্রায় সমস্তই মদ্যাদি পানে খরচ করিয়া ফেলে। উহাদের স্ত্রীলোকেরা খুব পরিশ্রমী। উহাদের স্ত্রীলোকেরা মৎস্যাদি ধরিয়া সংসার চালাইয়া থাকে। উহারা রুই, কাতলা, মির্গেল, বাটা প্রভৃতি পোনা মাছ ধরিতে পারিলেও উহাদের দ্বারা কেহ পোনা মাছ ধরায় না। খুব গভীর জলেও উহারা মাছ ধরিতে পারেনা। অগভীর জলাশয়েই উহারা চুনা (চিংড়ি, পুঁটী প্রভৃতি) মাছ ধরিয়া থাকে। কেটাজাল ব্যতীত আর একপ্রকার জালে উহারা চুনা মাছ ধরিয়া থাকে। সে জালে বড় মাছ ধরিতে পারা যায় না। এপ্রদেশের গ্রামের বাহিরে মাঠে অনেক অগভীর পুষ্করিণী আছে। সেই সকল পুকুরের মধ্যে অনেক পুকুরে বার মাস জল থাকে না। ঐ সকল পুকুরে ও গ্রামের পুকুরেও ছুলেদের স্ত্রীলোকেরা চুনা মাছ ধরিয়া থাকে। উহারা এপ্রদেশের অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে বারমাস চুনা মাছের রোজ দিয়া মাস কাবারে মূল্য আদায় করিয়া লয়। ইহা ব্যতীত নগদ পয়সা ও চাউলাদি লইয়াও মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ছুলে জাতির স্ত্রীলোকেরা মাছ বেচিয়াই সংসারের অধিকাংশ খরচ চালাইয়া থাকে।

পোনা মৎস্য ব্যতীত প্রায় সমস্ত মৎস্যই পুকুরে স্বভাবত জন্মিয়া থাকে। প্রায় সমস্ত চুণা মাছই পুকুরে ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্ব হইতেই মৎস্য জন্মিয়া থাকে। চিংড়ি মৎস্য নহে, উহা একপ্রকার জলজ কীট, উহা পুকুরে স্বভাবতঃ প্রায়ই জন্মিয়া থাকে। পুঁটী, মৌরলা, খয়রা, শইল, ল্যাটা প্রভৃতি মৎস্য পুকুরে ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্ব হইতেই মৎস্য উৎপন্ন হয়। পুকুরে ঐ জাতীয় ২।৪টা মৎস্য থাকিলে উহা দ্বারা বহু সংখ্যক মৎস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে যখন অধিক বৃষ্টি হয়, তখন মাঠ প্লাবিত হইয়া জল স্রোত প্রবাহিত হয়। সে সময়ে মাঠের প্রায় সমস্ত পুকুরে গ্রামের ও কোন কোন পুকুরে মাঠের ঐ জল প্রবিষ্ট হয়। যখন মাঠ প্লাবিত হইয়া জল স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন পোনা মাছ ব্যতীত সকল মৎস্যই ডিম্ব প্রসব করায় মাঠের জল মৎস্য পূর্ণ থাকে। সেই জল যে পুকুরে প্রবিষ্ট হয়, সেই পুকুরেই বিস্তর চুনা মাছ জন্মিয়া থাকে। তাহার কারণ মাঠের জল সহ প্রবিষ্ট মাছেরও বিস্তর বংশ বৃদ্ধি হয়। ছুলেদের স্ত্রীলোকেরা ঐ সকল মৎস্য ধরিয়া থাকে।

এই জাতির ছেলে মধ্যে সাঙ্গি (বিধবা বিবাহ) প্রথা প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই জাতির সমস্ত স্ত্রীলোকেই অন্য পতি গ্রহণ করিয়াই থাকে, তাহা ব্যতীত স্বামী স্বত্বেও অন্যকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে। তাহার সহিতও মনোমিলন না হইলে, তাহার গৃহে না থাকিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইপ্রথা ইহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশের পল্লীগ্রামে মোটেই গরুর গাড়ীর চলন ছিল না। পূর্ব্বে

খুব সঙ্গতি পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত মধ্যবিত্ত লোকের পুরুষেরা পদ ব্রজেই গমনাগমন করিতেন কেবল মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রীলোকেরাই পালকী বা ডুলিতে যাতায়াত করিতেন। এখন এ প্রদেশে গরুর গাড়ীর বহুল প্রচলন হইয়াছে। ভাড়াটে গরুর গাড়ী ব্যতীত এখন অনেক গৃহস্থই গরুর গাড়ী করিয়াছেন। এখন প্রায় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লোকই গোযানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অনেকেরই নিজের গরুর গাড়ী থাকায় সেই গাড়ীতেই যাতায়াত চলে। যাঁহাদের নিজের গরুর গাড়ী নাই, তাঁহারা ভাড়াটে গাড়ীতেই যাতায়াত করেন। এখনকার স্থায় তখনকার লোকের দুর্ব্বলতা আলস্য বিলাসিতা ও আত্মাভিমান ছিল না। পায়ে হাটিয়া কোন স্থানে গমন করিলে যে সম্মানের হানি হইবে এ জ্ঞান তখনকার মধ্যবিত্ত লোকের ছিল না। এখন অনেকেই দুর্ব্বলতা আলস্য বশতঃ হাটিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে চাহেন না। অনেকে আবার সামর্থ্য থাকিতে ও মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া এখন পদব্রজে স্থানান্তরে গমন করিতে অনিচ্ছুক। পূর্ব্বে খাদ্য পরিচ্ছদ চাল চলন প্রভৃতি সমস্ত মোটামুটী ছিল। এখন তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পূর্ব্বে ধান্যাদি বহন করিতে হইলে ও দ্রব্য সামগ্রী একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে গরুর পৃষ্ঠের উপর সমভাবে উভয় পার্শ্বেই ছালা চাপাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। এখন অনেক স্থলেই ঐ সকল কার্য্য গরুর গাড়ীতে সম্পন্ন হইতেছে। এখন অনেক চাষীই গাড়ি করিয়াছে। চাষের হেলে গরু দ্বারাই গাড়ী বহান হইয়া থাকে মাঠ হইতে পূর্ব্বে গরুর পৃষ্ঠে করিয়া ধান্যাদি আনায়ন করা হইত, এখন অনেকেই নিজ নিজ গাড়ি দ্বারা ধান্যাদি বাড়ীতে আনিয়া থাকে। নিজের গাড়ীতে অনেকেই স্থানান্তরে যাতায়াত ও করিয়া থাকেন। বর্ষাকালে এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই জল মগ্ন ও কর্দ্দম ময় হইয়া থাকে। রাস্তা না থাকায় অবাধে গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে না। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ দামোদর নদের তীরবর্ত্তী স্থান হইতে রায়না পর্য্যন্ত একটী রাস্তা কয়েক বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ রাস্তার অনেক স্থান এখনও পাকা হয় নাই। রাস্তার যে অংশ এখনও পাকা হয় নাই, সে অংশে বর্ষাকালে এত কর্দ্দমময় হয় যে, গরুর গাড়ীর যাতায়াত দূরে থাকুক মানুষের গমনাগমনও নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে।

বর্ষাকালে ঐ রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থান দিয়া গরুর গাড়ীর যাইবার উপায় নাই সে সময়ে মধ্যবিত্ত লোকের স্ত্রীলোক দিগকে ঐ রাস্তা দিয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে পালকীর প্রয়োজন হয়। তখন পুরুষ দিগকে অগত্যাই হাঁটিয়া যাইতে হয়।

কয়েক বৎসর হইল বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে হওয়ায় এপ্রদেশের লোকের কোন কোন স্থানে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। ঐ রেলওয়ে আমাদের গ্রামের এক মাইল

দক্ষিণ দিক দিয়া গিয়া রায়নায় শেষ হইয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে রায়না (রায়নগর) ষ্টেশন দুই মাইল, গোপীনাথ পুর ষ্টেশন দেড় মাইল দূরবর্ত্তী। অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন দেশে রেলওয়ের এত বিস্তার ঘটে নাই, দেশে এত রাস্তা ছিল না, তখন মানুষ এত দুর্ব্বল, অলস ও বিলাসী ছিল না। তখন দেশে এত ম্যালেরিয়ার ও প্রাদুর্ভাব ছিল না। দেশে নূতন নূতন রাস্তা ও রেলওয়ে বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়াও আধিক্য হইয়াছে। রেলওয়ের ও রাস্তা হইবার পূর্ব্বে বর্ষার জল যেরূপ অবাধে প্রবাহিত হইয়া যাইত, এখন আর সেরূপ যাইতে পারে না। সেই জল আবদ্ধ থাকায় এখন ম্যালেরিয়ার আধিক্য হইয়াছে বলিয়া,—অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া এপ্রদেশের প্রায় সকলেই রুগ্ন ও দুর্ব্বল। তজ্জন্য শ্রম সাধ্য কার্য্য করিতে অপারক এপ্রদেশে এখন জন্ম অপেক্ষা যেরূপ মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোন রূপ প্রতিবিধান না হইলে যে ভবিষ্যতে এ প্রদেশ জনশূন্য হইবে, তাহা আমরা নিশ্চতরূপে বলিতে পারি। অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশের সকলেই সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, আত্মাভিমান শূন্য ছিলেন। দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে হইলেও অনায়াসে পদব্রজে গমন করিতেন। ইহাতে লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। এখন অনেক হীন অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত লোক ক্ষমতা সত্ত্বেও পায়ে হাঁটিয়া কোন স্থান গমন করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। পূর্ব্বে বহু সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত লোক ও পায়ে হাঁটিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা অপমান বোধ করিতেন না। তখন ধনী লোক ব্যতীত সকল লোকের পুরুষেরা প্রায়ই পায়ে হাঁটিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন করিতেন। আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা অন্যূন ৩০ ক্রোশ হইবে। অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলওয়ে হওয়া স্বত্ত্বেও অনেকে তিন দিন হাঁটিয়া কলিকাতায় যাইতেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকেরা পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। এখান হইতে ত্রিবেনী প্রায় ১৬।১৭ ক্রোশ রাস্তা হইবে। ত্রিবেনী অপেক্ষা কোন স্থানের গঙ্গাই আমাদের এখান হইতে নিকট বৰ্ত্তী নহে। একারণ আমাদের এখানকার অনেকেই ত্রিবেনীতে গঙ্গা স্নান করিতে গমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীলোক মাত্রেই হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন। এখন আর কাহাকেও আর পায়ে হাটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত লোক ও মধ্যবিত্ত স্ত্রীলোকেরা পালকীতেই গমনাগমন করিতেন। একারণ ই, আই, রেলের প্রায় সকল ষ্টেশনেই ভাড়াটে পালকি বেহারা পাওয়া যাইত। এখন আর প্রায় কেহ পালকীতে গমনাগমন না করার দরুণ কোন ষ্টেশনেই পালকী বেহারা পাওয়া যায় না।

রজক (ধোপা)—বস্ত্র ধৌত করাই ইহাদের জাতীয় বৃত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জাতি কাপড় কাচিয়া আসিতেছে। এই জাতির সংখ্যা ক্রমশ খুব কমিয়া

আসিতেছে। ইহাদের বিবাহ কিছু অর্থ ব্যয় সাধ্য, পল্লীগ্রামের অনেক ধোবাই বিবাহের সময়ে সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করিতে পারে না। যখন অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিবাহ করে, তখন তাহার বিবাহের সময় অতীত হইয়া যায়। হয়ত আবার কাহারও আজীবন অর্থাভাবে বিবাহই হয় না। স্ত্রী বিয়োগ হইলে, দ্বিতীয়বার বিবাহ সংঘটন অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না। কেবল ধোবা বলিয়া নহে অনেক জাতিরই বংশ এইরূপে বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশ বংশ ক্ষয় হইতেছে। এখন অনেকেই বিবাহিত হইয়া অপুত্রক পরলোক গমন করায়, বালবিধবার সংখ্যা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল কারণে অনেক জাতিরই লোক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক না থাকায়, বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না। তজ্জন্য লোক সংখ্যা তত কমিয়া যায় নাই। যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা, নিকা, সাদির প্রথা প্রচলিত আছে সে সকল জাতির মধ্যে এত লোক সংখ্যা কম হয় নাই। ধোবা সকল গ্রামে নাই। যে গ্রামে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও ২।৪ঘর সঙ্গতিপন্ন লোকের বাস আছে, সেই গ্রামেই ২।১ঘর ধোবা দেখিতে পাওয়া যায়। ধোবার সংখ্যা কম হইলেও এখন ধোবার কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এখানকার ন্যায় দেশী বিলাতী সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার প্রায়ই ছিল না। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই চরকা কাটা সূতার দেশী তাঁতে বোনা মোটাবস্ত্র ব্যবহার করিত। এপ্রদেশের প্রায় সমস্ত মধ্য বিত্তের লোক ঐরূপ মোটা কাপড় অষ্ট প্রহর ব্যবহার করিতেন। ২।১ খানি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র যাহা পোষাকী বস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাই ধোবার বাড়ী যাইত। এখনকার ন্যায় বহু প্রকার জামা পূর্ব্বে প্রচলন ছিল না। অনেকেরই পূর্ব্বে মোটেই জামা ছিল না।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশের সম্পন্ন গৃহস্থ মাত্রেই কাপড় কাচা দরুণ ধোবাকে জমি দেওয়া ছিল। যাহাদের জমি দেওয়া ছিল না, তাহাদের কাপড় কাচার দরুণ বার্ষিক বেতন ধার্য্য ছিল। তখন ধোপাদের কাপড় কাচা দুই প্রকারের ছিল, সাজ ও বাসী। ছাগল নাদ, গোমূত্র, কলাবাকৃসনারক্ষার ইত্যাদি দিয়া ধোবারা সাজ কাপড় কাচিত। অষ্ট প্রহরে মোটা কাপড় সকল সাজো কাচিয়া ২।১ দিনের মধ্যেই দিত। অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল বাসি কাচান হইত। বাসি কাপড় কাচিতে কিছু বেশি সময় লাগিত। সাজো কাচার ন্যায় বাসী কাপড় প্রথম কাচিয়া সাজি মাটী ইত্যাদি দিয়া ভাটি (সিদ্ধ) করিতে হয়। তৎপরে কাচিয়া কলপ দিলেই বাসী কাপড় কাচা হইল। পূর্ব্বে ইস্ত্রীর প্রচলন প্রায়ই ছিল না। সকল ধোবার ইস্ত্রী ছিল না। কাপড়ে কলপ দিবার পর ভাজ করিয়া সেই কাপড় মৃত্তিকায় প্রোথিত মসৃণ কাষ্ঠ খণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপর কাষ্ঠের মুদগর দ্বারা আঘাত করিয়া কাপড় চৌরস করা হইত। তখন যে ২।৪ খান জামা ধোবারা কাচিত তাহাও ঐরূপ চৌরস করা হইত। এখন সকল ধোবারই ইস্ত্রী আছে। এখন অধিকাংশ কাপড়ই ইস্ত্রীর দ্বারা চৌরস করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

পটলের চাষ

পটল আমাদের অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় তরকারী। কি গন্ধে কি স্বাদে কি উপকারিতায় সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। বন্য অপকৃষ্ট পটল কদর্য্য ও অখাদ্য ইহার আদিম অবস্থায় একরূপ অখাদ্যই ছিল।

"পটল: কুল কাত্তিক্ত পাণ্ডুক: কর্কশ সুদ:। রাজীফল: পাণ্ডুফলো রাজেয়া শ্চা মৃতা ফল:। বীজ গর্ভ: প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাস ভঞ্জন:॥

পটল, কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশ সুদ, রাজী ফল পাণ্ডফল, রাজেয়, অমৃতা ফল, বীজ গর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা, কাস ভঞ্জন, এই সকল শব্দ পটলের নাম।

বোধহয় পটলের কর্কশ সুদ, বীজগর্ভ ও তিক্ত প্রভৃতি নামই উহার আদিম অবস্থার পরিচায়ক। ইহার ক্রমোন্নতি সাধন দ্বারাই পটলের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। ফলতঃ পটলের উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। কারণ বীজের অল্পতা, ত্বকের কোমলতা ও স্থূলত্ব হীনতা হওয়া আরও আবশ্যক। উহার আকার বর্ণ ও স্বাদের ও বহু উন্নতি সাধন হইবার বাকী আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে। পটল পাতাকে পলতা বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই পলতা ঔষধের অনুপানে ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, পটল পরিপাচক, হৃদ্য বীর্য্যকর, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, সিন্ন, উষ্ণবীর্য্য, এবং ইহা কাশ, রক্তদোষ, জ্বর, ত্রিদোষ ও ক্বমি নিবারণ করে। পটল মুল সুখ বিরেচক, পটল ডাঁটা কফ নাশক, পটল পত্র পিত্ত নাশক, পটল ফল ত্রিদোষ নাষক। তিক্ত বন্য পটলের ও পটলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। পটলের গাছ পাতা সমস্তই তিক্ত কিন্তু ফল মিষ্ট।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে পটলের চাষ হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, নাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পটল চাষ বিশেষ লাভ জনক হইলেও সকল কৃষকে ইহার চাষ করিতে স্বীকার হয় না। তাহারা আবহমান কাল পুরুষ পরম্পরায় যে সকল শস্যের চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছে তাহাই করিতেছে তদ্ব্যতীত অন্য কোন নুতন শস্যের আবাদ করিয়া দু পয়সা আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ কারণ তাহাদের দৃঢ বিশ্বাস ও মনে একটি কুসংস্কার বদ্ধ মুল আছে যে পুর্ব্ব পুরুষ গনের অতিরিক্ত অন্য কোন ফসলের চাষ আবাদ করিলে তাহাদের বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা। এই অলীক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তি হইয়াই অনেক কৃষক পটল, শশা, পেয়াজ, ইক্ষু, প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করিতে রাজি হয় না। সুতরাং ঐ সকল চাষেরও বিস্তৃতি ঘটে না।

পটল চাষের জমী উচ্চ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। যেস্থান বর্ষাকালে জল মগ্ন হয় বা যে স্থানে বর্ষায় জল দাঁড়ায়, সেস্থান পটল চাষের অনুপযোগী। বৃষ্টির পরিমাণ কম হইলে তাহাতে পটলের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অতি বৃষ্টিতে গাছগুলি মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। খোলা স্থান অর্থাৎ যেখানে অবাধে পটল গাছ রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পারে, সেইরূপ উন্মুক্ত স্থানই পটল চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। বেলে জমিতে ইহার চাষ করিলে সুফল লাভ করিতে পারা যায়। নদীর চড়ায় মাটী পলি মিশ্রিত বলিয়া তাহাতে ফলন বেশী হয়।

পটলের চাষে বিশেষ কোন সারের আবশ্যক না হইলেও সারিষার খৈল, গোময়, ছাই, ও হাড়ের গুড়া প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহার করিলে ফলন অধিক হয়। পলি মিশ্রিত কাদামাটীর সহিত বিঘা প্রতি ৩০। ৪০ মণ গোময় ব্যবহার করিতে পারিলে সুফল লাভ করা যায়। পটলের মুল এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত মাটির ভিতর প্রবেশ করে। সুতরাং ক্ষেত্রের মাটী গভীর রূপে কর্ষণ করিতে হয় প্রথমতঃ কোদাল দ্বারা জমী কোপাইয়া পরে ২। ৩ বার কর্ষণ করিলে গভীর রূপে কর্ষণ হইয়া থাকে। কোদাল দ্বারা কোপাইয়া তদুপরি জলাশয়ের কাদামাটী ছড়াইয়া দিয়া চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক মাসে পটলের ডগা বা মূল রোপণ করিতে হইলে বর্ষার প্রথম ভাগেই জমী কোপাইয়া তাহার জঙ্গল ও আগাছাদি পচান দিতে হইবে, জঙ্গলাদি পচিয়া গেলে জমীর উর্ব্বরতা ও বৃদ্ধি পাইবে। আশ্বিন মাসে জমী গভীর রূপে কর্ষিত ও উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হইলে তদুপরি তিন হাত অন্তর জুলি টানিয়া প্রত্যেক দুইটী জুলির অন্তর্গত স্থান সমুহ উচ্চ ও ঢালু করিতে হয়। জুলির খণিত মৃত্তিকা দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। এই উচ্চ স্থান গুলিতে পটলের মুল বা ডগা রোপন করিতে হয়। খনার মতে ফাল্গুন মাসে পটলের মুলাদি রোপণ করিলে অধিক পটল হয়। সুতরাং ফাল্গুন মাসে রোপণ করিতে হইলে মাঘ মাসেই জমী প্রস্তুত করিতে হইবে। খনা বলিয়াছেন "পটল বুনলে ফাল্গুণে, ফল হয় দ্বিগুণে"। কিন্তু অনেক স্থলেই কৃষকেরা খনার মতানুযায়ী কার্য্য করে না, অর্থাৎ ফাল্গুনের পরিবর্ত্তে আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যেই মাটী সরস থাকিতে ২ মূলাদি রোপণ করে। পটলের বীজ পুতিতে হয় না; ২। ৩ বৎসরের পুরাতন ক্ষেত্রে যে লতা থাকে, তাহার পুরাতন ও স্থূল ডগা কাটিয়া আনিয়া ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে, প্রত্যেক ডগা অন্ততঃ এক ফুট লম্বা হওয়া আবশ্যক ও তাহাতে ৪। ৫টী পত্রগ্রন্থি থাকা চাই, মাদায় কাৎভাবে হেলাইয়া তদুপরি ২। ৩ ইঞ্চ মাটী চাপা দিলেই হইল, নূতন কিম্বা অপরিপুষ্ট গায় গাছ জন্মে না। পটলের ডগার পরিবর্ত্তে মুল রোপণ করাই সুবিধাজনক, কারণ মুল হইতে শীঘ্র ও সতেজে বৃক্ষ জন্মে, ও অধিকতর ফল প্রসু হয়। পুরাতন ডগার ন্যায় ২। ৩ বৎসরের মোটা মুল পুতিলে গাছ অত্যধিক তেজে বর্দ্ধিত হইয়া যাড়াইয়া যায় তাহাতে ফল জন্মে না। কিন্তু পুরাতন মোটা মুলে যে সকল ফেকড়ি জন্মে তাহা রোপণ

করিলে সুফল লাভে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মুল রোপণ করিতে হইলে এক বৎসরের নুতন লতায় সরু ও ছোট মুল রোপণ করাই প্রশস্ত।

এই জমীতে রোপণ করা পটল গাছ ব্যতীত এতদ্দেশে এক প্রকার গৃহস্থ বাটীতে মাচার উপরে পটল হয়। এই জাতীয় পটল ক্ষেত্রে উৎপন্ন পটল অপেক্ষা খাইতে বেশী সুস্বাদু ও নরম এবং ইহার ত্বক খুব পাতলা বীজ ও কম, ইহাকে যত্ন করিলে বার মাসই ফল প্রদান করে। ক্ষেত্র জাত পটল অপেক্ষা ইহা দরে ও কিছু বেশী, বিক্রয় হয়। পটলের স্ত্রীজাতি ও পুংজাতি উভয় প্রকার লতাই হয়। উভয় প্রকার লতাতেই ফুল ফুটিয়া থাকে। কিন্তু পুংজাতীয় লতায় ফল হয় না এই জাতি লতা হইতে যে গাছ জন্মে তাহাও অফলা হয়। সুতরাং রোপণ করিবার সময় যাহাতে পুংলতার মুল বেশী রোপিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছ বাহির হইলে নিড়াইয়া ক্ষেত্র হইতে তৃনাদি বাছিয়া ফেলিতে এবং ক্ষেত্রের মাটি একবার কোপাইয়া দিতে হইবে। মুল গুলিকে সজীব রাখিবার জন্য আবশ্যকানুযায়ী জল সেচন করিতে হইবে। লতাগুলি যাহাতে বিজড়িত হইয়া না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। জড়াইবার সম্ভাবনা দেখিলে পৃথক করিয়া দিবে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পাইটের আবশ্যক নাই।

এক বিঘা জমিতে ন্যুনপক্ষে ২০। ২৫ মণ পটল জন্মে, মাটীভাল হইলে ও পলি মিশ্রিত কাদামাটী ও সার দিতে পরিলে বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ মণ পটল উৎপন্ন হইতে পারে মোটামুটী গড়ে বিঘায় ৩০ মণ হিসাবে ধরিলেও ৩৲।৪৲ টাকা মন বিক্রী হইলে ৯০৲। ১২০৲ টাকা হইতে পারে। ব্যয় বিঘা প্রতি ২৫৲। ৩০৲ টাকা বাদ দিলে ও এক বিঘা পটলের আবাদ করিয়া কৃষক ৬০৲ টাকা লাভ রাখিতে পারে। সুতরাং পটল চাষ যে বিশেষ লাভ জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে কৃষকগনের বিশেষ বিবেচনা ও মনযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

মলমূত্র সার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাজা গোবর প্রয়োগে গাছের ডালপালা ও পাতারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি ইহার বড় নাই। উত্তম তামাক ও আলু ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

তাজা গোবর প্রয়োগে ভূমিতে অনেক কীটের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। সুতরাং আলু প্রভৃতি দুর্ব্বল গাছে তাজা গোবর কথনও দেওয়া উচিত নয়। তাজা গোবর জমীতে আগাছারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বেলে মৃত্তিকায় গোবর সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

প্রস্তুত সার শস্য বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাজা সার বপনের প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত।

পুরীষ—গোবর অপেক্ষা মনুষ্য পুরীষ যে অধিক সারবান পদার্থ তাহা ব্যবহৃত না হইলেও একরূপ সর্ব্ববিদিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এইরূপ মূল্যবান পদার্থ বিনষ্ট হইতেছে। চীন, জাপান ও ইউরোপের অনেক স্থানে গোবরের ন্যায় ইহার আদর আছে। ইহার দুর্গন্ধের জন্য আমরা ইহাকে অশুদ্ধ মনে করি। প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অতি শীঘ্র ইহার গন্ধ বিনষ্ট করা যায়। সাধারণতঃ সহর ও নগরের মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণ, ইহার দুর্গন্ধে যাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট না করিতে পারে, তদ্বিষয়েই মনোযোগী, কিন্তু ইহার কোন সদ্ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহার গন্ধ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সেপ্টীক-ট্যাঙ্ক নামক পুকুর ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম। এই পুকুরে পচনক্রিয়া এক জাতীয় উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক এক দিবসের মধ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই বিধান ব্যয়সাধ্য কার্য্য, সুতরাং এই বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মিয়াগের সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ। উত্তম কর্ষীত মৃত্তিকায় A আকৃতি বিশিষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র বলদ দ্বারা টানিলে ৪ হাত প্রস্থ এবং ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত হয়। এই গর্ত্তের তলদেশ কোদালী দ্বারা পুনঃ একবার খনন করা আবশ্যক। তৎপরে এই গর্ত্তে পুরীষ ৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিতে হয়। অতঃপর উভয় পার্শ্বস্থ মৃত্তিকার উপর পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র টানিলে এই গর্ত্তের পুরীষ ঢাকিয়া যায়। এই উপায়ে ২ বা ৩ মাস মধ্যে, পুরীষ পচিয়া কৃষি-কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। এই জমীতে আদৌ দুর্গন্ধ হয় না। এই প্রণালী অনুসারে, সকল মিউনিসিপালিটীতেই পুরীষ রক্ষিত হইতে পারে।

গ্রাম্য মিউনিসিপালিটী নিম্নলিখিত সহজ প্রণালীটি অবলম্বন করিতে পারে। এক ফুট ৯ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া ইহার তলদেশ ৩ ইঞ্চি পুরু শুষ্ক মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিবে। তৎপরে ময়লা ৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিয়া, তাহা তিন ইঞ্চি শুষ্ক ধুলা মাটি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পুরীষ পচিয়া শিঘ্র কৃষিকার্য্যোপযোগী হয়।

গৃহস্থগণও এইরূপ গর্ত্তে ময়লা ত্যাগ করিয়া, শুষ্ক মৃত্তিকা বা ভস্ম দ্বারা ইহা ঢাকিতে পারেন। পুরীষ পচিয়া গেলে, ইহা কৃষি ক্ষেত্রে কিম্বা বাগানে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পুরীষ একস্থানে অধিক মাত্রায় পুতিলে, ইহার পচনে অনেক বিলম্ব হয়; কারণ, প্রয়োজনীয় বহুজাতীয় পচনকারী উদ্ভিদাণু বায়ুহীন স্থানে বাস করিতে পারে না।

পুরীষ বিলম্বে পচিলে ইহার দুর্গন্ধে অচিরাৎ পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে।

মনুষ্যের মলে শতকরা দেড় ভাগ নাইট্রোজেন ও এক ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যহ গড়ে অর্দ্ধপোয়া মল ও দেড় সের মূত্র ত্যাগ করে।

এ দেশের কৃষকদিগের জ্ঞান আছে, মূত্রসাররূপে ব্যবহার করিলে গাছ মরিয়া যায়। বস্তুতঃ জলের সহিত না মিশাইয়া যদি খাঁটি মূত্র কোন গাছের তলে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ গাছ মরিয়া যাওয়াই সম্ভব। মূত্র অতি তেজস্কর সার। ইহা অন্ততঃ দশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ব্যবহার করা উচিত। যদি জল মিশাইয়া এই সার ব্যবহার করা সুবিধা না হয়, তাহা হইলে যে জমিতে কোন ফসল নাই এমন জমিতে উহা ছিটাইয়া দেওয়া, অথবা যে ধানের বা পাটের জমিতে কিছু জল দাঁড়াইয়া আছে সেইরূপ জমিতে ঢালিয়া দেওয়া, ভাল। তৃণ-জাতীয় অথবা শাক-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সোরা-সার ও মূত্র-সার বিশেষ উপযোগী। ধান্য, গোধুম, যব, জই, ভুটা, দে-ধান, মড়ুয়া, ইক্ষু, তুঁত, পালম শাক, পাট, বাধাকপি, ইত্যাদি ফসলের জন্যই মূত্র প্রভৃতি যবক্ষারজান ঘটিত সার ব্যবহার করা উচিত। মিউনিসিপালিটির গো-শালা গুলির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই বহুমূল্য সার অনায়াসে কৃষিকার্যের উন্নতি কল্পে ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। প্রত্যেক কৃষক ও অনায়াসে মূত্রের অপচয় না করিয়া সাররূপে ইহা ব্যবহার করিতে পারে। মূত্র পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা অবস্থাতে ইহা জমিতে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা হইতে অধিক উপকার পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১০।১২ মণ পর্য্যন্ত মূত্র সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাদি-সার—গোময় অপেক্ষাও ছাগল ও মেষের নাদি তেজস্কর সার। এসকল অপেক্ষা পক্ষীর বিষ্টা ও পলুপোকার নাদি আরও উৎকৃষ্ট সার। ছাগল ও মেষ জমিতে বিঘা প্রতি ১০০টী এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া চরাইয়া লইলে জমি বিশেষ উর্ব্বরা হয়। এই সকল ছাগ ও মেষকে ছোলা মটর বা কলাই ও ভুসি জমির উপরই রাখিয়া খাইতে দিলে সার আরও তেজস্কর হয়। জমি ভাগ করিয়া চাষ করিতে পারিলে, ক্রমান্বয়ে জমির এক-ষষ্ঠাংশ প্রতি বৎসর পতিত রাখিয়া উহারই উপর গো-মহিষ চরাইয়া, উহাদের লবকারক আহার দান করিয়া পতিত জমি সারবান করিয়া লইতে পারা যায়। ময়মনসিংহের কৃষকদিগের মধ্যে এই সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে।

পরিমাণ—ধান, পাট, ইত্যাদি সাধারণ ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ৪০/ বা ৫০/ মণ পচা গোবর-সার ব্যবহার করা উচিত। আলু, ইক্ষু, তামাক, কপি, প্রভৃতি বহুমূল্য ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ১৫০।২০০ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। বীজ বপনের পূর্ব্বে সার ছিটাইয়া দিয়া জমিতে লাঙ্গল-মৈ দিয়া পরে বীজ বপন করিতে হয়। ঘোড়ার নাদি পচিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে ব্যবহার করা উচিত। গোময়ের অর্দ্ধেক পরিমাণ ঘোড়ার নাদি ব্যবহার করিলেও চলে।

মূত্র—পুরীষের ন্যায় মনুষ্যমূত্রও বিনষ্ট হয়। মল অপেক্ষা মূত্র রক্ষা করা কঠিন। মূত্রস্থ ইউরিয়া ও ইউনিক এসিড নামক নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ অতি স্বরায় এ্যামোনিয়াম-কার্ব্বনেটরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উড়িয়া যায়। যথা তথা মূত্র ত্যাগ করিলে, ইহার সমস্তই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। যথায় অর্দ্ধ-গলিত পত্রাদি বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বদা গৃহ কার্যের জল সঞ্চিত হয়, এমন গর্ত্তে মূত্র ত্যাগ করা উচিত মধ্যে মধ্যে ধুলা মাটির দ্বারা ইহা ঢাকিয়া দিতে হয়। ৩ বা ৪ মাস পরে এই মাটি সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। মূত্রে শতকরা ০·৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও ০·৪ ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গুয়ানো—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে সামুদ্রিক পক্ষিগনের মল শুষ্ক হইয়া স্তূপাকার ধারণ করে। ইহাকে গুয়ানো সার বলে। বৃষ্টীর দ্বারা ধৌত না হইলে, ইহাতে সাধারণতঃ শতকরা ১২ভাগ নাইট্রোজেন ও ১২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃষ্টি-ধৌত গুয়ানোতে শতকরা প্রায় ০৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩২ ভাগ ফস্ফরিক এসিড থাকে।

পায়রার বিষ্ঠাকেও সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট কৃষি-রাসায়নিক ইহাতে ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও ১·৩ ফস্ফরিক এসিড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্পাস

আজ কাল কার্পাসের খুবই দেশে আদর হইয়াছে। যেমন মহাত্মা প্রদর্শিত "মা" চর্কার (মা কারণ ইনি অন্নদেন) আদর দেশে বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুতার জন্য কার্পাস ও কার্পাস চাষের দিকে আমাদের দেশের লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বন্ধুবর হেম চন্দ্র দেব কৃত ব্যবহারিক কৃষি দর্পণ নামক একখানি পুস্তকে বহুকাল পূর্ব্বে কার্পাসের আলোচনা দেখিয়াছিলাম, তাহা আজ কালের কার্পাস চাষ ইচ্ছুক শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ২৮।৩নং বিডন রো, কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া যত্নে পাঠ করিতে পরামর্শ দিই। ইহার পর আমি আমেরিকার কৃষি বিভাগ এবং দক্ষিণ ফ্লোরিডা আদি দেশ হইতে গ্লোনষ্টার ও ট্রাইসকটন বীজ আনাইয়া আমার পালামুর জমীদারিতে চাষ করি; ইহা দীর্ঘ প্রসারী (Long staple) কার্পাস হইতেছে। খুব সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি। এখন আমি ২০।২৫ বিঘা বা তাহা অপেক্ষা অধিক চাষ করি। বেশ লাভ পাইতেছি এই কার্পাস জাতিদ্বয়ের ফলন উচ্চ পাহাড়ী জমীতে খুব হয়। উদ্ভিদ

শাস্ত্রে ইহা গসীপিয়াম পর্য্যায় ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতি প্রচীন কালে যখন অধুনা সভ্যতাস্পর্দ্ধীজাতি সকলের পিতৃপুরুষগণ অসভ্যতার তমোগর্ভে নিমগ্ন ছিল, এবং বন্য পশু চর্ম্ম বা গাছের বল্কলে বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত, তাহার ও শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কার্পাস শিল্প প্রবর্ত্তিত হইয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কার্পাস ইউরোপে নাহউক উষ্ণ ও সমশীতোষ্ণ কোটী খণ্ডে জন্মে। ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান, মিসর, মেক্সিকো, যুক্ত মার্কিন দেশ ইত্যাদি ভূখণ্ডে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আদৌ চীন এবং মিশর ভারতবর্ষ হইতেই কার্পাস শিল্প শিক্ষা করে, চীন হইতে মেক্সিকোর আদিম আজ্‌তেগ্‌ জাতিরা ইহা শিক্ষা করিয়া আমেরিকা দেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। অধুনা স্বদেশী বস্ত্রের উন্নতি কল্পে কার্পাসের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে অধিকন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অনুশাসন বাক্যে বঙ্গবাসী কতকটা জড়তা ত্যাগ করিয়া নিজেদের দেশের মরণোন্মুখ কার্পাস শিল্প জাগাইতে বসিয়াছে বলিয়া ইহার চাষের দিকে লোকের মন স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা বিগত ৮০।৯০ বৎসর ক্রমাগত বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া মাঞ্চেষ্টার কে ধন কুবেরে পরিণত করিয়াছিলাম, এখন আমাদের দেশর কুম্ভকর্ণী নিদ্রাভিভূত অধিবাসীগণের মাহাত্মার অনুশাসন বাণীতে সাড়া হইয়াছে দেখিয়া মনে ভরসা হইতেছে যে দীন, পদদলিত ভারতবাসী স্বাবলম্বন গ্রহণ করিয়া নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাড়াইবে। ভাই বঙ্গের দীনহীন কৃষক, শ্রমজীবি ও রায়ত ভ্রাতাগণ, অনেক কথা ববিবার আছে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই প্রসঙ্গে বিবৃত করিব। যত্নে পাঠ করিয়া কাজ কর এই আমার বিনিত প্রার্থনা।

পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাঙ্গালা, বিহার, কাশী, বম্বাই, গুজরাট, সুরাট, বরোচ, ধারবাণ, বেরার (বিদর্ভ), কঙ্কর, কর্ণাট, সাগর, নর্ম্মদা, মালাবার, উপকুল, ত্রিচিনাপল্লী, কুয়াম্বাটোর, তিনবল্লী, গয়া, পালামু, প্রভৃতি জেলা ও দেশ সমুহ হইতে প্রচুর পরিমাণ তুলা উৎপন্ন ও বিদেশে রপ্তানি হইত। ইহার পূর্ব্বে ঢাকা, কাশী, বহরমপুর, গয়া, দিল্লী, পাটনা, মান্দ্রাজ, মালদহ, লক্ষ্ণৌ, মশলিপত্তন, পুনা, সুরাট, ধারওয়ার, আমেদাবাদ, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, মালিগ্রাম, ইয়োলা, বীরভূম, গড়বেতা, তমলুক, বালেশ্বর, নবিনগর, ভাগলপুর, আদি স্থান হইতে কোটী কোটী টাকা মূল্যের বিবিধ বস্ত্র আরব, সিরিয়া, ভিনিস্‌, পারস্য, মিশর, তুর্কী, চীন ও ইউরোপের প্রধান প্রধান বন্দরে প্রেরিত হইত। কালে যন্ত্রবলোদ্ধত ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিদ্বন্দিতা রাজার করভারের পীড়ন ও সেকালের পুরাতন বাঙ্গলাদেশের জোলা ও তাঁতিদের উপর বনিক ইংরাজদের নানারূপ অত্যাচার, রাজার অমনোযোগিতা, এবং আমেরিকা দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার চাষ ও উৎপত্তি নিবন্ধন ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যেমন ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কার্পাসের চাষও কমিতে লাগিল। বোধ হয় আর কিছুদিন

এইভাবে চলিলে ভারতীয় কার্পাস লোপই পাইত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ১৮৬১ সালে আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ ষ্টেট্ সমূহে গৃহবিবাদ হইলে বাজারে মার্কিণী কার্পাস বহুমূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন ইংরাজকে অভাবে পড়িয়া ভারতীয় তুলার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হয়, ফলে ভারতীয় তুলা বহুগুণ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল; অতি অধমজাতীয় তুলা যাহা ফেলিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না, তাহাও লোকে আগ্রহপূর্ব্বক বেশী দাম দিয়া ক্রয় করিতে লাগিল; দেশের চারিদিকে তুলার চাষের প্রসারবৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে ১৮৬৫ সালে মার্কিণের গৃহবিবাদ নিষ্পত্তি হওয়ায় আবার মার্কিণী তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া আবার বাজার নামাইয়া দিল, ভারতীয় তুলার পূর্ব্বাবস্থা হইল; ইহার ফলে অনেক বম্বাইয়ের মহাজন ফেল বা দেউলিয়া হইয়া গেলেন। কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্রমশঃ কল কারখানা বসিতে আরম্ভ হওয়ায়, ভারতীয় তুলা বিলাতাদি দেশে রপ্তানী হইলেও দেশের কল সমূহে বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, সুতরাং ইহার চাষও ব্যবসায় আর লোপ পাইবার আর আশঙ্কা থাকিলে না। এদিকে মার্কীণ উৎকৃষ্ট তুলার দর চড়াইয়া একচেটিয়া করিয়া দিলে ম্যাঞ্চেষ্টার অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কাজেই এই সময় ভারতে তুলার চাষের উন্নতির জন্য ইংরাজরাজের প্রখরদৃষ্টির ফলে অনেক জেলায় উৎকৃষ্ট তুলাবীজ আনাইয়া আবাদের ব্যবস্থা ইংরাজ বণিকগণ করিলে দেশে তুলার চাষ শ্রীবৃদ্ধি ধারণ করিল। ১৮৫৩সাল হইতে আজপর্য্যন্ত ভারতে বহু কাপড়ও সুতার কল হওয়ায়, ভারতবর্ষে-যন্ত্রবল চালিত বস্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তন হইলে, ক্রমে ক্রমে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টারী কলওয়ালারা ১৮৭৬ সাল হইতে আবদার ধরিয়া কলে প্রস্তুত দেশী কাপড়ের উপর শুল্কবসাইলেন, ইচ্ছা যেন ভারতীয় যন্ত্রবলযুক্ত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয় এরূপ ইচ্ছা ইংরাজের আন্তরিক নহে, এবং তাহা যেন কোন মতে উন্নতি করিতে না পারে। যাহা হউক জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে, মহাত্মাজীর কৃপায় চীন, জাপানের অনুগ্রহে এবং স্বদেশীতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবে ভারতে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি, খদ্দরের ঘরে ঘরে ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমার মনে হয়, দেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার কৃষিতত্ত্বজ্ঞ ডেয়ারিও পুলট্রি বিশেষজ্ঞ—৩১নং এলগীন রোড কলিকাতা।

জাপানী কৃষি

জাপান প্রত্যেক জমি খণ্ড কিরূপ সদ্ব্যবহার করে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জাপান প্রতি-বর্গফুট জমি কাজে আনিতে জানে। অনুচ্চ পাহাড় গুলির গায়ে গায়ে সর্পাকারে চারিদিকেই মাটি কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার চূড়া পর্যন্ত এমন কি যথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সে সকল স্থান ও আবাদ করে। গৃহস্থ স্বীয় ভদ্রাসনের আশে পাশে এমন কি গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যতটুকু জমি আদায় করিতে পারে তাহাতেই বীজ বুনিয়া থাকে, গাছ পালা রোপন করে। পাছে বেড়া দিলে অল্প অল্প করিয়া ক্ষেত্রে কিয়দংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়ার পরিবর্ত্তে তাহারা ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন করে। গবাদি পশু বা শষ্য ধ্বংশকারী পক্ষীর অভাবে বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না। চাষ করিলে চাষ হইতে পারে এরূপ জমি এবং পতিত জমি যে থাকিতে পারে ইহা জাপানে অজ্ঞাত। জমির সদ্ব্যবহার জাপানী কৃষির অন্যতম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে তাহাদের চাষে অপরিচ্ছন্নতা বা অসাবধনতা ঘটিবার যো নাই। তাহাদের মতে সুন্দর ও সম্পূর্ণ ভাবে কর্ষীত এক টুকু জমি ও ভাল তথাপি যেমন তেমন চষা ময়দান ও ভাল নয়। তাই জাপানের মাটী নিখুত ভাবে পরিষ্কার করা।

কোন ঋতুতে ফসলের ভিতর একটা ও আগাছা দেখা যায় না। এই জন্য জাপানের কৃষি বলিতেই উদ্যান কৃষি বুঝায়।

বৈজ্ঞানিক কলের অভাবে জাপানে সামান্য কতিপয় হাতের যন্ত্র লইয়া চাষ করা হয়। সাধারনতঃ জাপানের মাটি কৃষ্ণ বর্ণ পাঁক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল বা কোদাল দিয়া মাটী খোঁড়া হয়। হাতে করিয়া খোঁড়া হয় বলিয়া অনেক ভিতর পর্য্যন্ত মাটী আলগা হয়। চাসী তখন সেই মাটী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সূক্ষ গুড়া করিয়া ফেলে। মাটী পরে পরে আলী ও নালী কাটা, তাহার দুই এক হাত অন্তর পুনঃরায় আলী তোলা। ফসল এমন ভাবে বুনা হয় যে আলীর উপরকার ফসল (শীতের গম, যব ইত্যাদি) যখন কাটিবার সময় আসে তখন নালী কাটার মধ্যস্থ ফসল গজাইতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খালী পড়ে না। একবার যাহা খালি থাকে ফসল কাটা হইবার পর চষিয়া তাহা নালী কাটায় পরিনত করা হয়। এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা নালী কাটা ছিল তাহা আলীতে পরিনত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জাপানী পাঙ্গে ভূমি (Dry upland) সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষ ভাবে রক্ষিত হয়। কোদাল দিয়া ভিতর কার মাটী উপরে তুলিয়া এবং

ক্রমাগত উল্টাইয়া জমীর ভিতর বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দেওয়ায় গাছগুলি সুপুষ্ট ফলবান হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পায় ফসলের সময়ই বেশী চষা হয়। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটী পেলু করিয়া দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেক গাছটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়, এবং অল্প অল্প করিয়া তরল সার ঘন ঘন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। আগাছার নাম মাত্র গজাইতে দেওয়া হয় না। পাথর, কাঁটা, আগাছা—এ সকল কি উচ্চ শুষ্ক ক্ষেত্র কি ধান্য ক্ষেত্র (Wet land) সর্ব্বত্রই অজ্ঞাত। জাপানিরা অতি সুন্দর ভাবে জমির পাট করিতে জানে। জাপানে প্রায়ই প্রবল বেগে বারিপাত হয়। কিন্তু তাহাদের নালী কাটা ও আলী বাঁধার পদ্ধতি জন্য এবং নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ জন্য মাটী ও সার ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বরং মাটী সূক্ষ্ম চুর্ণে পরিণত করায় জল অনেকটা বসিয়া যায়। যে ক্ষেত্রের মাটী আটাল তথায় বালি ও পাঁক মাটি মিশান হয় এবং বেলেমাটীর মধ্যে উদ্ভিজ্জ সার ও নরম মাটী মিশাইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির অভাব পূর্ণ করা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে ক্ষেত্র কর্ষণ উপযোগী এবং ভারবাহী পশু নাই বলিলেও চলে। সুতরাং পশু অভাবে কৃষকগণকে যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয় অপর দিকে তেমনি অতি সামান্য যন্ত্রাদির দ্বারা ক্ষেত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। মাটী খুঁড়িবার ক্ষুদ্র একটী শাবল অথবা খুরপি (Fork), একখানি কোদাল একখানি শস্য ছেদনের কাস্তিয়া, সার বহনের জন্য একটী পাত ও তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য একটী হাতা বা উখড়ী ব্যতীত জাপ কৃষকের অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। ক্ষেত্র প্রতি এই সকল দ্রব্যের জন্য সরকারী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে চারিটাকা মাত্র। এই সামান্য যন্ত্র লইয়া ইহারা অসামান্য ফল উৎপাদন করে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি সুন্দর ও নিখুত ভাবে বপন, রোপন প্রভৃতি সকল কাজ করিয়া থাকে। জাপানি কৃষকের মত পরিশ্রম করিতে জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সার দিবার গুণেই জাপানে পর্য্যায় বুননের কোন পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবশ্যকও বড় হয় না তথাপি নাইট্রোজেন উৎপাদক শীম্বী জাতীয় ফসলের দ্বারা মৃত্তিকার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি শীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে বুনা হয় তাহা কতকটা পর্য্যায় বুননেরই অনুরূপ। ভারতবর্ষে মাটীকেই লোকে ফসল উৎপাদনের মূল মনে করে এবং উৎপাদিত শক্তি অক্ষয় ভাবে। জাপান তাহারা ভাবে মাটী অবলম্বন বা আশ্রয় স্বরূপ। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জীবন মাটীকে আবার (Medicine) মাত্র রাখিয়া পর্য্যায় ক্রমে খাদ্য খাদককে পোষণ করে। তাহারা প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং জাপানিরা ক্রমাগত মাটীখুড়ে আর সার দেয়। তাহারা সার না দিয়া কোন ফসলই বুনেনা এবং যতটুকু সার গাছে পরিনত হইতে পারে তাহার কনা মাত্র নষ্ট করেনা। তাহারা বলে ক্রমাগত মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়াও যা সার না দিয়া ক্রমাগত জমিতে ফসল উৎপন্ন করাও তা; উভয়

ভ্রমই এক প্রকার, সার দিবার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পূর্ব্ব ফসলের সময়ে সার দেওয়া জমির যদি কিছু বাঁচিয়া যায় তাহাতে জাপানিয়া পুনরায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার

কৃষক

(১)

পল্লীর পাশে বট গাছ ওই শত শাখা আছে বিস্তারি,
বহিছে অনিল মৃদু মৃদু হের হৃদয়ে শান্তি সঞ্চারি।
কে তুমি শয়ান রয়েছ হেথায় প্রসারিয়া দেহখান,
পথের পথিক কাঙ্গাল বলিয়ে করে যার হেয় জ্ঞান।

(২)

মূর্খ তোমায় করে হেয় জ্ঞান নহত ঘৃণার পাত্র,
দেশের জন্য দশের জন্য ঘামিয়ে এসেচ গাত্র;
শোভিত গৃহ আঙ্গিনা তব কমলার কৃপা বর্ষণে,
নয়ন জুড়ায় পল্লীতে তব প্রকৃতির লীলা দর্শনে।

(৩)

কে করে তোমায় তৃণ হেন জ্ঞান তুমি জগতের স্তম্ভ,
তোমারি জন্য আমরা সকলে করিয়েছি আজ দম্ভ!
সারাটি জগৎ তোমারি উপর করে আছে নিরভর,
তোমার দুঃখ কিসের আবার, কারে কর তুমি ভর?

(৪)

কে বলে তোমায় পথের কাঙ্গাল থাকিবার নাই ঠাঁই!
তোমারি অন্নে পালিত বিশ্ব তোমার তুলনা নাই;
তোমার আবার ভাবনা কিসের ধারেনা কো কারো ধার,
তোমারই কাছে ঋণী মোরা সব শত ভাবে শত বার।

(৫)

দারুণ গ্রীষ্মে দুপুর বেলায় খেটেখুটে হও সারা,
দিনরাত নাই মাথার উপর বরষিছে বারিধারা।
কে তুমি তাপস প্রখর রৌদ্রে ঘামেতে করিছ স্নান,
ফেটে যায় তালু, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে হয় খান খান !

(৬)

কিবা আসে যায় রাজা মহারাজে যদি গো মরণ স্পর্শে,
তোমার অভাব হয়না পূরণ শতমাসে শত বর্ষে ;
(যবে) লুটিবে গো দেশ বিজেতার পায়ে গৌরব করিয়া তুচ্ছ,
(শুধু) তুমিই রহিবে আপনার শির আপনি করিয়া উচ্চ।

(৭)

রাজা রাজ্যদেশ হোক্ ছারখার তাতে তুমি উদাসীন,
কোন্ জাতি কবে কোথায় পেরেছে তোমায় করিতে ক্ষীণ ?
কে বাঁধিবে তোমা নিগড় বাঁধনে যুদ্ধে করিয়া জয় ?
তুমি যে মহান্, উদার, উচ্চ, চির স্বাধীনতাময় !

(৮)

হেরিলে শ্যামল শস্য কাহার গাছে গাছে ফল ভার,
ঘুচে যায় সব বিলাপ বিষাদ, শুকে যায় অশ্রুধার
খেটে খুটে এলে ধায় শিশুগণ বক্ষে উঠিতে কার
দুঃখদৈন্য দূরে যায় ওগো থেমে যায় হাহাকার ?

(৯)

থাক্ তব দীন ক্ষুদ্র কুটীর শান্তি পুলক ভরা,
দূর হোক্ তব দেহটুকু হ'তে অকাল মৃত্যু জরা,
হাসিতে পূর্ণ হউক তোমার শস্য শ্যামল ক্ষেত্র,
তোমারি পুণ্যে ভরুক বিশ্ব, ধন্য হউক নেত্র।

(১০)

প্রকৃতি তোমার পল্লীতে করে শান্তি সন্ধ্যা-আরতি,
পাপিয়া দোয়েল শ্যামাপিক্ বধূ আনন্দেগায় প্রভাতী,
তরুণ-অরুণ কিরণ প্রথম হাসায় কুটীর দ্বার,
বিটপি মেলিয়া নয়ন নিরখে মুছিয়া অশ্রুধার।

(১১)

কর্ম্মের লাগি এসেছ জগতে কর্ম্ম করিয়া যাও,
হিংসার জ্বালা বিলাস বাসনা হৃদে নাহি স্থানদাও,
আবেশে রজনী কাটাইয়া দাও শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনে,
মেতে উঠে তব প্রাণটি তখন ভক্তির ধারা সিঞ্চনে।

(১২)

শস্যে তোমার চিন্তা ; সরল বিশ্বাস তব ধর্ম্মে ;
সুস্থ সবল শরীর তোমার নিয়োগ করেছ কর্ম্মে ;
জাগ্রত হও, দীক্ষিত হও আজিকে নবীন মন্ত্রে,
ঝঙ্কৃত হোক্ নূতন রাগিনী সুপ্ত হৃদয় যন্ত্রে।

রূপাপাত হাইস্কুল
ফরিদপুর। }　　শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গের কৃষি ও কৃষিশিক্ষা

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(২)

এ সম্বন্ধে গত পত্রে সকল কথাই একরূপ বলিয়াছি। যদি জাতিরূপে আমাদের ধরাপৃষ্ঠে জীবিত থাকিতে হয় তাহা হইলে আমাদের পুনরায় লাঙ্গলের দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তজ্জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহা সস্তা হয় ও কৃষকদের দ্বারে যাহাতে পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা বঙ্গের বরেণ্য সুসন্তান; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার এবং বাণীর মন্দিরের হোতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিগত ১৯২১ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা "কৃষি শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১০।৮।২১ সালের সার্ভেণ্ট পত্রিকার স্তম্ভে "ঢাকার কৃষি কন্‌ফারেন্স এবং দেশের প্রয়োজন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্বয়ে কি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে? আমাদের দেশের Lower Primer, Middle Primer, Upper Primer, Matruiclation এবং আই,এস্, সিতে কৃষির পুস্তক প্রচলন মাননীয় স্যার আশুতোষ এবং মাননীয় মিঃ প্রভাষ চন্দ্র মিত্রকে করিতে বলি, কারণ কৃষির অনুশীলন ও লাঙ্গলের মুঠে আশু প্রত্যাবর্ত্তন বিনা

আর আমাদের কল্যাণ নাই। সেই জন্য বলি যে কৃষি ও বিদ্যাসচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারদের কৃপা দৃষ্টি যেন আশু এই দিকে পড়ে। আমি সকল কথাই বলিয়াছি এখন যদি কেহ দেশ মাতৃকার কল্যাণ কামী সুসন্তান থাকেন, যদি কেহ দেশের নিম্ন কৃষককুলের, অসহায় চাষী ও শ্রমজীবিদের বন্ধু থাকেন, তাহা হইলে এইদিকে খাটুন, যাহাতে দেশের প্রকৃত হিত ও কল্যাণ সাধিত হয়। কথায় চিঁড়া ভিজিবে না, কাজ চাহি। ইক্ষু, তুলা, চিনি, গুড়, গোপালন, গোচাষ, মক্ষিচাষ, মেষচাষ, দ্রোণদুঘা গাভী উৎপাদন, ধান যব, বই, কড়াই, ফলচাষ, তরিতরকারী উৎপাদন, প্রকৃষ্টও উত্তম বীজ উৎপাদন, পুষ্পচাষ, গন্ধচাষ, সার প্রয়োগ আদি যে বিস্তারদ্বারা বেশী পরিমাণ খাদ্য সম্ভার উৎপন্ন হয় ও সে বিষয় শিক্ষা লাভ হয় তাহার ব্যবস্থা সার মুখোপাধ্যায়,বা সার পি, সি, রায় বা বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ মহোদয়গণ আশু করুন যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়। এই সব বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকে, তিনি আমার নামে সডাক পত্র দিতে পারেন। যদি কেহ এই সকল বিষয় ডাক যোগে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় শ্রমজীবি ও কিশান জগতে তীব্র অশান্তি, ধর্ম্মঘট আদি অশান্তির কারণে শ্রমজীবি সম্প্রদায় কার্য্য হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে জীবন সংগ্রামের তীব্র কসাঘাতে নানারূপ অশান্তির দেখা দিয়াছে, ভারতেও এই ঢেউ আসিয়া পড়ায়, কয়লার খনি, রেলওয়ে, ডক্, ডাক্ঘর, ছাপাখানা, কেরানি, জাহাজ ইত্যাদি নানা স্থানের কেরাণি মজুর ও শ্রমজীবিদের মধ্যে অশান্তি দেখা দিতেছে. সরকারের তাহাদের উপর নীপীড়নের ও অভাব নাই সেটা স্বাভাবিক কাজেই উচ্চ বাজার দর, খাদ্য সম্ভারের দুর্ম্মূল্যতা, কাজের অভাব প্রযুক্ত শত সহস্র মজুর বসিয়া আছে এবং দেশে সেই জন্য অশান্তির শ্রোত বেশী বহিতেছে। এই সকলের মিমাংসা আশু কি দেশের সুচিন্তক এবং সরকারের কর্ত্তব্য নহে কি? আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের শ্রমজীবি ও কৃষকদের সংঘদ্ধ হইতে হইবে; তাহার জন্য আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রমজীবি সমিতি বা কৃষক সমিতি কি করিয়াছেন, বা করিতেছেন? এই সকল সমিতিদের এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সমবায় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, করিতে পারে। রায় বাহাদুর পণ্ডিত চন্দ্রিকা প্রসাদের সমবায়ের বইখানি আমি সকলকে. যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের দেশে যাহাতে দীনামার দেশের মত সমবায় ভিত্তির উপর এই সকল সমিতি পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং ব্যবস্থা করিতে হইবে. যাহাতে কৃষকদের শস্য বেশী দরে বাজারে বিক্রীত হয় এবং তাহাদের পাট আদি উৎপন্ন ফশল যাহাতে পৃথিবীর ডিমাণ্ডের অনুযায়ী উৎপাদিত হয় ও বেশী দাম পাওয়া যায় তাহা করিতে হইবে। Co-operative-marketing, Co-operative transport ইত্যাদি সকল বিষয়

সমবায়ের ভিত্তির উপর আমেরিকা বা দীনামার দেশের মত কৃষকদের হিতকল্পে পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফল কথা উৎপাদনও খরচের ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; আমাদের চাষাদের উৎপাদিত ফশল সকল এরূপ ভাবে জন্মাইতে হইবে যাহাতে ফশলের ফলন ও পৃথিবীর ডিমণ্ড যথাযথ অনুপাতে (Proportion) বর্ত্তমান থাকে। আমাদের ফশল আমাদের চাষাদের দ্বারের মাপকাঠিতে, দাঁড়িতে উঠানামা করিবে, বিদেশীর টাকার ভারে সেইগুলি নিউইয়র্ক, ডাণ্ডি, লণ্ডন, এবর্ডীন, গ্লাশগোতে যেন দাম কসাকসি না হয় এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ইহার জন্য চাষাদের শিক্ষা চাই, বিশ্বাস চাই। ধার্ম্মিক কাজের লোকের দরকার। যদি বাঙ্গালায় সকল শ্রমজীবি, কৃষিজীবি, কর্ম্মজীবিদের এবং সমিতিগণ এই সকলদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সংঘবদ্ধ ও সমবেত হন তাহা হইলে দেশে প্রকৃত পূর্ব্বকথিতরূপ কৃষিশিক্ষা বিস্তার, সমবায় ভিত্তির উপর বিক্রয়, বাজার আদি যাহার বিষয় উপরে বলিয়াছি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এই দেশেও প্রবর্ত্তিত, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইবেনা। তাই বলি ভাই বাঙ্গালার শ্রমজীবিও কৃষকসম্প্রদায়, আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের দেশে আপনাদের অনুরূপ শিক্ষাবিস্তার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন। আপনাদের কাজ করিতে পারে ও আপনাদের সুখ দুঃখেরভাগী হয় এইরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদের দলের মধ্য হইতে বড় অথবা ছোট দপ্তরে পাঠান; বিলাত বা আমেরিকার শ্রমজীবিদের সমিতি ও শক্তিশালী সংঘ আছে সেইরূপ আপনাদের দেশে গঠন করিয়া শক্তিশালী করুন, কৃষির প্রকৃত উন্নতি করুন, গোধনের রক্ষা ও উন্নতি করুন। বড়লাট মাননীয় রেডিং বাহাদুর গোকনফান্সের ডেপুটেশানে সেদিন যে উত্তর দিয়াছেন তাহা কদাচ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না. যাহাতে দেশের কৃষিবিভাগ পুনর্গঠিত হইয়া দেশীয় চাষী ও বিদেশী বণিক্ ও অধিবাসীদের হিতকল্পে দেশে অবস্থান করে তাহার জন্য আন্দোলন করুন ও ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হন। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার FRAS,MAICC, MBPAA&C ৩১নং এলগীন রোড, কলিকাতা।

পক্ষিচাষ বা পুল্‌ট্রী ফার্ম্মিং

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি যে ভূমধ্যসাগরোপকূলস্থ জাতিগুলি প্রায়ই ডিমে তা দেয় না, তাহারা আদৌ ভাল "বসিয়ে" নহে, তাহা যেন পাঠক স্মরণ রাখিবেন; তাহারা সচরাচর বেশী ডিম পাড়িয়া থাকে; কিন্তু তা দেওয়া মুর্গীদের মধ্যে অপিঙ্গটন, ওয়াণ্ডোট্ এবং রক্‌জাতীয়গণ শীতের দিনে বেশী ডিম দেয়। কিজন্য মুর্গী রাখা হইবে

তাহা ঠিক করিয়া, কোন জাতীয় পক্ষী রাখা হইবে তাহা স্থির করিবে। কোন জাতি শীতে বেশী ডিম দেয়, কোন জাতি ভাল বসিয়ে, কোন জাতি ভাল পালক, কোন জাতি ভাল মেজের পাখী হয়, কোন জাতি বেশ ভাল ডিম দেয় কিন্তু ডিমে আদৌ বসিতে চাহে না, কোনজাতি ভাল "খাশী" (capon) হয় এবং কোন জাতি মোটা করার পক্ষে (fattening) ভাল। সাদা এবং কাল লেগর্হন, আন্দুলেশীয়, মিনর্কা এবং কাম্পিনীগণ বেশ ডিম দাত্রী বলিয়া অধ্যাপক লিওয়েরর মতে প্রসিদ্ধ। কোন কোন সঙ্কর জাতি বেশ ডিম দাত্রী হয়; এ সম্বন্ধে পূর্ব্বও নম্বর তারিখের পত্রে আলোচনা করিয়াছি। সামান্য পরিসরের স্থানে রাখিতে হইলে মিনর্কা মেজের এবং ল্যাঙ্গশান বা রক্ মুর্গী জাত ছানা ভাল; মিণর্কা মোরগের পরিবর্ত্তে লেগহর্ণ মোরগও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ছানাগুলি তত উত্তম মেজের পাখার কাজ দেয় না। মিণর্কা মোরগের পরিবর্ত্তে রেড্ক্যাপ বা চিত্রিত (moltted) হ্যামবর্গ অথবা কাল হ্যাম্বার্গ মোরগও এইরূপ সঙ্কর উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাউদান মোরগ এবং ভারি জাতীয় মুর্গীর সংযোগে বেশ ভাল সঙ্কর পাখী উৎপাদিত হইয়া আশানুরূপ ফল দিয়াছে। যেখানে পাখীগুলি বাঁবার ভিতর রাখা হয় না বা বেশী ছাড়া জমীতে উৎপাদিত হয় (are raised in open nulimited grounds orrans) ও চরিবার জন্য খুব পরিসর ভূমি পায়, সেখানে দুই "অবসিয়ে" জাতির মধ্যে সঙ্কর সংজনন না করিলে আশার অতিরিক্ত ফল দিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে, মিণর্কা বা রেডক্যাপ বা লেগহর্ণ মোরগ × হাউদাগ বা হ্যাম্বার্গে বা স্পেনীয় মুর্গী সংযোগে, অত্যুত্তম ফল পাওয়া গিয়া থাকে। ইহাদের ছানা আকারেও বড় হয় এবং বেশী ডিমও দেয়। মিণর্কা বা লেগহর্ণ মোরগ × ওয়াণ্ডোট মুর্গী; হাউদান মোরগ × মিণর্কা লেগহর্ণ বা অপিঙ্গটন মুরগী; লেগহর্ণ মোরগ × অর্পিঙ্গটন মুরগী এবং কাম্পিনী মোরগ × ওয়াণ্ডোট মুরগী সংযোগে বেশ ভাল সঙ্কর উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহারা ভাল মেজের পাখীও হয় এবং প্রচুর ডিম দাত্রীও হইয়া থাকে। সঙ্কর উৎপাদনে কদাচ সঙ্কর মোরগ ব্যবহার করিবে না; এই কাজে খাঁটি (pure lered) মোরগই ব্যবহার করা বিধি; সঙ্কর মুর্গী যদিও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও তত সমিচীন নহে, কিন্তু মোরগ কদাচ নহে। সঙ্কর উৎপাদনে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যে সংযোজিত পাখীগুলি ডিম দাত্রী বংশের ছানা হয়, তাহা হইলে ফল আশানুরূপ পাওয়া যায়। পাল বা ঝাঁকের মধ্যে কোন মুর্গীগুলি বেশী ডিমদাত্রী তাহা পালকের জানা উচিত, তাহা জানিতে হইলে খাঁচা যুক্ত বাসা (trap nest) সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমি এইরূপ বাসা আনাইয়া দিতে পারি। এই বিধি সর্ব্বাগ্রে আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয় এবং ইহার দ্বারা তদ্দেশীয় কৃষকগণ পালের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহাদের দেখা দেখি আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব পাড়ে ফরাশী, বেলজিয়ম বাসী, ডেন, ওলন্দাজ, ইংলণ্ড, আয়রলণ্ড,

জার্ম্মেনী, সুইডিশ প্রভৃতি জাতিগণ আপন আপন দেশে এই নিয়ম বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া আশার অতিরিক্ত সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞ, উদ্যমহীন দেশে এ সব কিছুরই চেষ্টা নাই। লোকে কাগজে লিখিলে "পাগল বেকার" বলিয়া উপহসিত হয়!! হায়রে অধঃ পতিত দেশ!!! খাঁচা বাসাগুলি এইরূপ উপায়ে নিৰ্ম্মিত যে বাসায় মুর্গী প্রবেশ করিলেই তাহার প্রবেশদ্বার আবদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই তাহাকে সেই বাসার মধ্যে ডিম পাড়িতে বাধ্য হইতে হয়। ডিম পাড়িলেই তাহার গাত্রে কাগজে লিখিয়া রাখা হয়; এইরূপ প্রক্রিয়ায় কোন্ কোনটি ঝাকের মধ্যে বেশী ডিমদাত্রী মুর্গী তাহা সহজেই জানা যায়; তাহাদের সাহায্যে উত্তম ঐরূপ গুণ বিশিষ্ট মোরগের সংযোগে ছানা উৎপাদন করিলে কাজে কাজেই তাহারা বেশী ডিমদাত্রী হয়; অধিকন্তু এই প্রক্রিয়ার দ্বারায় কোন্‌টি ঝাকের মধ্যে অলাভ জনক তাহা জানা যাইলে, তাহাকে তৎপর হাটে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। অবাধ ও আমি চীন হত্যার এবং দারিদ্রের দংশনে কত নিস্ব চাষা ভাল ভাল ডিমদাত্রী মুর্গীকে হাটে পাঠায় তাহা বলা যায় না। তাহার ফলে উৎপাদন কমিয়াছে এবং মুর্গীবংশের অবনতি হইয়াছে; এইরূপ কারণে আমাদের দেশের গোবংশও নির্ব্বাণোন্মুখ! ধন্য আমার দেশ, ধন্য হিন্দু ও ভারতবাসী আমারা!

মুর্গী-চাষে আমেরিকাবাসীগণ পৃথিবীর মধ্যে সকল সভ্য জাতি অপেক্ষা উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা মুর্গী সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পত্রিকা প্রচার করেন, উত্তম বই প্রকাশ করিয়াছেন, অল্প দামে অতি উত্তম উত্তম ডিমদাত্রী বংশের মুর্গী ও মোরগ, হাঁস, পেরু ও অপরাপর পক্ষি বা পশু পাঠাইয়া থাকেন। আমাদের দেশের মুসলমান এবং বহু শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ পাঠাগার ত্যাগ করিয়া অলস জীবন পাত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; ভগবানের আদেশ ত তাহা নহে। যদি সেই সকল বালকদের কেহ পথ প্রদর্শক হন তবে আমি তাঁহাদের বলি যে পক্ষিও গো পালন চাষ কর। কৃষি অনুসরণ কর যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়া দেশকে খাওয়াইতে পারিবে। লোক মান্য গন্ধিমহাত্মার নিকট আমাদের মত কৃষকদের প্রতিনিধিদের এই মাত্র প্রার্থনা যে তিনি যেন এদিকে দৃষ্টি দান করেন এবং দেশের দৈন্য ও খাদ্য সমস্যা দুর করণে আশুমনযোগ দান করেন। শিক্ষা নবিস পক্ষি পালকের পাখি পত্রিকা এক খানা নিয়মিত আনাইয়া পাঠ করেন, এসম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট ২।১ খানি বই ও পাঠ করেন এবং এদিকে সামান্য ভাবে হাতে কলমে কাজ ও আরম্ভ করেন, তবেত অভিজ্ঞতা হবে, তবেত কাজ শিখা যাবে, তবেত এ ব্যবসায়ের অভাব অভিযোগ জানা যাইবে এবং তাহা সংশোধন ও দূর করার পথ উন্মুক্ত হবে। বই পড়ে কার্য্যকরি বিদ্যায় বা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় না এটা যেন স্মরণ থাকে। আমরা বই ২।৪ খানা পড়িয়া উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়া, হইয়াছি, হাতে কলমে কাজ

করি না, করিতে জানি না ও করিতে শিক্ষা পাই না বলিয়া আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের শিক্ষার দোষ, আমরা ভাতের কাঙ্গাল; তাই আমাদের দেশে আজ কাল এক শ্রেণী চিন্তকদের এবিষয় নয়ন উন্মীলন হইয়াছে বলিয়া "Slave mentalityর" কথা উঠিয়াছে। তীব্র আন্দোলন কর। শাসকদের বুঝাও তোমাদের কি প্রয়োজন, তাঁহারা দিতে বাধ্য হইবে!!! আমার মনে হয় এবং সে কথা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি যে ভাল দেশী মুর্গী লইয়া ২।৫।১০টা করিয়া প্রত্যেক পালক বিলাতী মোরগ সংযোগে মুর্গীর উন্নতি করিলে খুবই ভাল হয়। ২।৪।১০ বৎসরে আমার নিস্ব দেশ আমেরিকার মত মুর্গী ব্যবসায় প্রভূত ধনী হইয়া পড়িবে। এই সব পাখী, বই ও কল আদি আমি সব আনাইয়া দিতে পারি। একজনে যদি না পার ২।৪।৫ জন কৃষক সমবেত হইয়া কাজ আরম্ভ কর এবং স্থানীয় জমীদার ও গ্রামের মণ্ডল ও নেতাগণ তাঁহাদের সাহায্যে করুক এই আমার স্বদেশ বাসীর কাছে বিনীত প্রার্থনা। এসম্বন্ধে আমাকে সডাক পত্র দিলে পুস্তক, পত্রিকা, মুর্গী, কল ইত্যাদি আমদানী সম্বন্ধে সকল খবর যত্নে প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষিত যুবকগণকে আমার পরামর্শ এই যে তাঁহারা পুল্‌ট্রী ও ডেয়ারি ফার্ম্মিং করিবার আগে কিছু এসম্বন্ধে থিয়োরেটিক্যাল জ্ঞান লাভের জন্য কিছু পাঠ করিয়া লয়েন এবং মল্লিখিত গোপাল বান্ধব ও আমার ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া তবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এসম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ পর পর পত্রে বলিব। মনে করিবেন না আমার পাঠকগণ যে আমি অবৈজ্ঞানিক লেকচার বা বক্তৃতা দিতেছি। প্রথম প্রথম তাহা একটু প্রয়োজন হয় বিষয়টা বুঝিবার জন্য কারণ দেশের গতিক খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে আমার স্বদেশ বাসী ভাইগণ এসব দিকে নূতন দৃষ্টি দিতেছেন বলিয়া কিছু অবতরণিকা ও পুর্ব্বাভাষ করিতে হয়; তাহা না হইলে সে বিষয় হৃদয় গ্রাহী হয় না!!

ক্রমশঃ

অধ্যাপক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
৩১নং এলগীন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
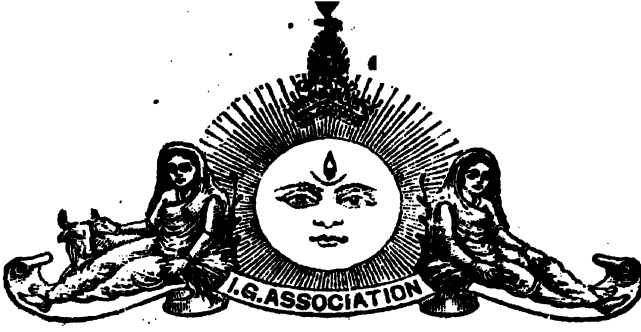
নব বর্ষ

বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে কৃষক ২৩ বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও এখানে শিক্ষিত মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষিচর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং অন্যান্য দেশে "কৃষকের" ন্যায় পত্রিকার যত গ্রাহক হইত এতদ্দেশে সে পরিমাণ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও একখানি বিশুদ্ধ কৃষি সম্বন্ধীয় পাত্রিকা যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থায় ২২ বৎসর কাটাইতে পারিয়াছে, তাহাও দেশীয় ব্যক্তিবর্গের কৃষি অনুরাগের পরিচায়ক। আমরা তজ্জন্য লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কৃষক ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখ পত্র। উক্ত সমিতির কার্য্য কলাপের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তজ্জন্য প্রথমেই আমরা সমিতির সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বলিব। অপরাপর বিষয়ে বিগত বৎসর সমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও একটি বিষয়ে ইহা সমধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত বৎসর দেশানুরাগী বিখ্যাত ভারতীয় কৃষি সমিতির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে দেশের ও ভারতীয় কৃষিসমিতির যে অনেক উপকার হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু

The world which credits what is done,

Is cold to all that might have been,

সুতরাং তাঁহার জীবনের অসম্পূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করিয়া বিশেষ ফল নাই।

কৃষি জ্ঞান-সাম্রাজ্যের অন্যতম বিভাগ। কার্য্যকরী জ্ঞানের হিসাবে ধরিতে গেলে কৃষি-বিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান। আমরা এস্থলে কৃষি অর্থে যাবতীয় ক্ষেত্রজাত

ফসল ও গৃহপালিত মানবের আহারোপযোগী যাবতীয় পশু পক্ষীর কথাই বলিতেছি। এইরূপ সুবিস্তৃত অর্থে ধরিতে গেলে কৃষি শুধু যে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান তাহা নহে, ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল বিজ্ঞানও বলিতে পারা যায়। কারণ সর্ব্বতোভাবে কৃষিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের অন্যূন সাতটি শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা আবশ্যক। যথা ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, বায়ু বৃষ্টিজ্ঞান, জীবাণুতত্ত্ব ও কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা। এই সমস্ত বিষয়ে যে সম্পূর্ণ পণ্ডিত হইয়া কৃষি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে কৃষিকার্য্যের সহিত এ সমুদয় বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-কার্য্য করিতে হইলে, তাহাতে উক্তবিজ্ঞান সমূহের যতটুকু আবশ্যক হয় ততটুকু আয়ত্ত করিতে হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বৈজ্ঞানিককৃষির আলোচনা করিতে হইলে, সুতরাং দেখিতে হইবে যে উক্ত প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগে কতটুকু নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাদের একত্র সমবায়ে ও প্রকৃত প্রয়োগে সাধারণ কৃষি কতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এতদ্দেশে এপর্য্যন্ত এমন সময় অথবা সামর্থ আসে নাই যে সাধারণ লোকে সভা সমিতি কিংবা স্কুল কলেজ গঠন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কৃষি বিজ্ঞান চর্চ্চা করে। এখনও পর্য্যন্ত ভারত কৃষি-জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে রাজার মুখাপেক্ষী। সুতরাং সাধারণ ভাবে ভারতীয় কৃষি সমালোচনা অর্থে সরকার-প্রতিষ্ঠিত সভা. সমিতি, স্কুল, কলেজ, নবতথ্যানুসন্ধানাগর প্রভৃতির সমালোচনা। এই সমুদয়ের সমালোচনা হইতে ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষির উন্নতির আভাস অনেকটা পাওয়া যায়।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা গোধুমের উন্নতি সাধন, বালুচিস্থানে ফল চাষ, বিভিন্ন জাতীয় তামাকের লক্ষণ নির্ণয় এবং ভারতীয় উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে পরকীয় নিষেকের (Cross-fertilization) মাত্রা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অন্যতম কার্য্য। ভারতীয় ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদের চেষ্টায় যে সমুদয় গোধুমসঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের শস্যের নমুনা বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। উক্ত নমুনা সমূহের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মার্কিন ও ক্যানেড়ীয় গোধূমের সমকক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে নির্ব্বাচন ও বিশিষ্ট প্রণালীতে সঙ্কর উৎপাদনের অভাবে ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় গোধুম সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বাজারেও উহাদের মূল্য কমিয়া যাইতেছিল; এক্ষণে সরকারের চেষ্টায় যদি ভারতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোধূম জন্মায় তাহা হইলে তদপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে?

কৃষি-রসায়ন বিভাগেও বিগত বৎসর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমালোচনা, আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ, জলের আবশ্যক হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জল যে ভারতীয় কৃষির প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকীয় দ্রব্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং

এতদ্দেশে জলের যেরূপ নিয়মিত ব্যবহার ও জল-সংরক্ষণ আবশ্যক হয় অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় না। সুতরাং কি পরিমাণ জল বিভিন্ন ফসল দ্বারা বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে নির্ম্মুক্ত হয় এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ফসলের বৃদ্ধির ও পরিপুষ্টির কোন অবস্থায় কত পরিমাণ জল আবশ্যক হয় তাহা জ্ঞাত হওয়া কৃষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই; আমরা শেষ ফল জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া রহিলাম। কৃষি-রসায়ন বিভাগে অন্যান্য পরীক্ষার বিষয়ঃ—মৃত্তিকা-উদ্ভূত বাষ্পের সহিত মৃত্তিকার অপরাপর উপাদানের সম্বন্ধ; কৃষ্ণবর্ণ ক্ষার বিশিষ্ট অনুর্ব্বর জমির পরীক্ষা ও ভারতীয় ধান্য সমূহের রাসায়নিক গঠন। শেষোক্ত বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে 'কৃষকে' সমালোচনা করিয়াছি।

উদ্ভিদ্‌রোগ বিভাগে ভারতীয় পরজীবি ছত্রকী জাতীয় উদ্ভিদ্ সংগ্রহ ও নাম নির্দ্ধারণের কার্য্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ভারতের অন্যান্য উদ্ভিদ্ সমূহ সম্বন্ধে বহু বর্ষ ধরিয়া ও বহু উদ্ভিদজ্ঞ পণ্ডিতের প্রাণপণ পরিশ্রমে যেরূপ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, ছত্রকী জাতী সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই হয় নাই। বস্তুতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ্ বিদ্যার চর্চ্চা ভারতে এক রকম ছিল না। সুতরাং এই সমুদয় সংগ্রহ ও নাম করণ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক উদ্ভিদ রোগ সম্বন্ধে গোদাবরী জেলার নারিকেল বৃক্ষের মুকুলের "ধসা" সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। বিগত কয়েক বৎসর হইতে গোদাবরী জেলায় এই ধসা রোগে অনেক নারিকেল গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই রোগের প্রতি-বিধানের জন্য ভারতীয় ছত্রকতত্ত্ববিদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সরকারী অভিজ্ঞেরা যেরূপ পরামর্শ প্রদান করেন তদনুযায়ী কার্য্য হয় নাই। ধসা রোগে আক্রান্ত নারিকেলের বাগানের পক্ষে প্রথমতঃ রোগগ্রস্ত বৃক্ষ-সমূহকে উৎপাটন করিয়া পোড়াইয়া ফেলাই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। তাহার পর যে সমস্ত বৃক্ষ বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, অথবা যাহাদিগকে রোগ বিশেষ রূপে আক্রমণ করে নাই, সে সমুদয় বৃক্ষে চূণ ও খৈল, পাঁস, মাছের সার ও লবণ মিশ্রণ প্রয়োগই রোগের অন্যতম প্রতিকার। যে সমুদয় স্থলে এই সকল উপদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে সে সকল স্থানে রোগের প্রাবল্য কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেখানে কৃষকেরা তাহাদের চিরন্তন ও বংশগত নবপ্রথা-প্রবর্ত্তন-বিরোধীতার আবেগে উল্লিখিত প্রথায় সন্দিহান হইয়াছে সেইখানেই ফল সুবিধাজনক হয় নাই।

নারিকেল রোগ ব্যতীত বিগত বৎসর চা'র ব্যাধি কালমরিচ, আদা, লেবু, পেঁপে ও ইক্ষু প্রভৃতির রোগ সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণ অনুসন্ধান চলিতেছিল। ফল যে তেমন ভাল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে এ সকল বিষয় অনুসন্ধানে বিশেষ সময়

আবশ্যক হয় এবং আশা আছে যে আগামী বৎসরে এই সমুদয় পরীক্ষা হইতে শুভ ফল পাওয়া যাইবে।

ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ্ যেরূপ বৃক্ষের বিশেষ অপকার করে কীট দ্বারাও সেইরূপ কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ছত্রক তত্ত্বের মত কীটতত্ত্বের আলোচনাও কৃষকের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। বিগত বৎসর কীটতত্ত্ব বিভাগে কৃষকের পক্ষে শুভজনক কতিপয় বিশেষ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যতম—ভারতীয় কৃষি-সমিতি দ্বারা "ফসলের পোকা" নামক গ্রন্থ প্রকাশ। ভারতীয় কীটতত্ত্ব বিদের অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ দ্বারা এই পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। এবং ইহাতে কৃষিকার্য্যের অনিষ্টকারী যাবতীয় কীটের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুন্দর ছবি সাহায্যে কীট সমূহের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে ও আমাদের বিশ্বাস যে এই পুস্তকের দ্বারা অনেক কৃষকের উপকার সাধিত হইবে।

অনিষ্টকারী কীট দমনের জন্য যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, শুভকারী কীট প্রতি-পালনেরও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। কীটতত্ত্ব বিভাগের উদ্যমে ও চেষ্টায় এড়ী, তুঁত, তসর ও লাক্ষা পোকার চাষের কিয়ৎ পরিমাণ বিস্তৃতি হইয়াছে। বিগত বৎসর অনেক স্থলে সরকারের চেষ্টায় এই সমুদয় পোকার চাষ আরব্ধ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে উত্তরোত্তর এই সমুদয় শাখায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

বিভিন্ন ফসল সমূহ উৎপাদন সম্বন্ধে যে কি কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। তবুও কি কি ফসল সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে উল্লেখ করিব। বিগত বৎসর প্রধানতঃ কার্পাস, গোধূম, চীনাবাদাম, ইক্ষু, তামাক, নীল, পাট, শণ, চা, সিমুল আলু ও ধান্য সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিয়াছিল। চীনাবাদামের চাষ গত বৎসর অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের সুন্দরবনে জমি আছে তাঁহারা সুখী হইবেন যে বিঘা প্রতি লবণাক্ত জমিতে প্রায় ৯—১৪ মণ চীনার বাদাম উৎপাদিত হইয়াছে। কাশ্মীরে এতদিন পর্য্যন্ত চীনাবাদাম চাষের প্রথা ছিলনা। গত বৎসর হইতে ঐ স্থানে চীনাবাদাম উৎপাদিত হইতেছে। কাশ্মীরে চীনাবাদামের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। সুতরাং উহার চাষ যে বিস্তৃতি লাভ করিবে তাহারও কোন সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্টতর জাতি প্রবর্ত্তন করিয়া ইক্ষুর গুড় উৎপাদনের মাত্রা অধিক করিবার জন্য অনেক স্থলে পরীক্ষা আরব্ধ হয়। মাদ্রাজে সমালকোট, বোম্বায়ে মাজরি, যুক্তপ্রদেশে প্রতাপগড় ও বঙ্গদেশে সাহাবাদ, বালেশ্বর এবং বীরভূমে কতিপয় পরীক্ষা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে অ্যামোনিয়াম সল্‌ফেট্ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অ্যামোনিয়াম সল্‌ফেট্ ব্যতীত, কুসুম ফুলের বীজের খৈল ও শণের সবুজসার ও ইক্ষুক্ষেত্রে প্রয়োগের বিশেষ উপযুক্ত।

কাবুলী ছোলার চাষ ক্ষেত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা অন্যান্য ফসলের পরীক্ষাদি সমূহের বারান্তরে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ মোট ফল দেখিতে গেলে ফসলাদির পরীক্ষা আশাপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়।

আমরা এতক্ষণ সরকারী কৃষির বিষয় বলিলাম। ভারতীয় কৃষি-সমিতি নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতদূর কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। অপরাপর বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও তাঁহাদিগের গোবিন্দপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে ফল সব্জী ও ফসল সম্বন্ধে কতিপয় পরীক্ষা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই সমুদয়ের মধ্যে যে সকল পরীক্ষা সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় নাই, আমরা সে গুলির এখানে উল্লেখ করিব না। অপর কতকগুলির ফল এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত না হইলেও বিগত বৎসরের পরীক্ষায় শেষ ফলের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত শ্রেণীর পরীক্ষাবলীর মধ্যে দার্জ্জিলিং ও নৈনিতাল আলুর চাষ একটি। অল্প বৃষ্টিপাত ও বীজের দোষ থাকায় ফলন যদিও সে রকম সুবিধাজনক হয় নাই তথাপি উভয় প্রকারের ফলনের তুলনায় দার্জ্জিলিং আলুর ফলনই বেশী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কীট অথবা ছত্রক রোগ সম্বন্ধেও দার্জ্জিলিং আলু অধিকতর রোগসহ। বর্ত্তমান বৎসরেও এই পরীক্ষা চলিবে এবং আশা করা যায় যে, ইহার ফলে নিম্নবঙ্গের সাধারণ দোয়াঁস মৃত্তিকার পক্ষে কোন জাতীয় আলু উপযুক্ত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাগানের মাসিককার্য্য

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান—মাখনসীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেপারি বীজ জৈষ্ঠ; আষাঢ় মাস পর্যন্ত বসান চলে। শসা বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালাঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১

দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জেয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারী পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাক্ষের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ ইক্ষুর বা আখের টাক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময় বা জৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুলবাগান—বৈশাশ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারাস্থাস, দোপাটী, গ্লোবআমরাস্থাস্, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মাটিনিয়াগুা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী, ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরির্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি, গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আটিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সবগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

---

২৩ খণ্ড। { কৃষক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল। } ২য় সংখ্যা।

কার্পাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট জাতীয় বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত। আমাদের দুরদৃষ্ট গুণে সবই গিয়াছে। ঢাকার মশলীন জগদ্বিখ্যাত, ঐ দেশের আবরোয়া আর জন্মায় না। এখনও ঢাকাই মলমল্ রুস ও মিশরের সুলতান ও খেদীব উষ্ণীষে ব্যবহার করেন। মান্দ্রাজের কালিকট্ ও মণ্ডলিপত্তনের বস্ত্র ও ছিট ভারতের আদরের জিনিষ; তাহার ব্যবসা মরণোন্মুখ। কালিকটের ছিট হইতে বর্ত্তমান বিলাতী ক্যালীকো উৎপন্ন হইয়াছে; মান্দ্রাজ দেশ হইতে বহু পরিমাণ লংক্লথ বিদেশে রপ্তানি হইত। পাটনা ও লক্ষ্ণৌ এই সকল ছিটের প্রধান আড়ং ছিল; ভারতের শিল্পকলা যে রূপ নষ্ট হইয়াছে এরূপ জগতের ইতিহাসে এদেশের কোন শিল্পীজাতী এইরূপ পথের ভিখারী হয় নাই; কোন জাতিরই এরূপ উৎকৃষ্ট শিল্পকলা নষ্ট হইতে দেখা যায় নাই।

বস্ত্র শিল্পের উন্নতি ও বিদেশে রপ্তানীর বন্দোবস্ত করিতে হইলে আমাদের নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। (১) বিদেশী ছাড়িয়া দেশী কাপড়াদি ব্যবহার করিতে হইবে। (২) মিহি ছাড়িয়া মোটা পরিতে হইবে। (৩) কল ছাড়িয়া চরকার প্রস্তুত করা কাপড় পরিতে হইবে এবং কলের কাপড় যদি একান্তই পরিতে হয়, তবে দেশী কলের কাপড় পরিতে হইবে, তাঁতে বোনা কাপড় পরিলে বহু দুঃস্থ পরিবারের অন্ন সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। (৪) পরীক্ষিত ও বহু প্রতিষ্ঠিত দেশীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসের চাষ বাড়াইতে হইবে। (৫) দেশের চারিদিকে দীর্ঘ প্রসারী (long stapled) ও সর্ব্ববিধ অধিক

ফলবান কার্পাসের চাষ করিতে হইবে। যাহাদের কলও ভুমির সুবিধা আছে তাঁহাদিগকে দেশে মিশরী ও মার্কীনি দীর্ঘ প্রসারী কার্পাসের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। (৬) প্রত্যেক লোককে অন্ততঃ ২ জোড়া কাপড়ের তুলা ও সুতা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইবে। (৭) প্রত্যেক গৃহস্থ বা চাষীর উদ্যানের আশে পাশে বৎসরে ৮।১০ সের পরিমাণ তুলা জন্মিতে পারে এই রূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস রোপণ ও চাষ করিতে হইবে। উত্তম জাতীয় বেশী-প্রসবকরী কার্পাসের চাষ দেশে বৃদ্ধি করিতে হইবে, আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উপরোক্ত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দেশের প্রণষ্ট বস্ত্র শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারিব নচেৎ তাঁতীকুলের শনির দৃষ্টি এড়াইতে পারা যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমরা বিলাসীর অগ্রগণ্য হইয়া পড়িয়াছি, মিহি বস্ত্র না হলে মন ওঠে না, গৃহলক্ষ্মীদের মিহি সুতার ধোপদস্ত কালা পেড়ে না হইলে মন মজে না। খনার বচনে আছে "শতচাষে মুলো" তার অর্দ্ধেক তুলা অর্থাৎ তুলার জমীতে যত বেশী চাষ হইবে ততই ফসল বেশী হইবে। উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস পূর্ব্বে ভারতেই জন্মিত, ভাগ্যক্রমে মার্কীণেরা তাহার চাষ করিয়া অপরিসীম উন্নতি করিয়াছে, আমাদের দেশের বীজ লইয়া যদি বিদেশে লইয়া মার্কীণ বাসীরা তাহার এত উন্নতি করিতে পারে, তবে আমাদের দেশের বীজ, আমাদের দেশের জল বায়ুতে, আবশ্যক হইলে এবং ঋতুদ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারিলে আমরা দেশী উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসের উন্নতি ও বিদেশী উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসের চাষ প্রবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারি। বিগত শত বর্ষ ধরিয়া দেশী বস্ত্র শিল্পের অনাদর, অযত্ন এবং কার্পাসের অযথা কর্ষণ জন্য তুলার উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অলাভ ও অল্প মুল্যতা বশতঃ সাধারণ কৃষক তুলার চাষ প্রায় ত্যাগ করায় অন্যান্য লাভ জনক কৃষি কর্ম্ম জাত ফসল উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে কিন্তু উত্তমরূপ ভুমি কর্ষণ ও সার প্রয়োগ দ্বারা যদি উন্নত উপায়ে দেশী বা বিদেশী দীর্ঘ প্রসারী উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ দেশে প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই লাভ দেখিয়া সাধারণ কৃষক ইহার চাষে যত্নবান হইবে; বিশেষতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অন্যান্য রবি শস্যের সহিত ইহার চাষ দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে কৃষক উপরি লাভের আশায় ইহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারগ ও সক্ষম হইবে। গয়া, পালামু, সিংভুম, বীরভুম, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, সাওতাল পরগণা, রাঁচী, মানভুম প্রভৃতি জেলার পার্ব্বত্য প্রদেশে বেশ কার্পাসের চাষ হইতে পারে, এবং চাষের উন্নতিও করা যাইতে পারে। কিন্তু সেদিকে আমাদের জমীদার প্রজা এবং রাজার আন্তরিক ইচ্ছা কোথায়? প্রথমতই ত বীজ সঙ্কট। চাষী উত্তম সস্তা বীজ পায় কোথায়? পয়সা দিয়াও সে তাহা পায় না। কৃষি বিভাগ সে জন্য বর্ত্তমান কিন্তু তথায় যে "বীজ রহস্য" কয়েক বৎসর সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় তাহা আমরা আজও ভুলি নাই। সে বিষয় ব্যবস্থাপক সভা পর্য্যন্ত যাইয়া শ্রাদ্ধ গড়াইয়া ছিল। বিগত ১৯১৫।২০, ২০১৫।২০

তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৮।৫।২০ তারিখের ইংলিসম্যান যত্নে পাঠ করিলে এবং কৃষি বিভাগের শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত ও মিঃ স্মীথের ফাইল দেখিলে সব কথা বিশেষ পুংখ্যানু পুংখরূপে জানা যাইবে। এখন কাজের কথা বলি। কার্পাস বীজ ভেদে ২ প্রকার; কাহারও বীজ পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ এবং কাহারও বীজ পরস্পর পৃথক ও উপরি-ভাগে দৃঢ় সম্বন্ধ তুলায় আবৃত। যে তুলার আঁইস লম্বা তাহাকে লঙ্গষ্টেপল্ (long stapled) বা দীর্ঘ প্রসারি, এবং যে গুলির আঁইস ছোট তাহাকে স্বল্প প্রসারী তুলা বলে কার্পাস তন্তু (fibre) দ্বি বা ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে; যাহার তুলা (lint) কোমল (Soft), স্থূল (Coarse, এবং সূক্ষ্ম (Fine); কার্পাসতুলা সাধারণতঃ শ্বেত (white or snow) এবং ফিকারক্ত এই দুই বর্ণের হইয়া থাকে। কাপাস তিন শ্রেনীতে ভাগ করা যায়ঃ—১ বার্ষিক (Anunal) ইহাদের প্রতি বৎসর চাষ করিতে হয়; ইহাকে নর্ম্মা কার্পাস বলে। উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস মাত্রই এই শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। ঢাকা, দীনাজপুরী, খুদেনর্ম্মা, গুজরাটী, বেরার, হিঙ্গনঘাট, বরোচ্, প্রভৃতি ভারতীয়, মিটাকিফি, আবাদী, আনোভিচ্ প্রভৃতি মৈশরী, এবং ক্যারোলাইনা, সিআইল্যাণ্ড, জায়রজীয়া, ট্রাইস, লোনষ্টার প্রভৃতি মার্কিনী কার্পাস এই শ্রেণীভুক্ত হইতেছে। এই শ্রেণীভুক্ত তুলা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম, কোমল, উজ্জ্বল, রেসমের মত মসৃন, সাদাবর্ণ, দীর্ঘপ্রসারী এবং সূত্রতন্তু ১৷৷০ হইতে ২৷৷০ বা ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও প্রধান উপাদান। (২) গুল্ম কার্পাস (Shrub Cotton) এই শ্রেণীর কার্পাসে কোন ২ জাতির আঁইসে ৪০ নং পর্য্যন্ত সূতা কাটা হইয়া থাকে। বুড়ি, ওল্‌লা, গারো, ষ্টানলি, পালামু, বাঙ্গীষ্টান্‌কীন্ প্রভৃতি জাতিয় কার্পাস এই শ্রেণীভুক্ত। (৩) গাছ কার্পাস (Tree Cotton) এই শ্রেণীয় গাছগুলি ৮।১০হাত হইতে ১৫।১৬হাত উচ্চ হয় এবং ১০ হইতে ২৫বৎসর জীবিত থাকিয়া উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে ফলণ হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার কারাভনিক উল ও সিল্ক (Cardvonica Wool & Silk) দুই প্রকার কার্পাস এই শ্রেণীভুক্ত; মান্দ্রাজ ও সিংহলে ইহাদের চাষের ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্পাস সমুদ্রতট হইতে ৯০০০ফিট উচ্চভূমিতে পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে এবং ইহারা চাষে প্রচুর সার ও জল সেচের আবশ্যক হয়। অনাবৃত, বাতাতপসঞ্চার বহুল জমিতে কাপাস ভাল উৎপন্ন হয়; যে অধিক পরিমাণে সূর্য্যের উত্তাপ সঞ্চয় রাখিতে পারে কাপাসের পক্ষে তাহাই বিশেষ উপযোগী ক্ষেত বলিয়া জানিবে। বেরার, ধারোয়ার, রুষিয়া, পোলাণ্ড, জর্জীয়া, পুসিয়ানা প্রভৃতি দেশের মত কাল মাটী কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী। যে জমীতে বহুকাল ধরিয়া লতাগুল্মাদি জন্মিয়া পচিয়া উদভিদ্ সারে তাজা হইয়া থাকে সে জমীও ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী। যে জমীতে সকল প্রকার সবজী জন্মিয়া থাকে এইরূপ দোঁয়াশমাটী ও সার দিয়া কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী।

বেলে মাটীতে গোবর ও পাতালতা গুল্মাদি পচা সার দিয়া মাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আক এবং কার্পাস চাষের পক্ষে বেশ হিতকর। মিশরীয় চাষারা নীলনদের ধারে এইরূপে কার্পাস চাষ করিয়া থাকে। কার্পাস চাষে সেচের বেশ সুবিধা করা আবশ্যক। বেলে মাটীতে সার দিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্ষাপ্লাবিত নদী সৈকতে সার দিবার আবশ্যক হয় না, কেবল সেচের ব্যবস্থা করিলেই চলে। মিশর দেশের নীল নদপ্লাবিত উভয় সৈকতে বহুল মিশরী কার্পাসের চষ হায় ;আমাদের দেশেও সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাট, বিহার, পালামু প্রভৃতি দেশেও এই প্রকার দোয়াশ বেলে মাটীতে মিশরী কার্পাসের চাষ হইতেছে ; মোটামুটী উষ্ণ, বেলে মাটীতে মিশরী কার্পাসের মত সমজাতীয় কার্পাস উত্তমরূপ জন্মে। শোণগঙ্গা, গণ্ডকী, বাগমতী, কুশী, কমলা, দামোদর, অজয় কন্তু, পুনপুন, তীষ্টা প্রভৃতি নদীর উভয় কুলে মিশরী জমীর মত জমী বহুল দৃষ্ট হয়। তাহাতে কার্পাস চাষ আরব্ধ করিলে বেশ লাভ পাওয়া যাইতে পারে। শুদ্ধ বালুকাময় জমী কার্পাস চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। লাল কাঁকুরে মাটীতে উত্তমরূপে সার দিয়া সেচের ব্যবস্থা করিলে বেশ কার্পাসের ফসল দেয়। আমাদের দেশে গয়া, পালামু, আসাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, চট্টগ্রাম, সাঁওতাল পরগনা, বর্দ্ধমান, মানভূম, সিংভূম, রাচী প্রভৃতি দেশে লাল কাঁকুরে মাটী বিস্তর দেখা যায় ; এই সকল জমীতে প্রচুর সার দিয়া সেচের ব্যবস্থা করিয়া কার্পাস চাষ করিলে বেশ ফলন হইতে পারে। বাতাস চালিত পাথার ব্যবস্থা করিলে পাৎকুঁয়া বা প্রবাহমান নদী হইতে জল তুলিয়া সেচের ব্যবস্থা বেশ সুলভে হইতে পারে। আমাদের দেশের চাষারা তাঁহাদের স্বল্প পুঁজী লইয়া বেশ চালাইতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয়। দোঁয়াশ মাটী কার্পাস চাষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ও সমিচিন ; অভাবে ধান, আক, পাট, আলু ও তামাকের জমীতেও কার্পাস চাষ সার দিয়া চলিতে পারে। যদি জলে বর্ষায় কার্পাসের গোড়া ডুবিয়া যায় তাহা হইলে "জুলী" কাটিয়া জল নিকাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়।

নীলের সীটি, পচাগোবর, ছাই, পুকুরের বা নর্দ্দামার বা পুরাণ ডোবার বা বীলের পচামাটী বা পাঁক, গৃহস্থের বাড়ীর আবর্জ্জনা বা গোয়ালের ঝাঁটুনি, সোরা, গোমুত্র, হাড় চুর্ণ, ছাগল, মেষ, মহিষাদির বিষ্ঠা, পচা পাতা সার,পানাপচা, টোকাপানা বা কচুরী পানার পোড়া ছাই, পুকুরের শেওলা ইত্যাদি সার যুক্তিযুক্ত রূপ প্রয়োগ করিলে ভূমি শীঘ্রই সরস হইয়া কার্পাস চাষোপযোগী হইয়া উঠে, নীলের সিটী বিঘা পিছু ৩০।৪০ ঝুড়ী, ছাই ১০।১২ঝুড়ী, দিলে পশুবিষ্ঠা বা গোময় বা পচাপাতা, সারজনিত যে পোকাধিক্য মাটীতে জন্মায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। উপরোক্ত সার গুলি judiciously ও আবশ্যক মত মিশাইয়া তাহাতে ছয় আনা অংশ ছাই মিশাইয়া জমীতে প্রয়োগ করিলে কীটের উপদ্রব বড় হয় না। গোময় পচাপাতা অন্যান্য পশু বিষ্ঠা, পাঁকমাটী আবর্জ্জনাদি বিঘা

প্রতি ৪০।৫০ ঝুড়ী দিলেই চলিতে পারে। গোমুত্রে খুব বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে; ইহা গাছের প্রধান খাদ্য। ইহা খুব পচিলে বিঘা পিচু ১৮।২০ কেরোসিন তেল টিনের ওজনে মাটীতে ছড়াইয়া চাষ দিবে। সারও মাটীর উপর ঝুড়ী করিয়া ঢালিয়া দিবে। ২।৩ বা ৪ দিন পরে বেশ রৌদ্রে শুখাইলে মাটীর সহিত চাষ দিয়া মিশাইবে। তুলার এবং মূলার জমীতে খুব চাষ দিয়া মাটীকে ধুলার মত মিহি করিতে হয় তাহা যেন শিক্ষানবিস চাষীর মনে থাকে। গাছের গোড়ায় পচা গোমুত্র প্রয়োগ করিলে বেশী তুলার ফলন হয়। হাড়চুর্ণ বিঘা পিছু ৩।৪ মণ কর্ষণের সময় ছিটাইয়া চাষ দিলেই বেশ উপকারী হয়। কাঠ কয়লার গুঁড়া ও হাড় ভাঙ্গিয়া তাহার উপর কিছু সালফিউরিক এ্যাসিড্ ছিটাইয়া মিশাইয়া মাটী চাপা দিয়া ১৫।২০ দিন পরে চাপা মাটী সরাইয়া হাড় গুলিকে পাথরে বা জাঁতায় বা কোনরূপ মুগুর দিয়া মশকাইয়া চূর্ণ হইলে মাঠে আবশ্যকমত ছিটাইয়া দিয়া চাষ দিবে। অন্যান্য সারের সঙ্গে হাড়চূর্ণ মিশাইয়া ও জমীতে প্রয়োগ করিলে কার্পাসের ফলন বেশী হয়, তন্তু দৃঢ় হয়। বিঘা প্রতি ৩০।৩৫ ঝুড়ি গোবর, ৫।৭ ঝুড়ী ছাই, ৫।৮ টিন গোমুত্র, ১৫০।২০০ ঝুড়ী টোকাপানা, কচুরীপানা বা শুঁড়ীপানা, ১০।১৫ ঝুড়ী আবর্জ্জনা জমীতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বার্ষিক কার্পাসের চাষে প্রতি বৎসর এইরূপ পরিমাণে সার দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু যে সকল জাতীয় কার্পাস ৩।৪ বৎসর বা ততোধিক কাল জীবিত থাকে, তাহাদিগের জন্য প্রথম বৎসর এই উপরোক্ত পরিমাণ সার দিয়া উত্তরোত্তর বর্ষে ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সার দিলেও চলে। কার্পাসের জমীতে খইল বিঘা প্রতি ১০।১৫ মণ দিলে জমী খুব উত্তম রূপ কার্পাস চাষোপযোগী প্রস্তুত হয়। সোরা সার বিঘায় ১॥।২ মন দিতে হয়। সোরা গুঁড়াইয়া বর্ষায় প্রথমে জৈষ্ঠমাসে ও শেষে ভাদ্রমাসে বরাবর ছিটাইয়া দিয়া পরে সেচ দিবে যাহাতে সোরা গলিয়া যায়, কারণ জল ব্যতিরেকে সোরা গলেনা এবং তাহা জমীর অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলে গাছের তেমন উপকার হয় না। সোরা অপর সারের সহিত মিশাইয়া জমীতে প্রয়োগ করা উচিত, তাহা না হইলে শুদ্ধ সোরা সার প্রয়োগে গাছের পাতা বাড়ে তেজ হয় কিন্তু ফলন বেশী হয় না। আমাদের দেশে চাষীরা কার্পাস চাষে জমীতে সার না দিয়া ১৫।২০ সেরের বেশী তুলা পায় না কিন্তু আমেরিকার চাষীগণ হাড়চুর্ণ, কেনিট্, গুয়েনো, ফসফেট্ আদি নানাবিধ রসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া বিঘা প্রতি ৩ মনেরও অধিক তুলা ফলাইয়া থাকে। আমি পালামুতে নিজ পার্ব্বত্য জমীতে সার দিয়া বিঘা প্রতি ২॥৵৩ মন তুলা পাইয়াছি।

ক্রমশঃ

জাপানী কৃষি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাহারা মনে করে মাটী সারকে শস্যে পরিনত করিবার যন্ত্র মাত্র। ইহাই তাহাদের জমির ফসল উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির এবং উষর ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার গুপ্ত মন্ত্র। তাহারা উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ্; নগরের আবর্জ্জনা, সমুদ্রের ঝাঁজি শৈবালাদি, নিম্ন ভূমির পাঁক, নর্দ্দমা, খানা, ডোবার আবর্জ্জনা প্রভৃতি শুষ্ক ও আর্দ্র ভূমির জন্য ব্যবহার করে এবং প্রেত্যেক খামারে রাশীকৃত মিশ্রসার জমা করিয়া রাখে। তা ছাড়া মৎস্য সার, খইল সকল জন্তুর বিষ্ঠা, বিশেষতঃ মানুষের মল মুত্রই জাপানে সারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

সার প্রস্তুত করণ ও প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটী বিশেষত্ব। প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্ব্ব প্রকার পরিত্যক্ত বস্তুই সারের কাজ করে। "সার" হয় তরল অথবা সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে প্রযুক্ত হয়। ঋতু এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে সার আবশ্যক মত তরল করিয়া ব্যবহার করা হয় কিন্তু মৎস্য, খইল, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, চূর্ণ, ঝিনুকাদির খোলা, ছাই, মাটী অস্থি চূর্ণ প্রভৃতি একত্রে পচিতে দেওয়া হয়।

পচিয়া অতি সূক্ষ্ম গুড়ায় পরিণত হইলে সার মাটীর মত ব্যবহৃত হয়। বীজ বা চারা বুনিবার সময় নালী কাটার দাগে তরল "সার" ঢালিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। বপনের পুর্ব্বে, এক স্তর মিশ্র সার পাতলা করিয়া পংক্তির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তৎক্ষনাৎ তাহার উপর অল্প মাটী মিশ্রিত সার দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ যখন গজাইতে থাকে তখন গাছগুলির মধ্যবর্ত্তী জমি পুনঃ পুনঃ খনন করিয়া প্রত্যেকবারই অল্প মাত্রায় তরল সার গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অল্প মাত্রায় অথচ ঘন ঘন সার প্রদান জাপানীদের পদ্ধতি। প্রথম সার প্রদানকে তাহারা বলে অঙ্কুরোৎপাদক সার। গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে তখন তাহাদের আহার স্বরূপ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে "সার" দেওয়া হয়। শীষ গুটি ধরিবার সময়ে শেষ "সার" দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ 'সার' কখনই দেওয়া হয় না। ডাক্তার নাগাই বলেন এই পদ্ধতির জন্যই জাপান আবাহমান কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট প্রতি বৎসর ফসল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞগণ জাপানিকে বিলক্ষণ পরিমিত ব্যয়ী, হিসাবী ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। ভারতবর্ষে বীজ বপনের পুর্ব্বে যে রাশি রাশি সার খরচ হয়, সেরূপ অযথা অপব্যয় করিতে জাপানিরা জানেই না। 'সারের' উপর তাহাদের লক্ষ্য। তাহারা সমগ্র দেশের জন সংখ্যার হিসাবে কত সার হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছে।

শতকরা ২৫ ভাগ নানা কারণে নষ্ট হয়। তিন কোটী ষাট লক্ষ লোকের 'সার' এক কোটী বিশ লক্ষ একর ভূমির সার যোগাইয়া থাকে। ইহাতে সকল বয়সের তিন জন ব্যক্তির 'সার কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূমি প্রতি পড়ে। যাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাও নানা কৌশলে ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা হইতেছে। কারণ এই "সার" অধিক প্রাপ্তব্য, গুণে উৎকৃষ্ট এবং মূল্যে সকল রকম 'সার' অপেক্ষা সস্তা। জাপানের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সার' ভারতে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয় ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

অধিকন্তু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে না। তাহারা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, অন্যায় অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচ শত মন শষ্য উৎপন্ন করে এবং সপরিবারে ২॥ শত মন আহার করে ও ২॥ শত মন বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারা সপরিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহন করিয়াছে তাহা 'সারের' আকারে ক্ষেত্রে প্রত্যার্পণ করিবে এবং যাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ 'সারের আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে। এই 'সার' এদেশে ঘরের 'কড়ি' দিয়া বিদায় করে। কিন্তু জাপানে ইহার সংরক্ষন, ইহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে সার প্রস্তুত করন ও ইহার ব্যবসায়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহা দেশের কৃষি পরিক্ষা সভা সমিতিতে পরিক্ষিত হয়। সারে কেহ ভেজাল দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। এইচিকেন (Aichiken) কৃষি পরিক্ষা সভার রাসায়নিক পরিক্ষায় প্রকাশ যে 'সার' হইতে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়ার আকারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায়। তাহাতেই চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ বিকিরণ করে কিন্তু নাইট্রোজেন মাটীর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান উপকরণ। সুতরাং যাহাতে এ্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পায় তাহা করা আবশ্যক।

সার কোন অভেদ্য পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া ছায়া যুক্ত স্থানে (চালার নিচে) ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে শতকরা দুই ভাগ চুণ দিলে আরও ভাল হয় কিন্তু খড়ি দিলে অনিষ্ট করে। চুনের পরিবর্ত্তে (১) খড়ি মাটী (gypsum), (২) উদ্ভিদের পচা শিকড় বিশিষ্ট জলা ভূমির মাটীর শুষ্ক গুড়া, (৩) গুড়া করা শুষ্ক আটাল মাটী, (৪) কয়লার গুড়া ও (৫) করাতের গুড়া ও ব্যাবহার করা যাইতে পারে—। জাপানের কোন পরিক্ষা ক্ষেত্রে Experimental station) এক মাসের পরিক্ষায় দেখা হইয়াছে যে কি উপায়ে রক্ষা করিলে সার হইতে কত পরিমাণ নাইট্রোজেন বাঁচাইতে পারা যায়। মোটের উপর নাইট্রোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজ সাধ্য উপায় এই যে চালার নীচে পাত্র পুতিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে শত করা তিন অংশ Superphasphate মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা শ্বেত সার যুক্ত অর্থাৎ মণ্ডবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিৎ নহে। ভারতের এত নদ নদীতে সমুদ্র জলে ও উপত্যকা ভুমিতে ও অন্যত্র

'সার' ফেলিয়া দেওয়া হয় যে তাহাতে কৃষি ক্ষেত্রের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্তু জল দুষিত হইয়া স্বাস্থহানি ও হইয়া থাকে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের দিনে জাপানের কৃষি পদ্ধতি ও ভারতের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। মৎস্য সার ও খুব নাইট্রোজেন বহুল কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ ভাগ Phosphoric acid আছে ইহা দ্বারা ও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। মাছের মুড়া ছাল কাঁটা প্রভৃতি প্রকাণ্ড হৌজে স্নান করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘুটিয়া খড়ের চাটাই ঢাকা দিয়া (জাপানিরা খুব গরম জলে স্নান করে) পচান হয়। কয়েক সপ্তাহে জল পচিয়া অসহনীয় দুর্গন্ধময় ও সবুজবর্ণ হইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নুতন ভাটির জন্য পুনরায় তাহাতে পূর্ব্ববৎ মাছ ও গরম জল ছাড়া হয়। এই সারের গুণে গাছ পালা অতি শীঘ্র গজাইয়া উঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়ের অভাব নাই মৎস্যও প্রচুর। এখানে এই সার প্রস্তুত করণের বিস্তৃত আয়োজন করা উচিৎ। খৈলের সার ও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে গত দশ বৎসর খৈলের আমদানী ১৪ গুণ এবং তাহার মূল্য ত্রিশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কার্পাসের বীজ ও সার স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। খৈল গুড়া করিয়া কাষ্ঠের ছাই, দগ্ধ মৃত্তিকা আস্তাবলের ময়লা জল বা মুত্র মিশাইয়া স্তুপাকারে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারনের জন্য স্তূপটী মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ এই সার অথবা মিশ্র সারের (compost) সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা হয়।

পক্ষীচাষ বা পুল্‌ট্রীফার্ম্মিং

দেশের জাতীয় ধনবর্দ্ধিত করিতে হইলে ডেয়ারি এবং পুল্‌ট্রীফার্ম্মিং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এদেশেও প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে; সেজন্য আমরা মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ প্রভাষ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত ক্ষমতাশালী প্রকৃত কার্য্যকরী ও বঙ্গমাতার সুসন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। কৃষি বিভাগের কর্ত্তা বঙ্গের কৃষি সচিব এবং মাননীয় বঙ্গেশ্বর লাট রোনাল্ডশে বাহাদুর কৃষিশিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী মন্তব্য ঢাকায় কৃষি কন্‌ফারেন্সের ১৯২১ সালের অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা আপিষের কতিপয় লোকের মতামত লইয়া আলোচিত ও আন্দোলিত হয়; এরূপ অত্যাবশ্যকীয় দেশব্যাপী হিতকর বিষয়ে দেশের লোকের

মতামত লইয়া দেশের শিক্ষা, কৃষি এবং রাজস্ব সচিব একসঙ্গে বসিয়া সরকারী এবং বেসরকারী সদস্য লইয়া এবিষয়ে আলোচনা করিলে সর্ব্ব হিতকর হয়।

আমি বলি যে, যদি প্রকৃত দেশের কাজ করিতে, দেশমাতৃকার যদি প্রকৃত হিত ও কল্যাণ সাধন করিতে হয়, যদি হৈ চৈ করিয়া নাম কেনার বাসনা না থাকে, তাহা হইলে ২।৩ জন প্রকৃত কৃষক বন্ধু ও উপরোক্তরূপ সদস্যে (কমিটি)—লইয়া আলোচনা করিয়া কাজ করিলে দেশের নিঃস্বচাষা কুলের প্রকৃত হিতকর কাজ হয়। তাই বলি যে সার আশুতোষ, সার প্রফুল্লচন্দ্র, সার জগদীশ, সার নীলরতন, মিঃ পি, সি, মিত্র প্রভৃতির মত লোক এবিষয়ে মাথা কি ঘামাইবেন।

এবিষয়ে টাকা ব্যয়ের আবশ্যক। টাকা সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না, যদি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মত দেশের কৃতি সন্তানকে অগ্রণী করিয়া চাঁদার খাতা খুলেন। বাঙ্গলায় নাম-কেনা-লোভী জমীদারদের কাছ হইতে অতি ক্ষীণ আশার রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইলেও মুক্তাগাছা, নাড়াজোল, বর্দ্ধমান, উত্তরপাড়া প্রভৃতিদের কাছ হইতে তথা মাড়োয়ারি ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ হইতে এ সৎ সংকল্পে প্রকৃত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছি, এখন কাজের কথা বলিয়া এই পত্রখানি শেষ করিব।

আমাদের দেশের চাষাগণ স্বতই মনে করিতে পারেন যে আমাদের দেশের যেরূপ নিঃস্ব অবস্থা তাহাতে বিলাতী কলকব্জা, পুস্তক, পাখী আদি আনিয়া পাখীচাষ এদেশে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে প্রবর্ত্তন করা বেশী ব্যয়সাধ্য, কষ্টকর এবং আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষকদের পক্ষে তাহা বুঝা, শিক্ষা ও দেশে প্রবর্ত্তন করা একরূপ অসম্ভব।

এটা একরূপ সত্য বটে। কিন্তু ইওরোপ ও আমেরিকার কৃষকদেরও অবস্থা আমাদের দেশের কৃষকদের মত ছিল, কিন্তু শিক্ষার দ্বারায় তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া সভ্য দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে; এবং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জাতীয় ধনেরও বহু সহস্র কোটী গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। তাহার প্রধান উপকরণ কৃষিশিক্ষা অর্থাৎ পশুচাষ, গব্য খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন, পাখীচাষ, মক্ষিকা চাষ ইত্যাদি।

আমাদের দেশের "দেশী মুর্গীগুলি" আকারে ছোট হয়, ইওরোপীয় পাখী অপেক্ষা অনেক ছোট ডিম পাড়ে, সংখ্যায় কম পাড়ে ইত্যাদি অনেক দোষ হয়; সেইগুলি পরিহারের জন্য পাশ্চাত্য শোণিত দেশী মুর্গীর শিরায় প্রবেশ করান একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের দেশী মুর্গী সচরাচর যেগুলি ভাল ডিমদাত্রী সেইগুলি বৎসরে ১৮০ হইতে ২০০টি ডিম দেয়, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উৎপাদকগণের অনুপাতে এইরূপ পাখী লাভ জনক নহে; তাঁহাদের মতে ঝাঁকে যে মুর্গী বৎসরে ২৫০

হইতে ২৯০টা ডিম না দেয়, এরূপ মুর্গী পোষা লোকসান জনক—তাঁহাদের মতে যে মুর্গী বৎসরে ২৯০ হইতে ৩২০টি ডিম দেয় এইরূপ মুর্গী ঝাঁকে রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের গো এবং পাখী সম্বন্ধে একই কথা। কেবল খরচও হত্যা আছে, পরিবর্দ্ধিত ও বৈজ্ঞানিক বিধিতে উৎপাদন নাই। এদিকে কি ভারতবাসী দৃষ্টিপাত করিবেন? যে গাভী খাদ্যের বিনিময়ে বেশী পরিমাণ দুগ্ধ দেয় এবং যে পাখীভুক্ত খাদ্যের পরিবর্ত্তে বেশী সংখ্যা পুষ্টিকর ডিম দেয়, সেই গাভী বা পাখী পোষণের উপযুক্ত। তাই বলি ভাই বঙ্গবাসী গো এবং পাখী চাষ দেশে প্রবর্ত্তন করাইয়া জাতীয় ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করুন। এই দীন লেখকের বিক্ষিপ্ত লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করুণ ও সাহায্যদান করুন এই আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতাদের নিকট নিবেদন।

কেবল স্বোয়ার ও কিউবের অনুশীলন বা মরা পাথরের চর্চ্চা কিম্বা রাজ নৈতিক আন্দোলনে নিঃস্ব ভারতবাসীর পেট ভরিবে না। ধনী রাজা মহারাজা, জমীদার মহোদয়গণ, দরিদ্র কৃষকদের প্রতিও কৃপা দৃষ্টিপাত করুন একবার।

আসাম গভর্ণমেণ্ট সেদিন গবর্ণর বাহাদুরের অধিনায়কত্বে একটি বেশ বৈঠক কৃষির উন্নতি বিধান গো এবং মুর্গী চাষ দেশে প্রবর্ত্তন জন্ম হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বৈঠকের আবশ্যকতা না থাকিলেও আলোচিত বিষয়গুলির দেশে আশু প্রবর্ত্তনের যে আবশ্যকীয়ত আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সভাসমিতিও মন্তব্যপাশে দেশের নিঃস্ব কৃষককুলের পেট ভরিবে না। যাহাতে এই সকল জিনিষগুলি কাজে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, ৩১নং এলগিনরোড, কলিকাতা।

* বর্ত্তমান সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পরে আমরা সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি।—সম্পাদক।

নূতন কৃষিযন্ত্র

ভারতবর্ষে শতকরা ৯৩ জন কৃষক। কৃষকের উন্নতি করিতে হইলে কৃষির উন্নতি হয়। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষি-যন্ত্রের উন্নতি করিতে হয়। আমরা মান্ধাতার আমল হইতে যে কৃষি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেই যন্ত্রের দ্বারা চাষবাস করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। যাবা প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতের যে বিট চিনির আমদানী হয় এবং অন্যান্য যে জিনিষ আমাদের দেশে আসে, ইহার প্রধান

কারণ আমাদের যন্ত্রের অভাব। আমরা ৫০ জনে যে কার্য্য করি তাহারা যন্ত্রযোগে সে কার্য্য একাই সমাধা করে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের প্রাচীন যন্ত্র সমূহের উন্নতি বিধান না করিলে এদেশের কোটী কোটী লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে ম্যালেরিয়া কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রধানতঃ মার্কিণ প্রভৃতি স্থানে যে প্রণালীতে এবং যেরূপ যন্ত্রযোগে কৃষিকার্য্য চলিতেছে, আমরাও সেই প্রণালীতে এবং তদনুরূপ যন্ত্রযোগে কৃষিকার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাহারা যে প্রকারে কৃষিকার্য্যের দ্বারা আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করিয়াছে, আমরা তদপেক্ষাও অধিকতর উন্নত করিতে পারি। কারণ আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এ বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করে। মার্কিণ বা ইউরোপে শীতের সাত মাস বিশেষ কোনও ফসল উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থায় জমি বার মাসই কোনও না কোনও ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত প্রস্তুত আছে। এই জন্য আমরা যদি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা তিন চারিটী বা ততোধিক ফসলও উৎপাদন করিতে পারি। এরূপ অবস্থায় আমাদের নিবৃত্ত থাকা উচিত কি ? আমরা যদি এক জমি হইতে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারি, তাহাতে যে দুর্ভিক্ষের কতকাংশে প্রশমন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু কলেরা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি জীবাণুঘটিত ব্যাধিগুলি অধিকাংশ স্থলেই জল-দোষ এবং অন্নকষ্ট ঘটিত ব্যাপার হইতেই উদ্ভুত। জল-দোষ নিবারণার্থ স্বল্প ব্যয়ে সুপেয় পানীয় সরবরাহের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাও কৃষি-যন্ত্রের অন্তর্গত। কৃষি-যন্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র লস্কর এ, এস, সি, ই, আমেরিকার হইতে আসিবার কালে তাঁহার আমেরিকাস্থ Hindu Student Experimental ফার্ম্ম হইতে যে সমস্ত কৃষিযন্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সুর মহাশয়ের সাহায্যে ৯ নং মিডল রো, ইটালীতে সংযুক্ত করা হইতেছে। আমাদের দেশে দশটী লাঙ্গল ও কুড়িটী গরু এবং দশ জন মানুষের দ্বারা যে কার্য্য সমাধা হইতে পারে, লস্কর মহাশয়ের আনীত যন্ত্রের সাহায্যে একটী মানুষ ও দুটি গরুতে সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে। এই লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিলে সেই বৎসরেই সেই জমি আর ঐরূপ লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করিতে হইবে না। ইহার দ্বিতীয় যন্ত্র "হল-চক্র"। জমি যখন শুষ্ক হইয়া যায়, তখন এই চক্রহল দ্বারা চাষের কার্য্য সমাধা হইতে পারে। ইহার তৃতীয় যন্ত্র শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র ভূষণ লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বারা ১২৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রথম পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা মই চক্র অথবা Disk harrow বলিয়া কথিত হয়। এই যন্ত্র দ্বারা ১০ বিঘা জমির ডেলা দুইটী গরু এবং একটী মানুষের দ্বারা একদিনে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে। চতুর্থ যন্ত্রের জন্য ঢালাই করের ব্যবস্থা করা

হইতেছে। ইহা 'কৃষি মই' বলিয়া কথিত হইবে। পঞ্চম যন্ত্রটী বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইক্ষু, বেগুন, মরিচ, পটল প্রভৃতি যে সমস্ত ফসল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে মৃত সঞ্জিবনীবৎ কার্য্য করিবে। জীব দেহ মাত্রেরই নূতন আহারের প্রয়োজন। এই যন্ত্র দ্বারা প্রতি সপ্তাহে যেমন চারার মূলে নূতন মাটী প্রদান করিয়া তাহাদের আহারের সুব্যবস্থা করা হইবে, অন্য দিকে মাটী চূর্ণিত হইয়া রস-ধারণের সহায়তা করিয়া চারাগুলিকে জল প্রদান করতঃ অধিকতর সতেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে। জঙ্গল নির্ম্মূল করিয়া বায়ুমণ্ডলস্থ এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিতে সহায়তা করিবে। এই যন্ত্র "নিড়েন" যন্ত্র বলিয়া কথিত হইবে। এই যন্ত্র দ্বারা একটী গরু এবং একজন মানুষ ১৫ বিঘা জমি একদিনে নিরেন করিতে পারিবে। এই যন্ত্রও ১২৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রস্তুতকরনার্থ চেষ্টা করা হইতেছে। যন্ত্রটি অতীব সহজ প্রণালীতে নির্ম্মিত হয়। উহা কৃষক বা আমাদের দেশীয় কর্ম্মকারেরাই অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারিবে। ষষ্ঠ যন্ত্র বপন যন্ত্র বলিয়া কথিত হইবে। আমাদের দেশে যে প্রকারের বীজ বপন করা হয় তাহার কতকাংশ মাটীর উপরে থাকাতে নষ্ট হইয়া যায়, কতক বীজ অত্যধিক মাটীর নিম্নে যাওয়াতে তাহা হইতে আর বীজ অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু এই বপন যন্ত্র যোগে প্রায় ২।৩ অঙ্গুলি মাটীর নিম্নে বীজ এমন ভাবে বপন করা যাইবে যে প্রত্যেক বীজটী অঙ্কুরিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চারা উৎপন্ন হওয়াতে জমি নিড়াইবার সুবিধা হইবে। সপ্তম যন্ত্র দ্বারা ধান্য ও জবাদি শস্য নিড়াইতে পারা যাইবে। এই যন্ত্র ও ঢালইকবের অপেক্ষায় এখনও প্রস্তুত হইতে পারে নাই। অষ্টম যন্ত্রকর্ত্তন যন্ত্র বা mowing machine বলিয়া কথিত হয়। এই যন্ত্র দ্বারা ১২ বিঘা জমির ধান্য কলাই আদি শস্য দুইটি গরু ও একটী মানুষ যোগে এক দিনে কর্ত্তন করা যাইবে। নবম যন্ত্র 'রেক' নামে কথিত হয়। ইহা এখন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না। দশম যন্ত্র "পিচকারী পাম্প" বলিয়া কথিত হয়। কৃষক মাটীর নিম্নে লোহার নল বসাইয়া দিয়া এই পাম্প যোগে জল উত্তোলন করিতে পারিবেন। এই যন্ত্রও প্রস্তুত করিবার আয়োজন হইতেছে। কিরূপে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নল প্রবেশ করাইয়া দিয়া জল উত্তোলন করা যায় তাহা এই সপ্তাহের মধ্যে ৯নং মিডল রো, ইটালীতে দেখান হইবে। কৃষক যদি এইরূপ নল দ্বারা জলোত্তলন করিয়া পানীয়ের সুব্যবস্থা করে তাহা হইলে কলেরা, ওলউঠা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি জীবাণু ঘটিত সংক্রামক ব্যাধিগুলির হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিস্কৃতি পাইতে পারিবে। একাদশ যন্ত্র force pump বলিয়া কথিত হয়। যন্ত্র দ্বারা একটী বালক এক ঘণ্টায় ছয়শত গ্যালন জল ৫ হইতে ২০ ফিট উর্দ্ধে উঠাইতে পারে। দ্বাদশ যন্ত্র মাখন তোলা যন্ত্র নামে অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা দৈনিক ৫০ মণ দুগ্ধের নবনী তোলা যাইতে পারে। ত্রয়োদশ যন্ত্র churning Machine বলিয়া কথিত হয়। ইহা হইতে ৫০ মণ দুগ্ধের

নবনী হইতে মাখম চারি ঘণ্টায় প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। অন্যান্য যন্ত্র এবং মাটী খোঁড়া অর্থাৎ পুষ্করিণী খননাদি যন্ত্রের বিবরণ বারান্তরে প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত যন্ত্রাদি তৈরী করিয়া কৃষকের বা দেশের উপকারার্থে লাগাইতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য একটি কোম্পানী গঠন করিয়া এগুলি দেশেই প্রস্তুত করা দরকার।

শ্রীঅধরচন্দ্র লস্কর।

কাপড় ধোলাই

পূর্ব্বে প্রায় সকল গৃহস্থই ঘরে কাপড় কাচিয়া ব্যবহার করিত। কেবল মাত্র বর্দ্ধিষ্ঠ ব্যক্তিগণ চাকরাণ জমি দিয়া বা বার্ষিক বেতন ধার্য্য করিয়া ধোবাদিগকে কাপড় কাচিতে দিতেন। এখন প্রায় নগদ পয়সা লইয়াই কাপড় কাচা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কাপড় কাচার পরিশ্রমিক এখনকার অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তখন এক খানা কাপড় বাসী করাইলে এক পয়সা করিয়া দেওয়া হইত। বেশি কাপড় কাচাইলে ধোপীগণ কুড়ি হিসাবে মজুরী পাইত। প্রতি কুড়ি খানি কাপড় কাচিতে তিন আনা হইতে চারি আনা লাগিত। এখন কাপড় কাচার ভাল মন্দ অনুসারে প্রতি কাপড়ে দুই পয়সা হইতে চারি পয়সা লাগে। এখানকার ধোবারা এখন কাপড় কাচিতে অতিশয় বিলম্ব করে, ও কাপড় ছিঁড়িয়া দেয়। এখন ধোবা বাড়ীতে কাপড় কাচান অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকে বাড়ীতেই সাজিমাটী, সাবান, সোডা, ক্ষার ইত্যাদি দিয়া কাপড় কাচিয়া ব্যবহার করিতে পারেন।

পূর্ব্বে দরিদ্র লোক মাত্রেই বিচালী, কলাবাসনা পোড়াইয়া ক্ষার করিয়া, ছাগলাদির, গোমূত্র দিয়া কাপড় কাচিত। ঐ সকল দ্রব্য পয়সা দিয়া ক্রয় করিতে হইত না। বিনা পয়সায়, নিজের পরিশ্রমে কাপড় পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিত। এখন আর সে প্রথা নাই, ঘরে কাপড় কাচিলেও গৃহস্থগণ সাজিমাটী, সোডা, সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে। সাজি মাটী চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত কিছু সোডা মিশাইয়া জলে গুলিয়া মৃন্ময়পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে, জল ফুটিয়া উঠিলেই তাহাতে কাপড় ফেলিয়া দিয়া কাঠি দ্বারা কিয়ৎক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া নামাইয়া, পুকুরের ঘাটে লইয়া গিয়া, কাঠের তক্তায় আছাড় দিলেই কাপড় কাচা হয়। কাপড়ের পরিমাণ অনুসারে সাজী-

মাটি ও সোডার পরিমাণ স্থির করিতে হয়। একপোয়া সাজীমাটি ও অর্দ্ধ পোয়া সোডায় ১০।১৫ খানা কাপড় বেশ ধৌত হয়। ভাল সাজীমাটি হইলে সোডা না দিলেও চলে।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

সংগৃহীত

মধুমক্ষিকার সময় জ্ঞান

একজন ফরাসী বিশেষজ্ঞ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে মধুমক্ষিকার সময় জ্ঞান আছে। তিনি এক অপূর্ব্ব উপায়ে পরীক্ষা করিয়া এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাতে সাতটার সময় ফাকা জায়গায় তিনি নিজের আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ঠিক দশটার সময় তাঁহার ভোজনের টেবিল পরিস্কার করা হইত। তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনে কোনরূপ মিষ্ট দ্রব্য থাকিত না, কিন্তু অপরাহ্ন ৫টার সময়ে তিনি যে জলযোগ করিতেন, তাহাতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হইত। এক সপ্তাহের মধ্যে সে অঞ্চলে যত মধুমক্ষিকা ছিল তাহারা সকলেই ব্যাপার বুঝিয়া লইল এবং তাঁহার আহারের সময় ঝাঁকে ঝাঁকে এত মধুমক্ষিকা আসিতে লাগিল যে অবশেষে ঘরের মধ্যে তাঁহাকে আহারের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইল। এই সব মধুমক্ষিকা ঠিক ঘড়ির কাঁটাধরা সময়ে আহারের স্থানে উপস্থিত হইত। কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আসিত না, কারণ তাহাতে মিষ্টান্নের গন্ধও থাকিত না। তারপর তিনি আহারের ৫ মিনিট পূর্ব্বে, একটি দূরবর্ত্তী জানলায় বাটিতে করিয়া কিঞ্চিত মধু রাখিয়া দিতেন। মৌমাছিরা তখন ঠিক সময় আসিয়া ঐ বাটির মধুর সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল, এবং এমন কাঁটাধরা সময়ে উহারা আসিতে লাগিল যে ইহাতে তিনি নির্ব্বিবাদে আহার করিতে পারিতেন।

ঝিনুকের দাম্পত্য

ঝিনুকের দাম্পত্য জীবন অতি বিচিত্র। পালাক্রমে প্রত্যেক ঝিনুকই একবার স্বামী ও একবার স্ত্রীর কাজ করিয়া থাকে। যে ঝিনুকের একবার ডিম হইয়াছে, পরবারে সে স্বামীত্বের কাজ করিবে, আর ডিম পাড়িবে না। পূর্ব্ববারে যে ঝিনুকটি স্বামী হইয়াছিল, এবারে তাহারই ডিম পাড়িবার পালা। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ঝিনুক দম্পতি পরস্পরের কার্য্য করিয়া থাকে। ডিমগুলি যতদিন বড় হইয়া জলে ভাসিয়া না যায়, ততদিন যে ডিম পাড়িয়াছে তাহাকেই মায়ের কাজ করিতে হয়, এবং ডিমগুলি বড় হইলেই সে হাঁফ ছাড়িয়া পুরুষ হইয়া বাঁচে।

বাবলার আবাদ

আমাদের দেশে বাবলা গাছের সহিত সকল বাঙ্গালীই বিশেষভাবে পরিচিত। শাল, সেগুণের ন্যায় বাবলাও একটী আয়কর বৃক্ষ। এ দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে, "দিগে যা বাবলা বাঁশ, পাবি ভাত বারো মাস।"

বাবলার কাঠ অত্যন্ত শক্ত এবং টেকসই, সেজন্য আজকাল ইহা অনেক কাজে লাগিতেছে এবং ইহার মূল্যও অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাবলা গাছের ছালে এক প্রকার ক্ষারাম্ল রস আছে, তাহাকে ট্যানিক এসিড্ বলে। এই জন্যই বাবলার ছাল চর্ম্ম শোধনের মুখ্য উপাদান।

ইউরোপ ও মার্কিণ দেশে বাবলার ছাল অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বাবলা কাঠে গাড়ীর চাকা, ঢেঁকী, লাঙ্গলের বাঁট ও মুড়ো, রেলওয়ে পাতিবার স্লিপার কাঠ, কামান বহনের গাড়ী প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

বাবলার পরিস্কৃত আটা আবার গঁদের পরিবর্ত্তে অনেক স্থানে ব্যবহার করা হইতেছে। চৈত্র মাসে বৃক্ষের গাত্রে এক বা দেড় আঙ্গুল পরিমাণে গর্ত্ত করিয়া দিলে ঐ আটা বহির্গত হইয়া সূর্য্য উত্তাপে জমাট বাঁধিয়া যায়। কফ, বাত, মেহ ও বহুমূত্র রোগে বাবলার লাল রঙের আটা সবিশেষ উপকারী।

কালী ও অন্য নানা প্রকার রংয়ের জন্যও বাবলার ছাল প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। বাবলার ছালে যে রঙ হয়, তাহা কাপড় ও চামড়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়! বাবলার ছালকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া /২॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১॥০ সের থাকিতে নামাইতে হয়, পরে শীতল হইলে তাহাতে আধ তোলা ফট্‌কিরীর গুঁড়া মিশ্রিত করিলে, এক প্রকার রঙ প্রস্তুত হয়। এই রঙে কোন কাপড় তিনবার ভিজাইয়া তিনবার শুষ্ক করিলে ঘোর পাটকিলে রঙ হয়। আবার এই জলে একটু হিরাকস মিশাইলে একরূপ পাকা রঙ প্রস্তুত হইয়া যায়। বাবলার এই সমস্ত গুণের জন্যই ইংরাজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইহা বিলাতে চালান দিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আরও উত্তম রকমের রং প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বাবলার চাষ অতি সামান্য। বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানেই এই গাছ জন্মিয়া থাকে বা জন্মিতে পারে। জমি একবার কোপাইয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই ৮।১০ দিনের মধ্যে চারা বাহির হয়। বর্ষাকালেই এই বীজ ছড়াইবার উপযুক্ত সময়। চারাগুলি একটু বড় হইলেই গায়ে কাঁটা বাহির হয়, সুতরাং ইহাকে অন্য কোন পশুতে নষ্ট করিতে পারে না। বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রমে এই লাভজনক কৃষিতে সকলেরই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্মিলনী

আয়ুর্ব্বেদের মহত্ত্ব

আমেরিকার বিখ্যাতনামা বহুদর্শী ডাক্তার জর্জ্জ ক্লার্ক, এম-এ, এম-ডি মহোদয় "চরক সংহিতা"র ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ইংরেজী চরক পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগের ঔষধের তালিকা হইতে আধুনিক যাবতীয় ঔষধ। রাসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে চরকের মতানুযায়ী চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যাও কম হইবে।"

ভাগলপুর ডিভিসনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত স্কাইন সাহেব লিখিয়াছেন—"ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনাদের ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, পাশ্চাত্য দেশবাসী ও সভ্যতাভিমানী আমরা সেই সকল বিষয়ের আবিষ্কারক বলিয়া গর্ব্ব করি।"

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার চাল্‌স মহোদয় একদিন বলিয়াছিলেন যে—"প্রাচীন হিন্দুদের অস্ত্র-চিকিৎসা-প্রণালী বর্ত্তমান অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুবিজ্ঞ ডাক্তার ম্যাকলাউড মহাশয় ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন—"হে হিন্দু ছাত্রগণ! বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তোমাদের ঋষিগণ ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল উন্নত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আজ আমি তাহাই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছি।"

ভারতের ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জন জেনারেল বিখ্যাতনামা ডাক্তার স্যার জন্ লুকিস্ মহোদয় লাহোর মেডিকেল লেবরেটরীর দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—"প্রাচীন কালের হিন্দুরা চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে সকল অমূল্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজকাল আমরা জগতে প্রচার করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। জর্ম্মাণ দেশের দুইজন বিখ্যাত ডাক্তার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শোথ ও উদরী পীড়ায় লবণ ও জল বর্জ্জন করা বিজ্ঞানসম্মত। হিন্দুরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।"

এইরূপ আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে জগতের নিরপক্ষ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অতি উন্নত অভিমত প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন হিন্দুরা ধাতুঘটিত ঔষধগুলির প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার ব্যবহার

সম্বন্ধে যে গভীর ও উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্তও জগতের কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সেইরূপ উন্নত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, প্রবাল প্রভৃতি ধাতুঘটিত ঔষধগুলি হিন্দুরা অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং নানা উৎকট পীড়ায় তাহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এখনও উক্ত ধাতুগুলির ব্যবহার কিম্বা শোধন করিতে সমর্থ হন নাই। লৌহ ও পারদ-ঘটিত ঔষধ পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা যথেষ্ট ব্যবহার করেন সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদরা এখনও হিন্দুর ন্যায় লৌহের ও পারদের নানা উৎকৃষ্ট যৌগিক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। শত-পুটিত বা সহস্র-পুটিত লৌহ এবং স্বর্ণসিন্দুর (মকরধ্বজ) ও সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রভৃতি প্রয়োগরূপের ন্যায় ঔষধ ডাক্তারি শাস্ত্রে একটিও আছে কি? ফলত নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে যে আয়ুর্ব্বেদ ও হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্র এখনও হিন্দুর রসায়ন শাস্ত্র অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। হিন্দু আজ মৃত জাতি বলিয়া জগতে পরিচিত; হিন্দুর আত্মসম্মান-জ্ঞান ও বিচারশক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছে। তাই আজ স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অসাধারণ পণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদ বৈজ্ঞানিক কি না, ইহার বিচার জন্য পাশ্চাত্য জাতির দ্বারস্থ হইয়াছেন।

—স্বাস্থ্য-সমাচার

ফলের চাষ ও ব্যবসা

আমাদের কৃষিক্ষেত্রে এমন অনেক প্রকার ফল উৎপন্ন হয় যে তাহার রীতিমত কারবার করিলেও লক্ষ লক্ষ লোক বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে বহু প্রকারের ফল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে বহু ফল আমরা কাঁচা খাই, কতকগুলি সিদ্ধ করিয়া ভোজন করি। আবার কতক ফল শুষ্ক অবস্থায়ও আমরা আহারকরি। কতগুলি কন্দ মূলও আমাদিগের নিত্য আহার্য্য। এই গুলিতে আবার ঔষধি বর্গের মধ্যেও ফেলা যায়।

আম, কাঁঠাল, নারিকেল, লেবু, লিচু, আনারস, সুপারী, খেজুর, জাম, গোলাপজাম, তাল, আমড়া, দাড়িম প্রভৃতি বাগানের ফল, ইহা ব্যতীত বনবাদাড়েও অনেক ফল জন্মে।

এই সকল ফলই আমাদের দেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। উন্নততর প্রণালীতে বাগান করিয়া ফলের চাষ করিলে অধিকতর লাভবান হওয়া যায়। রীতিমত ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে ফলের চাষ করা উচিত, ঐ সকল ফলের মধ্যে কলার চাষ ও কলার ব্যবসা এবং নারিকেল ও সুপারীর ব্যবসা বার মাস চলে। এই গুলি বারমেসে ফল। কোন কোন লেবুও বারমেসে ফলের মতন উৎপন্ন হয়। কিন্তু কলা ও নারিকেলের মত কোন ফলই বারমেসে নহে। কলা বার মাস পাওয়া যায়।—কাঁচা এবং পাকা দুই রকমেই কলার ব্যবহার হইয়া থাকে এবং কলাগাছ ও আমরা উপরের ডগা ফেলিয়া ভিতরের শাস আহার করিয়া থাকি। নারিকেলও কাঁচা ও পাকা দুই রকমেই আহার করিয়া থাকি।

কলার চাষে বিশেষ হাঙ্গামা নাই, বরং আম, কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান করিতে হইলে বিশেষ তদ্বিরের দরকার। এই সকল ফল ব্যতীতও অন্য রকম অনেক ফল আছে। যেগুলি লতা গাছে জন্মিয়া থাকে উহা সকল দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেগুলি হইতেছে লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, উচ্ছে, করলা, পটল, ইত্যাদি।

এই সকল ফলের চাষ সম্বন্ধে আমাদের নূতন করিয়া কিছুই বলিবার নাই। গৃহী মাত্রেই আপন আপন বাগানে এই সকল ফলের উন্নতকর প্রণালীতে চাষ করিতে পারেন। কখনও কখনও অতিশয় উচ্চ মূল্যে এই সকল ফল বিক্রয় হইয়া থাকে। উপযুক্ত রকমে চাষ করিতে পারিলে এক ফলের বাগান রাখিয়াও আপনার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা যাইতে পারে।

কালধর্ম্মে আমরা যেমন বাবু সাজিতেছি, সুবিধাজনক কৃষি কার্য্যাদিতে যেমন অমনোযোগ দিতেছি, তেমনই চাকুরী করা এবং দশটা-পাঁচটার আফিস করাকে আমরা অধিকতর সুবিধা মনে করিতেছি। কিন্তু যদি মনোযোগ সহকারে আমরা বাগানে সর্ব্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করি, তাহা হইলে সামান্য মাহিনার চাকুরী হইতেও আমরা অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি। চাকুরী করার অর্থ—অর্থ উপার্জ্জন। চাকুরী করার অর্থ এই নয় যে, নিজের সকল দিকের প্রতি অবহেলা দেখাইয়া পরের খাতাপত্র লেখা।

চাকুরী আদি করিয়াও এই সকল ফলের চাষ করা চলে এবং ফলের ব্যবসা করিয়া নিজের সাংসারিক জীবনেও আর্থিক উন্নতি করা যাইতে পারে। এই সকল ব্যবসায় বিশুদ্ধ। ইহাতে লোকের অনিষ্ট করিতে হয় না। লোককে ঠকাইবার কিছুই নাই বরং ফল যেমন পবিত্র মনও তেমনই পবিত্র হইয়া থাকে। পেঁপে, নারিকেল ও কলার ন্যায় লাভবান ফল। মানব জীবনে পেঁপের অনেক দরকার। উহাকে ঔষধীবর্গের মধ্যে ফেলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাঁহারা অন্যত্র চাকুরী করেন এবং নিজেদেরও বাগানজাত জমা পুকুর আছে,

তাঁহারা নিজ নিজ বাগানে সকল প্রকারের ফলের চাষ করিতে পারেন। ফলের চাষের নিত্য বাগানে বসিয়া থাকিতে হয় না! নারিকেল কলা পেঁপে প্রভৃতির নিত্য তদ্বিরের দরকার হয় না। প্রথমতঃ গাছ বড় হইবার সময়ে যাহাতে নষ্ট না হয় তাহাই দেখিতে হয়। আর ফলের শত্রু পাখী, অবশ্য সব ফলের নহে। বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে বাঁদরে ফল নষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র বাঁদর নাই। আর ইহাও সত্য যে ভগবৎ সৃষ্ট জীবে আহার করিলে বৃক্ষে ফল বেশী মাত্রায়ই ধরিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষিত সমাজ যদি এই সকল চাষের দিকে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে দ্রুত বেগে ইহার উন্নতি হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে বহু দূরদেশ হইতে ফল আসে। কিন্তু বাঙ্গালার ফল বহু দূর দেশে ব্যবসার ভিতর দিয়া যায় না।

আমেরিকা ও আফ্রিকা, যেখানে ফলের আদৌ চাষ ছিল না, অল্প দিনের ভিতরে সে সকল স্থানে অভাবনীয়রূপে ফলের চাষের উন্নতি হইয়াছে। কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ফলের চাষের উন্নতির বিবরণ পড়িলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা আমেরিকার ফল কৃষির সম্বন্ধে নানা পুস্তিকা পড়িয়া দেখিয়াছি, সেই হিসাবে আমাদের দেশের লোক শতাংশের একাংশও চাষ করেন না।

দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া আমরা দেখিয়াছি গৃহস্থের বাড়ীর আশে পাশে এমন সব জমি আগাছার বন হইয়া পড়িয়া আছে যে, গৃহস্থ ইচ্ছা করিলেই সে জমি হইতে অনেক উপকার পাইতে পারেন। আশা করি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ এই লাভজনক ব্যবসায়ে মনোযোগ দিয়া স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি করিবেন। —বাঙ্গালী

চাবাগানের শ্রমিক

বোম্বাইয়ের "লেবার গেজেট" নামক শ্রমজীবী সম্বন্ধীয় পত্রিকা আসাম গবর্ণমেণ্ট হইতে সংগৃহীত তথ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, আসামের চা বাগানের কুলীরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। অথচ নিম্নের বেতনের তালিকা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে, এমন মহার্ঘ্যের দিনে কেমন সুখে তাহাদের দিন গুজরান হইতেছে।

বৎসর	মাসিক বেতন
১৯১১—১২	৫৸৶১১ পাই
১৯১৪—১৫	৬ ৫ পাই
১৯১৮—১৯	৬৴ ৯ পাই
১৯১৯—২০	৬৸ ১০ পাই
১৯২০—২০	৭ ৩ পাই

উপরে পুরুষদিগেরই বেতনের হার দেওয়া গেল। ১৯২০—২১ সনে স্ত্রীলোকেরা মাসে ৫৷৭ পাই, বালকেরা ৩৷৴১০ পাই করিয়া পায়। "লেবার গেজেট্" হইতে সংগ্রহ করিয়াই উপরের হিসাব প্রদান করা হইল। বাস্তবিক পক্ষে উহাও কতদূর সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে যাহা হউক, আসামের চা বাগান সমূহে ৬,০০,০০০ কুলী পুরুষ স্ত্রী ও বালক কি ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তারপর প্রকৃত প্রস্তাবে উপরের হারে তাহারা বেতন পায় না। বেশী কাজ করিলে তাহাদিগকে যাহা অতিরিক্ত দেওয়া হয়, এবং তাহাদের পথ্যাদির বাবদ যাহা খরচ হয়, তাহাও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। মোটের উপর এই সব বাবদ খরচ বাদ দিয়া কুলীরা নগদ কিছু পায় কিনা, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। তবে কুলীরা বিনা ভাড়ায় যাইতেও পায়, বিনা পয়সায় ঔষধাদিও পায় এবং সুবিধা থাকিলে কম নিরিখে বাগানের মধ্যে জমি চাষ করে।

বাগানের কুলীদিগকে কিছু সস্তায় চাউল দেওয়া হয়। কখন কখন কাপড় নাকি সস্তায় দেওয়া হয়। মোটের উপর গত বৎসর কুলীদিগের নিকট ৫,১৯,২৪৮৲ টাকার চাউল বিক্রয় করা হইয়াছে, ইহার জন্য নাকি বাজারে কিনিতে হইলে তাহাদিগকে ৭,৪৭,৯৩৪৲ টাকা দিতে হইত। আপাততঃ শুনিতে ত মনে হয় যে, কুলীদিগের জন্য কতইনা করা হইতেছে, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেক কুলী মাসে ।৴০ আনার বেশী লাভ পায় না।—আনন্দ বাজার।

পশু খাদ্য

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, আগে গোজাতির উন্নতি দরকার। গোজাতির দেহ পুষ্টির জন্য, কোন পশু খাদ্যেরই আমরা আবাদ করি না। এ সম্পর্কে ভুট্টা ও বজরার আবাদ সুবিধা জনক। গমে যে সকল পুষ্টিকর পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশই ভুট্টায় পাওয়া যায়। বৎসরের মধ্যে তিন বার ভুট্টার আবাদ করা যায়।

গাজর—ইহা মূল জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য, মানুষ ও পশ্বাদির বিশেষ হিতকর। ইহা পুষ্টিকর শক্তিও অসাধারণ। অশ্ব, মহিষ, বলদ, গাভী প্রভৃতিকে হৃষ্টপুষ্ট রাখিতে হইলে যে কয়মাস ইহা অনায়াসে মিলে, সেই কয় মাস অন্ততঃ অর্দ্ধ সের হইতে পাঁচ পোয়া পরিমাণে কাটিয়া কুচা কুচা করিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে তাহাদের তেজ ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। গাজর নিয়ম মত গো, মহিষ ও ছাগলকে খাওয়াইলে উহাদের দুগ্ধ বেশ মিষ্ট হয় এবং পরিমাণেও বাড়িয়া থাকে।

কেল্লার কমিসেরিয়েটের গরু ও ঘোড়া আর ইংরেজের ঘোড় দৌড়ের ঘোড়দিগকে এই গাজর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত আছে। গাজরের উপকারিতার সহিত তুলনায় মূল্য অতি অল্প। ক্ষেত্রে চাষ করিয়া উৎপাদন করিলে এই গাজরের মণ কখনই আট দশ আনার বেশী পড়ে না। জমির অবস্থা ভেদে প্রতি বিঘার ৪০/০ মণ হইতে ৮০/ মণ পর্য্যন্ত গাজর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বীট—ইহাও একটী পুষ্টিকর পশু খাদ্য। বীট, শরীরের চর্ব্বি ও মাংস বৃদ্ধি করে।

সালগম—ইউরোপ, আমেরিকার ও উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষের গৃহপালিত পশুদিগের জন্য ইহার ও গাজরের বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। সালগম পয়স্বিনী গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ বেশী হয় এবং দুগ্ধের আস্বাদ অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হয়। কিন্তু সালগমের মূল যখন কঠিন হইয়া উঠে, তখন উহা মনুষ্য বা পশু কাহারও পক্ষে উপকারী বা সুখাদ্য নহে।

আর্টিচোক—ইহাও একটী উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য।

রিয়ানা বা হাতী ঘাস—এই ঘাস বা গাছ সাত আট হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, দেখিতে অনেকটা বজরা গাছের মত। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা বৎসরে পাঁচ বার কাটা যায় এবং প্রত্যেক বার কাটার পর সতেজ শাখা সকল ঝাড় বাঁধিয়া উঠে।

গিনি ঘাস—অফ্রিকার গিনি দেশ এই ঘাসের জন্মস্থান। এই গিনি ঘাস দেখিতে আমাদের দেশের উলু ঘাসের অনুরূপ; তবে উলু অপেক্ষা কোমল এবং গাঢ় সবুজবর্ণ। ইহার বিশেষত্ব এই যে উলুর মত অল্পস্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে, বৎসরের মধ্যে ১০। ১২ বার কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং একই জমিতে ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহা সমভাবে জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহার বৃদ্ধি এত দ্রুত হয় যে, তখন ২০। ২৫ দিন অন্তর ইহা একবার কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

খাড়ি আক—এই আক কঞ্চির মত সরু। ইহা নাড়িয়া গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা গো, মহিষ ও হস্তির প্রধান খাদ্য। ইহার ব্যবহারের দুগ্ধের মিষ্টতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

লুসার্ণ বা লুসারিণ ঘাস—আজ কাল পাশ্চাত্য দেশবাসীর মতে ইহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঘাস মধ্যে পরিগণিত, প্রত্যেক, একর জমিতে এই ঘাস, বৎসরে ৭৫ টন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ফণী মনসা—মার্কিন দেশে সকল সময়ই মনসা উৎকৃষ্ট পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উদ্ভিদ ভক্ষণ করিয়া তত্রত্য পশুগুলির যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা আমাদের দেশের ফণী মনসার ন্যায়—তবে উহা কাঁটাহীন করিয়া আবাদ হয়। চেষ্টা করিলে আমরাও উহা পারি।—শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মালদহ সমাচার।

ফিলিপাইনে শিল্প শিক্ষা

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকানদের শাসনাধীন। এখানকার ডাইরেকটর অফ্ এডুকেশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সহিত শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকায় অতি সুফল ফলিয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহের সহিত, কাষ্ঠের কাজ, কামারের কাজ, ঝুঁরি বোনা, কাপড় বোনা, জেলী বা আচার প্রস্তুত প্রণালী, সূচের কাজ, টুপী প্রস্তুত প্রভৃতি নিত্য আবাশ্যকীয় কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনের সহিত ভবিষ্য জীবনের জন্য বহু স্বাধীনজীবিকার উপায় ও প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ায় ফিলিপাইনবাসী স্বাধীনজীবী হইয়া উঠিতেছে, দেশের ছেলেরা এখন অল্প বয়সেই নানা প্রকার শিল্প কার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত অর্থে তাহাদের পিতামাতাকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেছে। যাবতীয় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ সজ্জার সামগ্রীর প্রায় বারো আনা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত। ফিলিপাইনে প্রায় ২৮০০ বিদ্যালয় আছে। সকল বিদ্যালয়ের সহিত উদ্যান সংলগ্ন আছে। সেই সকল ফল ও পুষ্পোদ্যান বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত এবং বাজারের ফলের অভাব এই সকল বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যান হইতেই মোচন হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয় এখন কেবল বিদ্যাশিক্ষার আলয় নহে, যথেষ্ট আয়কর হইয়াছে।

যে শিক্ষায় ছেলেদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে না পারে, সে শিক্ষা অকর্ম্মণ্য শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ভারতবাসীর সন্তান সন্ততিকে এইজন্য অসার অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। কতদিনে যে এই অসার শিক্ষার সংস্কার হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত শিল্পশিক্ষার যে একান্ত আবশ্যকতা, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের তথা কথিত জাতীয় বিদ্যালয়েও কিছু হইল না এবং গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়েও কিছু হইল না। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দেশবাসীর যে অশেষ অকল্যাণই হইতেছে তাহা দেশবাসী বুঝিয়াও প্রতিকারের কোন উপায়ই করিতে সচেষ্টিত নহেন। প্রত্যেক পিতা মাতা চায়—ছেলে কেরানী বা উকিল হৌক, হাকিম হউক, হইয়া চাকরী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করুক। দুর্ভাগ্য! সকলের অদৃষ্টে হাকিম বা উকিল হওয়া সম্ভব হয় না অধিকন্তু ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সভ্যতার অজুহাতে বিলাসী অকর্ম্মণ্য হইয়া একটী অপরূপ জীবরূপে দেশের দৈন্যদশাই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রতিদিন এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেশের লোকের চৈতন্য হইল না। এমন দেশ কখনও কি উন্নত হওয়া সম্ভবে? যদি কল্যাণ চান, দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করুন। ঘরে ঘরে শিল্পীগণ আপনাদের অভাব মোচনের জন্য বদ্ধপরি-কর হউন, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব

হইবে। গবর্ণমেন্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। ঝুলিতে এক কড়া না থাকিলে সে দেয় কিরূপে। দেশের একাকী কাহারও এরূপ প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব না হইতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা দশের অর্থের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্বাধীন জীবিকার জন্য বিবিধ কাজ করা যাইতে পারে। এখন শিল্পশিক্ষা ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা নাই। এদেশে জলাভাবে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব নয়, আকাশের জলেই যতদূর হয়। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যে শুখা হাজা নাই। দেশের কাঁচামালের সদগতি হইবে, দেশের অর্থ প্রকৃতই দেশেই থাকিবে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট দ্বারায় হউক বা দেশের দশের সমবায়ে হউক, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত কার্য্যকরি শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। ফিলিপাইনদ্বীপের লোকগণ আমেরিকার সংস্রবে আজ উন্নতির পথে ধাববান। কবে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের সুমতি হইবে?—কাজের লোক।

চুলের ব্যবসায়

ইয়োরোপের দেশ সমূহের চুল হইতেও অর্থাগম হয়। জর্ম্মাণীর মহিলা এবং প্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ তাহাদের চুলের খুবই যত্ন করে। যেমন কৃষকগণ, তাহাদের শস্য আবাদের যত্ন করে, ইহারাও নিজেদের চুল যাহাতে প্রচুর জন্মে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহাদের চুল গোছাতেও যেমন, কোমলতাতেও তেমনি। জর্ম্মাণীর মহিলাদের চুলের রং যেন পাকা সোণার মত, কিন্তু ফ্রান্সের মহিলাগণ কৃষ্ণবর্ণের চুলেরই পক্ষপাতী বেশী। বৎসরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহারা এই কেশ দাম কর্ত্তন করিয়া উচ্চমূল্যেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। ইয়োরোপের নানাস্থান হইতে এজেণ্টগণ নগরে নগরে টাকা লইয়া মহিলা গণের কেশের গুণের তারতম্যানুসারে মূল্য দিয়া নারীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্যের উপাদান কেশদাম কাটিয়া লইয়া যান। সচরাচর একটী স্ত্রীলোকের চুল প্রায় ২৫ তোলা হয়। তাহার মূল্য ৩০ হইতে ৬০ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হয়। এই সকল চুলে নানা প্রকার জিনিষ যথা—লকেট, চেন, হার, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাল ভাল পরচুলা হয়। সমুদ্রগামী পোত সমুহের কাচি প্রস্তুত হয়, ইহ লবণাক্ত জলে অন্য দ্রব্যের প্রস্তুত কাচির ন্যায় সহজে নষ্ট হয় না। ভারতের চুল একটু মোটা ও কড়া। সূক্ষ্ম কাজের জন্য ইহার আদর নাই, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানায় ভেড়ার লোমের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাজে লাগান হয়। এদেশের ও চীনের চুল দ্বারা পরচুলা হয় এবং তাহা মৃত বা তীর্থযাত্রীর চুল। টাকা লইয়া মাথার চুল বিক্রয় করার পদ্ধতির কথা এদেশে শুনা যায় না। পাশ্চাত্য জগতবাসী অর্থের জন্য সকল কাজই করিতে পারে।—কাজের লোক।

নিবেদন

"কৃষক" ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া যথা সাধ্য দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, এ দেশে বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি কিম্বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকার এখন পর্য্যন্ত আদর হয় নাই। বাঙ্গালীর শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী। কৃষকগণ সাধারণতঃ অক্ষর জ্ঞান হীন; তাহারা পত্রিকা পড়িয়া বাহিরের কৃষি ও বাণিজ্য খবর লইবে ইহার সম্ভাবনা নাই। কৃষকের মালিক জমীদার, তাঁহারাও কৃষি ও বাণিজ্যের খবর পড়িবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না। তাহাদের জমীর খাজানা আদায় ব্যতীত জমীর উন্নতি বা অবনতির সহিত তাহারা বড় একটা সম্বন্ধ রাখেন না।

কৃষকগণ ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে ব্যক্তির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল তাহার পদ থাকিলেও সে চলিতে পারে না, হস্ত থাকিলেও কিছু ধরিতে কিম্বা করিতে পারেনা। জাতিবিশেষের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য। কৃষক সম্প্রদায় শিক্ষা অভাবে অন্ধ, তাহাদের মনে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, দেহে শক্তি থাকিলেও হৃদয়ের বল নাই। বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে, তাহারা কৃষি কর্ম্মে নিপুণ সত্য, কিন্তু তাহাদের এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

বাঙ্গালী কৃষক পশ্চিম ভারতের কৃষির তো কোন সংবাদ রাখেই না, এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক পশ্চিম বঙ্গের কোন খবর রাখে না, আবার পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের খবর রাখেনা। আলুর ন্যায় মূল্যবান ফসলের চাষ পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণ জানে না। পশ্চিমবঙ্গের আলু ও ইক্ষু, উত্তর বঙ্গের তামাক ও পূর্ব্ববঙ্গের পাট চাষ যেরূপ পরিপাটীর সহিত সমাধা হয়, বঙ্গদেশের অন্যত্র সেইরূপ হওয়া উচিৎ। সার ব্যবহার সম্বন্ধেও বাঙ্গালী কৃষক অনভিজ্ঞ। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষকগণেরই খৈল সারের উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। উত্তরবঙ্গ ও মৈমনসিংহ জেলার কোন কোন স্থলে শণ ও ধৈঞ্চার সজীসার প্রয়োগ হয়, কিন্তু বাঙ্গালার অন্যকোন স্থানের কৃষকগণ তাহার বিষয় কিছুই জানে না। হাজার হাজার মণ খৈল ও হাড় সারের জন্য বিদেশে চলিয়া যায়, কিন্তু এই দেশে ইহাদের ব্যবহার নাই। এক বিঘায় ৮মণ ধান্য জন্মে, কি করিলে তথায় ১০মণ ধান্য জন্মিতে পারে, ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গালী কৃষকের মনে আসে না।

শিক্ষাদ্বারা মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাদ্বারা বালকগণ মহাজন ও জমীদারের মুহুরীগিরি এবং উচ্চ শিক্ষার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী আফিসে কেরাণীগিরি করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে মাত্র। বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বারা কুসংস্কার দূর হয় না, কিম্বা মনে স্বাধীন চিন্তার উদয় হয় না। বাঙ্গালীর কতজন ভদ্র সন্তান লাঙ্গল ধরিয়া কৃষি কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে প্রস্তুত হইয়াছে? পক্ষান্তরে, কৃষকের পুত্র কয়েক বৎসর পাঠশালায় পড়িয়া, পাঁচ টাকা বেতনে, মহাজনের মুহুরী বা ডাকপিয়ন হইবার জন্য উমেদারী করিবে। সে তাহার পিতার চাষাগিরি করিতে অনিচ্ছুক; কারণ চাষ করিলে, কেহ ভদ্রলোক বলিবে না। পিতার মৃত্যুর সহিত তাহার পৈতৃক চাষ ও স্বচ্ছন্দতা-বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ অনাহারী মুন্সী পেটের দায়ে, কৃষকে কৃষকে ঝগড়া বাঁধাইয়া, রাজদ্বারে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি ও মোড়লগিরি করিয়া উদরান্নের সংস্থা করে। এই সকল মোড়লের হাতে পড়িয়া ভিটামাটি বন্ধক রাখিয়া, মহাজনের নিকট হইতে অসম্ভব চক্রবৃদ্ধি শুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া, কৃষকগণ উৎসন্নে যাইতেছে।

অভিজ্ঞকৃষক বর্ত্তমান শিক্ষার এই কুফল দেখিয়া, তাহার পুত্র কিম্বা পৌত্রকে স্কুলে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হয় না। কোন এক সময়ে, আমাদের গ্রাম্য স্কুলের নিমিত্ত কৃষকবালক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই নাই। যে দুই চারিটী বালক সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাদের কেহ "মুন্সী" হইয়াছে, কেহ বা ডাক পিয়ন হইয়াছে। এই সমস্যার প্রতিবিধান কি তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না।

বর্ত্তমানে, বহুশিক্ষিত যুবক কৃষকের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিতেছেন। তাহারা যথার্থ বুঝিয়াছেন যে, কৃষি ও কৃষকের উন্নতি না ঘটিলে ভারতবর্ষের উন্নতি অসাধ্য। কিন্তু যতদিন তাহারা স্বহস্তে হলচালন না করিবেন, ততদিন বঙ্গদেশে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। কৃষিকর্ম্ম চাকুরী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিতে হইবে এবং দেশের লোকদিগকে বুঝাইতে হইবে। আশার বাণী লইয়া "কৃষক" কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে।

কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রিকা পরিচালন যে অতিশয় কঠিন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া যে কয়েক খানি মাসিক কৃষি পত্র যথা, কৃষিসম্পদ, কৃষিকথা, ভূমি লক্ষ্মী, পল্লীশ্রী এবং সরকারী কৃষিবিভাগের কৃষিসমাচার প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, ইহাদের পরস্পর সহানুভূতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, একে অন্যের নিন্দা করিলে, কৃষকদিগের নিকট সবগুলি পত্রই হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পত্র চালকগণ মনে রাখিবেন, যে বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাইরেন্‌সেষ্টার কৃষিকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের পূজ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সাধারণের সহানুভূতির অভাবে কৃষিগেজেট্ নামক পত্রিকা অধিকদিন চালাইতে পারেন নাই। এই পত্রে কৃষিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ প্রবন্ধ

লিখিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে এমন গবেষণাপূর্ণ কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাগজ চলিল না। বর্ত্তমান অবস্থায়, সমকর্ম্মীদিগের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ, যে বিরোধ না ঘটাইয়া সমবেত চেষ্টায়, দেশের কৃষি উন্নতির ব্যবস্থা ও কৃষি পত্রগুলির পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, কৃষকদিগের মধ্যে কৃষি উন্নতির আকেঙ্ক্ষা উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রচারের জন্য, আমরা বঙ্গদেশের সমুদায় সাময়িক পত্রগুলির সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

"কৃষক" প্রচলনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ৺ মন্মথনাথ মিত্র, ৺কানাইলাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু। দুই কর্ণধার ইহধাম ত্যাগ করিয়া চ'লয়া গিয়াছেন; শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুও বৃদ্ধ হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার ও শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত মহাশয়গণ যথাক্রমে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই গুরুতর ভার আমার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সুযোগে দেশের কিঞ্চিৎ কাজ করিতে পারিব মনে করিয়া, আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কৃষকের পাঠক, লেখক এবং আমার বন্ধুবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

কার্পাস তুলা

সভ্য মানুষের আহারের পর বস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। পশমী বা রেশমী বস্ত্র সাধারণতঃ দুর্ঘট। কার্পাস অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সহজে ইহা হইতে সূত্র ও বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জন্য, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এত অধিক পরিমাণে কার্পাস ব্যবহৃত হইতেছে। ইউরোপের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ২,২৩,০০,০০০ বেইল (৫মণে এক বেইল) তুলার প্রয়োজন হইত ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে সর্ব্বসমেত ১,৫০,০০,০০০ বেইল তুলা খরচ হইয়াছে। ১৯২১-২২ সনে অনুমানিক ২,১০,০০,০০০ বেইল তুলার বস্ত্র প্রস্তুত হইবে। ইহার মধ্যে ১৯২০ সনে কোনদেশে বিশেষত ভারতবর্ষে কত তুলা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানা আমাদের কর্ত্তব্য।

দেশ	জমী	উৎপন্ন তুলা (বীজবাদে)
	একর	বেইল—
ভারতবর্ষ … …	২,৩৩,৫[illegible],০০০ …	৫৭,৯৬,[illegible],০০
বুলগিরিয়া … …	৪,০০০ …	২,০০০
ইজিপ্ট … …	১৮,৯৮,০০০ …	১৪,৯৪,০০০
জাপান … …	৬,০০০ …	৫,০০০
ইউনাটেডষ্টেট … (আমেরিকা)	৩,৬৩,৮৩,০০০ …	১,৫৫,৩২,০০০
মোট—	৬,১৬,৪৩,০০০ …	২,১৪,২৯,০০০

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে, যে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উৎপন্ন কার্পাসের দুই তৃতীয়াংশ আমেরিকা হইতে এবং এক চতুর্থ ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের তুলা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমেরিকার দুই এক স্থলে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সি-আইল্যাণ্ড নামক তুলা জন্মিয়া থাকে। তৎপরে ইজিপ্টের তুলা উৎকৃষ্ট। আমেরিকার সাধারণ তুলা ও সাধারণত উত্তম বলা যায়। বিলাতের কলে ভারতবর্ষের তুলা ব্যবহার হয় না। ভারতবর্ষের তুলায় কলে ৪০ নম্বরের অধিক সূতা কাটা যায় না। ভারতবর্ষের তুলা প্রধাণত জাপানে রপ্তানি হয়। রপ্তানির পাঁচভাগের প্রায় তিন ভাগই জাপান খরিদ করে। গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে কত তুলা উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়াছে তাহা নিম্নস্থ তালিকায় দেখান হইল—

সন	উৎপন্ন তুলা বেইল—	রপ্তানি তুলা বেইল—
১৯১৮-১৯	৩৯,৭২,০০০	১০,৩০,০০০
১৯১৯-২০	৫৭,৯৬,০০০	২৩,৯৯,০০০
১৯২০-২১	৩৫,৫৬,০০০	২০,৭৪,০০০

ভারতবর্ষের কলে প্রায় ৩০ লক্ষ বেইল তুলা খরচ হয়।

বঙ্গদেশে এত সামান্য পরিমাণে তুলা জন্মে যে, তাহা দেখিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের উৎপন্ন তুলা

	জমী (একর)	তুলা (বেইল)
১৯১৮-১৯	৭৩,০০০	৩২,০০০
১৯১৯-২০	৬৯,০০০	২৫,০০০
১৯২০-২১	৭০,০০০	২১,০০০

আসাম প্রদেশে বাঙ্গালার মাত্র একার্দ্ধ পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়।

বাঙ্গলা দেশের তুলায় বাঙ্গালীর কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রয়োজনের ষোল আনির মধ্যে মাত্র এক আনি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। খাওয়া পরার জন্য একদেশ অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, ইহা অস্বাভাবিক। মোটা কাপড় চলিলে, বাঙ্গলাদেশেই বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় তুলা জন্মিতে পারে।

আম্র ফল

বর্ত্তমান বৎসরের মত এত আম কেহ কখন দেখিয়াছেন এমন কথা কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। আমাদের জ্ঞানে ইতি পূর্ব্বে অনেক বার এইরূপ প্রচুর আম ফলিতে দেখিয়াছি, কিন্তু মানুষের ভোগে তাহা লাগে নাই; কারণ পাকিবার পূর্ব্বেই তাহা

ঝড়ে ফেলিয়া দিত। এই বৎসরে মুকুল ধরিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, যথা সময়ে, মাঘ মাসে একবার ও চৈত্র মাসের প্রথমে আর একবার সুবৃষ্টি হইয়াছিল। তদাবধি ঝড় বৃষ্টি কিম্বা শিলা বৃষ্টির দ্বারা আমের কোন অপচয় হয় নাই। সুতরাং এই বৎসরের ফলনের তুলনা হয় না। কলিকাতায় দেশী আম শতকরা দশ আনা হইতে বার আনায় বিক্রয় হইয়াছে। বোম্বাই ও ল্যাঙ্গরা আমও ৩৸০ টাকা হইতে ৫৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মজফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, মালদহ প্রভৃতি আমের প্রধান স্থানে, ১৲ টাকা হইতে ১৷৷০ টাকায় একশত উৎকৃষ্ট কলমের আম বিক্রয় হইতেছে। অনেক লোক এক বেলা আম খাইয়াই কাটাইতেছে। এত আমের কথা পূর্ব্বে কখন কেহ শুনেন নাই। বোম্বাইর আম বিখ্যাত। বেহার প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা, মজফরপুর চাম্পারণ, সারণ ও ভাগলপুর জেলায় অপর্য্যাপ্ত আম জন্মে। তথায় সব কলমের আম। বীজু আম ঐ সকল জেলায় অন্যান্য বৎসরে সাধারণতঃ শতকরা পাঁচ আনা হইতে আট আনা এবং কলমের আম ৩৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকায় বিক্রয় হইত।

ভাগলপুরের জর্দ্দা আলু নামক সুস্বাদু ও সুগন্ধ বিশিষ্ট আম কুত্রাপি পাওয়া যায় না। বেহার প্রদেশে ল্যাঙ্গরা আমের নাম "মালদ"। সম্ভবত মালদহ হইতে ঐ আম বেহার প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

বড় আমের মধ্যে "ফজলী" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। মালদহ জেলায় ফোজলী নাম্নী একটী গরিব মুসলমান রমণী বাস করিতেন। তাঁহার একটী আম গাছ ছিল। ঐ গাছের আম বিক্রয় করিয়া ফোজলী তাঁহার ভাত কাপড় সংগ্রহ করিতেন। অচিরে ঐ গাছের আম বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া ঐ গাছের কলম লইয়া যায়। বঙ্গদেশের মধ্যে মালদহই আমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। রাজসাহী বগুড়া জেলায় উত্তম আম জন্মে। কিন্তু মালদহ ব্যতীত কলমের গাছ কোথায়ও অধিক নাই।

মুরশিদাবাদের নবাবগণ বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ আমের কলম আনিয়া তথায় রোপন করেন। তদবধি মুরশিদাবাদ আমের একটী বিখ্যাত স্থান হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে সাধারণতঃ লাল মাটীর আম পলি মাটীর আম অপেক্ষা সুমিষ্ট। অনেকেই হয়ত অবগত আছেন যে মিষ্ট ফলের বীজের চারা অনেক স্থলে মিষ্ট ফল প্রদান করে না। সুতরাং কলমের গাছ ব্যতীত মিষ্ট ও আশ বিহীন ফল পাওয়া একরূপ অসম্ভব।

পূর্ব্ব বঙ্গে যথেষ্ট বীজু আম পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় আমের ভীষণ শত্রু একরূপ পোকা আছে। বাহির হইতে ফল দেখিতে বেশ, কিন্তু ভিতরের সব শাস পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে। ঐ পোকার পাখা হইলে, আমের গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া

উড়িয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অধিকাংশ আম এই পোকার দ্বারা অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।

আমের আদি স্থান এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বভাগ। মধ্য ভারতবর্ষের পাহাড়ে ও হিমালয় পর্ব্বতের সমতল ভূমি হইতে ১০০০ হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ প্রদেশে বন্য আম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বন্য আম অতিশয় টক। ভারতবর্ষের সুমিষ্ট আম ভারতবর্ষেই উৎপত্তি হইয়াছিল, কিম্বা অন্যদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে হনুমানজী লঙ্কা হইতে অমৃত ফল আমদানি করিয়া ছিলেন; বাস্তবিক মালয়া দ্বীপের আম্র অতি উত্তম।

কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ী কাচা আম হইতে মুখরোচক আচার ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে চালান করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে কাচা আম হইতে আমচুর ও পাকা আম হইতে আমসত্ব প্রস্তুত হয়। নারিকেল ও চিনি সহকারে আমসত্ব অতিশয় উপাদেয়। আমের বীচির শাস হইতে পালো প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

পাটের অবস্থা

যুগান্তকারী ভীষণ যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই পাটের দর নামিয়া যায়। যুদ্ধের সময়ে পাটের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ ৩ কোটী থলিয়া বিদেশে রপ্তানী হইত; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে ৭ হইতে ৮ কোটী থলিয়া রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু পাটের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস হইয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে থলিয়াতে বালী পুরিয়া আত্মরক্ষা বা শত্রু আক্রমণ জন্য পাহাড় প্রস্তুত হইত। এই জন্য থলিয়ার কাট্‌তি অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। পাট কলের মালিকগণ সস্তাদরে পাট কিনিয়া অগ্নিমূল্যে থলিয়া বিক্রয় করিত। গরীব কৃষকের ফসল ধরিয়া রাখিবার শক্তি না থাকায়, তাহারা সস্তাদরে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধাবসানে পাটের সেইরূপ প্রয়োজন থাকে নাই, এবং অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য মন্দ হওয়ায়, পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া যায়। কাজেই বাধ্য হইয়া, কৃষকগণ ১৯২০ সনে ২৮ লক্ষ একরে এবং ১৯২১ সনে মাত্র ১৫ লক্ষ একরে পাট বপন করে। ১৯১৯ সনে ২৮ লক্ষ একরে পাট জন্মিয়াছিল।

গত বৎসরে মাত্র ৪০ লক্ষ বেইল (৫মণে এক বেইল) পাট, উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫৯ লক্ষ বেইল, তাহার পূর্ব্ব বৎসরে (১৯১৯) ৮৫ লক্ষ বেইল পাট জন্মিয়াছিল। গত বৎসরে পাট অৰ্দ্ধেক পরিমাণে জন্মিয়াও কৃষকের কোন উপ-

কার করিতে পারে নাই। কারণ কৃষক গরীব, তাহারা কোন ফসলই ধরিয়া রাখিতে পারে না; ক্রেতা যাহা দেয় তাহাতেই তাহারা উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলে। তাহ না করিলে, জমীদার ও মহাজন তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে। যখন প্রজার হাতে আর পাট নাই, তখন হঠাৎ গত চৈত্র মাসে, পাটের দর মণকরা চারি টাকা হইতে বার টাকায় উঠিয়াছে। এ বৎসরে যথাসময়ে বৃষ্টি হয় নাই, তজ্জন্য কৃষকগণ অনেক স্থানে পাট বুনিতে পারে নাই। সুতরাং এই বৎসরে, পাটের দর থাকিলেও, বেশীর ভাগ কৃষক ইহার ফললাভ করিবে না।

আব্‌হাওয়া

ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোনস্থলেই যথানির্দ্দিষ্ট জমীতে ধান ও পাটের চাষ হইতে পারে নাই। মাঘ মাসের বৃষ্টির পরে, যেস্থলে ধান ও পাটের আবাদ হইয়াছিল, তাহাও কোন কোন স্থলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পানীয় জলের অভাবে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র অবর্ণনীয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে কোন কোন স্থলে দুধ দধির ন্যায় ফেরি করিয়া জলও বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহ কখনও এইরূপ জল কষ্টের সংবাদ শুনে নাই। এইরূপ অবস্থা আর এক পক্ষকাল থাকিলে, পূর্ব্ববঙ্গের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত। অবশেষে সুবৃষ্টি পড়িয়া লোকের তৃষ্ণা নিবারণ ও জমীর ফসল রক্ষা করিয়াছে। এই বৎসর, দশবার দিন পূর্ব্বেই বর্ষারম্ভ হইয়াছে।
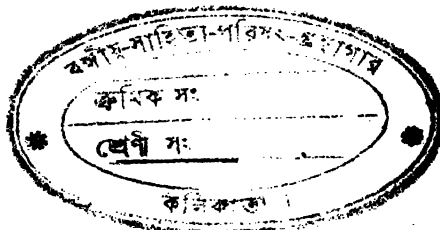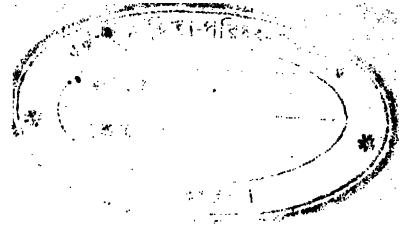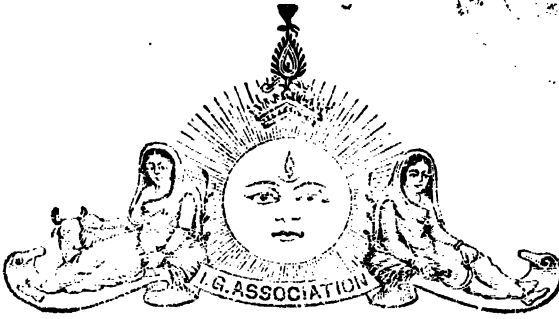
২য় খণ্ড { কৃষক—আষাঢ়, ১৩২৯ সাল { ৩য় সংখ্যা

বাঙ্গলা ভাষার প্রতিষ্ঠা

সম্প্রতি, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে; অর্থাৎ ইতঃপর বাঙ্গলা শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে গণ্য হইবে। ইতি পূর্ব্বে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য ছিল। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় এমন কি সংস্কৃত ভাষাও ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রবেশিকা পরীক্ষার সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। মাতৃভাষার এইরূপ দুর্দ্দশা অধঃপতিত দেশ বা জাতির পক্ষেই কেবল সম্ভব হইতে পারে। এতদিন পরে বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গলা দেশের এই কলঙ্ক দূর হইল।

বাঙ্গলা ভাষার বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে, ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য না থাকিলে বাঙ্গালীর শিক্ষা অপূর্ণ থাকিবে। ইংরাজী এক শ্রেষ্ঠ ভাষা ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, অন্য দেশী লোক, সাধারণতঃ, আপন ভাষার সাহায্য ব্যতীত বিদেশী কোন ভাষায়, কোন বিষয়ে, ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না; পারিলেও কষ্টসাধ্য। রাজার ভাষা শিক্ষা করাও ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই জন্য রাজার ভাষায় ইতিহাস ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিতে হইবে, এমন কোন কারণ পাওয়া যায় না। এই সব বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা স্বভাবতঃ সহজ। বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সব তত্ত্ব মাতৃভাষার সাহায্যেই সাধারণের মধ্যে প্রচার সম্ভব; বিদেশী ভাষায় কিম্বা জাতীয় প্রাচীন ভাষায় তাহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

সাধারণতঃ, বাঙ্গালীর নিকট বিদেশী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সহজসাধ্য না হইলেও প্রাচীন মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ন্যায় ইহা দুঃসাধ্য নহে। ইংরাজী উন্নতিশীল ও

সজীব ভাষা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহা হইলেও বিদেশীর নিকট ইহা কঠিন। সংস্কৃত এক মৃত প্রাচীন ভাষা। প্রাচীনকালেও ইহা কখন সাধারণের ভাষা ছিল না। পণ্ডিত মণ্ডলীর গবেষণা ও জ্ঞান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া উহা কখনও সাধারণ লোকের গোচরে আসিত না। সাধারণ লোকে ইহাকে দেব ভাষ বলিত।

অধিকাংশ পরীক্ষার্থী অন্ন সংস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হয় সুতরাং যে ভাষা-শিক্ষাদ্বারা সহজে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়, তাহাই সাধারণের জন্য প্রযুজ্য। যাহারা সক্ষম, তাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও অন্যান্য বিদেশীয় ভাষা হইতে উপাদেয় সারবস্তু সকল চয়ন করিয়া মাতৃভাষায় প্রচার করিবেন। এই সব নানা কারণে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাতৃ-ভাষা যথাস্থান প্রাপ্ত হওয়ায়, আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের আশা হয় যে, এখন বাঙ্গলা ভাষায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা হইবে না। যে সকল কৃতি ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায়, প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিয়া, মাতৃভাষাকে যথাস্থানে উপবিষ্ট করিলেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালাদেশ কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ রহিল। এই প্রসঙ্গে, বীণাপাণীর বরপুত্র, ধীমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধিপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী জাতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেছে।

আর একটী কথা বলিয়া আমাদের মন্তব্য শেষ করিব। কতিপয় শ্রেষ্ঠ মুসলমান ব্যক্তি মুসলমান বালকদিগের জন্য বাঙ্গলার স্থলে উর্দ্দু ভাষা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের উর্দ্দু ভাষায় কোন জ্ঞান নাই,—সুতরাং এই সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। তবে দেশের মঙ্গলের জন্য, একদেশে একই ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব থাকা প্রয়োজন মনে করি। সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, যে ভাষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা সাধারণের পক্ষে গ্রহণোপযোগী সরল কিনা? আমাদের কয়েকটী মুসলমান বন্ধু বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দ্দু কঠিন। বাঙ্গলা ভাষার ইকারাদি এবং ষত্ব ও ণত্ব বিধানের জটিলতা ছাটিয়া, সংস্কৃত করিতে পারিলে, কায়েতী হিন্দি ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষারমত এমন সরল ভাষা ভারতবর্ষে আর নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গলাই মাতৃভাষা। মাতার কোল হইতে যে ভাষা শিক্ষা হয় তাহা মূঢ়ের নিকটও সরল। বাঙ্গালী মুসলমান বালকদিগকে বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিলে, মুসলমান সমাজের অনিষ্ট হইবে। মেধাবী ব্যক্তিগণ মাতৃভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু মাতৃভাষা উপেক্ষা করিলে, ইহার ফল ভাল হইবে না।

কমলা লেবু

কমলা লেবু অতি উৎকৃষ্ট ফল। ইহা যেমন সুস্বাদু তেমনি উপকারী। লঘু পথ্য বলিয়া কঠিন পীড়ার সময়েও এই ফল রোগীকে ব্যবস্থা করা যায়। কমলা লেবু পাহাড়িয়া ভূমিতে জন্মে। চূণ প্রধান মৃত্তিকায় ফল মিষ্ট হয়। চূণ প্রয়োগদ্বারা সকল টিলা ভূমিতে উত্তম কমলা লেবু উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের কমলা উৎকৃষ্ট। নেপাল ও নাগপুরের কমলাও বিখ্যাত। খাসিয়া পাহাড়ের ফলকে সাধারণতঃ সিলেটী লেবু বলা হয়। খাস সিলেট জেলায়ও লেবু জন্মে। কিন্তু ইহা তত সুমিষ্ট হয় না। কিন্তু সিলেটী লেবুর খোসা পুরু বলিয়া ইহা অনেক দিন রক্ষা করা যায়। দূরদেশে চালান দিবার নিমিত্ত সিলেটী লেবুর বিশেষ আদর। নেপাল, খাসিয়াপাহাড় ও শ্রীহট্ট জেলায় লেবুগাছে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নাগপুরে জল সেচন ব্যতীত কমলা জন্মে না। নাগপুরের যে লেবু কার্ত্তিক মাসে পাকে তাহা বিশেষ সুমিষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ গাছ হইতে, যে লেবু চৈত্রমাসে পাকে, সেই ফল খুব মিষ্ট হয়। নাগপুরে একগাছ বৎসরে দুইবার ফল দেয়। কমলা লেবুর গাছ সাধারণতঃ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। কলমের গাছ পাঁচ বৎসরেরেই ফলবান হয়। আর বীজের গাছ আট বৎসরে ফল ধরে।

জমি কোপাইয়া অথবা ভালরূপে পরিস্কার করিয়া, দশ হাত অন্তরে গর্ত্ত করিয়া, বীজের বা কলমের চারা রোপন করিতে হয়। বীজের চারা করিতে হইলে কোন উচ্চ স্থানে বীজতলা প্রস্তুত করিবে। মাটি কোপাইয়া ঐ স্থানে গোবর সার দেওয়া উচিত। পরে আর দুইবার মাটি কোপাইয়া ধুলারমত করিয়া পরিপাটি করিতে হইবে। তৎপরে মনোনিত গাছের উৎকৃষ্ট ফলের বীজ এক ইঞ্চি অন্তর রোপন করিবে। কার্ত্তিক মাসের চারা আষাঢ় মাসেই রোপনের উপযুক্ত হয়। লেবুর বাগান বৎসরে দুইবার কোপাইয়া দেওয়া উচিত। চূণ ও হাড়চূর্ণ কমলা বাগানের উপযুক্ত সার।

প্রত্যেক গাছ ৫০০ হইতে ১০০০ ফল ধরে। বৃহৎ গাছে ১৫০০ হইতে ২০০০ ফল উৎপন্ন হয়। গড় পরতায়, ১০০ লেবু এক টাকায় বিক্রয় হয়। এক গাছ হইতে প্রায় ৫০ বৎসর লেবু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কমলা লেবু খুব আয়ের ফসল।

কমলা গাছের নানা শত্রু। এক প্রকারের পোকা গাছের কচিপত্র ও ডাল খাইয়া উদরসাৎ করে। এই প্রজাপতি কচিপত্রে হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ডিম প্রসব করিয়া উড়িয়া যায়।

ডিম ফুটিয়া পাটকেলে রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীড়া বহির্গত হইয়া পত্রের কচি ডাঁটা খাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের দেহের কোন কোন স্থানে শুভ্রবর্ণের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে পাখীর মল মনে হয়। ক্রমশঃ ইহারা চারা গাছের সমুদায় পত্র খাইয়া গাছগুলি মারিয়া ফেলে। পরে পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত হইয়া কয়েকদিন পত্রের

মধ্যে পৌত্তলিক অবস্থায় কাটায় ও কয়েকদিন পরে প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যায়; এবং নূতন লেবু গাছের কচি পত্রে ডিম্ব পাড়ে। বৎসরে তিন বা চারি বার এই কীড়া উৎপন্ন হয়—প্রথম এপ্রেল মাসে, দ্বিতীয় বার জুন মাসে, তৃতীয় বার নবেম্বর মাসে। শীতের

প্রকোপ না থাকিলে আর একবার ডিসেম্বর মাসেও ইহারা উৎপন্ন হয়। ছায়া গাছগুলি ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদের ছোট ছোট কীড়া গুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে; তখন অনায়াসে উহাদিগকে ধরিয়া মারিয়া ফেলা যায়।

সূতার মত শুভ্র বর্ণের একরূপ ছার পোকা জাতীয় কীড়া অনেক স্থলের গাছ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকে লেদা পোকা বলা যায়। কেরোসিন তৈলের ইমালসন করিয়া ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা যায়।

এক রকম কাঠ-পোকা লেবুর গাছের ভয়ানক শত্রু। জননী পোকা গাছের ছালের উপর ডিম প্রসব করে। ডিম ফুটিয়া কীড়া ছাল ভেদ করিয়া গাছের কাঠের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ ইহারা কাঠ খাইয়া গাছ সমূলে বিনষ্ট করে ও গাছ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। বাহির হইতে গাছ মরিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে পারা
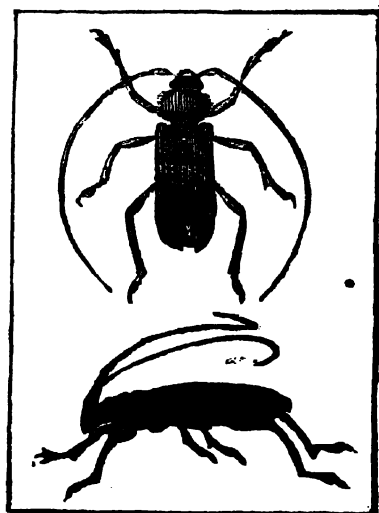
যায় না। কিন্তু খুব পর্য্যবেক্ষণ করিলে গাছের গায়ে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলায় বহু বাগান এই পোকার দ্বারা ধ্বংশ হইয়াছে।

আসামের নানাস্থলে, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলায় টিলা জমিতে কমলা লেবুর বাগান লাভ জনক হইবে। ছোট নাগপুরেও কমলা লেবু জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু তথায় জল সেচনের প্রয়োজন হইবে।

আনারস

আনারস দক্ষিণ আমেরিকার ফল। পর্তুগীজগণ কর্তৃক ভারতবর্ষের ইহার চাষ প্রবর্তন হইয়াছে। পর্তুগীজগণই বিলাতী আলু, মকাই প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ফসল দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আদিম নিবাসীগণ আনারসকে "আনানস" বলে। এই আনানসের আমরা নাম দিয়াছি আনারস।

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে মান্দ্রাজে আনারসের চাষ আরম্ভ হয়। তথা হইতে চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় ইহার চাষ প্রবর্তন হইয়াছে। আসাম ও শিলেট জেলায় ইহার চাষ যেমন সফল হইয়াছে, তদ্রূপ ভারতবর্ষের কুত্রাপি হয় নাই।

আনারস সরস দোয়াশ ও বালী মাটিতে উত্তমরূপে জন্মে। আনারস চাষের জন্য টিলা ভূমি মনোনীত করা কর্তব্য। সমতল ভূমির ফল সুমিষ্ট হয় না। আগ্নতায়ও মিষ্ট ফল জন্মে না। গাছের তলায়, বাঁশ ঝাড়ের নীচে, আনারস জন্মে সত্য কিন্তু ঐ ফল অম্ল ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না।

আনারসের জমিতে চুণ সার শ্রেষ্ঠ। একরে ১০ মণ চুণ প্রয়োগ করা উচিত। চুণ সার আনারসের জমির পক্ষে শ্রেষ্ঠ। চতুর্থ বৎসর হইতে প্রতিবৎসর একর প্রতি ১০০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিলে ফসল বৃদ্ধি হইবে।

সিঙ্গাপুরের 'কুইন' নামক আনারস বঙ্গদেশে ভাল জন্মে। এই আনারস অতি উপাদেয়। প্রত্যেক ফল ওজনে প্রায় দেড় সের হইবে। আসামের কোন কোন চাবাগিচায় ইহার চারা কিনিতে পাওয়া যায়।

আনারসের গোড়ার চারা রোপণ করা উচিত। মাথার চারা ভাল হয় না। চারি হাত অন্তর লাইন করিয়া চারি হাত অন্তরে চারা বসান উচিত। এক একর জমির পরিমাণ ফল ৪৮৪০ বর্গ গজ। চারি হাত অন্তর চারা বসাইলে প্রতি একরে ১২১০ টা গাছ বসিবে। আনারসের ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবার কোদালী দেওয়া আবশ্যক। তৃতীয় বৎসর হইতে আনারসের ঝাড় বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। ৫ম বৎসরে প্রতি ঝাড়ে ৪।৫ টা গাছ উৎপন্ন হয়। চতুর্থ বৎসরে একর প্রতি ২০০০ ফল পাওয়া যায়। ৫ম বৎসরে ফলন প্রায় ৪০০০ হইবে। ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম বৎসরে প্রত্যেক একরে প্রায় ৫০০০ হইতে ৬০০০ ফল পাওয়া যায়। নবম বৎসর হইতে ঐ ক্ষেত্রের ফল নিকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। গড়ের হিসাবে, প্রথম হইতে অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের ফলন দুই হাজারের কম হইবে না। মূল্য প্রতিফলে এক আনা ধরিলেও ১২০ টাকা। খরচ প্রতি একরে ৬০ টাকা ধরিলে, বাৎসরিক লাভ ৬০ টাকা। ৫০ একর জমি হইতে

বৎসরে ৩০০০ টাকা খরচ করিয়া, ৬০০০ টাকা আমদানী কম লাভের কথা নহে। প্রথম বৎসরে পতিত জমি আবাদ করিতে একর প্রতি আনুমানিক ৩০ টাকা খরচ পড়িবে।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্ত্তী জলডোবা নামক স্থানে দেশীয় উৎকৃষ্ট আনারস জন্মে। আমরা তথাকার আনারসের চাষ দেখিয়াছি। তাহারা তিন হাত অন্তরে লাইন করিয়া,—প্রত্যেক লাইনে এক বা দেড় হাত অন্তরচারা লাগায়। তিন বৎসরেই, গাছ এত ঘন হইয়া পড়ে যে, তথা হইতে দুই বা তিন বৎসর ব্যতীত, উত্তম ফল পাওয়া যায় না। তাহারা জমীতে কোন সারও প্রয়োগ করে না।

কচুরী পানা

আসাম ও বঙ্গদেশে এক নূতন রোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা খাল বা নদী দিয়া প্রথমতঃ বিল, নালা, ডোবা প্রভৃতি স্রোতহীন জলাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। দুই এক বৎসরের মধ্যে ইহারা ঐ সকল স্থান ছাইয়া ফেলে। গত আট-দশ বৎসরের মধ্যে এই আগাছা এত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে এখন আসাম ও বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় খাল, বা পুকুর ও ক্ষুদ্র নদীগুলি ইহারা একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। যে জলাশয়ে ইহারা জন্মে তথাকার জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। তথায় মাছ পর্য্যন্ত জন্মে না। পূর্ব্ববঙ্গ জলের দেশ। তথায় প্রায় বার মাস নৌকা পথে যাতায়াত করিতে হয়। এখন তথাকার খাল বিল ও ক্ষুদ্র নদীতে নৌকা চলে না। গমনাগমন ও মাল আমদানী ও রপ্তানী কঠিন হইয়াছে। ইহারা এখন ধানের ক্ষেত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতেছে। লোকের কষ্ট বর্ণনাতীত। গরু বাছুর পর্য্যন্ত জল পাইতেছে না। দশ বার বৎসরের পূর্ব্বে কচুরীর এত বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। তখন কোন কোন স্থলে ইহা দেখা যাইত। এখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই ইহার প্রাদুর্ভাব।

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কচুরীর ফুল ফুটে ও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ পাকিয়া জলে কিম্বা মাটিতে পড়ে। শীতকালে কচুরী গাছ গুলি মৃত প্রায় হইয়া জমীতে পড়িয়া থাকে। বর্ষারম্ভে ইহার মূল ও বীজ গজাইয়া উঠে এবং ইহার বংশ শতাধিক গুণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে।

কচুরী কোথা হইতে আসিল তৎসম্বন্ধে নানা মত প্রচারিত হইতেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে কচুরীর আদিম নিবাস আমেরিকা, কেহ বা বলেন আসাম। কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে, আসামের সীমানায় তারের বেড়া দিয়া আটকাইয়া রাখিলে

বাঙ্গলা দেশ নিরাপদ হইবে। তাঁহারা বলেন আসাম দেশ কেন বাঙ্গলাকে উৎসন্নে দিবে। বাঙ্গলা দেশ যদি কচুরীকে ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া আসামে ফেরত চালান দিতে পারিত, তবে বোধ হয়, এ প্রস্তাবও শুনিতাম!

কোন বিশেষজ্ঞকে বলিতে শুনিয়াছি যে পাট পচার জলে কচুরির উৎপত্তি। পাটের শিরে এতদিন তিনটী বোঝা চাপান হইত, যথা, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ ও চাষার মাছ দুধ খাওয়া। এখন নূতন আর একটা চাপ পড়িতেছে। পাট এখন যায় কোথায়? গত বৎসর ইহার চাষ অর্দ্ধেকে নামিয়াছিল; এবারে ও সেই অবস্থা। আমেরিকা সাধ্য সাধন করিতেছে কিন্তু পাট জন্মভূমি ছাড়িতে রাজি হইতেছে না। পাটের জনক উত্তর বঙ্গের চাষাগণ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে জার্ম্মানী শত্রুতাবশত উড় জাহাজে চড়িয়া কচুরীর বীজ ছড়াইয়া গিয়াছে। তদাবধি এই রক্ত বীজের বংশ বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই জন্য, তাহারা এই বিষ গাছের নাম দিয়াছে 'জার্ম্মানীন'। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পাঠকগণ কচুরী সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে জানাইলে তাহা আমরা সযত্নে মুদ্রিত করিব।

পরিব্রাজক মার্টিনেট

আমাদের ধারণা ছিল যে ভারতবাসীই পরিব্রাজক হয়। কিছুদিন পদব্রজে ভ্রমণ না করিলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ইহাই এদেশের বিশ্বাস। এই জন্য, হিন্দু পর্য্যটক সন্ন্যাসীকে পরিব্রাজক বলে। ধর্ম্মচারী সংসারী লোকের পক্ষেও তীর্থ পর্য্যটন বিধেয়। রেলওয়ে সংস্থাপনের পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তীর্থ পর্য্যটনের জন্য নানা স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। সে অনেক দিনের কথা নহে। ভারতবর্ষের পরিব্রাজক ভারতবর্ষেই ভ্রমণ করিতেন। এখন দেখিতেছি যে, আমেরিকাবাসী মার্টিনেট্ পদব্রজে ভূপ্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি ১৯২০ খৃঃ অব্দের ১৪ই এপ্রেল গৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে প্রায় ৮০০ শত মাইল চলিয়া নিউইয়র্ক সহরে উপস্থিত হন। তথা হইতে জাহাজে ইংলণ্ডে গমন করেন। কয়েকদিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বেলজিয়ম, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী, আলবেনিয়া, গ্রীস ভ্রমণ করিয়া জাহাজে ভূমধ্য সাগর পার হইয়া মিশরে উপস্থিত হন। তৎপর আরব ও মেসপোটেমিয়া অতিক্রম করিয়া জাহাজে চড়িয়া বোম্বে সহরে উপস্থিত হন। বোম্বাই হইতে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া, নাগপুরের পথে গত ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার ৪২ দিনে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হইতে বোম্বাই ১২৫০ মাইল। সুতরাং তিনি প্রত্যহ গড়ে

৩০ মাইল চলিয়াছেন। পথে কোন কোন স্থানে দুই একদিন বিশ্রামও করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবত তিনি এত দ্রুত বেগে চলিতেছেন যে ইহা কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। তিনি ইতিমধ্যে ১৪ হাজার মাইল চলিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ দৈনিক ৪০ মাইল চলেন। সন্তরণেও তিনি বিশেষ পটু। ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম, চীন ও জাপান ঘুরিয়া পরিব্রাজক মার্টিনেট্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার পায়ে জুতা ও মাথায় টুপি নাই। তাঁহার কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের তুলনা হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে, আতিথ্যে ইউরোপের মধ্যে আলবেনিয়া ও পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। মহাজনের বাক্যে ভারতবাসী গৌরবান্বিত হইলেন। তিনি কলিকাতায় বাঙ্গালীদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মার্টিনেট ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ১৩মে তারিখে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অন্তর্গত লুসিয়ানা জেলায় কোন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স এখন ৪৪ বৎসর। তাঁহার কোন বিলাসিতা নাই। তিনি সামান্য আহারে জীবন ধারণ করিতেছেন। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তাহা হইলে কখনই তিনি এই সন্ন্যাসীর পথে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তিনি প্রকৃতই সাধু পুরুষ।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

কোন জাতির উন্নতি বা শ্রেষ্ঠত্ব ঐ জাতির শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী জাতি হীন, কারণ বাঙ্গালী শারীরিক ও মানসিক উভয়ত দুর্ব্বল। বাঙ্গালীর শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার অভাব বর্ত্তমান, সুতরাং তাহারা উপাধি প্রাপ্ত হইলেও মৌলিক গবেষণায় প্রবিষ্ট হইতে, পারিতেছে না। বাঙ্গালী শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। শরীর রক্ষা না হইলে বিদ্যা শিক্ষায় ফল কি? বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত যেন অকাল মৃত্যুর সন্নিকট সম্বন্ধ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়, ছাত্রদের প্রতি তিন জনের মধ্যে ২জন কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত, শতকরা ৩৬ জনের চক্ষু খারাপ, এক তৃতীয়াংশ ছেলেদের দাঁত খারাপ এবং শতকরা ৪১ জন কুব্জাকৃতি।

সৌভাগ্যের কথা এই যে, এইরূপ অবস্থার মধ্যেও মৌলিক গবেষণায় দুই চারি জন বঙ্গ মাতার কৃতি সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মৌলিক গবেষণার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়াছেন। অঙ্গ গঠন বিদ্যায়ও এই দুর্ব্বল জাতি হইতে এক অসামান্য বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার নাম শ্রীমান যতীন্দ্র চরণ গুহ। গোবর বাবু নামেই তিনি বিখ্যাত। ইউরোপীয়দিগের মতে ভারত বাসী দরিদ্র, দুর্ব্বল ও বিদ্যা বুদ্ধিহীন কাপুরুষ। গোবর

বাবুর বীরত্ব সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছে। তিনি যথা সময়ে কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য লোকের ন্যায় তিনি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা অর্থ উপার্জ্জনে নিয়োগ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই শরীর গঠনের দিকে তাহার মন আকৃষ্ট; তজ্জন্য তিনি ব্যাম শিক্ষা অভ্যাস করেন। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতার পালোয়ানদিগকে পরাস্ত করিয়া খ্যাতি উপার্জ্জন করেন। সেই বৎসরই তিনি বিলাত গমন করেন। তথায় বিলাতের প্রসিদ্ধ পালোয়ান এসেল্‌কে পরাস্ত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "চ্যাম্পিয়ন" উপাধি লাভ করেন। তৎপর জার্ম্মাণী ও বেলজিয়ম রাজ্যের প্রধান প্রধান পালোয়ান দিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। আমেরিকায় শ্রেষ্ঠ পালোয়ানদিগের কুস্তি হইবে শুনিয়া, ১৯২০ খৃঃ অব্দে তিনি তথায় গমন করেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দ হইতে কুস্তি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি সমুদায় বিখ্যাত পালোয়ানদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। পৃথিবী বিখ্যাত স্যাণ্ডোর পুত্র ইয়ং স্যাণ্ডোর সহিত যুদ্ধে গোবর বাবু বিজয়ী হইয়াছেন। অবশেষে লিউস্ নামক পালোয়ানের সহিত কুস্তি লড়াই হয়। প্রথম দিনের যুদ্ধে গোবর বাবু জয়ী, দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে পরাভব হন। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে গোবর বাবু বিজয়ী হইয়াছেন। আমেরিকাবাসীগণ গোবর বাবুর বীরত্ব দেখিয়া তাজ্জব হইয়াছেন এবং সমুদায় সংবাদ পত্রে গোবর বাবুর খ্যাতি ঘোষিত হইতেছে। গোবর বাবুর কীর্ত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুখোজ্জল হইল ও বাঙ্গালীর কাপুরুষতা-কলঙ্ক দূর হইল।

গোবর বাবুর পূর্ব্ব পুরুষ বঙ্গজ কায়স্থ। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি বাস করেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ী কায়েস্থের সহিত আদান প্রদান করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ী কায়েস্থের সমাজ ভুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে মসজিদ বাড়ীর গুহ দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজে সম্মান লাভ করেন। এই গুহ বংশ ধনে মানে ও বিদ্যায় কলিকাতার মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ ঘর। গোবরের পিতামহ অম্বিকা চরণ গুহ এবং খুল্লতাত ক্ষেত্র চরণ গুহ প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে গোবরের জন্ম হয়। এখন তাহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর। আমরা গোবর বাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

মনোনীত প্রবন্ধ

কলা

আমাদের দেশে যেমন কলার আদর এরূপ আর কোথায়ও নাই। পূজা পার্ব্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কোনও না কোনও আকারে হিন্দু গৃহস্থ কলা

ব্যবহার করেন। কতদিন হইতে এরূপ হইয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না। তবে ইহা স্থির যে বৈদিক যুগেও ইহার প্রচলন ছিল। কলার চাষ সহর ও সহরতলীর নিকটে দেখিতে পাওয়া যাইলেও সুদূর মফঃস্বলে সেইরূপ আবাদ হয় না। বহু স্থলে কলা আপনা আপনি জন্মাইয়া থাকে। জঙ্গলে, পাহাড়ের নীচে, উপত্যকায় জঙ্গলী অবস্থাতে কলা দেখিতে পাওয়া যায়। মর্ত্তমান, কাঁঠালী, চাঁপা, কাঁচকলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ২০।২৫ প্রকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জঙ্গলী জাতি হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, বিশেষজ্ঞরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। কলা সাধারণতঃ দোআঁশ মাটীতে জন্মে। যে সব জমি স্বভাবতঃ আদ্র সেই খানেই ইহার বেশী বিস্তার। বাঙ্গলা উড়িষ্যা, উত্তর বিহার ও মাদ্রাজেই বিশেষতঃ শেষোক্ত প্রদেশের সমুদ্র তীরবর্ত্তী উপকণ্ঠে উত্তম জাতীয় কলা পাওয়া যায়। তথায় ইহা খুব বেশী পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে।

ঝড় কলার পরম শত্রু। অত্যন্ত শুষ্ক অথবা ঠাণ্ডা দেশে কলা হয় না। এই দেশে বৎসরে কত কলা জন্মে তাহার কোনও হিসাব পাইবার উপায় নাই। কলা রন্ধন না করিয়া পক্ব অবস্থায় খাইলে তাহাকে সাধারণতঃ বানানা বলা হয়।

কলা খাদ্য গুণে শ্রেষ্ঠ। সুপ্রসিদ্ধ কৃষক পত্রিকার সমপাদক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের খাদ্যতত্ত্বে কলার নিম্ন লিখিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ লিখিবদ্ধ আছে।

দাহ্যগুণ		মেদকারিতা গুণ	
শ্বেত সার ও শর্করা	১৪.০	প্রোটিড	১.০
তৈল	০.৪০	ভস্ম	০.৬

জল ৪৮.৯

খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, কলার মত জীবন ধারণ ও শরীর বর্দ্ধনের অন্য কোনও ফল নাই। আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকায় কাঁচা ও পাকা কলাই প্রধান খাদ্য। বিগত যুদ্ধের সময় মধ্য ইউরোপের লক্ষ লক্ষ লোক শুষ্ক কলা হইতে তাহাদের জীবন ধারণের প্রধান উপাদান সংগ্রহ করিত। আমাদের দেশে আমরা কলা ভিন্ন ভিন্ন রকমে গ্রহণ করি। পাকা কলা শুধুই খাই এবং কাঁচা কলা, মোচা প্রভৃতি রন্ধন করিয়া খাইয়া থাকি। আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ ও জল প্লাবনের সময় যখন অন্যান্য খাদ্যের অভাব হয়, তখন অনেক লোকই কলার মূল হইতে প্রাণ ধারণ করিবার উপযুক্ত আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য দেশে তাঁহারা অন্য উপায়ে কলা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ছোট, পাকা, মিষ্ট কলা হইতে নানাবিধ মিঠাই তৈয়ার হয়। বড় মিষ্ট কলা হইতে আটা অথবা ময়দার মত একটি পদার্থ তৈয়ার করিয়া পিষ্টকাদিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। পাকা কলা হইতে জেলী, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কলা যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যাইলেও ইহা যে ব্যবসার হিসাবে আমাদের দেশের ধনাগমের একটি প্রধান উপায় হইতে পারে, তাহা কেহ বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পোর্টল্যাণ্ড, সেণ্টলুইস্ প্রভৃতি সহরে ব্যবসার জন্য কলার প্রচুর পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত মিঃ গোর সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন পোর্টল্যাণ্ড, সেণ্টলুইস্ এই দুইটি জেলায় দুইজন

লোক পাঁচ মিনিট আলাপের মধ্যেই কলার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িবেন। ধনী নির্ধন সকলেই প্রতি বৎসর নূতন নূতন জমিতে কলার চাষ বাড়াইতেছে। আমাদের দেশে কলা চাষ খুব ভাল রকমে হইতে পারে। যে সব জমি ভিজা থাকে কিন্তু জল দাঁড়ায় না, সেই সব জমিতে কলার চাষ করা উচিত। কিন্তু বেশী জমি আবাদ হইলেই যে কলা হইতে অর্থাগম হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ পাকা কলা ২।১দিনের মধ্যেই পচিয়া যায়। সুদুর মফঃস্বল হইতে কলা চালান দিবার সুবিধা হইবে না। তবে যদি খুব বিস্তৃত ভূমিতে চাষ করা যায়, তাহা হইলে নৌকা বা ষ্টীমারে করিয়া কলা চালান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সুবিধা না হয়, ততদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে কলাকে অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। বড় বড় মর্ত্তমান কলা হইতে জেলি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে এবং জেলি নষ্ট হইবে না ও অনেক দিন থাকিবে। জেলি প্রস্তুত করা কিছু কঠিন নহে। পাকা কলার খোসা ছাড়াইয়া রুটির টুকরার মত পাতলা করিয়া কাটিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার পর ছাঁকিয়া লইলেই জেলি প্রস্তুত হইল। তাহার পর চিনি, লেবুর রস বা সাইট্রিক এসিড্ সংযোগ করিলেই চলিবে।

ভাল সুপক্ক কাটালী চাঁপা প্রভৃতি কলা হইতে একরূপ খাদ্য তৈয়ার করা যাইতে পারে। খোসা ছাড়াইয়া খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া কোনও পাত্রে সাজাইয়া গরম করিয়া তাহার জল বাহির করিয়া রাখিলে ও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে ইহা নষ্ট হইবেনা। জল বাহির হইয়া যাইলে চুপসিয়া ইহার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়া যাইবে। এই শুষ্ক কলা আমসত্ত্বের ন্যায় বহুদিন ঘরে রাখিয়া প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাইবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইউক্যালিপ্টস্

আলু, কপি শালগাম প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বিদেশী শাক সবজীর ন্যায় ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষও ইংরেজ কর্ত্তৃক আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার আদিম জন্মস্থান অষ্ট্রেলিয়া মহা দেশে; কিন্তু অধুনা ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরের উভয় কুলবর্ত্তী প্রদেশ, ফ্রান্স, স্পেন, পুর্ত্তুগাল, মিশর, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তিন শতাধিক বিভিন্ন প্রকারের ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষ আছে; কিন্তু ২০।২৫ প্রকারের ইউক্যালিপ্টস্ পত্র হইতে বাজারে চলিত ইউক্যালিপ্টস্ তৈল প্রস্তুত হয়।

প্রায় আশী বৎসর পুর্ব্বে ইউকামণ্ড, সাহারানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে সরকারী জঙ্গল বিভাগ হইতে ইহার পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, এই বৃক্ষ এক্ষণে প্রত্যেক সহরেই ধনী ও বিলাসী বাবুদের বাগানবাটীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। শোভা ও সৌন্দর্য্য ভিন্ন যে ইহার বহুল প্রচলন বিশেষ প্রয়োজন তাহা প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধে মুখ্য উদ্দেশ্য।

ম্যালেরিয়ার প্রতিযোগিতা করিতে ইউক্যালিপ্টস্ অদ্বিতীয়। যে সকল স্থান

সদা সর্ব্বদা সিক্ত থাকে, তথায় ইহা রোপিন করিলে জমির আদ্রতা নষ্ট হয়; কারণ ইউক্যালিপ্টস্ প্রচুর পরিমাণ জল শোষণ করে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন অধিক সংখ্যক ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষ রোপন করিলে নালা, নর্দ্দমা, যেখান হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও প্রসার হয়, তাহা একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে। মৃত্তিকার নীচে ৬০।৭০ ফিট পর্য্যন্ত ইহার শিকড় নামিয়া যায় ও সেখান হইতে পুষ্টির জন্য রস সংগ্রহ করে। পক্ষান্তরে শুষ্ক বালুকা ও কঙ্করময় জমিতেও ইহা জন্মে। কোন কোন স্থলে ইউক্যালিপ্টস্ বহু পরিমাণে রোপন করিয়া তথায় বৃষ্টির আধিক্যও দেখা গিয়াছে। নাইল নদের মোহনাস্থিত বদ্বীপ এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তথায় বৎসরে ৬।৭ দিন মাত্র বৃষ্টি হইত; কিন্তু ৬০ বৎসরের রোপনের ফলে এক্ষণে তথায় বৎসরে ৪০ দিবস বৃষ্টি হইতেছে ও কৃষির সমধিক উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের দেশে নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ অতি সরল ও উচ্চ; কিন্তু ইউক্যালিপ্টাস্ ইহাদের অপেক্ষাও অধিক উচ্চে (১০০।১২০ ফিট) সরল ভাবে উঠিয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ কঠিন বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, রেলের শ্লিপার ও পুলে যথেষ্ট ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শাল গাছ হইতে এসকল কার্য্যের জন্য তক্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিন্তু শালের অপেক্ষা লম্বা ও শক্ত বলিয়া, প্রচুর পরিমাণে পাইলে, ইহার সমধিক ব্যবহার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নারিকেল বৃক্ষের যেমন ছাল ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়, ইউক্যালিপ্টসেও সেরূপ করিতে হয়। ছাল বেশ লম্বা ও চওড়া সেজন্য অষ্ট্রেলিয়ায় ছাউনী মটকা প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

আজকাল আমরা অনেকেই ইউক্যালিপ্টস্ তৈল ব্যবহার করি। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দ্দিতে আমরা যে তীব্র গন্ধযুক্ত তৈল রুমালে ব্যবহার করি, তাহা ইউক্যালিপ্টসের নির্য্যাস। দুই রকম ইউক্যালিপ্টস হইতে ঔষধার্থ তৈল প্রস্তুত হয় এবং এই তৈলের দাম বেশী। অন্যান্য শ্রেণী হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণতঃ ঔষধার্থ ব্যবহার হয় না বলিয়া তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খনিজ পদার্থ হইতে গন্ধক প্রভৃতি দূর করিবার জন্য অল্প মূল্যের তৈল ব্যবহার হয়। বড় বড় কারখানায় রুলারের অনেক দিন কাজ হইলে একটা কঠিন স্তর পড়িয়া থাকে। যাহাতে তাহা না হইতে পারে সেই জন্য এই তৈল মাখাইয়া দেওয়া হয়।

সরকারী জঙ্গল বিভাগ অনেকদিন যাবত নীলগিরি পর্ব্বত ও উপত্যকায় ইউক্যালিপ্টসের আবাদ করিয়া আসিতেছে এবং সেই জন্য তথায় তৈলও প্রস্তুত হইতেছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তথায় তৈল চুয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। গত যুদ্ধের

সময় যখন ভারতের বাহির হইতে তৈলের আমদানীর সুবিধা ছিল না, তখন নীলগিরি তৈল যথেষ্ট ব্যবহার হইত। সেখানে বৎসরে ৬০০ মন তৈল প্রস্তুত হইতেছে। নীলগিরিতে গবিওলুয়াস নামক ইউক্যালিপ্টাস্ রোপন করা হইতেছে। এখনকার তৈল আলজেরিয়া দেশের তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ ইহাকে উত্তম তৈলের মধ্যে গণ্য হয়।

আমাদের দেশে আবাদ করিতে হইলে স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইউক্যালিপ্টস্ রোপন করা প্রয়োজন, কারণ শুষ্ক মাটীতে যাহা উত্তমরূপে জন্মিবে, আর্দ্র মাটীতে তাহা হইবে না। ইউক্যালিপ্টস্-পারক্টকোরাস যে কোন জল হাওয়ায় জন্মিতে পারে। ইউক্যালিপ্টস্-সিট্রিডোরা কঙ্করময় স্থানে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে বা উপত্যকায় ইউক্যালিপ্টস্-এলবুইস্ রোপন সন্তোষ জনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ডুমরা নামক ইউক্যালিপ্টস মধ্যভারতের মত কঙ্করময় স্থানের উপযুক্ত। বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে যেখানে জলের আধিক্য তথায় ইউক্যালিপ্টস্-রোভাষ্টাই ও ইউক্যালিপ্টস্-নেট্‌কিউটিনইভাস উপযুক্ত। যে সকল স্থানে উই পোকার প্রাদুর্ভাব ও কোন গাছ বেশী বাড়িতে পারে না, সেইখানে ইউক্যালিপ্টস্ মাইক্রকোরিস রোপন উপযুক্ত। ব্যবসায় করিবার জন্য আবাদ করিতে হইলে বহুল পরিমাণে ইউক্যালিপ্টস্ রোপন করা আবশ্যক। নীলগিরিতে প্রায় ২০০০ একর জমিতে ইহা রোপন করা হইয়াছে।

বাঁধা কপির চারা তৈয়ার করিবার জন্য যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা হয়, ইউক্যালিপ্টস্ বৃক্ষের চারা সেইরূপে করিতে হইবে। দোআঁশা মাটিতে কিছু বালি মিশাইয়া লইতে পারিলে ফল ভাল হয়। মাটি প্রস্তুত হইলে তাহাতে বীজ বপন করিতে হইবে ও বীজের উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ চূর্ণ মাটিদ্বারা চাপা দিতে হইবে। যত দিন উহাদের অঙ্কুর বাহির না হয়, ততদিন প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় জল সেচন করিতে হইবে। ছয় ইঞ্চি অঙ্কুর বাহির হইবার পর তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে লইয়া, আট হাত অন্তর রোপন করিতে হইবে। কাষ্ঠের জন্য আবাদ করিতে হইলে আরও ঘন ভাবে চারা বসান যাইতে পারে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

যাঁহারা সহরে বাস করেন, সহরের কূপ মণ্ডুক হইয়া সহর ভিন্ন অন্য কোন স্থানের সংবাদ রাখেন না, পল্লী স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

ফলতঃ পল্লীই যে দেশরক্ষার প্রধান উপায়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সহরে কলের জল বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ সুবিধার পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধান্য, কলাই, মুগ, মসূরাদি পল্লীর আবিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাও উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরের ন্যায় পল্লী প্রদেশে মণি কাঞ্চনের সুলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণরজত অলঙ্কার বিহীন পল্লীবাসীর অঙ্গলতা হরিৎ শ্যামল শষ্প সম্ভারে যে সৌন্দর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, যেরূপ লাবণ্যের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তজ্জন্যই বাঙ্গলার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কত দূর প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নানা কারণে বাঙ্গালার পল্লীগুলির ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্তিবাসের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, কাশীরাম দাসের ভিটা শ্বাপদ কুলের আবাস ভূমি হইয়াছে। ভারত চন্দ্রের জন্মভূমি প্রায় জন শূন্য শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদ্বীপ একদিন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি পুরাণ চিকিৎসা জ্যোতিষের গর্ব্বে সকল দেশের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের জ্বালায় পিতৃ পিতামহের ভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, তথাকার অর্দ্ধেক অধিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাসীগণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রাম নিবাসীগণ, এখন আর দেশের খবর রাখেন না। কারণ রোগের পীড়নে দেশে থাকিবার উপায় নাই। জয়দেবের কেন্দ বিল্ব গ্রাম, যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বয়ং ভগবান আসিয়া "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজ জন শূন্য। বোপদেবের ভিটা কেহ আর চাহিয়া দেখে না। বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাসের জন্ম ভূমি যে কোথায় ছিল, সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখন আর কেহ মনে করে না।

ফলতঃ কেন এমন হইল, কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজ স্বর্ণবঙ্গের অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ সুবিধা যত প্রকারেই বর্দ্ধিত হউকনা কেন, সহর হইতে কেহই কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন ইহাও আমরা সহর হইতে কোন কালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ যথেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, যথেষ্ট পাইবে; কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, ন্যায়ের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান সহর নহে। বাঙ্গালার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে সকলের উর্ব্বর ক্ষেত্র সহরে কোন কালে প্রশস্ত হয় নাই। আজ কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী জননী তাঁহার কৃতি সন্তানদিগকে প্রবাসী সাজাইয়া দারুণ দৈন্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহার সেই হৃত শ্রী ফিরাইতে পারি কিনা, এই সমস্যার সমাধান করাই কিন্তু এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে

আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সহরে বাস করার ফলে উদর পূর্ত্তির জন্য যাহারা পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরের খবর রাখিবার চিন্তা তাহাদের অনেকেরই নাই। অর্থের সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু কোন্ কোন্ দেশ হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে সেই ধান্য রাশি হইতে আমরা আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং সেই চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ও চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারি কিনা, এই সব চিন্তা করিবার অবসর তাহাদের আদৌ নাই। অবসর নাই বলিয়া প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো অবসর আসিবে?

ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের লোকই যে আজি বিপর্য্যস্ত, এবং ইহা পৃথিবীর অন্য কোন দেশকে ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করে নাই তাহা নহে। বাঙ্গালা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও এই দুরন্ত রাক্ষসী সে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল দেশের অধিবাসীদিগের চেষ্টা ও যত্নে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সেই সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। অন্যান্য দেশের লোক আমাদের মত বচন বাগীশ নহে, তাহারা প্রকৃত কর্ম্মের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে, কাজে কাজেই তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আর আমাদের পল্লী জননা এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য সন্তান সন্ততির বিয়োগ ব্যথা অম্লান বদনে অনুভব করিতেছেন। যে মুষ্টিমেয় অপত্য না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া প্লীহা, পার্শ্ব জোড়া যকৃৎ ও কুক্ষি জোড়া অগ্রমাস, তাহাদের স্বাস্থ্য দৈন্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাদের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন। যাহাদের গত্যন্তর নাই তাহারা উপায় রহিত অবস্থায় ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া নিজেদের আয়ু-প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় করিয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালা দেশের কথা চিন্তা করেন এমন মনস্বী লোক অনেক আছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? মোট কথা এরূপ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় চিন্তা কেবল কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না, অথবা গগনভেদী বক্তৃতার জোরে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণ পটহ বিদীর্ণ করিলেও চলিবে না। এই চিন্তার ফলে পল্লীর কৃতি সন্তানগণ যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চির কালের মত পল্লী মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সহর প্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহারাই পল্লীর আশা ভরসা সহায় সম্বল, এই সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া, যাহাতে তাঁহারা আপন আপন পল্লীর উন্নতিসাধনে বদ্ধ পরিকর হন, তাহার জন্য চেষ্টা

করিতে হইবে। যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন। এইরূপে যাঁহার যতটুকু শক্তি তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্য যদি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে, এই দুরন্ত দানবীর সহিত যুদ্ধে অন্যান্য দেশের মত, আমরাও জয়ী হইব, তাহা অবিসম্পাদিত।

যাঁহারা সহরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন সহরেও রোগের জ্বালা কম নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাধি, কিন্তু সহরে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাধি যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ। সহরের বদ্ধ বায়ু, কল কারখানার ধোঁয়া ও খাদ্যাখাদ্যের বিচার শূন্যতা, মোটামুটি এই কয়েকটী কারণে সহরে থাকিয়াও, লোক যক্ষ্মাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছে। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইবার আরও অনেকগুলি কারণ আছে সে সমস্ত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বার মাস লাগিয়া আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কলেরা, নিউমোনিয়া, কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব। সুতরাং ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, অনেককেই আবার পল্লী ভিটায় ফিরিয়া যাইতেই হইবেক। যদি আর কিছু দিন পরে তাহাই হয়, তবে আর বাঙ্গালার পল্লী গুলি শ্মশানে পরিণত করিয়া লাভ কি? এখন হইতেই কায়মনোবাক্যে পল্লী সংস্কারে মনোযোগী হইয়া যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আবার সে কালের মত সুখ সমৃদ্ধিতে কাটাইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য নয় দশ টাকায় একরূপ নির্দ্দিষ্ট ভাবেই দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অনেকেই চাউলের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহেন। বাজার আছে, যখন যে দরই হউক ইহা ক্রয় করিয়া আনিয়া রন্ধন করিতেছেন। ইহাই মাত্র চাউলের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে কাতর নহেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ দুর্ব্বিষহ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন বাঙ্গালী জাতি সেই অতীত যুগের অসভ্য প্রথায় পল্লী প্রান্তরে আবার কৃষি কর্ম্মে মনঃ সংযোগ না করিবে, তদবধি এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। বাঙ্গালী চাকুরিই করুক, আর যাহাই করুক, বাঙ্গালী যে এখন "হাভাতের দল" হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধিকাংশ ব্যক্তিই পূর্ব্বে চাকুরি করিত না বটে, কিন্তু তখন তাহাদের চাষে ধান্য হইত, অন্যান্য ফসলাদি হইত, ক্ষেত্রে তরকারী জন্মিত, পুকুরে মৎস্যের অভাব ছিল না, তাহার ফলে তখন বাঙ্গালী এখনকার মত "হাভাতের দল" হয় নাই। চাকুরির স্পৃহাতেই বল, আর ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বল, আর সখ মিটাইবার জন্যই বল, বাঙ্গালী পল্লী পরিত্যাগ করিয়া, সে কালের বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া, আপন কর্ম্ম দোষে, স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে আছে দেশের আশা

ভরসা বাঙ্গালীর এই দারুণ দুর্গতির দিনে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া তাহার বহুকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইয়া, পল্লী পরিত্যাগই যে তাহার আজি চরম দুর্গতির কারণ, তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া আবার তাহাকে স্বপথে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধন চেষ্টা করিবে? যিনি এই কাজে অগ্রসর হইবেন আমরা তাঁহাকে কোটী ধন্যবাদ দিব। বিশ্ব সংসার তাঁহার গুণ গাথা গাহিবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাহার নাম অবিনশ্বর ভাবে কীর্ত্তিত হইবে। যদি কাহারও সাহস থাকে, এস বাঙ্গালী জাতিকে আবার নিজের পথ দেখাইয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

প্রবন্ধের আকার অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল, যাহা হউক এক্ষণে দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কিরূপে হইতে পারে তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইলে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না গেলেও তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরে শতকরা ৪০ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রমণে মরিয়া থাকে। একি মৃত্যু! জগতের কোন দেশের লোক তো এরূপ ভাবে মরণের পথ পরিষ্কার করে না। চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্র, শ্রাবনের অবিরাম বারিধারা পৌষের, হাড় ভাঙ্গা শীত অম্লান বদনে সহ্য করিয়া, যাহারা দেশের জন্য, জাতির জন্য, পল্লী প্রান্তরে সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপাদনের প্রয়াস করিতেছে, তাহাদের মরণের পথ চাহিয়া দেখিলে তো চলিবে না। তোমার আমার দেশরক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা তাহারা যে সত্য সত্য কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিতেছে, এই কথাটী এখন আর মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিলে চলিবেনা। বৎসরে যদি শতকরা ৪০ জন কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবেনা ইহা ধ্রুব সত্য। পল্লী প্রান্তরে কৃষককুল নিরক্ষর হউক, অসভ্য হউক, কিন্তু তাহারাই সমগ্র বাঙ্গালী-জাতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র ভরসা। তাহারা কুশলে থাকিলে, তবে বাঙ্গালায় সকল জাতি কুশলে থাকিবে, তাহারা রক্ষা পাইলে বাঙ্গালী জাতিরক্ষা পাইবে, বঙ্গের কৃতি পুরুষগণ তোমরা জন্ম ভূমিতে ফিরিয়া যাও আর না যাও, অগ্রণী হইয়া দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর, তাহাদের আবাস স্থানের পার্শ্বস্থ বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, নালা ডোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দোবস্ত কর, পানীয় জলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাহাদের রুদ্ধ প্রায় জলাশয়গুলির সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে দেখিবে তাহাদের আবাস ভূমি আবার স্বাস্থ্য নিকেতন হইয়া উঠিবে, পল্লীর সুখ সৌভাগ্য অতীত যুগের শান্তি বহন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে।

কৃষকের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইত, সেগুলি পরিপক্ক হইলে কাটিয়া, আনিয়া আছড়ান হইত, তৎপরে শস্য সস্তার পৃথক করিয়া লওয়ার পরে গৃহে আনীত হইলে

কৃষাণীই সে শস্য রক্ষার অধিকারিণী হইত, কৃষাণী সে গুলিকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইয়া কতকাংশ বিক্রয়ের বন্দবস্ত করিয়া তদ্বারা তৈল লবণ বস্ত্রাদি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয় করিত। হৈমন্তিক ধান্য যখন এইরূপে গৃহজাত হইত, তখন সকল গৃহেই কি এক অদ্ভুত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইত। এখনকার নবান্ন, এখনকার পৌষ পার্ব্বণ, সেতো বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র, একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার হইতে নূতন চাউল ক্রয় করিয়া আনিয়া এখন যেমন নবান্নের আয়োজন, পৌষ পার্ব্বণের ঘটাও তদ্রূপ। কিন্তু সেকালে যখন সমস্ত বৎসরের শ্রমের ফল নূতন ধান্য অঙ্গিনা প্রদেশ আলোকিত করিত, তখন কৃষাণী সেই ধান্যে নবান্নের আয়োজন করিত, পুরোহিত ডাকা হইত, মন্ত্র পাঠ হইত, প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালীর পৌষ পার্ব্বণও ছিল ঐ নূতন ধান্য উৎপন্নের পরে। এখন সে নবান্নের ঘটাও নাই, পৌষ পার্ব্বণের উৎসব ও নাম মাত্র আছে।

পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, মশক দংশনই ম্যালেরিয়া আক্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে সকল দেশে মশক নাই, তত্তৎ প্রদেশে ম্যালেরিয়াও নাই। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইতে অগ্রে মশক বংশ নির্ম্মূলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বল্প তোয়া নদী সরিৎগুলি, খালবিল ডোবাগুলি, গৃহ পার্শ্বস্থ গর্ত্ত ও নালা গুলিই হইতেছে মশক বিস্তৃতির সর্ব্বপ্রধান স্থান, সেগুলির সংস্কার সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মশারি ব্যবহারে উপদেশ দিতে হইবে। বর্ষার সময় জল স্বভাবতঃই দূষিত হয়, এজন্য গরম জল পানীয় রূপে ব্যবহার করিবার জন্য, সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন নানা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। কৃষক দিগের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যায়ামের আবশ্যক নাই, কর্ম্ম সূত্রে তাহারা যে ব্যায়াম করে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু কৃষিজীবী বা অন্যান্য শ্রমজীবী ভিন্ন যাহারা পল্লীতে বাস করেন, তাহাদের পক্ষে কিছুক্ষণ ব্যায়াম আবশ্যক। এই সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া বঙ্গ দেশ হইতে প্রস্থান করিবে, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক কে হইবেন, ইহাই চিন্তার কথা, কে এমন কর্ম্মবীর আছেন, যিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই সকল তথ্য অবগত করাইবেন।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

সংগৃহীত

কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটি

যুদ্ধের পূর্ব্বেও ইংলণ্ডে এই হিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহে ইহার প্রচলন ছিল। ইংলণ্ডের লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহাদের মূলধন ন্যস্ত করিতেন, কৃষির দিকে তাঁহাদের আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাহার পর যখন দেশের লোকে বুঝিল যে কৃষি ব্যতীত অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, তখন চারি দিকে "Back to the land" শব্দ পড়িয়া গেল। কৃষকদের সাহায্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে এক আইন পাশ হইল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ মূলধনের অভাবে নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কঠোর দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন কাটাইতে হয়। সেই কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ অল্প সুদে অর্থ পাইলে দেশের কৃষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া সুখে থাকিতে পারে, তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, তাহারাও আবার ভদ্রলোক হইয়া জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।" ইংলণ্ডের লোক একথা বুঝিল, তাই সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠান করিয়া কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে সাহায্য করিতে কৃত সংকল্প হইল। দেশের ব্যাঙ্ক সমূহ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল, অচিরে তাহাদের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিল। কৃষির উন্নতির আবশ্যকতা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে এমন বুঝিতে হইয়াছিল যে সুন্দর সুন্দর প্রমোদ উদ্যান সমূহকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইয়াছিল। এ দেশের কৃষক দরিদ্র; দেনার দায়ে সমগ্র বৎসরের পরিশ্রমের উৎপন্ন খাদ্যসম্ভার মহাজনের ঋণের সুদের দায়ে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া সমস্ত বৎসর তাহার অপগণ্ড পোষ্যগুলিকে লইয়া অর্দ্ধাসনে দিনাতিপাত করিতে হয়। এমন শোচনীয় দৃশ্য কেবল ভারতেই দেখা যায়---অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতের বহু সংখ্যক জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে, কৃষকগণের মূলধন নাই—দেনার দায়ে জর্জ্জরিত—চক্র বৃদ্ধি হারে তাহারা তো সুদ দিয়াই আসে, অধিকন্তু মহাজনকে বেগার প্রভৃতি শারিরীক পরিশ্রম দিয়াও মন যোগাইতে হয়। ভারতে সমবায় সমিতির দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। যদি কেহ কৃষকগণকে এই কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটীর হিতকারিতা বুঝাইয়াদিয়া তাহাদিগকে সমবায় সমিতির দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতই হিতসাধন করা হয়। কিন্তু

হইয়াছে কি, কৃষকগণ নিরীহ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা কম, তাহারা কি করিতে কি হইবে, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্টের এই প্রকৃত হিতকর উদ্দেশ্য হইলেও ইহার ভিতর আসিতে চাহে না। তাহারা জমী জমার চৌহদ্দী প্রভৃতি দিলে পাছে ভবিষ্যতে কোন ফেসাদ বাধিয়া উঠে, সেই ভয়ে এদিকে ঘেসিতে চাহে না। সরল ভাবে ইহাদের এই ভ্রম অপনোদ করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারা, সুদখোর বিষয় লোভীদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। গ্রামের লোকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সমবায় সমিতির নিয়মানুসারে জেলার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হস্তে দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অল্প সুদে টাকা পাইতে পারে ও তদ্বারা কৃষি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের শাসন ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক সুতরাং প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ইচ্ছা থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রজার আগ্রহ এবং তাহাদের কিছু টাকা দেখিলে গবর্ণমেণ্ট ধার দিতে পারেন। আমেরিকায় জার্ম্মাণীতে এই সমবায়ে দ্বারা কৃষকগণ তাহাদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করিতে পারিয়াছে, এদেশকে তাহা করিতে হইবে নচেৎ মুক্তির উপায় নাই। উৎপন্ন দ্রব্য সমবায় প্রতিষ্ঠান একেবারে ক্রয় করিয়া লইয়া বাজার উঠিত পড়িত হইলেও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিয়া ইহার সভ্যগণকে বহু অপব্যয়ের দায় হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ কৃষকগণের সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগকে একথা এখন বুঝাইয়া দেয় কে? সেইটাই কথা। কাগজে কলমে বড় বড় আফিসে কৃষিবিভাগ গবেষণা করিয়া এতকাল দেশের প্রজার প্রকৃত হিতকর কিছু করিতে পারেন নাই। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটীর অবস্থাও সেইরূপ, বিশেষ প্রচার এখনও হয় নাই। অনেকে ইহার উদ্দেশ্য এখনও বুঝেনা।—কাজের লোক।

ধনী ও শ্রমিক

সমগ্র জগতেই ধনী এবং শ্রমজীবির ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চল্‌চে, ধনী তার টাকা বার করে লোকজনকে এতকাল খাটিয়ে লভ্যাংশের সমস্তই বেশ নিরাপদেই ভোগ করে আস্‌ছিলেন, সহসা শ্রমজীবি বুঝ্‌লে, আমরাই খেটে খুটে জিনিস তয়ের করি, চাষ করি, রেল চালাই, অথচ আমাদের দুঃখুতো ঘোচেনা। আমরা যদি বেঁকে বসি, মূল ধন পঙ্গু হয়ে পড়ে, ধনী টাকা শুধু একলা কি কর্‌তে পারে? এই বহুকালের ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে যেয়ে জগতটার ধনী আর শ্রমজীবিতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বেধে গেল। তাই আজ নানাস্থানেই ধর্ম্মঘট, আর আপোস নিষ্পত্তির ঘটা বেড়ে উঠেছে। ধনীকে'কার কারবার কর্ত্তেই হবে—শ্রমজীবির দল আবদার করে কিছু লভ্যাংশের ভাগ আদায় কর্ত্তেও ছাড়বে না। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বেচারা মধ্যবৃত্তি লোক গুলো মারা গেল।

ই, আই রেলের ধর্ম্মঘট হলো, রেলকোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ শুনচি ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। রেল কোম্পানী ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে সে টাকা তুলে নিচ্চেন। এতে হলো কি? নীরিহ মধ্যবৃত্তি লোকেরই এখন প্রাণ যায়—এরা না শ্রমজীবি, না ধনী। বসে বসে তাহারা শ্রমকাতর—পঙ্গু হয়ে পড়েছে, একক্রোশ হাটবার ক্ষমতা নাই। এখন এমনি মজার যুগ এসেছে যে, যার দাম বাড়বে, তাহা আর কম্‌তে জানেনা। মেনে নিলাম শ্রমজীবিরা কিছু আবদার করে কি আদায় কল্লে বটে, কিন্তু তাদিকেও তো রেলে উঠতে হবে, তখন সেই বৃদ্ধিটা সুদে আসলে রেল কোম্পানীকে না দিলে আর বাঁচাও কোথা। আর সে টাকা তো এদেশে থাকবে না, সুতরাং যাই কর বাপু, ঘুরে দরে সেই হাটু জল। অধীন জাতির ছুনিয়ার কোথাও সুবিধা হতে পারে না। যাক্, এখন এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপার সুদূর পল্লীর শ্রমজীবিকেও সেয়ানা করে দিয়েছ বেশ। চার আনায় যে মজুর খাট্‌তো, সে আজ ॥•, ৷৷৹ মজুরী না হলে খাট্‌তে চায় না। সে বুঝেছে, আমার বিনা সাহায্যে ভদ্রলোকের চলবার যো নাই, তা সে ধনী হউক, মধ্যবৃত্ত হোক, আর দরিদ্র হোক বড় বড় কারবারের কথা ছেড়েই দিলাম। সামান্য জমি যায়গা নিয়ে যারা দিন গুজরান করে, তাদেরই কথা আগে ধর্ত্তে হবে। এইরূপে মজুর আর ধনীতে ঠোকাঠুকীর ফলে কাজও অনেক কমে যাবে। গৃহস্থ ভদ্রলোক, মজুর খাটাতে পারবে না—জমি জমা আবাদ হবে না—শ্রম জীবিরও দৈন্যদশা আরও ঘনীভূত হয়ে আস্‌বে, জমীর উর্ব্বরা শক্তি কমে যাবে, মধ্যবৃত্ত লোকের দেনা বাড়বে, ধনীলোক ক্রমে তাদের সর্ব্বস্ব কিনে নেবে। তা হলেই বেশ দেখা যাচ্চে, হয় ধনী হতে হবে—না হয় মজুর হবে। এর মাঝখানের লোকের আর অস্তিত্ব থাক্‌বে না। যে দিকেই যাও কল্যাণ কোন দিকেই নাই। এদেশের শ্রমের মত মহার্ঘ শ্রম কোন দেশেই নাই। কেন—তা বল্‌চি। ম্যালেরিয়া পীড়িত, দুর্ভিক্ষ জর্জ্জরিত দেশে বলবান মজুর জন্মান কি সম্ভব হতে পারে?—পেট রোগা, পিলে যকৃতে মুমূর্ষু মজুরের সংখ্যাই সর্ব্বত্র। পেটের দায়ে খাট্‌তে আসে, তারা এক বেলা খেতেও পায় না। এহেন দেহে আলস্যের মুকরুড়ী আড্ডা। খাট্‌তে এসে ঘুম পায়—পারে না। হিসাব করে দেখা যায়, এক টাকার মজুরীতে মোটে ।৴• আনার খাটুনী পাওয়া যায়। ॥৴• আনা আনা পয়সা গৃহস্থের লোকসান। এক দিনের কাজ দশ দিনে—তাই এদেশের মজুরী জগতের সমস্ত দেশের মজুরী অপেক্ষা মহার্ঘ্য। তবেই দেখ, ধনী গেল, মধ্যবৃত্ত লোক মলো—মজুরেরও বাঁচাও নাই। বাঁচবার আর কোন রাস্তাই নাই। ধনী এবং মজুরের সদ্ভাব না হলে সংসার অচল হবে।

মজুরের উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্ম সঙ্গত, এবং বিধেয়, তার আর সন্দেহটাই নাই। কিন্তু শ্রমজীবির স্বচ্ছলতার পয়সা যায় কোথা? মদের দোকানে, তাড়ি খানায়, আবগারীতে। পেটের ভাতের জোগাড় না করেও সে শুঁড়ী খানায় শ্রমলব্ধ অর্দ্ধেক দিয়ে আসে। নৈতিক অবনতি ভারতের অস্থি মজ্জায় ঢুকেছে। হুজুকে শুধু বাহবা

দিলে হবে না। নৈতিক উন্নতি কেউ করে দিতে পারে? তা হলে মজুরের ও ধনীর ধর্ম্মজ্ঞান হবে, ঠোকা ঠুকী হবে কেন? যে যার আপনার কর্ত্তব্য কাজ করে যাবে। এ শ্রম সমস্যা পাশ্চাত্যের আমদানী। এ আগুণ নিয়ে খেলার একটা মস্ত ভীষণ পরিণাম আছে, সেই পরিণামের জন্য আজ সমগ্র জগত ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। নৈতিক অবনতিই এই সকল অনর্থের মূল। সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক অবনতি যত অনর্থের মূল। ধর্ম্মজ্ঞান হারিয়ে মানুষই রাক্ষস হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে অভাবের হাহাকার উঠেছে। এ হাহাকার কি নিব্‌বে? এবে খোদার মার!—কাজের লোক।

গাভী পালনের কেন দরকার ?

এ' দেশের লোক কৃষিজিবী। এ দেশের বড় লোক ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া সযত্নে পালন করে, কিন্তু গো পালনে বড়লোকদের তেমন লক্ষ্য নাই। অনেকে গয়লার জল দুষিত দুগ্ধ খাইয়া নিজের ও সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে শমন ভবনে যাইবার সাহায্য করেন, কিন্তু বিলাসী বাবুগণ বাড়ীতে পাছে গোময়ের গন্ধ হয় বলিয়া গো-পালন করেন না। প্রত্যেক সংসারেই গাভীচর্য্যা, গাভী পালন করিলে বিশুদ্ধ ঘৃত দুগ্ধ পাওয়া যায়, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেও পারেন।

পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে এখনও গাভী আছে, সেইজন্য পল্লীশিশু বড় একটা ইন্‌ফ্যানটাইল লিভার বা শিশু যকৃত পীড়ায় মরেও না। সহরের দুষিত দুগ্ধ খাওয়া অপেক্ষা দুগ্ধ না খাওয়াই ভাল। তাহা হইলে সহরের শিশু বাঁচে কি খাইয়া? সেইজন্য সহরেও প্রত্যেক গৃহে গাভী রক্ষা করা উচিত। বিলাতি দুগ্ধ খাওয়া আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। গতবারে বোধ হয় পাঠকগণ ডাক্তার নন্দীর গাঢ় দুগ্ধ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গাভী রক্ষা করিলে দুগ্ধের স্বচ্ছলতা হইবে। সহরে গরু পোষা একটু ব্যয় বাহুল্য বটে, কিন্তু শিশুর অমূল্য জীবনের কথা ভাবিলে এ ব্যয়টাকে অপব্যয় বোধ হইবে না।—কাজের লোক।

ফরিদপুরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র

ফরিদপুর সহরের কতিপয় বে সরকারী সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের উদ্যোগে ফরিদপুর 'কৃষি ও শিল্প সমবায় সমিতি' নামে একটী যৌথ কারবার খুলিবার প্রস্তাব স্থিরকৃত হইয়াছে। স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ লোন আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র বি-এল, এবং ফরিদপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এল প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহার প্রধান উদ্যোগী। ফরিদপুর হইতে ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী আমলবেড়া নামক স্থানে খাসমহালের যে ১০০ শত বিঘা জমী আছে উহাই এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের স্থান হইবে। দেশে এরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বিশেষ বাঞ্ছনীয়।—সম্মিলনী।

ভারতীয় করদাতার বোঝা

বণিক সমিতি সমূহের প্রতিনিধি বড়লাটের সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ঠকুর দাস মহাশয় ভারতবাসীর প্রত্যেকের আয় ও করভারের নিম্নলিখিত হিসাব প্রদান করেন:—

প্রত্যেকের বাৎসরিক আয়		মাথা পিছু টেক্স
১৮৭১ (নওরোজীর হিসাবে)	২০৲	১৶৹
১৮৮১ (স্যার ডেভি বার্কার)	২৭৲	২ ৩ পাই
১৯০১ (লর্ড কার্জ্জন)	৩০৲	২।৶ ৬ পাই
১৯১১ (মিষ্টার কুক)	৫০৲	২৸৶ ৩
১৮১৩———	৲	২৸৶ ৫
১৯২২———		৬ ৴ ৮ পাই

বিবিধ

আবহাওয়া

আষাঢ় মাসে বৃষ্টির বিরাম নাই। কোন কোন স্থলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পাটের অনিষ্ট হইয়াছে। যেস্থলে ধান ও পাটের গাছ বড় হইয়াছিল তথাকার ফসলের অবস্থা ভাল। মোটের উপর ধানের অবস্থা আশা জনক। রোপা ধানের পক্ষে এই বৃষ্টি খুব উপকারী। এত বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলায় তুলার অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের ভয় হয়।

এবার বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ভারতবর্ষের নানা স্থলে বৃষ্টির জন্য পূজা ও আরাধনা হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোর গঞ্জ হইতে একটী আমোদ জনক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনাটি ব্যাঙের বিবাহ। তত্রত্য গ্রাম্য লোকদিগের বিশ্বাস যে, ব্যাঙের বিবাহ দিলে ব্যাঙ দম্পতী আমোদ করিবার জন্য বৃষ্টি আহ্বান করে। মেঘ ব্যাঙের আহ্বান কখনও প্রত্যাখ্যান করেন। খবরটী মালদহ সমাচার হইতে সংগৃহীত হইল।

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের এক বর্দ্ধিষ্ণু তালুকদার, এই অনাবৃষ্টির দিনে, বৃষ্টির আশায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ব্যাঙ-ব্যাঙীর বিবাহ দিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় বাজানাদি বাজাইয়া যখন মহা সমারোহে শুভ পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছিল, তখন সালঙ্কারা—

গলায় সোণার হার দেওয়া কন্যা ব্যাঙটী লাফাইয়া এক খড়ের স্তূপে গা ঢাকা দেয়। কন্যার জন্য না হউক, সোণার হার ছড়াটার জন্য, খড়ের গাদা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইতেছিল—এমন সময়ে এক জনের হাতের প্রদীপ হইতে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়া যায়—ফলে আট খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। খবর মজার বটে।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আর একটী এইরূপ কৌতুকবহ সংবাদ "সন্দেশ" পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদটী এই :—

"গাছ পালা ঘাস কুটো শুকিয়ে মাটী যেন কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। কুয়োর জল সেই কোন্ তলায় একটু চিক চিক করছে। ঘানির মত করে গরু ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও বেশী জল উঠে আসে না। সকলেরই খুব কষ্ট যাচ্ছে। এমন সময় একদিন বিকাল বেলা, যখন বেশী ধুলো উড়্ছে না, তখন কন্যা-আশ্রমের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখ্লুম, একটা জায়গায় ভারি গোলমাল হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি যে, একটী বিধবা মুখে কাপড় দিয়ে "হায়, হায়! মেরী গুড়িয়া মর গই" করে খুব কাঁদ্ছেন, আর তাঁকে ঘিরে অনেকে মুখ বুক চাপড়াচ্ছে। একজন একটা কেরোসিনের টিন পিটাচ্ছে, আর একজন একটা ছোট তক্তার উপর একটা পুতুল শুইয়ে রেখে সেটা নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে। এই মেয়ের দল সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে ন্যাকড়া, কাগজ, তুলো, খড় কুটো সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগ্ল। সকলেই হাসিমুখে এদের কিছু না কিছু দিলেন। যখন কাঠ কুটো, খড় ন্যাকড়া ইত্যাদি স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্ল, তখন এরা বিধবাশ্রমের পিছনে একটুখানি ঘেরা যায়গায় গিয়ে জড় হ'ল। কন্যা-আশ্রম, বিধবাশ্রম, অনাথালয় আর আশে পাশের বাড়ীর অনেকে এসে সেখানে জড় হলেন। একদল মেয়ে হাঁটু, বুক আর মাথা চাপড়িয়ে সেই পুতুলের "মা" এর সঙ্গে কান্না জুড়ে দিলেন। "হায়, হায়, লাল দোশালাওয়ালী" "হায়, পিলা শাড়ীওয়ালী" আরো কত কি বলে তাঁরা কাঁদ্তে লাগ্লেন। সেই পুতুলের কেমন সুন্দর নাক মুখ ছিল, তার সোণালী চুল ছিল, আরো কত কি ছিল সব বলে বলে এঁরা কাঁদ্তে লাগ্লেন। তারপর খড় কুটো গাদা করে, তার উপর তক্তা শুদ্ধ পুতুল চাপিয়ে কেরাসিন তেল ঢেলে, তাতে অগ্নিসংযোগ করে দেওয়া হ'ল। সকলে মুঠো মুঠো জঞ্জাল সেই আগুনে ফেল্তে লাগ্লেন। এমনি করে কিছুক্ষণ কেরোসিন টিনের বিকট শব্দ আর হৈ হৈ সকল কান্নার সঙ্গে, পুতুল পোড়ানো কাজটা চল্ল। যখন সব থেমেথুমে গেল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'ব্যাপারটা কি?' পুতুলের মা তখন বলিল যে আমাদের দেশে বৃষ্টি না হলে পুতুল পুড়িয়ে আমরা বৃষ্টিকে ডাকি। অনাবৃষ্টিতে দেশ শুকিয়ে গেল, তাই পুতুল পোড়ালাম।"

ব্যাঙের বিয়ে ও পুতুল দাহের ঘটনা বাঙ্গালাদেশে সচরাচর ঘটেনা। কিন্তু অনাবৃষ্টির সময়ে পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকগণ বৃষ্টিপ্রাপ্তির জন্য বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগিয়া উহাদ্বারা মেঘের পূজা করিয়া থাকেন, জানি। পুরাকালে আর্য্যগণ বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের পূজা করিতেন।

সুতা ও কাপড় আমদানীর হিসাব

বিদেশী সুতার আমদানী

সন	পরিমাণ	(১পাউণ্ড= অর্দ্ধসের)
১৯১৪-১৫	৪,২৮,০০,০০০	পাউণ্ড
১৯১৫-১৬	৪,০৪.০০,০০০	
১৯১৬-১৭	২,৯৫,০০,০০০	
১৯১৭-১৮	১,৯৪,০০,০০০	
১৯১৮-১৯	৩,৮০,০০,০০০	
১৯১৯-২০	১,৫০,০০,০০০	
১৯২০-২১	৪,৭৩,০০,০০০	
১৯২১-২২	৫,৭১,০০,০০০	

গতবৎসরে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সূতার আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষে হস্তচালিত তাঁতের কার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিদেশী কাপড়ের আমদানী

সন	পরিমাণ	
১৯১৪-১৫	২৪৪,৫৬,০০,০০০	গজ
১৯১৫-১৬	২১৪,৮১,০০,০০০	”
১৯১৬-১৭	১৯৩,৩৫,০০,০০০	”
১৯১৭-১৮	১৫৫,৫৫,০০,০০০	”
১৯১৮-১৯	১১২,১৯,০০,০০০	”
১৯১৯-২০	১০৮,০৭,০০,০০০	”
১৯২০-২১	১৫০,৯৭,০০,০০০	”
১৯২১-২২	১০৮,৯৮,০০,০০০	”

উপরোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য, পরে অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষে বিলাতী কাপড়ের আমদানী হ্রাস হইতেছে। কিন্তু আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইলেও বিলাতী কাপড়ের মূল্য গতপূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছিল।

ভারতবর্ষে বিদেশী সুতা ও কাপড় আমদানীর মূল্য

সন	মূল্য	
১৯১৪-১৫	৩২,৬০,০০,০০০	টাকা
১৯১৫-১৬	২৮,৭০,০০,০০০	”
১৯১৬-১৭	৩৫,১০,০০,০০০	”
১৯১৭-১৮	৩৭,৬০,০০,০০০	”
১৯১৮-১৯	৪০,৩০,০০,০০০	”
১৯১৯-২০	৫৯,৭০,০০,০০০	”
১৯২০-২১	১০,৩৮০,০০,০০০	”
১৯২১-২২	৬০,৩০,০০,০০০	”

আমাদের অনুমান হয় যে চরকা প্রবর্ত্তনের ফলে গতবৎসরে বিলাতী সূতাও কাপড়ের মূল্য বিলক্ষণরূপে কমিয়া গিয়াছে। নিম্নস্থ তালিকায় ইহা পরিষ্কার করিয়া দেখান যাইতেছে

সন	দর	সূতা		কাপড়	
১৯১৫-১৬	প্রতি ১ পাউণ্ডে (১৫ টাকায়)	২০	পাউণ্ড	৮৬	গজ
১৯১৬-১৭	"	১৫	"	৬৪	"
১৯১৭-১৮	"	৭	"	৪৭	"
১৯১৮-১৯	"	৬½	"	৩৫	"
১৯১৯-২০	"	৪	"	২১	"
১৯২০-২১	"	৩½	"	১৮	"
১৯২১-২২	"	৫	"	২৬	"

১৯২০-২১ অর্থাৎ গত পূর্ব্ববৎসরে—সূতা ও কাপড়ের দর এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সেরূপ আর কখনও হয় নাই। যদি ভারতবর্ষে চরকাদ্বারা সূতা কাটা না হইত, তবে গতবৎসরে সূতা ও কাপড়ের দর কখনও পড়িত না। বিশেষতঃ গত বৎসরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দর অপেক্ষা তুলার দরও অধিকছিল। সুতরাং কলওয়ালাগণ সূতা ও কাপড়ের দর বৃদ্ধি করিতেন সন্দেহ নাই।—চরকার সূতা মোটা হইলেও ইহা সস্তা; কাজেই কলওয়ালাগণ তাহাদের সূতাও কিছু সস্তায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমদানী সূতার শতকরা ৩০ হইতে ৭০ ভাগ বোম্বাই প্রদেশে, ২০ হইতে ২৫ভাগ বাঙ্গালা এবং এই পরিমাণে মান্দ্রাজ প্রদেশে গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সূতা সিন্ধু ও ব্রহ্ম প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। কাপড় আমদানীর শতকরা ৪০ভাগই বাঙ্গালাদেশ ক্রয় করিয়া থাকে। বোম্বাইপ্রদেশ ৩০ভাগ, সিন্ধু প্রদেশ ১৫ভাগ এবং ব্রহ্ম ও মান্দ্রাজ প্রদেশ বাকি ১৫ভাগ কাপড় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ ও ব্রহ্মদেশ বিলাতী কাপড় অধিক ব্যবহার করে না। এস্থলে ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে, বোম্বাই প্রদেশ আমদানীর শতকরা ১০ হইতে ৩০ভাগ সূতা ও কাপড় পুনঃ অন্যদেশ চালান দিয়া থাকে। বাঙ্গালীর ন্যায় অন্য কোন ভারতবাসী বিলাতী কাপড় ব্যবহার করে না।

ভারতবর্ষের কলের সূতা ও কাপড়

ভারতবর্ষে ১৯১৮-১৯ সনে ২৬৪ কাপড়ের কল ছিল। এই সব কলে ১,১৬,০৯৪টী তাঁত ও ৬৫,৯০,৯১৮টী চরকা ছিল এবং ২,৯০,২৫৫ জন মজুর এই সব কলে কাজ করিয়াছে। গত ৮ বৎসরে ভারতবর্ষীয় কলে কত পরিমাণে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎপন্ন সূতা

বৎসর	পরিমাণ
১৯১৪-১৫	৬৫,১৯,৮৪,০০০ পাউণ্ড
১৯১৫-১৬	৭২.২৪,২৪,০০০
১৯১৬-১৭	৬৮,১১,০৭,০০০
১৯১৭-১৮	৬৬,০৫.৭৫,০০০
১৯১৮-১৯	৬১,৫০.৪০,০০০
১৯১৯-২০	৬৩,৫৭,৬০,০০০
১৯২০-২১	৬৬,০০,০২,০০০
১৯২১-২২	৬৯,২৩,১৩,০০০

ভারতবর্ষের কলের চরকায় একার্দ্ধ পরিমাণে ১১ হইতে ২০ নম্বরের সূতা কাটা হয়। ইহার পর ২১ হইতে ৩০ নম্বর সূতা ইহার পরিমাণ এক চতুর্থ ভাগ। সমস্ত সূতার এক ষষ্ঠ ভাগ, ১ হইতে ১০ নম্বর; বক্রি এক আনি পরিমাণ সূতা ৩০ নম্বরের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম। ভারতবর্ষের তুলা হইতে ৪০ নম্বরের অধিক সূক্ষ্ম সূতা কাটা যায় না।

উৎপন্ন কাপড়

বৎসর	পরিমাণ	
১৯১৪-১৫	১১৩,৫৭,০৭,০০০	গজ
১৯১৫-১৬	১৪৪,১৫,১৪,০০০	
১৯১৬-১৭	১৫৭,৮১,৩২,০০০	
১৯১৭-১৮	১৬১,৪১,২৬,০০০	
১৯১৮-১৯	১৪৭,০৭,২৬,০০০	
১৯১৯-২০	১৬৪,০০,৪৭,০০০	
১৯২০-২১	১৫৮,০৮,৪৯,০০০	
১৯২০-২২	১৭৩,১৫,৭৩,০০০	

ভারতবর্ষীয় কলের কাপড়ের মূল্য ও বিলাতী কাপড়ের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। নিম্নস্থ তালিকায় ইহা প্রমাণ হইতেছে যে ১৯১৯-২০ খৃঃ অব্দে ৫৭,৮০,৮৬,০০০ টাকা, ১৯২১-২২ খৃঃ অব্দে ৬০,৭৭,৪৩,০০০ টাকা এবং ১৯২০-২১ খৃঃ অব্দে ৬২,৯[illegible]১০,০০০ টাকা মূল্যের অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কলের উৎপন্ন দুই আনা পরিমাণ সূতা ও প্রায় দেড় আনা পরিমাণ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হয়। চীন ভারতবর্ষের প্রধান খরিদদার। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সূতা কাপড় কলে প্রস্তুত করিতে হইলে ভারতবর্ষে আরও ১০০ অধিক কল স্থাপন করা আবশ্যক। এক একটী কল স্থাপন করিতে বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ২৫লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে সূতা ও কাপড় রপ্তানীর হিসাব নিম্ন তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

সুতা রপ্তানী

সুতা	পাউণ্ড	মূল্য——টাকা
১৯১৮-১৯	৬,৩৭,৯৮,০০০	৭,২২,৩৩,০০০
১৯১৯-২০	১৫,১৮,৭০,০০০	১৮,২৫,৯২,০০০
১৯২০-২১	৮,২৫,৩৫,০০০	১০,১৭,১৫,০০০
১৯২১-২২	৮,১০,৩৩,০০০	৭,৭১,৪৬,০০০

কাপড় রপ্তানী

কাপড়	গজ	মূল্য— টাকা
১৯১৮-১৯	১৪,৯০,৮৮,০০০	৬,৪৫,২৬,০০০
১৯১৯-২০	১৯,৬৫,৫৫,০০০	৮,৭৩,৬২,০০০
১৯২০-২১	১৪,৬৩,৬৫,০০০	৭,৫০,৬৩,০০০
১৯২১-২২	১৬,০৯,৬৭,০০০	৭,৪৮,০৫,০০০

সরকারী পাটের সংবাদ

প্রথম বিবরণী

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামে এবৎসর ১৪,৫৬,৫৪৬ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরে ৬১,৪১২ একর জমিতে পাটের চাষ কম।

নিম্নে ১৯২১ ও ১৯২২ সনের পাট চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

	১৯২১	১৯২২	বৃদ্ধি	হ্রাস
বঙ্গদেশ	১৩,২৯,১৯০	১২,২০,৫৪৮	×	১,০৮,৬৪২
বিহার ও উড়িষ্যা	১,০৮,৩৬৮	১,৪৪,৫৯৮	৩৬২৩০	
আসাম	৮০,৮০০	৯১,৪০০	১০,৬০০	

বঙ্গ দেশ

১৯২০-২১ সনে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে গড়ে যত পাট হইয়াছিল, তাহার ৮৮-২ অংশ একমাত্র বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কত জমিতে পাট বপন হইয়াছে ও পাটের বর্ত্তমান অবস্থা পঞ্চায়েতদিগের দ্বারা প্রস্তুত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

এ বৎসর বঙ্গদেশে ১২,২০,৫৪৮ একর জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে। এবৎসর গত বৎসর অপেক্ষা ১,০৮,৬৪২ একর জমিতে পাটের চাষ কম। বপনের সময় দীর্ঘকাল স্থায়ী অনাবৃষ্টি ইহার একমাত্র কারণ। পাটের মূল্য হ্রাস ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিও ইহার অন্যতম কারণ।

১৯২১ সনের নবেম্বর মাস হইতে ১৯২২ সনের মে মাস পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাস ভিন্ন গত বিশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ অনাবৃষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ পূর্ব্ববঙ্গে কোথাও কৃষকগণ

পাটের জমি ভালরূপে কর্ষণ করিতে পারে নাই। উত্তর বঙ্গে সামান্ত বৃষ্টি হওয়ার নিম্ন জমিগুলি ভালরূপে কর্ষিত হইয়াছিল। মার্চ্চমাসে পূর্ব্ববঙ্গে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হওয়ার নিম্ন জমিতে পাট বপনের পক্ষে কিছু সুবিধা হইয়াছিল। পাটের জন্ত বিখ্যাত মৈমনসিংহ জেলাতে উপযুক্ত সময় বপন হয় নাই। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে যে সব নিম্ন ভূমিতে পাট বপনকরা হইয়াছিল তাহাও অনাবৃষ্টির দরুণ মোটেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। মে মাসে উপযুক্তপরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় উচ্চ ভূমিতে বপন কার্য্যের সুবিধা হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গে বপন বিলম্বে আরম্ভ হইয়া জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সেজন্ত জুন মাসে প্রচুর বৃষ্টিতে পাটের চারা কোন কোন স্থানে নষ্ট হইয়াছিল। তথাপি পশ্চিম বঙ্গে পাটের চাষ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাটের বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক। নিম্ন ভূমির পাটের অবস্থা একপ্রকার মন্দ নহে। এবৎসর নদী অনেক বিলম্বে জলে পূর্ণ হওয়ায় নিম্নস্থ পাটের জমির ফসল ভালরূপ জন্মিয়াছে। গত বৎসরের পুরাতন পাট অল্প পরিমাণ।

বিহার ও উড়িষ্যা।

বিহার ও উড়িষ্যায় ১,৪৪,৬০০ একর জমিতে এবৎসর পাটের চাষ হইয়াছে। গতবৎসর অপেক্ষা এবৎসর ৩৬,২৩০ একর জমিতে পাটের চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা পুর্ণিয়া জেলাতে পাটের চাষ অনেক বেশী হইয়াছে। কটক জেলা ভিন্ন অন্ত জেলাতে মার্চ্চমাসে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই। এপ্রিল ও মে মাসের মধ্য-ভাগে ও জুন মাসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ায় পাট ফসলের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল। পাটের বর্ত্তমান অবস্থা মন্দ নহে। বিহার ও উড়িষ্যায় পুরাতন পাট অল্প পরিমাণ মজুত আছে।

আসাম।

বসন্তকালে আসামে মোটেই বৃষ্টিপাত হয় নাই। সেজন্ত বপন কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। বৃষ্টির অভাবে পাটের চারা বাড়িতে পারে নাই। পরে বৃষ্টি হওয়ায় বর্ত্তমান সময় পাটের অবস্থা সন্তোষজনক হইয়াছে। আসামে মোট ৯১,৫০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পাটের চাষ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের পাট অতি অল্প মাত্রায় মজুত আছে।

কলিকাতা বাজার দর

আষাঢ় মাস

দ্রব্য	দর
চাউল পাটনাই ১নং	১০॥৹
২নং	১০।৹
৩নং	৮॥৹ ৯।৹
ঐ সিদ্ধ	৭৸৹ ৮॥৹
চিনি সকর	১১॥৹ ১২॥৹
দাদখানী	৯॥ ১০৲
বাক তুলসী	৮॥৹ ৯।৹
বালাম	৭ ৭॥৹
নাগ্রা	৭।৹ ৮৲
রাচী	৬৸৹ ৭।৵৹
কাজলা	৬৲
খুদ	৪৲ ৫॥৹
কুড়া	১৵ ১॥৹
আটা উৎকৃষ্ট	১০৵ ১০॥৵৹
সাধারণ নং ১	১০৵ ১০।৴৹
ঐ নং ২	৯॥৵৹
ঐ নং ৩	৫৲
ঐ নং ৪	৪৵৹
সুজী	১০॥৵৹
গম দেশী,	৬৲ ৭॥৹
ঐ বকসার নং২ (২½% বাদ	৭।৹ ৭।৴৹
মটর	৪৲ ৪॥৹
ঐ সাদা পাটনাই	৫৲ ৬॥৹
খেসারী	৩॥৹ ৪॥৹
কুলতী কলাই	৩।৹ ৩॥৹
যব	৩॥৹ ৪।৹
মসুর	৪॥৹ ৫॥৹
অরহর	৫৲ ৬৲
বুট	৫॥৹ ৬।৹
খই	৪॥ ৫।৹
ভুট্টা	৩॥ ৩৸৹
দাইল মুগ	১০৲ ১০৲
খাড়িমসুর	৯৲ ১০৲
উরিদ	৭৲ ১০৲
অরহর	৬॥৹ ৯॥৹
বুট	৭॥৹ ৮॥৹
মটর	৭৲ ৮৲
মসুর	৬॥৹ ৭॥৹

দ্রব্য	দর
খেসারী	৫॥৹ ৬॥৹
তৈল-বীজঃ—	
তিসি (শতকরা ৫ বাদ)	১০৲
সরিষা শ্বেত	৮॥৹ ৯৲
লোটণী	৮ ৮॥৹
রাই	৭॥৹ ৮৲
পোস্ত দানা	১২৲ ১৩৲
তিল	৮৲ ১১৲
এণ্ডি	৭॥৹ ৮৲
খৈল এণ্ডি (শতকরা ৫-৬ নাইট্রোজেন)	৪৸৵৹
সরিষা	৩।৹ ৩।৵৹
তিসি	৫।৵৹
চীনাবাদাম	৪৸৹
হাড়চুর্ণ	৫৲
সোডা নাইটেট্	১১৲
পটাস নাইট্রেট	১০॥৹ ১৬৲
মৎস্ত (শতকরা ৭-৮ নাইট্রোজেন	৬৲
শর্করাঃ—	
দেশী দোবরা	২৩৲
ভেলি	৮৲
কাশীপুর	১৭।৹
মান্দ্রাজ পেটী	১৭৲
জাভা সাদা	১৩॥৹
জাভা লাল	১৪।৴৹
মরিশাশ	১৫৶৹
পাটের বাজারঃ—	
৫ নং—পাটের দর	১৫৲ ১৫॥৹
রিজেক্'ন্	১৩৲ ১৩॥৹
টেরিবল রিজেকসন	১১৲ ১১॥৹
সিমুল তুলা	১০॥৹ ১৩৲
কার্পাস তুলা দেশী	৪৩॥৹
ঐ বোম্বাই	৫১।৹
ঐ নাগপুরী	৫৪।৹
লবণ	
লিভারপুল	১২৮ ১৩৫৲
সৈন্ধব	
এডেন	১১১ ১২০৲

নারিকেল কাতা	৫।০ ৭॥০	শুট	১৯ ২৩৲
তৈল, এরণ্ড নং ১	২৫৲	মোম	৬০ ৭৫
নং৩	২৪৲	হরিতকী	১৯৲ ১৬৷০
ঐ সরিষা	২৩ ২৫	তেঁতুল	৩৲ ৮৲
ঐ নারিকেল	২৪ ২৫৲		
ঐ চীনাবাদাম	২৬ ২৮৲	হরিদ্রা দেশী	১২৲ ১৫৲
ঐ তিসী	৩০ ৩৫৲	ঐ মান্দ্রাজী	১৫৲ ২০৲
ঐ তিসি৽	৩২৲		

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

কৃষকের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করাতে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ও বসুমতী আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন; তজ্জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অমৃত-বাজার লিখিয়াছেন—

Krisak.—We are glad to announce that Mr. N. C. Choudhury, M. R A. S., Dip. in Agriculture of the Sibpur Engineering College, author of "Jute in Bengal" and several books on agriculture, has accepted the editorship of the vernacular monthly, "Krisak." The "Krisak" a journal devoted to Agriculture, is one of the oldest scientific journals in Bengal and is published by the Indian Gardening Association, from 162, Bowbazar Street, Calcutta. Its annual subscription is Rs. 3. We have no doubt, under the distinguished and able editorship of Mr. Chowdhury, the "Krisak" will enhance its reputation as a leading periodical devoted to agriculture.

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান স্থান। এখানে কৃষির উন্নতি করিতে পারিলে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের জন্য আমাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কৃষি বিষয়ক একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকার আবশ্যক। "কৃষক" এই বিষয়ক একখানি মাসিক পত্র। সুদক্ষ কর্ম্মাধ্যক্ষের অভাবে এই পত্রিকাখানি এতদিন ভালরূপে পরিচালিত হয় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-তত্ত্ববিদ্ সুলেখক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত কৃষিরসায়ণ কার্পাসের কথা, খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিশেষ আদৃত। তাঁহার প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে "কৃষক" পত্র খানি শীঘ্রই একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কৃষি পত্রিকায় পরিগণিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।—আনন্দবাজার ১লা জুলাই, ১৯২২।

কৃষক একখানি পুরাতন কৃষি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিলেন। নিবারণ বাবুর কৃষিরসায়ণ, খাদ্যতত্ত্ব, কাপাসচাষ প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। তাহার নবপূর্ণ কৃষি সম্বন্ধীয় লেখা বাঙ্গালাদেশের অনেক সংবাদ পত্রেই প্রকাশিত হয়। আমরা আশাকরি নিবারণ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে।—বসুমতী ৪ঠা জুলাই, ১৯২২।
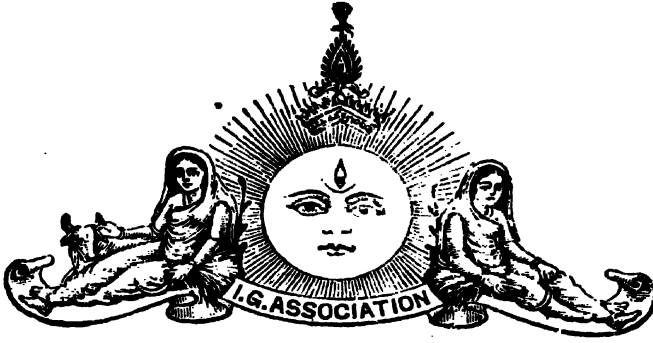
২৩ খণ্ড { কৃষক—শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল } ৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্গীয় মতিলাল

স্বর্গের মণী মতিলাল গত মঙ্গলবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৩২৯, ৭৫ বৎসরের নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে ফিরিয়া গিয়াছেন। মানুষের কল্যাণ সাধনার্থ, সময়ে সময়ে স্বর্গের দেবগণ মর্ত্তে আগমন করেন। স্বার্থপর, হিংসা-দ্বেষ-জড়িত মোহমুগ্ধ ভারত সন্তান সন্ততীদিগকে কর্ত্তব্য পথে আনিবার নিমিত্ত, তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মতিলাল অদ্ভুত কর্ম্মীরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত হইতে শিক্ষা পাই, মানুষ কিরূপ পিতা মাতার সেবা করিবে, কিরূপ কনিষ্ঠ অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইবে, কিরূপ অগ্রজ কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহশীল হইবে, এবং কিরূপে দেশের সেবা করিতে হইবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক আগাছা উৎপাটন করিতে, তিনি কাহারও মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বাধা, বিঘ্ন, দুঃখ প্রভৃতি বীরপুরুষদের নিকট তুচ্ছ।

মাতৃভক্ত ভ্রাতৃযুগল শিশিরকুমার ও মতিলাল মাতার নামে অমৃতবাজার নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পল্লীবাসী লোকদিগের অভাব মোচন করিতে অমৃতবাজার গ্রামে "অমৃত বাজার পত্রিকা" প্রকাশ করেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা" প্রথমতঃ তাঁহাদের স্বহস্তে প্রস্তুত কাঠের প্রেসে মুদ্রিত হইত। ভ্রাতৃযুগল তখন এই পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর ও প্রেসমেন সব। এই পত্রিকা এখন ভারতের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এমন অধ্যবসায়ের তুলনা হয় না।

ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবি। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি না ঘটিলে, ভারতের উন্নতি হইবে না, এই কথা যেমন শিশির কুমার ও মতিলাল বুঝিতেন, এমন বুঝি আর কেহ বুঝেন না। আমি কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া স্বর্গীয় ভ্রাতৃযুগল আমাকে কত স্নেহ করিয়াছেন এবং উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের সকলের মস্তকে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

কার্পাসের ইতিবৃত্ত

দেহ রক্ষার্থ আহারের যেমন প্রয়োজন হয়, তদ্রুপ মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্যও বস্ত্রের প্রয়োজন আছে। আদিম কালে মনুষ্যগণ লজ্জা নিবারণের জন্য প্রথমতঃ পত্র ও বল্কল বাস পরিধান করিতে আরম্ভ করেন; ক্রমশঃ মেষ লোম দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র ও কম্বল বয়ন প্রবর্ত্তন করেন। ইহা-দ্বারা তাহাদের অভাব মোচন না হওয়ায়, তাহারা বন জঙ্গলের গাছ গাছড়ার ছাল হইতেও উপযুক্ত সূত্র চয়ন করেন। ক্রমশঃ তাহারা শণ, তিসি, প্রভৃতি গাছ সন্ধান করিলেন, এবং চাষ করিয়া এই সকল গাছ হইতে যথেষ্ট সূত্র সংগ্রহ করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হয়। তখনও কার্পাসের সন্ধান হয় নাই। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত তাহারা কোমল বস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন কার্পাস আবিষ্কার হয়। বৈদিক-কালে কার্পাস আবিষ্কৃত হইয়া ছিল কিনা সন্দেহ। বেদে সূত্রের উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সূত্র কিসের তাহার নিশ্চয়তা নাই। সে যাহা হউক ভারতবর্ষেই সর্ব্ব প্রথম কার্পাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তথায় তিনি কার্পাস দেখিতে পান। তথাকার অধিবাসীগণ কার্পাস সূত্রের মোটা কাপড় প্রস্তুত করিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে যে ভারতবর্ষে কার্পাস সূত্রের দ্বারা সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে।

গ্রীকগণ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাহারা ভারতবর্ষের কার্পাস বস্ত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বকালের কথা। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ শিমুল গাছকে কার্পাস গাছ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। ৪৫০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে তাহার ইতিহাস লিখিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে "ভারতবর্ষের বন্য বৃক্ষে পশমফল উৎপন্ন হয়। এই পশম মেষ লোম অপেক্ষা সুদৃশ্য ও

শ্রেষ্ঠ ; এবং ইহার দ্বারা ভারতবাসীগণ বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে”। শিমুলের তুলায় সূত্র কিম্বা বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। এবং কার্পাসও যে বনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত ইহাও প্রত্যয় করা যায় না। কারণ হিন্দুদিগের কোন পুস্তকেই বন্য কার্পাসের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীকদিগের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত ইহার প্রমাণ মনুসংহিতা হইতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতার কাল ১০০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৫০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গণনা করা যায়। মনুসংহিতায় বহু স্থলে কার্পাসের উল্লেখ আছে। তৎকালে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন সম্বন্ধে আমরা মনুর দ্বাদশ অধ্যায়ে ৬১ ও ৬৪ শ্লোকে দেখিতে পাই। মনু বলেন কৌষেয় (রেশমী) বস্ত্র হরণে জন্মান্তরে তিত্তিরী পক্ষী, ক্ষৌম (তিসিসূত্র) বস্ত্র হরণে মণ্ডূক, কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ পক্ষীযোনি প্রাপ্ত হয়। আর ধান্য চুরি করিলে ইন্দুর, গোহরণে গোধা এবং গুড় চুরিতে বাদুর হইয়া থাকে।

মনুসংহিতার অন্যত্র (৫ম অধ্যায়) কৌষেয়, আবিক (মেষ লোম জাত), কুতপ (কম্বল), ক্ষৌম ও অংশুপট্ট (বল্কল বস্ত্র) প্রভৃতি বস্ত্রের ধৌত প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে আমারা কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীদিগের পরিধেয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। ইহাতে দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শণবস্ত্র, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ক্ষৌমবস্ত্র, বৈশ্য ব্রহ্মচারী আবিক বস্ত্র পরিধান করিবে। এখানেও আমরা কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাইনা।

অন্যত্র তন্তুবায় বস্ত্র বয়নের জন্য দশ পল (৪০ তোলা) সূত্র লইয়া গৃহস্তকে মার প্রয়োগ প্রযুক্ত একাদশ পল ওজন বিশিষ্ট বস্ত্র প্রদান করিবে। এখানেও সূত্রের সংজ্ঞা নাই।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষের তখনও কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র দুর্ল্লভ ছিল। তাহা না হইলে, শণ সূত্রের উপবীত ক্ষত্রিয়ের, মেষলোমের উপবীত বৈশ্যের জন্য ব্যবস্থা করিয়া, ব্রাহ্মণগণ কার্পাস সূত্রের উপবীত গ্রহণ করিতেন না। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শণ-সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিতেন। কারণ, শণ-সূত্র বোধ হয় তখনও অপেক্ষাকৃত দুর্ল্লভ ছিল। এই শণ-সূত্রের উপবীত ব্যবস্থা হইল ক্ষত্রিয়ের জন্য, তাহা অপেক্ষাও দুর্ল্লভ কার্পাস সূত্রের উপবীত বিশেষত্বের জন্য, তাঁহারা স্বজাতির জন্য নির্দ্ধারিত করিলেন। সে যাহা হউক, গ্রীক আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৫০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে, ঐতিহাসিক থিওফ্রেটাস্ ভারতবর্ষে কিরূপে কার্পাস গাছ রোপণ করা হয় এবং ঐ কার্পাসের পত্র দেখিতে কিরূপ, তৎসম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, আরব দেশেও কার্পাস রোপণ হইয়া থাকে। ৬৩ খ্রীঃঅব্দে, আরব

দেশীয় বনিকগণ ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র লইয়া যাইতেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে খোটান প্রদেশে কার্পাস চাষ ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার বর্ণনা চিনের বিবরণ হইতে জানা যায়। চীন-সভ্যতা বহু প্রাচীন হইলেও, তথায় কার্পাস বস্ত্র ও কার্পাস চাষ বহু পরে প্রচলিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন সম্রাট ওউ সর্ব্বপ্রথম কার্পাস সূত্রের পোষাকে শোভিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কার্পাস চাষের প্রচলন হয় নাই। বর্ত্তমান কালে, মিশর উৎকৃষ্ট কার্পাসের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তথায়ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কার্পাস চাষের প্রবর্ত্তন হয় নাই। আরব দেশের বিখ্যাত হা কম আবদুল লতিফ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি মিশরের সকল গাছ গাছড়ার নাম লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি কার্পাস গাছের নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, তৎকালে মিশরে কার্পাস চাষের প্রচলন হয় নাই।

কার্পাস প্রধানতঃ দুই জাতীয়। এক জাতীয় গাছ ১৫।১৬ বৎসর জীবিত থাকে; অন্য জাতীয় গাছ ফসল উৎপন্ন করিয়া বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়। ভারতবর্ষের কার্পাস কোন শ্রেণীর, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক দিগের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাজ্ঞগণের মতে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় কার্পাসই বাগানে রোপিত হইত। আমাদের মতে, ঢাকাই-মসলীন এই জাতীয় কার্পাস হইতেই প্রস্তুত হইত। কারণ, পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থল, বর্ষা ঋতুতে, জলে প্লাবিত হয়। সুতরাং তৎপ্রদেশে দ্বিতীয় জাতীয় বাৎসরিক কার্পাসের চাষ অসম্ভব, ঢাকা, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ও শ্রীহট্ট জেলায় উচ্চ ভূমিতে বাৎসরিক কার্পাস অবশ্য জন্মিতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির আধিক্য হেতু, তথায় নিকৃষ্ট কার্পাস ভিন্ন মস্‌লিনের উপযুক্ত কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে, চট্টগ্রাম, ও ত্রিপুরায় যে কার্পাস জন্মে, ইহার সূত্র দীর্ঘতায় অর্দ্ধ ইঞ্চি অপেক্ষা ন্যূন। গারোহিলেও এই কার্পাস জন্মে। ইহাকে আমরা গারোহিল কার্পাস বলিয়া থাকি। এই কার্পাস-সূত্র বিলক্ষণ দৃঢ় হইলেও ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইতে পারে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে কার্পাসদ্বারা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের উপবীত প্রস্তুত হইত। তজ্জন্য সম্ভবত অতি যত্নের সহিত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বাটীতে দুই একটী করিয়া কার্পাস গাছ রোপণ করিতেন। তৎপরে ক্রমশঃ ঐ সূত্র দ্বারা কার্পাস বস্ত্র বয়ন আরম্ভ হয়। মিশর দেশেও প্রথমতঃ এই কার্পাস বাগান বাটীর শোভা বর্দ্ধনের জন্য রোপণ করা হইত। এই উভয় জাতীয় গাছের বর্ণনা দ্বারা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বাৎসরিক কার্পাস সর্ব্ব প্রথমে আরবদেশে আবিষ্কৃত হয়। তথা হইতে এই কার্পাস অন্যান্য দেশে বিস্তারিত হইয়াছে।

নবম শতাব্দীতে, মুশলমানগণ সিসিলি জয় করিয়া তথায় কার্পাস চাষের প্রবর্ত্তন

করেন এবং দশম শতাব্দীতে কার্পাস তাহাদের দ্বারা স্পেনদেশে প্রচলিত হয়। ১৪৩০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ড কার্পাসের নাম মাত্র জ্ঞাত ছিল। ঐ সময়ে, জেনোয়ার ব্যবসায়ীগণ ইংলণ্ডে মরিচ, রং, রেশম, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিয়া, পশম ও পশমী জিনিষ গ্রহণ করিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই, ভারতবর্ষ হইতে সোজাসুজি ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্র প্রেরিত হইত। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে কার্পাস শিল্পের ব্যবস্থা হয় এবং ইহার পরে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতবর্ষের বস্ত্রের উপর একশত টাকার কাপড়ের উপর ৭৫ টাকা শুল্ক বসাইয়া ভারতীয় বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস তুলা খরিদ করিত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডের প্রয়োজনের এক কানিও ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করে নাই। তাহারা আমেরিকার দীর্ঘ সূত্রধারী কার্পাস খরিদ করিতে থাকেন। তখন ইংলণ্ডে বৎসরে প্রায় আড়াই ক্রোর হইতে তিন ক্রোর সের তুলার প্রয়োজন হইত।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে কলম্বস আমেরিকায় কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র দেখিতে পান। ইউরোপীয়গণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াই, তথায় কার্পাস চাষের ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা প্রথম ভার্জেনিয়া প্রদেশে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্পাস চাষ আরম্ভ করেন। পরে একশত বৎসরের চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা কার্পাস চাষের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে, তাহারা সর্ব্বপ্রথম ৮ বস্তা কার্পাস ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এক্ষণে আমেরিকাই পৃথিবীর কার্পাস উৎপত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর কোন দেশে, কত জমীতে কত কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

দেশ	জমি একর	উৎপন্ন বেল = ৪০০ পাউণ্ড
ভারতবর্ষ	২,৩ ৩,৫২, ০০০	৫৭, ৯৬, ০০০
বুলগেরিয়া	৪,০০০	২,০০০
ইজিপ্ট	১৮, ৯৮, ০০০	১৪, ৯৪, ০০০
জাপান	৬,০০০	৫,০০০
ইউনাইটেড-ষ্টেট্	৩,৬ ৩,৮৩,০০০	১,৫ ৫,৩২,০০০
সর্ব্ব মোট	৬,১৬, ৪৩,০০০	২,১৪, ২৯,০০০

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ে, পৃথিবীর উৎপন্ন কার্পাসের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভাগ আমেরিকা হইতে এবং এক চতুর্থ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে এবং অবশিষ্ট ইজিপ্ট দেশে উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সি-আইল্যাণ্ড নামক কার্পাস আমেরিকার অন্তর্গত বাহামা দ্বীপে, দক্ষিণ কারোলিনার কোন অংশে, সামান্য পরিমাণে, উৎপন্ন হয়। ইহার সূত্র দীর্ঘে প্রায় ২ ইঞ্চি। তৎপর মিশরের কার্পাস ইহা দীর্ঘতায় ১৷৷০ ইঞ্চি। মার্কিণ

কার্পাসও দীর্ঘে প্রায় ১ ইঞ্চি। ভারতবর্ষের কার্পাস অতিশয় নিকৃষ্ট। ইহা দৈর্ঘে অর্দ্ধ ইঞ্চি। কোন কোন স্থলে ১ ইঞ্চি দীর্ঘ সূতার কার্পাসও জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের কার্পাস ভারতীয় কার্পাসের মধ্যে নিকৃষ্ট।

ভারতের কার্পাস বিলাতের কলে ব্যবহৃত হয় না। কারণ এই তুলায় সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় না। বিলাতের কলের দ্বারা সূক্ষ্ম সূতাই কাটা হয়। ভারতবর্ষের নিকৃষ্ট কার্পাস জাপানে রপ্তানি হইতেছে। তাহাদের কলে মোটা সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়। মিশর ও মার্কিণ দেশে দিন দিন কার্পাসের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। ভারতবর্ষে কিছুই হয় না। বর্ত্তমানে আমরা বিদেশী কার্পাস রোপণ করিতে পরামর্শ দিতে পারি না। যতদিন না ভারতীয় কার্পাসের উন্নতি ঘটে, ততদিন এই অদীর্ঘ নিকৃষ্ট কার্পাসের আবাদ করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের কার্পাসের বিশেষ কিছু উন্নতি সাধন হয় নাই। কোন কোন স্থলে মার্কিণ কার্পাস অনেকটা সুফল প্রদান করিয়াছে। ধারোয়ার, কম্বোডিয়া ও ছোটনাগপুরে অল্প বিস্তর এই মার্কিণ কার্পাসের চাষ দৃষ্ট হয়। ছোটনাগপুরে মার্কিণ কার্পাসকে বুড়ী কার্পাস বলে। বুড়ী কার্পাসের অনেক ডলা-পালা মাটিতে গড়াইয়া যায় ও কার্পাস ফুটিলে ইহার তুলায় ধুলা মাটি লাগিয়া যায়। কিন্তু ধরোয়ার কিম্বা কম্বোডিয়া কার্পাস সেরূপ নয়। কানপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন কার্পাস উত্তম হইয়াছে। সি-আইল্যাণ্ড কার্পাস ভারতবর্ষের কোথায়ও জন্মে নাই। মিশরি কার্পাসের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। মিশরী কার্পাস কেবল মাত্র সিন্ধুপ্রদেশে কিছু কিছু জন্মিয়াছে। কিন্তু তথায়ও তিন চারি বৎসর পরে ঐ কার্পাসের অবনতি ঘটিতেছে।

বৃষ্টি অত্যধিক হয় বলিয়া বঙ্গদেশ, কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী নয়। তবে যখন গারোহিল কার্পাস বঙ্গদেশে জন্মিতেছে, তখন এই কার্পাসের চাষ বহু স্থলে, যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, সিলেট প্রভৃতি জেলায় বিস্তার করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে মাত্র ৫০।৬০ হাজার একরে কার্পাস চাষ হয়। ইহা অত্যন্ত কম। বঙ্গদেশের প্রত্যেক ভিটা-বাড়ী কিম্বা বাগান বাড়ীতে গাছ কার্পাস রোপণ করিলে, এখানে অনেক পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইতে পারে। সম্ভবতঃ ধারোয়ার, কম্বোডিয়া এবং কানপুরের মার্কিণ কার্পাস বঙ্গদেশের উচ্চস্থলে জন্মিতে পারে।

খাওয়া ও পরার জন্য এক দেশ অন্যদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে—ইহা অস্বাভাবিক। অন্য দেশ বঙ্গদেশকে কাপড় সূতা ও তুলা যোগাইবে, ইহা আমাদের গৌরবের কথা নহে। বাঙ্গালীর খাওয়া পরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। চারি কোটী লোকের জন্য অন্ততঃ ৮ ক্রোর সের তুলার প্রয়োজন। তন্মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষ সের কার্পাস বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

এরণ্ড

বাঙ্গালা দেশে, কোন স্থলে, বিস্তারিত ভাবে এরণ্ড চাষ হয় না। আসামে এড়ি রেশম-পোকা চাষের জন্য ইহার গাছ দৃষ্ট হয়। তথায় ইহা কোন উচ্চ ভূমিতে একবার রোপণ করা হয়; তৎপর ঐ স্থানে বীজ পড়িয়া বৎসর বৎসর জন্মে।

এরণ্ড প্রধাণতঃ দুই জাতীয়। এক জাতীয় গাছ বাগানে জন্মে এবং ইহার গাছ ৮।১০ হাত লম্বা হয়। ইহার বীজ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিলে মাঘ, ফাল্গুন মাসে পাকে। বাগানের গাছ ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। অন্য প্রকারের এরণ্ড ভাদ্র মাসের প্রথমেই বপন করিতে হয়। ইহার বীজ চৈত্র বৈশাখ মাসে পরিপক্ক হয়। এই জাতীয় গাছ ৪।৫ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। এই গাছের বীজ ছোট। ইহাদের মধ্যে দুই জাতীয় বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বীজ খুব ছোট। ইহার তৈলও খুব পরিষ্কার। ইহার গন্ধও খুব তীব্র নহে। ঔষধের নিমিত্ত এই জাতীয় এরণ্ডের তৈলই উৎকৃষ্ট। বিহার প্রদেশে ইহাকে চানাকী বলে। ছোট গাছের এক জাতীয় বীজ অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার ফসল অধিক। কৃষকগণ এই জাতীয় এরণ্ডই অধিক পরিমাণে লাগাইয়া থাকে। এড়ি রেশম পোকাকে ছোট এরণ্ড গাছের পাতা খাওয়ান হয়। কারণ বড় গাছ হইতে পত্র সংগ্রহ সুবিধাজনক নহে।

এরণ্ড দো-আস পলী মাটিতে উত্তমরূপে জন্মে। যে ভূমিতে বর্ষাকালে বানের জল উঠে না, তথায় ভালরূপে সার না দিলে, এরণ্ড জন্মে না। জমী ৫।৬ বার লাঙ্গল করিয়া উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে লাঙ্গল দিয়া ৪ হাত অন্তর সীতা কাটিতে হয়। এই সীতার উপরে দুই হাত অন্তর এক একটি বীজ নিক্ষেপ করিয়া মই দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। গাছ দুই ফিট আন্দাজ উচ্চ হইলে, একবার লাঙ্গল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিতে হয়। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ফল পাকিলে, ডাটা সহিত ফল ভাঙ্গিয়া লইতে হয়।

বীজ ছাড়াইবার জন্য, বীজ কোন গর্ত্তে খড়ের মধ্যে রাখিয়া, একবার জল সেচন করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। ৮।১০ দিন পরে ইহার খোসা নরম হইয়া যায়। তখন হাত দিয়া একটু ঘসিলেই বীজ খোসা হইতে বাহির হইয়া আসে। এরণ্ডের ফসল একর প্রতি ১২ মণ। উৎকৃষ্ট জমিতে ১৫ মণ পর্য্যন্ত ফসল পাওয়া যায়।

এরণ্ডের ঘোড়া পোকা ও শুঁয়া পোকা ভয়ানক শত্রু। চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে ইহারা এরণ্ডের পাতা খায়। প্রথম হইতে নজর না রাখিলে, এক এক সময়ে,

ইহার সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে, বড় বড় ক্ষেতের একটী পাতাও থাকে না। অপর চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। প্রজাপতি রাত্রিতে উড়িয়া উড়িয়া এখানে ওখানে এরণ্ড পত্রের উপরে ডিম্ব প্রসব করে। এক একটী স্ত্রী প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে। ডিম হইতে আবার প্রজাপতি হওয়া পর্য্যন্ত, ও গ্রীষ্ম বর্ষাকালে, ২০।২৫ দিন লাগে। ইহারা বন ভেরেণ্ডার ও অন্যান্য জঙ্গলের গাছের পাতা খাইয়াও বাঁচিতে পারে। এরণ্ড ক্ষেতের কাছে, বন জঙ্গল থাকিলে, এক এক সময়, এই জঙ্গলে ইহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে, কীড়া দলে দলে আসিয়া এরণ্ডের ক্ষেতে পড়ে এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ক্ষেত্রের পাতা সাবাড় করিয়া ফেলে।

এক রকম শুঁয়া পোকা ও এরণ্ডের শত্রু। ইহার পীঠে একটা ডোরা থাকে এবং গায়ের, দুই ধারে ভালুকের মত বড় বড় রোঁয়া থাকে। মাথার দুই ধারে সিঙের মত দুই গোছা লম্বা রোঁয়া আছে। ইহাদের স্ত্রী-প্রজাপতি হলুদে এবং পুং-প্রজাপতিরা সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট।
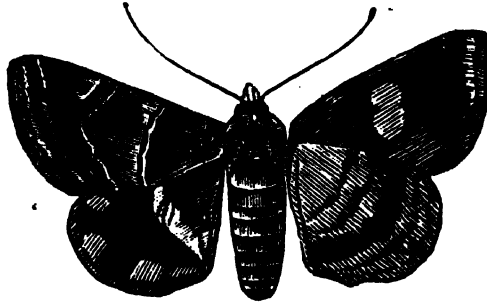
পীঠে ডোরাযুক্ত, সবুজ রঙের এবং গায়ে অনেক কাঁটাওয়ালা আর এক রকম পোকা ও এরণ্ডের পাতা খায়। ইহাদের প্রজাপতি কাল দাগ মিশ্রিত হলদে রঙের হয়। এরণ্ডের ক্ষেতে দিনের বেলায় ইহাদিগকে উড়িতে দেখা যায়।

এই সমস্ত পোকাকে বাছিয়া মারিয়া ফেলাই সহজ উপায়। আর যেখানে এরণ্ডের চাষ হয়, তাহার নিকটে কোন স্থানে, কোন প্রকার জঙ্গলা গাছ জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর হইতে, এরণ্ড তৈলের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। এই তৈল সাধারণতঃ কলে ব্যবহৃত হয়। এরণ্ডের খৈল জমীর একটি প্রধান সার। বর্ত্তমানে এই সারের মূল্য মণ করা ৪৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা। অন্য তৈলের খৈল অপেক্ষা এই খৈলের উপকারিতা অল্প দিনের মধ্যেই দেখা যায়। এই জন্য কৃষকগণ সর্ষপ খৈল ৩৲ টাকায় খরিদ না করিয়া ৪৲ টাকায় এরণ্ডের খৈল ক্রয় করে। বঙ্গদেশে উপযুক্ত স্থানে এরণ্ডের চাষ প্রবর্ত্তন করা উচিত।

লোণাজলে ধানের চাষ

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, লোণাজলে কোন ধান জন্মে? কোন কোন ব্যক্তি, লোণাজলে বা লোণা মাটিতে জন্মিতে পারে এমন কোন কোন ধানের খবরও সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন। ঐরূপ মন্তব্য পাঠ করিয়া, যিনি চাষ করিয়াছেন, তাঁহার লাভ কি লোকসান হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু লোণা জলের কোন ধান আমাদের জানা নাই। এক সময়ে সুন্দর বনে অবস্থিত ফেজারগঞ্জ নামক স্থানে, আমরা কিছু দিন ছিলাম। ফেজারগঞ্জ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। তথাকার মৃত্তিকায় এত লবণ ছিল যে, ৮।১০ বৎসরেও উহা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত হইতে পারে নাই। ফেজারগঞ্জের নানা স্থলে চাষ করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে স্থলের মৃত্তিকায় এক ফুটের মধ্যে শতকরা ১/৪ ভাগ লবণ আছে, তথায় ধান জন্মিয়াছিল। যে মৃত্তিকায় শতকরা ১/২ ভাগ লবণ তথায় কোন ফসলই জন্মে নাই।

কোন স্থলের মৃত্তিকায় শীতকালে অধিক লবণ থাকে। কিন্তু বৃষ্টির সময়ে বৃষ্টির জলে অতিরিক্ত লবণ ধৌত হইয়া ধান চাষের উপযুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র লোণা জলে কিম্বা মৃত্তিকায় একই পরিমাণে লবণ থাকে না। হইতে পারে, কোন স্থলে ধান জন্মিয়াছে। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় না যে, তথায় অতিরিক্ত লবণ ছিল। এবং এক স্থানে ধান জন্মিল বলিয়া অন্যত্রও ধান জন্মিবে এমন কথা নাই। যে স্থলে ধান জন্মিয়াছে, বুঝিতে হইবে যে, তথায় লবণের ভাগ অধিক নয়। বাঁধ দিয়া লোণা জল না আটকাইতে পারিলে, লোণা জল প্লাবিত স্থানে কখনও ধান জন্মিতে পারে না। যে স্থানে গ্রীষ্মকালে লোণা জল আসে, কিন্তু বর্ষাকালে তথাকার জল মিঠা, সে স্থলে রোপন ধান উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের কৃষিরসায়ণ পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

কচুরী-পানা

গত শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার গবেষণালয়ে কচুরীপানার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটী গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কচুরীপানা বঙ্গদেশের ভয়ঙ্কর শত্রু। প্রজাগণ কচুরীর সহিত যুদ্ধে হার মানিয়াছে। কচুরীর আক্রমনে বিলান জমী পতিত হইয়া পড়িতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া

প্রজাগণ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞেরা, কচুরীপানা জ্বালাইয়া, ইহার ভস্ম জমীতে সাররূপে প্রয়োগ করিতে, উপদেশ দেন। কচুরী সংগ্রহ ও শুষ্ক করা দুঃসাধ্য। প্রজাগণ এ প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। অতঃপর সরকারের অনুরোধে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু কচুরীধ্বংশ করিবার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি উত্তপ্ত জল প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে কেবল পাতা মরিয়া যায়, কিছুদিন পরে, আবার কচুরী প্রবল বেগে বিস্তার আরম্ভ করে। তিনি পিচকারী দিয়া কচুরীপানার উপর বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কচুরী পত্র কেবল মরিয়া পুনরায় গজাইয়া উঠে। কচুরীর মূল জলে থাকে। মূলে উত্তপ্ত জল কিম্বা বিষ পৌঁছে না। কাজেই কচুরীও মরে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র কচুরীর যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি গবেষণা পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই; এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিষয় বুদ্ধি হীন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কোন সুফলের আশা নাই।

কচুরীপানা যে কেবল বীজ হইতেই উৎপন্ন হয় তাহা নহে। বীজ অপেক্ষা মূল দ্বারা ইহার অধিক বিস্তার হইতেছে। একটী পানা এক বৎসরে ১০ কাঠা (৮০০ বর্গহস্ত) পরিমাণ জলাশয় ঢাকিয়া ফেলে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে, কচুরীপানার গাছ দেখা যাইত। তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, এই ক্ষুদ্র গাছ, কোন সময়ে, সমগ্র বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে।

কৃষকের সংখ্যা

ভারতবাসীর ন্যায় কৃষিজীবি জাতি পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে কৃষকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু জমির পরিমাণ তদনুসারে কম। বর্ত্তমান সময়ে, প্রায় ২০ ক্রোর জমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। সমুদায় ভারতবাসীর পূর্ণ আহারের জন্য আরও ৫ ক্রোর জমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন করা আবশ্যক। চাষের উপযোগী এত পরিমাণে জমি না পাইলে, প্রায় ৮ ক্রোর লোকের আহারের জন্য শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া, অন্যদেশ হইতে, খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আমদানী করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন দেশের কত লোক কৃষিজীবি ইহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষিয়া দেশে	শতকরা	৭০ জন	কৃষিজীবি
অষ্ট্রিয়া	”	৬২ ”	”
ইটালী	”	৫২ ”	”
আয়রল্যাণ্ড	”	৪৫ ”	”
ক্যানাডা	”	৪৩ ”	”
ফ্রান্স	”	৪২ ”	”
জারমানী	”	৩৯ ”	”
ইউনাইটেড-ষ্টেটস্	”	৩৫ ”	”
অষ্ট্রেলিয়া	”	২৫ ”	”
বেলজিয়াম	”	২৫ ”	”
হল্যাণ্ড	”	২২ ”	”
ইংল্যাণ্ড	”	১০ ”	”
ভারতবর্ষ	”	৮৫ ”	”

শিল্প বাণিজ্য উপেক্ষা করিয়া, যে দেশের লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই দেশের লোকই দরিদ্র। এইজন্য ইউরোপের মধ্যে রুষিয়া, এবং পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র।

মনোনীত প্রবন্ধ।

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য

ষড় ঋতু বিরাজিত ভারতবর্ষ অতি বিশাল দেশ। এখানে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি আছে, বিভিন্ন প্রকৃতির আবহাওয়া আছে; নানা প্রকার মৃত্তিকা আছে, মৃত্তিকায় উর্ব্বরতা শক্তিও নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং উদ্ভিদাদি যাহা প্রয়োজনীয়, ভারতে তাহার অভাব ঘটে না। পৃথিবীর প্রায় সকল রকম শস্য, শাক সজী তরকারী, ফল

ও ফুলের গাছ এবং আয়কর বৃক্ষাদি ভারতের কোন না কোন স্থানে জন্মিয়া থাকে, ; এই কথায় বলিতে গেলে "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে" বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের কৃষি চির প্রসিদ্ধ। কার্পাসের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে সময়ে, পৃথিবীর অনেক জাতি বল্কল পরিধান করিয়া, লজ্জা নিবারণ করিত, সেই অতি প্রাচীন কালেও, ভারতবাসী কৃষিলব্ধ কার্পাসে আপনাদের ধানের অভাব বিদুরিত করিতে সমর্থ ছিল। একমাত্র কৃষিই সে সময়ে, সভ্যতার তুলা দণ্ড স্বরূপ ছিল। সেই সুদুর অতীত কালেও স্বর্ণপ্রসূ ভারতের কৃষির বা সভ্যতার বিবরণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইয়াছিল। সেই শুভ যুগে ভারতবর্ষই জগতের আদর্শ স্থল ছিল, এবং সভ্যতার ইতিহাসের শীর্ষ স্থলেও ভারতের নামই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য লইবার জন্য অনেক বৈদেশিক জাতি ভারতে আগমন করিত; কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য একরূপ অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। যে ভারত এক দিন জগতের অশন বসনের অভাব দূর করিয়া ছিল, আজ সেই ভারতই অন্নের জন্য লালায়িত ও বসনের জন্য পরমুখাপেক্ষী।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চাষ আবাদ করিয়া অনেক নগণ্য দেশও কৃষি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সুসভ্য ভারতের কৃষিতে আজ পর্য্যন্তও সেই মান্ধাতা আমলের প্রথা চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতের কৃষির অবস্থা দিন দিনই অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতি দেবী চিরদিনই এ হতভাগ্য দেশবাসীর প্রতি বিশেষ সদয়া আছেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহ লাভে ভারতে আজিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অফুরন্তই রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী ভারতবাসীর প্রতি সদয়া, বৃষ্টির ও নদীর জলেই ভারতের ভূমি সিক্ত থাকে, এবং বর্ষার জল প্লাবনে কত দূর প্রদেশ হইতে ও সার বহন করিয়া আনিয়া জমীতে ছড়াইয়া রাখিয়া যায়। এই জন্যই আমাদের মাতৃভূমি এখনও সুজলা সুফলা ও শস্য শ্যামলা। বস্তুতঃ রাজপুতানার মরু প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই শ্যামল শস্যের পরিপূরিত রহিয়াছে। এই মরুতে নদী নাই। বিশেষতঃ ভারতের মত সুবিস্তৃত দেশের এমন স্থলে রাজপুতানা অবস্থিত যে বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর অথবা ভারত মহাসাগরের যে কোন স্থান হইতেই মেঘ উত্থিত হউক না কেন, তাহা ভারতের স্থানে স্থানে জল বর্ষণ করিতে, করিতে রাজপুতনায় পৌছিতে পারে না, রাজপুতনায় সমীপবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, অথবা বায়ু ভরে পরিচালিত হইয়া হিমালয় প্রদেশে গিয়া পৌছে। কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হইলেই রাজপুতনায় কিঞ্চিৎ বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। যথোচিত বৃষ্টির অভাব হইলেও রাজপুতনায় কিয়ৎ পরিমাণে শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। একমাত্র রাজপুতনা ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই ভূমি উর্ব্বরা এবং আবহাওয়াও কৃষির অনুকূল। তথাপি

ভারতের যে অন্নাভাব ঘুচে না, ইহা ভারতবাসীর কৃষির প্রতি ঘৃণাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ প্রথা ভারতের সর্ব্বত্রই যদি প্রচলিত হয়, ভারতবাসী যদি আবার পূর্ব্বের ন্যায় কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে, তাহাহইলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের দৈন্য দশা বিদূরিত হয়, এবং স্বর্ণপ্রসূ ভারতের মৃত্তিকায় আবার সোণা ফলিতে পারে।

ভারতবর্ষের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, এই স্থানে বালি ও দোআশ, প্রস্তরময় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মৃত্তিকা এবং সকল প্রকারের আবহাওয়াই আছে। সুতরাং ভারতবর্ষে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের উদ্ভিদই জন্মিতে পারে, এবং অল্পাধিক পরিমাণে জন্মিয়াও থাকে। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান্য, গম, যব, কলাই, ভুট্টা, চিনা, বজরা ইত্যাদি মানবের প্রধান খাদ্য দ্রব্যের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ধান্য ও গম এত অধিক পরিমাণে জন্মে যে, তাহা দ্বারা ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর আহার্য্য সংস্থানের পরও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ বিদেশের নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে। যাহারা রেঙ্গুন বা করাচী বন্দরে জাহাজ ঘাটের রপ্তানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, প্রতিদিন বিদেশীর প্রাণরক্ষার জন্য কি পরিমাণ ধান্য ও গম বিদেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহা তাহারা জ্ঞাত আছেন। ধান্য, গম প্রভৃতির পর তুলা, পাট, তামাক, ইক্ষু, চা, কাফি, আফিং, তিল, সরিষাদি শস্যের নামোল্লেখ করা যায়।

এই সমস্ত উৎপন্ন শস্যের মধ্যে বঙ্গের ধান্য ও পাট, ব্রহ্ম দেশের ধান্য, পাঞ্জাব অঞ্চলের গম, আসামের চা, বরদা ও বম্বের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের তামাক, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ইক্ষু, পাটনা ও মধ্য ভারতের কোন কোন প্রদেশের আফিং, দাক্ষিণাত্যের চিনা, বজরা, কাফি, কোকো, মশলাদি বিখ্যাত। কাশ্মীর, আসাম, নিম্নবঙ্গ, মহীশূরে রেশম কৃষির উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ ঘটিতেছে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে তুলার চাষ হয়। তুলার চাষে আমেরিকার পরই ভারতের নাম করা যায়। লঙ্কা দ্বীপের ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা। অনেকে লঙ্কা দ্বীপকে "ভারতের উদ্যান" নামেও অভিহিত করেন। এই স্থানের আবহাওয়াও কৃষির পক্ষে উপযোগী। শস্যের মধ্যে চা, কাফি, কোকো, ধান্য, দারুচিনি, তামাক, সিঙ্কোনাই বিখ্যাত। ভারত, ব্রহ্ম, সিংহলের নানা স্থানেই মূল্যবান বৃক্ষাদি সমাচ্ছাদিত বহুসংখ্যক অরণ্যানী দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল অরণ্য হইতে প্রতিবৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতের মৃত্তিকা ও জলবায়ু বিশেষ অনুকূল বলিয়াই অযত্নেও এদেশে বিস্তর ফল ফলিয়া থাকে। জাপানীরা আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল আমেরিকায়, কোরিয়া ও চীনে রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতেছে। ফলের চাষে একটুকু মনোযোগী হইলে ভারতবাসীরাও বিদেশে পাঠাইবার উপযোগী নানাবিধ ফল অনায়াসেই উৎপাদন

করিতে পারে। টাটকা ফল পাঠাইবার সুবিধা না থাকিলেও, অনেক রকম ফল শুষ্ক করিয়া কি কৌটায় পূরিয়া, তাহা অন্যত্র প্রেরণ করা দুঃসাধ্য বা বহু ব্যয়সাপেক্ষ নহে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে আম্র জন্মে। তন্মধ্যে মালদহ, বোম্বে, মান্দ্রাজ, সাহারণপুর অঞ্চলের আমই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কশ্মীর, পঞ্জাব, ও সীমান্ত প্রদেশে বাদাম, কিশমিশ, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর ও আকরোট প্রভৃতি অতি উপাদেয় সুমিষ্ট ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আসাম ও নাগপুরের কমলালেবু বিখ্যাত। মজঃফরপুর ও সাহারণপুর অঞ্চলের লিচু অতি সুস্বাদু। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলের ও বোম্বাই প্রদেশের কলা এবং উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের কাঁঠালের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ফলই ভারতবর্ষে অত্যধিক পরিমাণে জন্মে। ভারতের ফল বিদেশে পাঠান ত দূরের কথা, এক প্রদেশের ফল অন্য প্রদেশে পাঠাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেও প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারা যায়। যে কাঁঠাল পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এবং নিকৃষ্ট ফল বলিয়া অনাদৃত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতের অনেক স্থানের লোক তাহার নাম পর্য্যন্তও অবগত নহে। অযত্নে সুলভ ফল যাহা যে প্রদেশে জন্মে, সেই প্রদেশের লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং অন্য প্রদেশের ফলবান বৃক্ষের চাষের প্রতি কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। নূতন কোন ফলবান বৃক্ষের চাষ করা দূরে থাকুক, চাষের চেষ্টা ও করা হয় না। এক স্থানের ফলের মাটী ও আবহাওয়া অন্য স্থানের ফলের চাষের উপযোগী নহে ইত্যাদি ভাবিয়াই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোক হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে।

বৈদিক যুগে বা জগতের সভ্যতার আদি যুগে গরু আর্য্য দিগের প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই সুদূর অতীত কালে ভারতবাসী আর্য্যগণ গোপালন, গোচারণ ও গরুর সাহায্যে কৃষি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা "অন্নং ব্রহ্ম" মনে করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অন্নোৎপাদন ও অন্ন বৃদ্ধির জন্য কৃষি কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই ভারতবাসী কৃষি কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন; সুতরাং কৃষি কার্য্যের এক মাত্র সহায় গো জাতি ও তাহাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। এই জন্যই তৎকালে গোপালন ও গো সেবা আর্য্যদিগের ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত এবং গো জাতিও গোধন নামে অভিহিত হইত। বৈদিক যুগের কথা দূরে থাকুক, প্রচীন কালেও এদেশের সর্ব্বত্রই গো পালন প্রথা প্রচলিত ছিল, যে গৃহস্থের অধিক সংখ্যক গরু থাকিত, তাহাকেই লোকে সম্পত্তি শালী বলিয়া সম্মান করিত। বেশী দিনের কথা নহে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ও ভারতের ঘরে ঘরেই গো পালন প্রথা বর্ত্তমান ছিল। গৃহস্থগণ স্ব স্ব প্রয়োজনাতিরিক্ত দুগ্ধ গোয়ালাকে প্রদান করিতেন। নাম মাত্র মূল্য দিয়া গোয়ালাগণ গৃহস্থের নিকট হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিত ও তদ্দারা প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, মাখন প্রভৃতি গব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দেশের

ও দশের অভাব মোচন করিতে সমর্থ ছিল। এক সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক গব্য সামগ্রীর ব্যবসায়ে সংলিপ্ত ছিল, বিশেষতঃ সে সময়েও এদেশে দুগ্ধের অভাব ঘটে নাই। সুতরাং গব্য সামগ্রীর অভাব কি তাহা তৎকাল পর্য্যন্ত ও ভারতবাসীর অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু অধুনা খাঁটী গব্য সামগ্রী একরূপ দুষ্প্রাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে। যাহাও পাওয়া যায়, তাহাও দুর্ম্মূল্য বলিয়া সাধারণের ব্যবহারের সামর্থ্য নাই। এখনও গোয়ালা সম্প্রদায় জাতীয় ব্যবসায়েই লিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে গোপালন প্রথা এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই গো দুগ্ধের ও গব্য সামগ্রীর বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। এই জন্যই পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতের নানা স্থানে ব্যবসায়ের হিসাবে গোপালন ও গব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কল কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবনা চলিতেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রায় সকল লোকই মাংসভোজী, কিন্তু ভারতের প্রায় দশ আনা রকম লোকই মাংস ভক্ষণ করেনা। এদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে মাংস ভোজীর সংখ্যা অতি অল্প। যাহারাও মাংস খায়, পাশ্চাত্য দেশবাসীর ন্যায় তাহাদেরও নিত্য মাংসের আবশ্যক হয় না। এদেশের মুসলমানগণ মাংস ভোজী বলিয়া মুসলমান গৃহস্থগণ সাধারণ ভাবে যে পশু পক্ষী প্রতিপালন করিয়া থাকে, তাহাতেই মাংসের বড় অভাব ঘটেনা। এইজন্যই ব্যবসায়ের হিসাবে পশু পক্ষী পালন প্রথা ভারতের কুত্রাপি প্রচলিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই যাহা তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত নহে, এইরূপ পশু পক্ষীর পালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বাড়ীতে আনয়ন করা ও আপত্তি জনক বলিয়া মনে করে। ভারতে পশু পক্ষী পালন প্রথা প্রচলিত না হইবার ইহাও একটী প্রধান কারণ। ভারতের অধিকাংশ পশু ও পক্ষীর চর্ম্ম ও লোম বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পশ্বাদি সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলের চর্ম্ম ও লোমই বিখ্যাত। কাশ্মীরের মেষের লোম জগদ্বিখ্যাত, উহাতে মূল্যবান শাল প্রস্তুত হয়। ভারতের চর্ম্ম ও লোম রপ্তানী হইয়া অন্যদেশে যায়, এবং রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় ভারতে আসিয়া থাকে। ইহাতে কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাণপুর ও ধারিওয়াল অঞ্চলে যে কয়েকটা চর্ম্মের কারখানা আছে, তাহারও প্রায় সকল গুলিই বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত।

ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। ভারতবাসী ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃষ্ট ব্যবহারেও অজ্ঞ বা অপারক। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ভারতবাসী যে অর্থলাভ করে, সেই সকল দ্রব্যই রূপান্তরিত ভাবে এদেশে ফিরিয়া আসিলে তাহা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্য দিয়া তাহাদিগকে ক্রয় করিতে হয়। ভারতের দরিদ্রতার ইহাই মুখ্য কারণ। ভারত কৃষি প্রাণ দেশ হইলেও এখানে কৃষক দিগের কৃষি শিক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। পক্ষান্তরে এদেশবাসীর কৃষির প্রতি

যেরূপ ঘৃণা এবং এদেশে কৃষিকার্য্য যত হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, জগতের কুত্রাপি সেরূপ ঘৃণায় ভাব পরিলক্ষিত হয় না। যাহা হউক অভাবের তাড়নায় ইদানীং কৃষির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতের সদাশয় শাসন কর্ত্তারাও ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্টায় বিরত নহেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই ভারতের কৃষির অবস্থা যে অনেকাংশেই উন্নত হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

সংগৃহীত।

বাঙালী ও ইংরাজ

আমরা বাঙালী পরাধীন—ওপারে ওই শ্বেতদ্বীপের লোকেরা স্বাধীন; অতীতের গরিমায় আমাদের তরী ভরপুর, বর্ত্তমানের আলোয় ওরা জ্যোতির্ম্ময়। আমরা যখন পেছনের দিকে চেয়ে 'হা' করে ভাবি, ওরা তখন দশহাত এগিয়ে চলে; সামনের দিকে আমরা আঘাত পেলে হজম করি, ওরা আঘাত পেলে ফিরিয়ে দেয়। একটা চড়ায়ে উঠ্‌তে আমরা হাঁফিয়ে হাঁসিয়ে মরি, হিমালয়ের বুকে চড়ে ওরা নৃত্য করে। আমরা দূর থেকে সাগর দেখে কবিতা লিখি, ওরা সাগরের বুকে নেমে গিয়ে দেখে আসে তাহার

গোপন ধন ; আমরা কাজ আরম্ভ করি—শেষ করি না, ওরা শেষ না করে কাজ ছাড়ে না ; আমরা অদৃষ্টকে বিশ্বাস করি বেশী, ওরা নিজেকে বিশ্বাস করে বেশী ; আমরা নেশায় নামি কাজ করতে আয়োজন না করে, শেষে বলি শুধু 'The movement is a huge failure" ; ওরা তোড়জোড় বেঁধে তবে নামে'—হেস্তনেস্ত করে তবে থামে। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি বক্তৃতা করি পরলোকের ভাবনা ভাবি—ওরা তখন কাজ করে বিজ্ঞান রচে ইহলোকের পাথেয় সংগ্রহ করে।

আমরা বীজ পুঁতেই হাঁ করে চেয়ে থাকি—দেখি গাছ বেরোলো নাকি, যদি শীঘ্র না বেরোলো তবেই বিরক্ত হয়ে বীজের চোদ্দপুরুষের উদ্ধার করে ঘরে ফিরে আসি—ওরা বীজ পুঁতে থালকেটে জল এনে দিনের পর দিন চেয়ে থাকে, না বেরোলে তার কারণ ভাবে প্রতিকার করে আবার পোঁতে নূতন সার ঢালে গাছ বার করে তবে ছাড়ে।

ওরা যখন আবিষ্কার করতে থাকে, আমরা তখন ভুল খুঁজতে ব্যস্ত থাকি—ওরা বনে গিয়ে বাঘ দেখে আসে, আমরা ঘরে বসে ছবির বাঘ দেখে সন্তুষ্ট। ওরা ধুলোও তুলে দেখে, আমরা স্বজাতকেও ছুঁই না—ওরা দাম দিয়ে জিনিস নেয়, আমরা চাই অমনি সস্তায় ; ওরা জানে কর্ত্তব্য, আমরা জানি অধিকার।

প্রকৃতির রহস্য জানতে ওরা প্রকৃতির বুকে গিয়ে ঘা দেয়, ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে, বৃষ্টির সঙ্গে আলাপ করে, কাঁটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে—আমরা বাঙলা মায়ের সুবোধ শিশু, ঝড়বৃষ্টির কৃতদাস, শত্রুর সঙ্গে জোর পারি বাকযুদ্ধ চালাতে।

ওরা অতৃপ্ত, ওরা "সুদূরের পিয়াসী" নূতনের বিধাতা, পাহাড় ঠেলে ওরা ধেয়ে চলে যায় জমাট বাধা বরফ ভেঙ্গে অজানা দেশের বুকে নিজেদের বিজয় নিশান উড়িয়ে দেয়, ঢেউ-এর সঙ্গে নাচে ওরা, বাতাসের সঙ্গে ছোটে, প্রাণ ভরে চায় ওরা, অনন্ত ওদের পিয়াসা—আমরা তৃপ্ত, পাঁচিলঘেরা ঘরখানা আমাদের স্বর্গ, আমরা ভাল ছেলে, সুবোধ শান্ত শিষ্ট অল্পেই পরিতুষ্ট।

ওরা সাহারার মত মরুকে সাগর করতে চায়, ওরা হিমালয়ের মত পাহাড়ের মাথায় নিজেদের রক্ত নিশান উড়িয়ে দেয়, ওরা সাগরের মত অতলের তলে ডুবতে চায়, ওরা আগ্নেয়গিরির মত ভীষণের মাঝে জ্ঞানের পিপাসায় নেমে যায়, ওরা আকাশকে টেনে ছিঁড়ে নির্মে আসে তার ঘরের দুয়ারে, ওরা শক্তিমান্ ধৈর্য্যশালী, ওরা কর্ম্মী, ওরা দুরন্ত আমরা শান্ত! এরা পৃথিবীর রাজা, আমরা বিনীত প্রজা।

আমরা ছেলেকে যত কম বয়সে পারি স্কুলে দিয়েই অল্পসময়ে বেশী বিদ্যার আশায় বস্তা বস্তা বই চাপিয়ে দি বেচারার ঘাড়ে, "পাছে একটু দেরী হলে বিদ্যা-দিগ্গজ হবার আশা কিছু ক্ষীণ হয়!" ব্যবসা খুলেই লাভের খাতা নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করে দি,

রোগ হলেই অস্থির হয়ে উঠি এ্যালোপাথিক দেখাবো না হোমিওপ্যাথিক না কবিরাজী না ও তিনটাই একত্রে, অস্থির হয়ে রোগ বাড়াই শুধু; আমাদের দোকান খোলার ধূপধুনোর সঙ্গে সঙ্গেই লালবাতি জ্বলে উঠে। এসব আমাদের অস্থৈর্য্যের চপলতায় পরিচয়।

আমরা ইংরাজের অনুকরণ করেছি বা করছি। তার মানে—"ইংরাজ টেবিলে খায়, আমরা কলাপাতায় খাই, দেখাদেখি আমরা টেবিলে কলাপাতা পেতে বসে গেলাম। ইংরাজ মদ খায় রেস খেলে, আমরাও ৩০৲ টাকা মাইনে নিয়ে আবকারীর আয় বাড়ালাম। রেসের মাঠ জমায়ৎ করলাম। ইংরাজেরা পিয়ানো বাজায়, আমাদের আর একতারায় সুর উঠ্‌লো না। ইংরাজের মেয়েপুরুষ হাতধরাধরি করে বেড়ায়, আমাদের ললনাদের ঘরের অখণ্ড কোণে আর নারীত্বের বিকাশ হলো না ঘর তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো, পুরুষদেরও বাইরেটা কেমন ফাঁকা হয়ে এলো। ওদের দেশের মেয়েরা ব্যারিষ্টারী করে চাকরী করে, আর আমাদের দেশের মেয়েরাই বা কি দোষ করলে? তারা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয় আর আমরাই পুরুষদের মুখের দিকে চেয়ে থাকব? তাদের দেশের লোকেরা হ্যাট-কোট পরে, সিগার টানে, পার্কে বেড়ায় আর আমরা এমনি অধম যে, এই মোটা করকোরে ঠেঙ্গাধুতি পরে থাকব; আমরা কি গুরুতর অপরাধ করেছি?

আজ আমরা নকলেন্‌নাকাল হয়ে উঠেছি। যদি ইংরাজের কার্য্যকুশলতা, তাদের একান্ত উদগ্র একাগ্রতা পেতাম, তাদের মতন দুরন্ত হতাম, তা হলে আর এমন রাস্তায় রাস্তায় বাপ-মা মরা ছেলের মত কাঁদুনি গেয়ে গেয়ে বেড়াতাম না।

আজ মনে রাখা দরকার, সস্তাদরে সুবিধা করে কেউ আর কিছু দিচ্চে না। জিনিষ পেতে হলে তাকে তৈরী করতে হবে—না হয় উচিত দাম দিয়ে তাকে কিন্‌তে হবে। ভিক্ষা আজ কেউ দেবে না, সকলেই ভিখারী। কর্ত্তব্য না সেরে, কর্ত্তব্য না করে অধিকার অধিকার বলে গলা ভাঙলেও অধিকার ফিরিয়ে পাবে না—অধিকার পেতে হলে কর্ত্তব্য শেষ করতে হয়। অপরের ঘরের ছিদ্র দেখে হাসার চেয়ে নিজের ঘরের ছিদ্রগুলা সারানো কি বেয়াদবী? ধূমকেতু—

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

আদমস্মুমারী

সমগ্র ভারতে এবারকার লোকগণনায় প্রায় সাতলক্ষ হিন্দু কমিয়া গিয়াছে—অন্যদিকে ২০ লক্ষ মুসলমান বাড়িয়াছে। খৃষ্টানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির ত এই অবস্থা। পাঁচশত বৎসর পরে পৃথিবীতে হিন্দু জাতির চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার ধ্বংস অদূরবর্ত্তী; মৃত্যু তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া—পরপারের ডাক শুনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ ডাক শুনিয়াও আমরা শুনি নাই; রসাতলের শেষ ধাপে যখন নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, তখনও আমাদের চৈতন্য নাই!

বাঙ্গালী হিন্দুর ধ্বংসের লক্ষণ অনেক দিন হইতেই দেখা গিয়াছে। তাহার বৃদ্ধির হার বৎসরের পর বৎসর কমিয়া আসিতেছে; মৃত্যুর হার ভীষণ ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচে তাহার নমুনা দিলাম:—

সমগ্র বাঙ্গালার লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার—

১৮৭২—৮১	১৮৮১—৯১	১৮৯১—১৯০১
১১.৫	৭.৩	৫.১

১৯০১—১৯১১—এই দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ উঠিয়া—শতকরা ৮ জনে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত। ১৯১১—১৯২১ এর হিসাবে দেখা যাইতেছে—সমগ্র বাঙ্গালার লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ২.৮ জন। আসলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৮৭২ হইতে ১৯২২—মাত্র এই ৫০ বৎসরে বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার শতকরা ১১.৫ হইতে শতকরা ২.৮ জনে আসিয়া পৌছিয়াছে। যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির হার কমিতেছে—তাহাতে শীঘ্রই যে নীচের দিকে সংখ্যা নামিতে থাকিবে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু সমগ্র বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যার এই হ্রাস যে বাঙ্গালী হিন্দুর জন্যই ঘটিতেছে, এ বিষয়ে তর্ক করিবার কিছু নাই। উট পাখী শুনিয়াছি, বালির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আপনাকে লুকাইয়া রাখে। আমরাও যদি আজ সেইরূপ হাস্যকর ভাবে আত্মব্যাধি গোপন করিতে চেষ্টা করি—তবে কাল পুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বক্র হাস্য করিবেন। বাঙ্গালী হিন্দু যে ক্রমশঃ কমিতেছে, আর মুসলমানেরা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, তাহা এই ৫০ বৎসরের মোটামুটী হিসাব করিলেই জলের মত বোঝা যায়। আমরা জানি, প্রেমকাহিনী, গণিকাকাহিনী ও ডিটেকটীভ উপন্যাস-প্রিয় বাঙ্গালী পাঠকের চোখে সংখ্যাসংগ্রহ ব্যাপারটা বিভীষিকা। তবু জোর করিয়াও মরণ বাঁচনের কথাটা শুনাইতে হয়—শুনিতে হয়,—"রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন"।—

লোক গণনার ফল (মোটামুটী)

সাল	হিন্দু	মুসলমানের (সংখ্যা)	মন্তব্য।
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী।
১৮৮১	১৭২॥০ লক্ষ	১৭৯ ,,	মুসলমান ৬॥০ লক্ষ বেশী।
১৮৯১	১৮০ ,,	১৯৬ ,,	,, ১৬ ,,
১৯০১	১৯৪ ,,	২২০ ,,	,, ২৬ ,,

অর্থাৎ ১৮৭২ সালে বাঙ্গলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ বেশী ছিল। ৩০ বৎসর পরে ১৯০১ সালে সেই মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ২৬ লক্ষ বেশী হইয়া দাঁড়াইল।

১৯০১ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই ২০ বৎসরের হিসাব ধরিলে ব্যাপারটা চোখের উপর আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে :—

(মোটামুটী)

সাল	হিন্দু	মুসলমান	মন্তব্য
১৯১১	২০৯ লক্ষ	২৪২ লক্ষ মুঃ ৩৩ লক্ষ	বেশী
১৯২১	২০৮ লক্ষ	২৬৪ লক্ষ মুঃ ৪৬ লক্ষ	বেশী

দেখা যাইতেছে, পঞ্চাশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ৪৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, হিন্দুদের বৃদ্ধির হারই এতদিন কমিতেছিল। এই বার প্রকৃত পক্ষেই হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। যথাযথ সংখ্যা ধরিতে গেলে হিন্দুর সংখ্যা ১৯১১ সালে ছিল, ২০৯৪৫৩৭৯—আর ১৮২১ সালে হইয়াছে ২০৮০৯১৪৮ অর্থাৎ হিন্দুর সংখ্যা ১৩৬২৩১ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১২৪৮৮৯৬ অর্থাৎ প্রায় ১২॥০ লক্ষ।

নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ও মোহগ্রস্ত না হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদের আয়ুঃ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে ঠিক ঠিক গণিয়া বাহির করা যায়। জ্যোতিষার্ণবগণ হিন্দু জাতির একটা কোষ্ঠী রচনা করিয়া ফেলুন না; আর স্মৃতিতীর্থ, তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় যে যেখানে আছেন, ইতিমধ্যেই হিন্দুজাতির শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটাও করিতে থাকুন। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলী, এবং ঢাকার রাজভক্ত সারস্বত-সমাজের মুখপাত্রগণের পশ্চাতে আমরাও নিমন্ত্রণ খাইতে যাইব। পাঁচকড়ি বাবু তো' বুক ঠুকিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঠিক থাকিলেই বাঙ্গালী হিন্দুর আর মার নাই। তবে আর চিন্তা কি।

বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যুর ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যদি আমরা বাঙ্গলার বিভিন্ন বিভাগের লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির তুলনা করি। সকলেই জানেন—বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ এই তিন বিভাগ হিন্দু প্রধান।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ মুসলমান প্রধান। দেখা যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি ও রাজসাহী বিভাগেই লোক সংখ্যা কমিতেছে—আর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগেই অপেক্ষাকৃত বাড়িতেছে! বর্দ্ধমান বিভাগের অবস্থা এত শোচনীয় যে, এক হাওড়া ছাড়া ঐ বিভাগের সকল জেলাতেই লোক কমিয়া গিয়াছে,—বাঁকুড়ায়,—১০.৪; বীরভূম—৯.৪; বর্দ্ধমান,—৬.৫; এবং মেদিনীপুরে শতকরা—৫.৫ লোক কমিয়াছে। একমাত্র হাওড়ায় শতকরা, ৫,৬ লোক বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, হাওড়া জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী, আর বহু অ-বাঙ্গালী রেলওয়ে ও কারখানায় আসিয়া সেখানে শ্রমিকের কাজ করিতেছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগেও প্রায় সর্ব্বত্রই (যথা নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর) লোক কমিয়াছে। চব্বিশপরগণা ও কলিকাতায় লোক বাড়িয়াছে;—কিন্তু হাওড়ার ন্যায় এই দুই জেলার অবস্থাও বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য স্থান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রাজসাহী বিভাগের, পাবনা ও মালদহ জেলার লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। আর দুই একটী জেলায় বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু তাহা অতি সামান্য, ০.৬; ১.০; ৩.৭; এই রকম। শীঘ্রই যে ঐ সব জেলায় লোকসংখ্যা কমিতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একটী ভয়ের কারণ এই যে, রাজসাহী বিভাগে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া নারীর সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। লোকক্ষয়ের ইহা যে একটা পূর্ব্বলক্ষণ তাহা বিশেষজ্ঞেরা জানেন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী (যুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল)।

আমাদের কথা যে কাল্পনিক নহে, তাহা বাঙ্গলার বিভিন্ন বিভাগের বৃদ্ধির হার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে—

বিভাগ—	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
বর্দ্ধমান—	—৪.৯ (হ্রাস)
প্রেসিডেন্সি—	০.৪
রাজসাহী—	২.০
ঢাকা—	৭.১
চট্টগ্রাম—	৯.৮

আমরা জানি অনেক বুদ্ধিমান লোক বলিবেন যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের আবহাওয়া ভাল—ম্যালেরিয়া কম, ভূমি উর্ব্বরা—অতএব সেখানে লোক বাড়িতেছে, রাজসাহী, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়াই সেই সব স্থানে লোক কমিতেছে,—হিন্দু, মুসলমানের পার্থক্য কিছুই নাই। যুক্তিটা আপাততঃ মনোরম শোনা যায় বটে। কিছু কিছু সত্যও ইহার মধ্যে আছে। কিন্তু লোকগণনার সম্পূর্ণ বিবরণ পাইলে আমরা দেখাইয়া দিব যে বাঙ্গালার সকল বিভাগেই এমন কি

ঢাকা ও চট্টগ্রামেও—মুসলমানেরা বাড়িতেছে, আর হিন্দুরা কমিয়া যাইতেছে। একই দেশে বাস করিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন এই পার্থক্য? কেন হিন্দুজাতির জীবনী শক্তি এত কম—কেন তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে—কে এই কথার উত্তর দিবে? মরণ পথের যাত্রী, তোমরা কি অধঃপতনের মুখে দাঁড়াইয়াও একবার ফিরিয়া চাহিবে না; এ ঘোর অমানিশায় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-দীপ্তিকে একবারও জীবনের পথ দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিবে না?—

আনন্দ বাজার।

সন্তরণে কৃতিত্ব

অষ্ট্রেলিয়ার সন্তরণদক্ষ মিঃ টম্ মরিশ্‌কে সম্প্রতি হাত পা বাঁধিয়া টেম্‌সের ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ব্রিজ হইতে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ঐরূপ বন্ধনাবস্থায় সাঁতার কাটিয়া সেই স্থান হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে ক্লিওপেট্রাস্ নিডল্ নামক স্থানে নিরাপদে পৌছিয়াছিলেন।

মিষ্টার এল, পি, সোয়ান সম্প্রতি টেম্‌স নদীতে সাঁতার দিয়া ২৩ মিনিটে ৫ মাইল ৬০ গজ গিয়াছেন। মানুষ হাটিয়াও এত কম সময়ে এতদূর যাইতে পারে না।

গত জুলাই মাসে অপরাহ্নকালে গঙ্গা বক্ষে সন্তরণের এক প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় আহিরীটোলা সুইমিংক্লাব, আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, কলেজস্কোয়ার সুইমিংক্লাব ও বাগবাজার ক্লাবের কয়েকজন যুবক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একজন ফরাসী যুবতীও এই সন্তরণে প্রতিযোগিতা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে খড়দহের ঘাটে গমনও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে গঙ্গার ঘোলা জল দেখিয়া তিনি আর জলে অবতরণ করেন নাই। মোটের উপর ১৮ জন দেশীয় যুবক সন্তরণ দিয়াছিলেন।

খড়দহ হইতে আহিরীটোলার দূরত্ব ১৩ মাইল বা সাড়ে ছয় ক্রোশ। এবারে এই ১৩ মাইল পথ সন্তরণে গমন করিবার কথা হইয়াছিল। প্রায় একমাস পূর্ব্বে উত্তরপাড়া হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত সাত মাইল সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। সেই প্রতিযোগিতায় আহিরীটোলার শ্রীমান আশুতোষ দত্ত নামক একটি ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবারেও সেই আশুতোষই প্রথম হইয়াছে। এই ১৩ মাইল পথ সন্তরণে অতিক্রম করিতে তাহার দুই ঘণ্টা ৩৫ মিনিট মাত্র সময়

লাগিয়াছিল। আনন্দের বিষয় এই যে এই দীর্ঘ পথ সন্তরণ দিয়াও আশুতোষ ক্লান্ত হয় নাই।

বেলা ২টার সময় খড়দহ হইতে সন্তরণ আরম্ভ করিবার কথা ছিল, কিন্তু তখন জোয়ারের বেগ প্রবল থাকাতে এক ঘণ্টারও অধিককাল সকলকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। বেলা ৩টা ৫ মিনিটের সময় সন্তরণ আরম্ভ হয়। বেলা ১টার পর হইতেই, এই সন্তরণে প্রতিযোগিতা দর্শন করিবার জন্য গঙ্গার উভয় তীরে লোক সমাগম আরম্ভ হয় এবং ৪টার সময় উভয় তীরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

সন্তরণপটু যুবকগণ "সাইকিক" নামক একখানি ষ্টিমারের উপরে অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতা বন্দরের ডেপুটি হার্ব্বার মাষ্টার মিঃ রবিন্স সঙ্কেত করিবা মাত্র সকলে একযোগে জলে ঝম্প প্রদান করেন। প্রায় আধ মাইল পথ সকলে এক সঙ্গে গমন করেন, কিন্তু তাহার পর ৮জন অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে এই আটজন এতদূর অগ্রসর হইলেন যে তাঁহারা আর পশ্চাৎবর্ত্তী যুবকগণকে দেখিতে পান নাই। প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিবার পর তাঁহারা শিবতলার ঘাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রবল বাতাসে গঙ্গাবক্ষে অত্যন্ত তরঙ্গ হইয়াছিল। এজন্য যুবকগণকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সেই তরঙ্গে সন্তরণ কালে শ্রীমান্ আশুতোষ এক মুহূর্ত্তের জন্যও জল মধ্যে মস্তক নিমজ্জিত করে নাই। ৫টা ৪০ মিনিটের সময় আশুতোষ, তাহার ৮ মিনিট পরে দুর্গাচন্দ্র মিত্র এবং ধীরেন্দ্রনাথ রায় যুগপৎ এবং তাহার পরে বি, বসু আহিরীটোলার ঘাটে উপস্থিত হয়েন। ১৮জনের মধ্যে ৯জন এই ১৩ মাইল সন্তরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সন্তরণকারীদিগের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমার, নৌকা প্রভৃতি গমন করিয়াছিল। একখানা নৌকায় ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। অন্য একখানা নৌকায় একজন চিকিৎসক ঔষধাদি লইয়া গমন করিয়াছিলেন একজন যুবক আহিরীটোলার ঘাটে উঠিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। চিকিৎসক মহাশয় অচিরে তাঁহাকে সুস্থ করেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে সমুদ্রে সাতার দিয়াও খুব বাহাদুরী নিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জাবিজ ওল্প নামক একব্যক্তি ডোবার প্রণালী সন্তরণ সাহায্যে পার হইতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনেক বিপদ অতিক্রম করিতে হয়। কেবলমাত্র দুইবার ডোবার প্রণালী সন্তরণ সাহায্যে পার হওয়ার কথা শুনা যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট ক্যাপ্টেন আয়েব ২১ একুশ ঘণ্টা ৪৫ পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ডোবার প্রণালী পার হইয়া ফ্রান্সের তীর ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত ঘণ্টায় ১৬॥০ সাড়ে ষোল মাইল সাঁতরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডবলিউ, টিমারণেণ নামক আর একব্যক্তি ১৪।১৫ চৌদ্দ পনের বার অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে

৬ই সেপ্টেম্বর সাউথ চোরল্যাণ্ড হইতে গ্রীসনেজ অন্তরীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন আয়বের সফলতা দেখিয়া অনেকেই ডোবার প্রণালী পার হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জারিজ ওল্ল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী ছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম চেষ্টা করেন। ৯॥০ সাড়ে নয় ঘণ্টা তিনি জলের মধ্যে ছিলেন, এই সময়ে ফ্রান্সের তীরভূমিতে চারি মাইলের মধ্যে আসিয়াছিলেন। পর বৎসরে চারিবার চেষ্টা করেন, একবার গ্রীসনেজ অন্তরীপ হইতে এক মাইলের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তাঁর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একজন অষ্ট্রেলিয়ান মহিলা পার হইতে চেষ্টা করেন, ফ্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া ২০ কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত সন্তরণ করিয়াছিলেন। ১৯১৩খৃষ্টাব্দে মিস কেল্লারম্যান নাম্নী আর একজন মহিলা ৬ ছয় ঘণ্টা সাঁতরাইবার পর সামুদ্রিক পীড়া হেতু সাঁতার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অন্ন সমস্যা ও কৃষি

সাধারণ কৃষকগণ যে পরিমাণ জমি চাষ করে অধিকাংশ স্থলেই তদনুপাতে তাহার পরিবারের সংখ্যা অধিক। তদুপরি মহাজনের ঋণের দায়ও লাগিয়াই আছে, কাজেই তাহার আর্থিক অবস্থার বড় একটা পরিবর্ত্তন সহজে ঘটে না। কৃষিপ্রণালীর কোন প্রকার উন্নতি করিবার ইচ্ছা বা সামর্থ অনেক স্থলে দেখা যায় না। কাজেই ইহাদের অবস্থা দৃষ্টে কৃষি কার্য্যের লাভালাভ সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। আজকাল আরও একটী বিষয় শিক্ষিত লোকদের নিকট কৃষির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষির উন্নতিকল্পে নানা স্থানে Experimental Farm স্থাপিত হইয়াছে। তাহার আর্থিক আয় ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় ব্যয়ের মাত্রাই অধিক ইহাতেও অনেকে কৃষি সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব কৃষি-আগার নানা প্রকার গবেষণা (Experimental) করিবার জন্যই স্থাপিত। ঐ সব গবেষণা দ্বারা কোন সুফল লাভ হইলে তবে যাহাতে সাধারণ লোকেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া প্রচুর ফল লাভ করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্যই এই সব Experimental Farm স্থাপিত। এই সব Farm এর বার্ষিক খরচের উপর দৃষ্টি না করিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব নিলে তবে তাহা সাধারণের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য কি না তাহা স্থির করা যায়।

একটু হিসাব করিয়া দেখিলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে সকল প্রকার ফসল হইতেই যথেষ্ট লাভ থাকে। অতএব ব্যবসায় হিসাবেও ইহা নিকৃষ্ট নহে বরং—এত লাভের হার অনেক কম ব্যবসাতেই আছে। উপরি লিখিত হিসাবে সাধারণ প্রনালীর চাষের হিসাব দেওয়া হইল। কলকজাদির উন্নত প্রণালীতে চাষ করিলে খরচের হারও অনেক কমিয়া যাইবে অথচ উৎপন্ন চাষেরপরিমাণও বৃদ্ধি হইবে।

সুবিধাজনক স্থান নির্ব্বাচন করিলে বৎসরে ২।৩টী ফসলও পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্য্যে কতকগুলি নৈসর্গিক বাধা বিঘ্ন আছে বটে কিন্তু শিক্ষিত সমাজ কৃষিকার্য্য গ্রহণ করিলে এই সব অন্তরায় যথা—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা শস্যের হানি অনেকটা কমাইতে পারে। একেবারে বাধা বিঘ্ন নাই এরূপ কোন ব্যবসা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কাজেই তাহা বলিয়া কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, কার্য্যে অগ্রসর হইলে বাধা বিঘ্ন দূর করিবার ব্যবস্থাও হয়।

তাই বলিতেছিলাম, কেবল চাকুরীর মোহে না চলিয়া শিক্ষিত যুবকগণ কৃষি কার্য্য করিলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় (সম্মিলনী।)

বিদেশ বাণিজ্যে ভারতের দশা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবে Indian Fiscal Commission বসিয়াছিল এবং বোম্বাই-এর স্যার এব্রাহিম রহিমতুল্লা হইয়াছিলেন তাহার সভাপতি। কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে বিলম্ব আছে।

এখন কথা হইতেছে, প্রধানতঃ ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যাপারে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে?—Free Trade অর্থাৎ অবাধবাণিজ্য, যাহাতে আমদানি রপ্তানির উপর বিশেষ কোন শুল্ক বসে না,—কিম্বা Protection অর্থাৎ রক্ষণশীলতা যাহাতে দেশীয় ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসে এবং বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ হইয়া দেশে সেই জিনিষ তৈয়ারী হইবার ব্যবস্থা হয়? আমার দেশ, শিল্প-বাণিজ্যে বড় হইবে, কর্ম্মকুশল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি দেশে প্রস্তুত হইবে, স্বদেশী ব্যক্তিগণ অন্নবস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইবে না; দেশের ধন দেশে থাকিবে, চিন্তাশীল স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি মাত্রেই ইহা ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আজ কি লজ্জাকর অবস্থা—

"আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক তবে দিগম্বর সাজ,
বাকল-টেনা ডোর-কপিন ?
ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

বিনিময় প্রথা হইতেই ব্যবসার উৎপত্তি। আন্তর্জাতিক ব্যবসার মূলেও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও অবাধ বিনিময়—একজনে অন্যের নিকট হইতে তাহার নির্ম্মিত দ্রব্য দিয়া নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে।

আমাদের বাঙ্গালা দেশ পাট তৈয়ারী করে। বোম্বাই বস্ত্র প্রস্তুত করে। ধরুন, বোম্বাইএর পাট দরকার, বাঙ্গালায় বস্ত্রের প্রয়োজন। এখন বাঙ্গালা কি পাট ছাড়িয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিবে, না বোম্বাই পাট বুনিতে আরম্ভ করিবে ? সেইজন্য বাঙ্গালা বোম্বাইকে পাট বিক্রয় করিবে, এবং বোম্বাই বাঙ্গালাকে বস্ত্র পাঠাইবে। ইহাতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু যখন বাঙ্গালা ইংলণ্ডকে পাঠ পাঠায় এবং ইংলণ্ড পরিবর্ত্তে ম্যানচেষ্টারে তৈয়ারী কাপড় পাঠায়, তখনই আমরা আপত্তি করি। দেশের ধন বিদেশ গেল। বিলাতের জিনিস আনা বন্ধ কর।

অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ বলেন, অবাধ-বাণিজ্য বন্ধ করিও না। বিলাত যদি কম দামে কাপড় তৈয়ারী করিতে পারে করুক, ভারতবর্ষের তাহা লওয়া উচিত, তাহার আমদানী বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বোম্বাই ও বাঙ্গালার মধ্যে অবাধ বিনিময় যেমন ভাল, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ। প্রাদেশিক ব্যবসায়ে যে কথা খাটে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সেই কথা খাটে। তাহার ব্যতিক্রম করিতে গেলে শ্রমবিভাগ ও বিনিময়-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

অর্থনীতি-শাস্ত্র মতে কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু কেবল নীতিশাস্ত্র দেখাইয়া কোন জাতির এই সভ্য পৃথিবীতে বাঁচা বড় কঠিন। যুদ্ধের মত নৃশংস ব্যাপার ত আর নাই। বিশ্বব্যাপী শান্তিই সকলের চেয়ে ভাল। তাই বলিয়া কি দেশ-প্রেমিক কর্ম্মবীর বলিবেন যে সৈন্যসামন্ত পুলিশ পাহারা সব এখনই বরখাস্ত কর ? অন্য সব জাতি কিন্তু লোলুপ দৃষ্টিতে সঙ্গীন উঁচু করিয়া রহিল। সেই রকম পৃথিবীর অন্য সব জাতি অবাধ-বাণিজ্য ছাড়িয়া রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিল, নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া আমদানি-রপ্তানির উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইল, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্য সব তাহাতে নষ্ট হইয়া গেল, আর ভারতবর্ষ কি কেবল অর্থ-নীতির দোহাই দিয়া, মার্শাল্ পিগু আওড়াইয়া

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে? ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্য ইংলণ্ডের সুবিধা, আমেরিকার সুবিধা, জাপানের সুবিধা। তাহারা পৃথিবীতে এমন সুবিধার জায়গা আর পায় না। অধ্যাপক লিস্ স্মিথ বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ইংলণ্ডের কেবল এখন একটি "open market" বা খোলা বাজার আছে—সেটি হইতেছে এই দুর্ভাগ্য দেশ।

কিন্তু পাছে ইংলণ্ডের বা অন্য পাশ্চাত্য জাতির ক্ষতি হয় সেইজন্য সর্ব্বভূতে দয়াশীল নরণারায়ণ বিশ্বাসী ভারত কি আজ আপন ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিবে? গত শতাব্দীর ইতিহাস দেখুন, ইউরোপের এমন একদিন গিয়াছে যে, এই ভারতবর্ষই ইংলণ্ডকে কাপড় পাঠাইয়াছে; আর আজ ইংলণ্ড হইতে ৮১ কোটী টাকার সূতার জিনিষ আনিয়া ভারতবর্ষ লজ্জা নিবারণ করিতেছে। আজ আমাদের যেরূপ অবস্থা একশত বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানীরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। জার্ম্মানীর সর্ব্ব প্রধান অর্থ-নীতিবিদ্ লিষ্ট লিখিয়াছিলেন—জার্ম্মানী কেবল খাবার জিনিস এবং কাঁচা মাল (raw materials) রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত দ্রব্য (mannfactured goods) বিদেশ হইতে আমদানী করে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত জাতীর সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আজ ভারতবর্ষের সেই রকম অবস্থা। ভারতবর্ষের প্রধান রপ্তানির মাল হইতেছে—

(১৯২০-২১ সাল)

(১) পাট	৬৯	কোটি টাকা	শতকরা	২৯
(২) তুলা	৬০	"	"	১৭
(৩) চাউল গম প্রভৃতি	২৫॥০	"	"	১১
(৪) চামড়া	৮॥০	"	"	৪
(৫) চা	১২	"	"	৫
(৬) বীজ	১৭	"	"	৭
(৭) গালা	৭॥	"	"	৩
	১৯৯॥			৭৬

এইগুলিতেই প্রায় আমাদের রপ্তানির বার আনা জিনিষ হইয়া যায়—মোট রপ্তানি ২৩৮ কোটি টাকার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা। আর আমাদের আমদানী প্রধানতঃ—

(১৯২০-২১ সাল)

(১) সূতার জিনিষ	১০২	কোটি টাকা	শতকরা	৩০
(২) লোহা এবং ইস্পাত	৩১	"	"	৮
(৩) কল কব্জা	৩১	"	"	৭
(৪) চিনি	১৮॥	"	"	৬
(৫) রেলওয়ের জিনিসপত্র	১৪	"	"	৪
(৬) লোহার জিনিস	৯	"	"	৩
(৭) খনিজ তৈল	৮	"	"	২
(৮) রেশম	৭	"	"	২
	২০৩॥			৬২

এই আটটী জিনিসেই আমাদের আমদানীর প্রায় দশ আনারও উপর হয়। মোট

আমদানি দ্রব্যের দাম ৩৩৫ কোটী টাকা—এই আটটীতে ২০৩॥০ কোটী টাকা খরচ হয়।

এই আমদানী মালগুলির বেশীভাগই শিল্পজাত দ্রব্য। আর রপ্তানি অধিকাংশই খাদ্যদ্রব্য বা কাঁচা মাল—যাহা বিদেশ হইতে নিপুণ শিল্পীর হাত ঘুরিয়া আবার দেশে ফিরিয়া আসে ;—দেশ হইতে যাইবার সময় যায় সস্তাদরে—আসিবার সময় দাম হয় তাহার বহুগুণ।

এই রকমে কিছুদিন চলিলে লিষ্ট জার্ম্মানীর পক্ষে যাহা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষেও তাহাই হইবে—এই জাতীয় সর্ব্বনাশ হইবে ; শ্রমশিল্পের কখনও উদ্ধার হইবে না। বিদেশী শিল্পীর জন্যই ভারতবর্ষ কেবল কাঁচা মাল তৈয়ারী করিবে এবং পুনরায় সেই জিনিসই দ্বিগুণ দামে কিনিবে। দেশেরই চামড়া বিলাতে গিয়া tanned হইয়া ফিরিয়া আসিবে, লাভটা লইবে বিদেশীরা। লিষ্ট যাহা জার্ম্মানীকে এক শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষকে এখন তাহাই করিতে হইবে—to make her economic progress in the face of the overwhelming industrial supremacy of Great Britain"—অর্থাৎ শ্রমশিল্পে সমুন্নত গ্রেট ব্রিটনের সম্মুখে তাহার অর্থ নৈতিক উন্নতি করিতে হইবে। জার্ম্মানির পক্ষে ইহা যেরূপ দুরূহ ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা এখন তাহা অপেক্ষা বহু কঠিন। কারণ জার্ম্মানী ছিল স্বাধীন, ভারতবর্ষ পরাধীন—আবার যে জাতি শিল্প-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাকে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে তাহারই অধীন। এই কথা গোপন করিয়া, সত্যকে বিকৃত করিয়া, আমলাতন্ত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া, কোন লাভ নাই। জার্ম্মানির অপেক্ষা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নিকট ব্যবসায় বাণিজ্যে অনেক বেশী পরাধীন। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতেই দেখাযায় যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ভারতবর্ষের সমস্ত আমদানীর মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের যদি গড়-পড়তা হিসাব করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ভাগ হয় শতকরা ৬৩, অর্থাৎ মোট ১৪৬ কোটি টাকার আমদানীর মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে আসিত। যুদ্ধের কয় বৎসর ইংলণ্ডের ভাগ কিছু কমিয়া যায়। ১৯১৭-১৮ সালে ৫৪%, ১৯১৮-১৯ সালে ৪৬%, ১৯১৯-২০ সালে ৫১%। আবার গত বৎসর খুব বাড়িয়াছে। নূতন Trade Review বা বাণিজ্য সমালোচনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৯২০-২১ সালে ইংলণ্ডের অংশ বাড়িয়া প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্ব অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—শতকরা ৬১ ভাগ বিলাতী জিনিস। ঐ বৎসর আমদানীও ভয়ানক বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী ছিল প্রায় ১৫০ কোটি টাকা, গত বৎসর হইয়াছে ৩৩৫ কোটি টাকা ; তাহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকারও উপর ইংলণ্ডের জিনিস। আমদানী রপ্তানী দুই ধরিলেও ইংলণ্ডের ভাগ হইতেছে শতকরা ৫৬, যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ৫২।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষের উপায় কি ? লিষ্ট জার্ম্মানীকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন,

এবং জার্ম্মানী যাহাতে বাঁচিয়া গেল, এই দেশেরও সেই পথে যাওয়া উচিত। সেটি হইতেছে—"A reasoned policy of protection"—অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক রক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা। জর্ম্মানীর Zollverin বা শুল্ক-যৌথ এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও আশা করি যে এক শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের Fiscal Commission সেই পথ নির্দ্দেশ করিবেন।

আরো একটা কথা। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বরাজ কেবল রাষ্ট্রীয় অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে এই দেশের প্রয়োজন তাহা নয়। জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, বাণিজ্যলক্ষ্মীকে দেশমাতৃকার সিংহাসন পার্শ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবল প্রতাপশালী অসীম কার্য্যকুশল অপূর্ব্ব কর্ম্ম-যোগী পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংঘর্ষণের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বীয় স্থান অধিকার করিতে হইলে স্বরাজ একান্ত আবশ্যক। মহামতি রাণাডের কথাগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকা উচিত।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—কেবল Protection বা রক্ষণশীলতায় কোন জাতি বড় হইতে পারে না। বিদেশী আমদানি বন্ধ করিবার এবং নিজের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিবার একটা উপায় বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসান। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের উপরই খুব উচ্চ হারে শুল্ক বসাইলেই যে দেশের উন্নতি হইবে তাহার কোন অর্থ নাই—ইহাতে কেবল জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবে। আর গরীব লোক মারা যাইবে। প্রথম দেখিতে হইবে সে জিনিষ দেশে তৈয়ারী হইবার সুবিধা আছে কি না, তাহার জন্য যে সব মাল মশলা দরকার তাহার কতটা দেশে আছে, সেই শিল্পের উপযোগী শ্রমজীবী পাওয়া যাইবে কি না, এবং কিরূপ খরচে তাহা তৈয়ারী হইবে ও বিদেশী জিনিষের অপেক্ষা দাম কত বেশী পড়িবে। এইস্থানে ইংরাজ অর্থনীতিজ্ঞ আডাম স্মিথের কথাটি মনে রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে খুব বেশী শুল্ক বসাইয়া আর দাম খুব বেশী বাড়াইয়া সব জাতীই প্রায় প্রত্যেক জিনিষই তৈয়ারী করিতে পারে। উদাহরণ দিয়াছিলেন যে স্কটল্যাণ্ডে ভাল মদ তৈয়ারী হয় না, কিন্তু কাচের ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার ভিতর আঙ্গুর জন্মাইয়া অন্য দেশের অপেক্ষা ত্রিশ গুণ বেশী খরচ করিয়া স্কটল্যাণ্ডে খুব ভাল মদ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। (Wealth of nations, vol. 1, Book 1V, Ch. 11 P, 23) ভারতবর্ষেও হয়ত খুব বেশী খরচ করিলে এখনকার আমদানীর অনেক জিনিষ তৈয়ারী করা যায়। তাই বলিয়া কি সব বিদেশী পণ্যের উপর কর বসান ঠিক? তাহাতে ফল হইবে বিপরীত—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নষ্ট হইবে, আমদানী বন্ধ হওয়ার সহিত রপ্তানীও বন্ধ হইবে, কিংবা জিনিষের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত শুল্কভার বহন করিয়াও বিদেশী দ্রব্য আসিবে এবং তাহার দাম সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য জাতিরা রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিল্পোন্নতির অন্য কারণও ছিল—প্রধান হইতেছে স্বাধীনতা। ইংলণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেখিলেন যে ভারতীয় সূতার জিনিষের সহিত কিছুতেই সমকক্ষ হইতে পারিতেছেন না। ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলসন্ বলিয়াছেন যে ভারতের প্রস্তুত সূতা এবং পশমের জিনিষ ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যের অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম দামে বিলাতে বিক্রয় হইত। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, কি করিলেন? ভারতীয় জিনিষের উপর শতকরা ৮১ টাকা শুল্ক বসাইলেন এবং ভারতবর্ষে বিলাতী আমদানীর উপর নামমাত্র ২॥০ টাকা শুল্ক রাখিলেন। ফলে এই হইল যে ভারতীয় শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিছুদিন পরে শুল্কগুলি তুলিয়া লওয়া হইল, কিন্তু তখন ভারতীয় শিল্পগুলির সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

"এই রকম উচ্চহারে শুল্ক না বসাইলে পেস্‌লি বা ম্যান্‌চেষ্টারের কলগুলি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়া যাইত, আর কখনও চলিত না। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের উপর হইল তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষও ইংলণ্ডীয় পণ্যের উপর বিনিময়ে খুব উচ্চ শুল্ক বসাইয়া ইংলণ্ডকে শিক্ষা দিতে পারিত। কিন্তু বিদেশীর কবলে বলিয়া তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে দেওয়া হইল না। জোর করিয়া ব্রিটিশ জিনিষ ভারতের উপর বিনা শুল্কে চাপান হইল এবং বিদেশী বণিক রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের দ্বারা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপিয়া খুন করিল।

ভারতে নষ্ট শিল্পের উদ্ধার কেবল অর্থনীতির দ্বারা হইবে না—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও চাই। শুদ্ধ রক্ষণশীলতা কিছু করিতে পারে না, নিজের মতে কাজ করিবার ক্ষমতাও চাই।

জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার

মানব জগতের সহিত উদ্ভিদ্-জগতের জীবনের অভিব্যক্তি বিষয়ে যে গূঢ় সম্বন্ধ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এতাবৎকাল আবিষ্কারে অসমর্থ ছিলেন, পদার্থ-বিজ্ঞান-কেশরী বঙ্গের কৃতী সন্তান ভারত-গৌরব স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনন্যনিষ্ঠা সাধনার ফলে সে তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া সমগ্র জগতে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। জগদীশ চন্দ্র এই সমস্ত নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের জন্য যে যে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন সে সমস্ত যন্ত্রও তাঁহার উপদেশে ও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ভারতীয় শিল্পী

দ্বারা নির্ম্মিত হইতেছে। ঐ সমস্ত যন্ত্র সমূহও অতিশয় আশ্চর্য্য শক্তিশালী। উদ্ভিদের স্নায়ু-কেন্দ্রের অতি সূক্ষ্মতম স্পন্দন পর্য্যন্ত এই সমস্ত যন্ত্র সাহায্যে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায়। ইঁহার ক্রেস্কোগ্রাফ বা বৃদ্ধিমান নামক যন্ত্রটি ইউরোপে ও আমেরিকায় ইউরোপে ও আমেরিকায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী হইতে এই যন্ত্রের বহু গ্রাহক হইয়াছেন। এই যন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেনঃ—

"প্রথমতঃ গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে, তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধি গতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ, এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নামকে স্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধি-মাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ করা যায়। যেখানে অনুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের গতি লক্ষ গুণ বেশী। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাঙ্গালা নাগপুর ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীর দৌড় হইয়াছিল কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক সম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কো-গ্রাফের উপর আরোহন করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ী বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।"

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র এই যন্ত্রের নামকরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া বৃদ্ধিমান রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ এই সকল নাম কিম্ভূত-কিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বষ্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; সম্পাদক লেখেন যে "যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটীন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে! তাহা যদি হয়, তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?" বলপূর্ব্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গত বারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল "কাঞ্চনম্যান" সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে—হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মত কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম; হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে ইহার কোন একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত যথেচ্ছা উচ্চারণ করা যাইতে পারে; কেবল হয় না ঋ ও ৯। তাহার উপরে কিম্বা নীচে দু একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

"সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করান যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত বলান একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই আমাদের হরিকে হ্যারি হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের বুদ্ধিমান নামকরণের ইচ্ছা একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমান, তাহা হইলে বারডোয়ান হইত। তার চেয়ে আহেলা ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।" (অব্যক্ত ২০৫-৮ পৃষ্ঠা)

জগদীশ চন্দ্র উদ্ভিদ্ জীবন সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তথা বৃক্ষের রসগ্রহণ। বৃক্ষ মূলের দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে তাহা ঊর্দ্ধতম শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চারিত করে এ তথ্য এতদিন বিজ্ঞান জগতে অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি ভারতীয় আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র যন্ত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদ্ মূলের দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া দেহস্থ বহু কোষাণুর দ্বারা ঐ রস উর্দ্ধে সঞ্চারিত করে। একটী কোষাণুর Cell আর একটী কোষাণুর নিকট গৃহীত রস সমর্পণ করে, সেটী আবার অপর একটী কোষাণুর নিকট উহা সমর্পণ করে—এইরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ রস অতি দীর্ঘকায় বৃক্ষের শীর্ষদেশে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই নিয়মেই বৃক্ষের সর্ব্বশরীরে রস সঞ্চার হইয়া থাকে। যন্ত্রসাহায্যে এই প্রক্রিয়া অতি আশ্চর্য্যরূপে সপ্রমাণে সমর্থ হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর বৃক্ষজীবনের আর একটী তথ্যও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইনি বহুদিন হইতে উদ্ভিদ-জীবন যেন সর্ব্বাংশে মানব জীবনেরই অনুরূপ ইহা বলিয়া ও সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছেন। সুখ দুঃখ উন্মাদনা ইত্যাদি অনুভূতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের একটী ধারণা ছিল যে Carbonic acid gas (অঙ্গার বাষ্পজান বায়ু) উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী এবং উদ্ভিদেরা পত্র দ্বারা ঐ বায়ু গ্রহণ করিয়াই শরীর পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু জগদীশ চন্দ্র এই বিশ্বাস যে মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি যন্ত্রসাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে Oxygen (যবক্ষার জান) বায়ু প্রাণিগণের পক্ষেও যেরূপ হিতকর, উদ্ভিদাদির পক্ষেরও তাদৃশ হিতকর। উদ্ভিদ্গণ ইহার অভাবে ম্রিয়মাণ হয় এবং অঙ্গারবাষ্পজানযোগে বিশেষরূপ কষ্ট অনুভব করে। অনুপম প্রতিভাশালী জগদীশচন্দ্রের এই তথ্য জগতে প্রচারিত হইলে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের একটী প্রধান (theory) অনুমান এবার পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

শ্রদ্ধেয় জগদ্বরেণ্য আচার্য্যের এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যুগপৎ ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে প্রচারিত হইবে। জগদীশ চন্দ্র জীবন ধারারূপ "ভাগীরথীর যে উৎস সন্ধানে" ধাবিত হইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদরূপ জয়মাল্য লাভ করিতেছেন, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার সেই অনুসন্ধান কার্য্য সম্পূর্ণ ও সফল করুন।—

হিতবাদী।
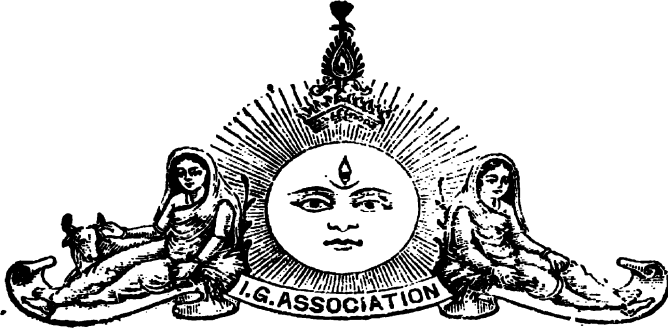
২৩ খণ্ড { কৃষক—ভাদ্র, ১৩২৯ সাল } ৫ম সংখ্যা

সেকালের পূজার খরচ

এখনকার কালে দেশে দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবা উপায় নাই। জীবনযাত্রা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অহর্নিশ "ত্রাহী মধুসূদন" ডাকিতেছে, প্রাণ সকলেরই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য আমরা অপর দেশের কথা বলিতেছি না। হয় ত তুলনায় ভারতের বাহিরে দ্রব্যাদির মূল্য আরও অধিক হইতে পারে, কিন্তু ভারতের দারিদ্র্যের অনুপাতে, ভারতের নিত্য অভাব অনাটনের অনুপাতে, এ দেশের সহিত অন্য দেশের মূল্য বৃদ্ধির তুলনা করা যায় না। এ দেশে লোকের গড় পড়তা আয়ের সহিত অপর দেশের আয়ের তুলনা হইতে পারে না। এ দেশের মৃত কল্প শিল্প বাণিজ্য প্রতীচ্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং শিল্প বাণিজ্যের প্রকৃত অভাবে—কেবল কৃষি ও কৃষিজাত কারকারবারে যে ধনাগম হয়, তাহা প্রতীচ্যের কোটিপতির ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়ের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এ দেশের লোক অল্প বিস্তর ব্যবসায় বাণিজ্যে মন দিতেছে বটে, কিন্তু এদেশে ব্যবসায়ে লাখ দুলাখ টাকা নিয়োগ করাটাই মস্ত কথা। আর প্রতীচ্যে? সে তুলনা না করাই ভাল।

বাঙ্গালার কথাটাই ছোট করিয়া ধরা যাউক না। বাঙ্গালীর মুখে আগে যে হাসি দেখিয়াছি, এখন আর তেমন প্রাণ খোলা হাসি দেখিতে পাই না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অস্বাস্থ্য ও অভাব। বাল্যকালে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দুর্গা পূজায়

যে আনন্দ, যে স্বচ্ছলতা, যে প্রফুল্লতা দেখিয়াছি, এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। আমাদেরই স্বগ্রামে, বসিরহাটের পার্শ্ববর্ত্তী দণ্ডীর হাট গ্রামে, আমাদের বাটীতে যে দুর্গোৎসব দেখিয়াছি, এখন তেমনটী দেখিতে পাই না। কেন পাই না, তাহার কারণ অন্বেষণ করা, Economic গবেষণা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল সে সময়ের ও এসময়ের অবস্থার তারতম্যের কথা উল্লেখ করিতেছি।

তাহারও পূর্ব্বে ১২৫৬।৫৭ সনে, ইংরেজী ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭০।৭২ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা আরও স্বচ্ছল ছিল। গৃহস্থের গোলা ভরা ধান, বাগান ভরা তরকারী, পুকুর ভরা মাছ এবং গোয়ালভরা গাভী, কবির কল্পনা নহে। এ সব ত আমরা বাল্যকালেই দেখিয়াছি। কেবল আমাদের ঘরে নহে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশকাদি প্রত্যেক গৃহস্থেরই দেখিয়াছি। তাহার পূর্ব্বে পল্লীগৃহস্থের কিরূপ অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল এবং কিরূপ অল্প ব্যয়ে বৃহৎ ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত, আজ তাহার যৎসামান্য পরিচয় দিব।

বস্তুতঃ আমি ১২৫৬ সনের একখানি খরচের খাতা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। খাতাখানির কাগজ, মলাট, কালির অঙ্কপাত সকলেরই দেশী উপকরণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা, এই ৭২ বৎসরের পুরাতন কাগজ এখনও সে দিনের কাগজ বলিয়া ভ্রম হয়। কালির দাগ এখনও সজীব রহিয়াছে। কি উপকরণে তখন এমন মজবুত ও কাল-সহ কালি প্রস্তুত হইত, তাহাই বোধ হয়, এখন এ দেশের অনেক লোক জানে না।

এই খাতাখানিতে ৭২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঘরে দুর্গোৎসবের খরচের হিসাব আছে। পূজার সময় দ্রব্যাদির মূল্য স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বহু দ্রব্য কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে দণ্ডীর হাটে লইয়া যাইতে হইত; সে হিসাবেও যে মূল্যের হিসাব এই খাতা হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে, উহা সাধারণ বাজার মুল্য নহে। তাহা হইলেও হিসাবটা একবার দেখুন আর একালের সহিত মিলাইয়া হা হুতাশ করুন:—

(ক) ফল মুলাদি :—

৯৭টা ঝুনা নারিকেল	১৲	ছয় পণ কাঁটালি কলা	।৶১০
২০টা ডাব নারিকেল	।০	দুই পণ মর্ত্তমান কলা	।৵১০
৭টা চাল কুমড়া	⁄১৫	৩০ গাছ আক	৷⁄০
৪টা প্রকাণ্ড মানকচু	৵০	৪টা আনারস	৶
⁄৮ সের পটল	।০	⁄৩ সের পানিফল	⁄১০
১৪টা বাতাবিলেবু	৵১০		

(খ) বেণে মশলা :—

সুপারি /২ সের	।১০
ছোট এলাচ /০ ছটাক	৶১০
বড় ঐ ।০ পোয়া	৵১০
ধনের চাউল /১ সের	/১০
দারুচিনি /০ ছটাক	/০
খদির /১ সের	৵০
লবঙ্গ ৵০ আধপোয়া	/১০
কর্পূর / এক ছটাক	/১৫
জিরে ৸০ পোয়া	৶০
মরিচ ৸০ পোয়া	৶০
সার চন্দন ।৵০পোয়া	৶০
রক্তচন্দন ॥০ সের	/৫

(গ) খাদ্যদ্রব্য :—

চিনি /৪ সের	৸০
ময়দা ॥০ মন	১।৵
গব্যঘৃত /৭॥ সের	৩৲
সর্ষপ তৈল ।৪ সের	২৲
লবণ /৮।০ সের	৸০
দুগ্ধ ।৭ সের	১৲
বালাম চাউল ১/ মণ	১/০
পূজার জন্য ঘৃত /৫॥০	২৲
অন্য বাবদে ঐ /৩॥ সের	১॥০
গুড় /৪ সের	/১০
মধু /২॥ সের	৶১৫
মিছরি /৩॥ সের	১৲

(ঘ) মিষ্টান্নাদি :—

সন্দেশ ।০ সের	৩৲
মিঠাই /৭॥০ সের	১৲
খাসা দধি ॥০ মণ	৸৵
ওলা /৩।	১৲

(ঙ) শস্যাদি :—

আতপ তণ্ডুল প্রস্তুতের জন্য ৮ আড়ি ধান্য	৪৲
খই প্রস্তুতের জন্য ১ আড়ি ধান্য	॥০
চিঁড়া প্রস্তুতের জন্য ১ আড়ি ধান্য	।/০
ছোলা /৫ সের	৵১০
কাল কলাই ১/মণ	॥৶৫
মুগ কলাই ॥০ মণ	॥৵১০
অড়হর কলাই ॥০ মণ	৸/০
খেঁসারী কলাই ।০ সের	।০
ছোলা দাইল ।৫ সের	।৵
সাদা বুট /৭॥ সের	।/০
বরবটি /২ সের	/১৫

(চ) কুমার সজ্জা :—

কলিকা ২৫টা	৲১০
প্রদীপ ২৫টা	৲১০
বড় খুলি ১০০ খানা	৵১০
খুরি ২০০	৵০
কলসী ৫টা	/৫
ভড়রী ১১টা	৵০
তিজেল হাড়ি ১৬টা	/১৫
মালসা ২৫টা	৲১৫
মালসা ৪০টা	৲১৫
সরা ৪০ খানা	৲১৫
টাটি ১৫০	/১৫
ধামা ৪টা	।৶০
চেঙ্গারী (ওড়া) ২ খানা	৵১০
দাঁড় /৫ সের	।৵

(জ) স্বর্ণ রৌপ্যাদি :—

সোনা ভরি	১৪৲
ঐ মজুরি ৸০ আনা হইতে ১।০ পর্য্যন্ত	
৩ খানা সভারিণ ॥৶ ওজন হিঃ দর ১০৲ হিঃ	৩০৲

(ঝ) বস্ত্রাদি :—

দেশী তাঁতের ১০ হাত

প্রমাণ শাটী ১ খানা	॥৶০
৮ হাত ঐ ১ জোড়া	৸০
১০ হাত সাদা ধুতি ১ জোড়া	১৸০
ঐ উড়ানী ১ খানা	॥৵০
৩ বধুর ১০ হাত শাটী ৩ খানা ॥৵১০ হিঃ	১৸৶১০
সাদা ভুনি ১ খানা	॥৶

১ জোড়া বিনামা ১৲
" " ৸০
" " ॥৵০
" " ।৵০

(ঞ) জ্বালানী ঃ—

রাত্রে রোশনাই বাবদ
নারিকেল তৈল /৬॥ ১৲
মোমবাতি /১॥ সের ১॥৶
১টা আমগাছ ময় কাটাই
খরচা ১।৵

(ট) মজুরী ঃ—

কলিকাতা হইতে দণ্ডীর হাট নৌকা
ভাড়া (২॥০ দিনের পথ) ১৵৫
দণ্ডীর হাট হইতে কাশীধাম
নৌকা ভাড়া ৬৲
চাকরের বেতন ১।০
একদল যাত্রা মোক্তা ফুরণ ১৯৲

(ঠ) প্রাতে জ্ঞাতি ভোজন—

(১৫০ জনের) বাবদ
মৎস্য ৫৲
উৎকৃষ্ট বাঁকতুলসী চাউল ১/মণ ১৵
তরিতরকারি ॥৶১০
দুগ্ধ ।৬ সের ৸১০
দধি /১ মণ ২॥০

খাতা হইতে মাত্র কয়টি হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আরও অনেক দ্রব্যের তৎকালিন মূল্য ঐ খাতা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়। বাহুল্য ভয়ে উহা এই সংখ্যায় সন্নিবেশিত করিলাম না। বসুমতী—

ব্যবসায় নীতি।

শ্যা্ম হোয়াইট মেয়ার একজন আমেরিকান। তিনি কয়েকটী মূল্যবান ব্যবসায় নীতির উল্লেখ করিয়া পরামর্শ দিয়াছেন।

তোমার ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাল খরিদ করিবে, যেন জিনিস প্রস্তুতকারককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মাল গস্ত করিও না। যে মাল খরিদ্দার পছন্দ করে না, সে মাল যে ব্যবসায়ী খরিদ করিয়া টাকা নিশ্চল করিয়া দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

২। ক্রেতার টাকার যথোপযুক্ত মূল্যের দ্রব্যই ক্রেতাকে দিবে, কখন ঠকাইবে না। খরিদ্দার লক্ষ্মী, স্থায়ী ব্যবসায় স্থাপন করিবার বাসনা থাকিলে ক্রেতাকে মূল্যবান উপকরণ মনে করা উচিত।

৩। দীর্ঘসূত্রী হইও না, প্রাণপণে লোকের সঙ্গে কারবারের নির্দ্ধারিত সময় রক্ষা করিবে এইটী ব্যবসায়ের অত্যাবশ্যক নীতি। যাহার সহিত যে সময় দেখা সাক্ষাত, কাজের সময় নির্দ্ধারিত আছে, ঠিক সেই সময় তাহা সম্পন্ন করা বর্ত্তমান

ব্যবসায় নীতির একটা অতি আবশ্য বিষয়। এইটী যে উপেক্ষা করে, লোকের তাহার সহিত কাজ কর্ম্ম করা একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। তেমন ব্যবসায়ী ক্রমে লোক চক্ষে উপেক্ষিত হয়, কারবার নষ্ট হয়।

৪। সৎ-ব্যবসায়ীর নিকট তোমার মালপত্র খরিদ করা উচিত। শঠ ব্যবসায়ীর নিকট যাইও না

৫। ভাল ভাল কারকারবারের যেরূপ আধুনিক নিয়ম পদ্ধতি, সেইরূপ তোমার নিয়ম পদ্ধতি করিবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে Fair price makes business and friends'' ন্যায্য সুবিধাদরের কারবার যে শুধু ভাল চলে, তা নয় ক্রেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কারবারের এইটুকুই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

যে জিনিস ভাল—দরে সুলভ, তার জন্য ভাল বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনে এবং ব্যবসায়ের কর্ম্ম পদ্ধতিতে মৌলিকত্ব না থাকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। সবাই যা' করে, তাহাদের অনুকরণে আমিও যদি তাই করে যাই, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সাফল্য হয় বহু বিলম্বে না হয় চির জীবনেও হয় না। আপনার মৌলিক পদ্ধতি এবং মৌলিক বিজ্ঞাপন উদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। শুধু হাটুর উপর হাত দিয়া চিরপদ্ধতি অনুসারে রাস্তার পথিকের দিকে তাকিয়ে বসে থাকাই সফলতা লাভের পন্থা নয়।

খুব সুবিবেচনার সহিত বিজ্ঞাপন দিতে ক্রটী হইলে কারবারের পতনের জন্য ঐ অবিবেচনামূলক বিজ্ঞাপনই দায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সকল ব্যবসায়েরই উন্নতি ঐকান্তিক অবিরাম চেষ্টারই ফল।

স্বাধীন জীবিকার পথের পথিককে ঐ মূল্যবান উপদেশ গুলি সর্ব্বদাই মনে রাখিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে কর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

কাজের লোক।

বিবিধ।

কৃষি স্কুল

বঙ্গদেশে ঢাকা ও চুচুড়াতে দুইটি কৃষিস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মধ্য ইংরেজী পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা ইংরেজী স্কুলে যাহারা মেটিকুলেসান ক্লাসে পড়িয়াছে এরূপ ছাত্র উক্ত কৃষি স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ছাত্র দিগকে বেতন দিতে হয় না। তথায় দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। ছাত্রদিগকে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিদ্যার্থীদিগকে কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামোটি ভাবে ও ব্যবহারিক কৃষি সম্বন্ধে উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে, তাহাদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। কৃষি পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা ও কৃষি বিভাগের ডিমনষ্ট্রেটর কাজ উত্তমরূপে চালাইতে পারিবে। প্রত্যেক বালকের হাতে এক এক বিঘা জমি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহারা স্কুলের বলদ ও লাঙ্গল দ্বারা চাষের কার্য্য করিবে বীজাদির খরচ বাদ যাহা লাভ হইবে, তাহা তাহাদের খরচের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারিবে। বালক দিগের কৃতকার্য্যতা দেশের অশেষ মঙ্গল জনক হইবে। ঢাকা স্কুলে প্রায় ৪০ ও চুচুড়াতে ৩০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে।

দিল দুয়ার কৃষিক্ষেত্র

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে মৈমনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ জমীদার গজনবীগণ তাহাদের স্বগ্রাম দিল দুয়ারে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন। সংপ্রতি ১০০ একর বা ৯০০ বিঘা জমিতে চাষ আরম্ভ হইবে। আশা করি অন্যান্য ভূস্বামীগণ গজনবী দিগের সৎকার্য্য অনুসরণ করিবেন।

সমবায় সমিতি

বঙ্গদেশে ১৯২০-২১খৃঃ অব্দে ৫,৭৮৬ ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ১৬২, ২৪১ জন সদস্য বা মেম্বর। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৪,৯২০ সমিতি ও ৫,৭৮৬ সদস্য ছিল। এই সমিতি গুলির মূলধন ও ১,০৪,০৮, ২০১ টাকা হইতে ১, ২২, ৬২, ১৮৮ টাকা উঠিয়াছে। ঐ বৎসর জমিতে জল সেচন করিবার জন্য সাতটি সমিতি

গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশেই হউক কিম্বা বিলাতের মত ধনীর দেশেই হউক, দশে না মিলিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামে ঋণও বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

রাজসাহী কৃষি কলেজ।

দিঘাপতিয়ার পরলোকগত দানশীল কুমার বাহাদুর রাজসাহী কলেজের সংশ্রবে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার্থ আড়াই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন যে, এই কৃষি কলেজের কোন উপযুক্ত ছাত্র যদি এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পুষা বা অন্য কোন কলেজে অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হয়, তবে তিন বৎসর কাল মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে তাহাকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। সম্প্রতি দিঘাপাতিয়ার রাজা বাহাদুর রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই কৃষি কলেজের আয় ব্যয় সম্বলিত একটী কার্য্য প্রণালী (Scheme) প্রস্তুত করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে রাজসাহী কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা (Botany) ও প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যার (Zoology) B.Sc. শ্রেণী খোলা আবশ্যক। এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দুই দুই জন Lecturer, এক এক জন Laboratory Assistant এবং দুই দুই জন চাপরাসী রাখিতে হইবে।—সম্মিলনী।

স্কটল্যাণ্ডে বাঙ্গালী ভাস্কর।

শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ বসু পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বসু। ফণীন্দ্রবাবু চৌদ্দ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া এডিনবরার রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউস্ পার্শি প্লেটসমাউথ নামক ওস্তাদ মিস্ত্রীর নিকট চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কৃতিত্বের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল প্রাপ্ত হন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মূর্ত্তি পরিদর্শন ও শিল্পীদের কাছে শিক্ষার জন্য তাঁকে একটি Travelling বৃত্তি প্রদান করা হয়। শিল্প কলার চরম কেন্দ্র ইতালী ও ফ্রান্সে তিনি এক বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেখান হইতে তিনি স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং একটি কারখানা খুলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ রয়েল স্কটিশ একাডেমিতে তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি পাঠাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় বরোদারাজ সন্তোষ লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি প্রস্তুতের জন্য আহ্বান করেন। এখন তিনি স্কটল্যাণ্ডে নিজের ব্যবসার উন্নতি লাভে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। "প্রবাসী"

অস্পৃশ্যতা

হিন্দুদিগের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিবার জন্য লাহোর আর্য্য সমাজের সভাপতি ও সদস্যগণ সমস্ত নিম্ন জাতিগণকে লইয়া লাহোরে একটী ভোজের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকই এই ভোজে যোগদান করেন। তিনশত সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাও উহাতে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দবাজার

ফিসার ইণ্ডষ্ট্রিয়াল স্কুল

স্বল্প শিক্ষিত খৃষ্টানদিগকে কার্য্যক্ষম ও অর্জ্জনক্ষম করিবার অভিপ্রায়ে "ফিসার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল নামক একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে টেলারিং উইভিং, পেণ্টিং, এনগ্রেভিং এবং কম্পোজিং প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় ১৩নং পটুয়াটুলি লেন, কলিকাতার বাবু হরিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় ইহার উদ্যোক্তা।

লবণের গুণ

সম্প্রতি ডাক্তার হেরিস নামক একজন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষের পক্ষে দৈনিক ১০ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ (১৮০ গ্রেণে ১ তোলা) লবণ গ্রহণ যথেষ্ট। ইহার অতিরিক্ত লবণ শরীরের অনিষ্ট করে। আমরা যে লবণ গ্রহণ করি তাহার অধিকাংশ দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি মধ্যে অবস্থান করে। কেবল সামান্য পরিমাণে রক্ত শোধনের জন্য ইহার প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত লবণ দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতে অবস্থান করিয়া রক্ত হইতে জল শোষণ করিয়া রক্তের গাঢ়তা জন্মায় ও রক্তের চলাচল শক্তি হ্রাস করে। এতদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার গণের মতে উদরি ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর পক্ষে লবণ গ্রহণ নিষিদ্ধ। ডাক্তার হেরিস বলেন যে অধিক লবণ গ্রহণ করিলে পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। বাগবাজারস্থিত শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে পুরাতন পেটের পীড়া, (গ্রহণী) প্রভৃতি রোগে রোগী, লবণ গ্রহণ না করিলে, সহজে রোগমুক্ত হইতে পারেন।

পাট

গত জুলাই ও পূর্ব্ব দুই বৎসরের জুলাই মাসে কলিকাতায় নিম্নলিখিত পরিমাণে পাট রপ্তানী হইয়াছে।

সণ	আমদানী	রপ্তানী
	বেইল	বেইল
১৯২২	১৪৭,৬৩৭	১৫৯,৭৮৭
১৯২১	২২৮,৯৭৮	৮৬,০৪৯
১৯২০	১৬৪,৪২৮	১০৪,৩৭৫

মিলের আমদানী

জুলাই

১৯২২	১২৮,৩২৪
১৯২১	৯৩,২০০
১৯২০	২৭৫,৩৯৬

জানুয়ারীমাস হইতে জুলাইমাস পর্য্যন্ত তিন বৎসরে থলিয়া চট রপ্তানী

১৯১২২	থলিয়া	১৮৯,৯৬৬,৫৬১	১৬৫,৪৮৫ টন
	চট	৬৪৩,০১৭,৭১০	
১৯২২	থলিয়া	২২৮,৫৭০,০১৬	১৮৭,৯২১ টন
	চট	৫৮৮,৩১৭,৭৪৪	
১৯২০	থলিয়া	২৭৩,৩০৩,৯০০	২২২,৪৩২, টন
	চট	৮৭৬,৪১২,৬৭৩	

চীনদেশে কাপড়ের কল

গত দশ বৎসর মধ্যে চীনদেশে কাপড়ের কলের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং কলের সংখ্যা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মাত্র ৪১টী কাপড়ের কল ছিল। ১৯১৯ সাল ৫৫টী এবং ১৯২১ সাল ৮০টী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কেবল সংঘাই নগরে ইংরাজদিগের ৫টী, জাপানীদিগের ১২টী ও চীনদেশীয় লোকদিগের ৬টী কাপড়ের কল চলিতেছে।

সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, চীনদেশে ইংলণ্ড হইতে ১০ লক্ষের অধিক কলের চরকা আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

চীনদেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তথায় ভারতীয় সূতার আমদানী অবশ্য হ্রাস হইবে। কিন্তু তুলার আমদানী সেই পরিমাণে বাড়িবে। সুতরাং ভারতবর্ষীয় কৃষকগণের তুলাচাষ বৃদ্ধি ও ইহার উন্নতি বিধান করিতে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবহাওয়া

এই বৎসর জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল না। বৃষ্টির অভাবে পূর্ব্ববঙ্গে যথোপযুক্ত পরিমাণে ধান ও পাটের চাষ হয় নাই। অনেক স্থলে পানীয় জলও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। তৎপরে আষাঢ় মাস হইতে অতি বৃষ্টি। ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থলের ধান ডুবিয়া গিয়াছে ও ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে। মানুষেরা মাচা করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছে। গরু বাছুরের অবস্থা কি হইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। রাঢ় উচ্চ দেশ। তথায়ও বন্যায় বহু গ্রাম প্লাবিত। বাঁকুরা, মেদিনীপুর ও হাবড়া জেলায় বহু স্থলে লোকের ঘর পড়িয়া গিয়াছে ও সঞ্চিত খাদ্য ডুবিয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের পরিসীমা নাই। এমন ভীষণ জলপ্লাবন শীঘ্র ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে কাঙ্গালের মা বাপ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ নানা স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দুস্থ লোকদিগকে নানারূপে, অন্নবস্ত্র ঔষধাদি দ্বারা সাহায্য করিতেছেন। দয়া পরবশ হইয়া,যাহারা যে কিছু অর্থ বা জিনিষ বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে পাঠাইবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

বঙ্গদেশে তিল চাষের বিবরণ (১৯২২—২৩ সন)

১৯২০-২১ সনে, ইহার পূর্ব্বে পাঁচ বৎসরের গড়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যত তিল উৎপন্ন হইয়াছে, বঙ্গদেশে উহার পরিমাণ শতকরা ৪.৯ অংশ মাত্র।

জলবায়ু তিলের ভূমি কর্ষণের জন্য অনুকূল ছিল, কিন্তু পরে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি বপন সময় হইতে আরম্ভ হইয়া তিল কাটার সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই জন্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর অনেক অল্প ভূমিতে তিল বপন করা হইয়াছে, এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণও হ্রাস হইয়াছে।

এবৎসর বাঙ্গালাদেশে ১১০,৬০০ একর জমিতে তিল বপন করা হইয়াছিল। গত বৎসর ১৬২,৭০০ একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। সুতরাং এবৎসর ৪২,১০০ একর জমিতে তিলের চাষ কম হইয়াছে।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যত তিল উৎপন্ন হয়, এবৎসর শস্যের শতকরা তাহার ৫৯ অংশ ও গত বৎসর ৭৩ অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ৬½ মন ধরিয়া, এবৎসর মোটামোটি ১৪,৭০০ টন তিল ও গত বৎসর ২৬,৭০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উৎপন্ন শস্যের হ্রাস শতকরা ৪৫ অংশ ভাগ।

নিম্নলিখিত জেলাতে অধিক তিল উৎপন্ন হয়।

জেলার নাম	ভূমির পরিমাণ (একর) সাধারণতঃ	এবৎসর	গতবৎসর
মৈমনসিংহ	১১২,৮০০	৩৩,৪০০	৭২,৯০০
পাবনা	৩৩,৫০০	১৯,২০০	২১,১০০
ঢাকা	৫,৯০০	১২,৯০০	১৩,৮০০
ত্রিপুরা	৯.২০০	৮,৬০০	৯,১০০
ফরিদপুর	১১,২০০	৭,৯০০	১২০০০
রাজসাহী	১০,৩০০	৬,৮০০	৮,৬০০
বাকরগঞ্জ	৭,৫০০	৬,০০০	৫,৫০০
মেদিনীপুর	৭,৫০০	৫,০০০	৫,৬০০

পত্রাদি।

মাননীয় "কৃষক" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিসনের অন্তর্গত মগরাহাট থানার এলাকাধীন জমীগুলি এ বৎসর অতিবৃষ্টিতে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল নাবাল জমীতে চাষ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায় এ কারণ ডায়মণ্ডহারবারে শ্লুইস্ গেট নির্ম্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু ঐ গেটের উপকারিতা প্রজা সাধারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষের এ দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অনেক লেখা হইল কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঘটনাস্থল কেহই পরিদর্শন করিতে গেলেন না। কত লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হৈমন্তিক ধান্যের কোন আশাই নাই। তবে বোরো ধান্যের চাষ করা যাইতে পারে যগুপি ঐ জল রাশি আর বাহির করিয়া দেওয়া না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভাবে অনর্থক জল বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে তাহাতে বোরো ধান্যের আবাদ হইবার আশা আদৌ করা যায় না। কোন্ উদ্দেশ্যে যে এই জল এখনও বাহির করা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজে

বোরো ধান্যের চাষ করিয়াছিলাম। গাছগুলিও বেশ আশাপ্রদ হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জলাভাবে অসময়ে গাছগুলি শুকাইয়া গেল। প্রার্থনা, সরকার বাহাদুর এ বিষয় একটু তদন্ত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক জল বাহির করা বন্ধ করিয়া দিউন। এ বিষয় দরিদ্র প্রজাগণকে, জয়নগর ও মগরাহাট থানা হইতে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে তাহারা বোরো ধান্য চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। কারণ একবার হৈমন্তিক ধান্য চাষ করিয়া তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আবার বোরো ধান্য চাষ করিতে গিয়া দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। এই বোরো ধান্য ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে জন্মিয়া থাকে। ঐ ধান্যের বীজও সরকার হইতে যথাসম্ভব কম মূল্যে প্রজাদিগকে সরবরাহ করিতে পারিলে ভাল হয়। আশা করি আপনার "কৃষক" পত্রে এ বিষয় মুদ্রিত করিয়া দিলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং আপনার সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ ঐ বোরো ধান্য যেখানে পাওয়া যাইতে পারে তাহার সন্ধান লিখিয়া পাঠাইবেন। ইতি—

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা, এবং নাবী জাতীয় সীম সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া

মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩,৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এইমাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি, ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া, আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি ; দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে !

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙ্গালাদেশের মাটি বড় রসা এইকারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলঃ—		প্রতিমণ—	
আতপ— পাটনা-সীতা		১নং	১০৲
ঐ		২নং	৯৸৹
ঐ		৩নং	৯৷৷৹
খুদ	৪৲	হইতে	৫।৵
পুরাতন দেশী	৯৸৹	”	১০৲
চিনিশক্কর	১১৷৷৹	”	১২৷৷৹
সিদ্ধ—দাদখানি	৯।৹	”	৯৸৹
বাঁকতুলসী	৮৷৷৹	”	৯৲
পাটনা	৭৸৹	”	৮৵
বালাম	৬৷৷৵৹	”	৭।৵
নাগ্রা	৭৲	”	৭৸
রাঢ়ী	৬।৹	”	৬৷৷৵
কাজল	৪৸৵	”	৫৷৷
গম	৬৲	”	৭৲
যব	৩৷৷৹	”	৪৲
যই	৪।৹	”	৪৸
মাকাই	৩৲	”	৩৷৷

সাদা মটর—	৫৲	”	৬৲
মটর (সাধারণ)	৪।৹	”	৪৸৹
খেসারী (শতকরা ৫ বাদ)			৪৲
কুলতি কলাই	৩৲	”	৩৷৷৹
মসুর কলাই—	৪৷৷৹	”	৫৷৷৹
অরহর	৪৸৹	”	৫৷৷৹
বুট	৫৲	”	৬৲
দাইল :—			
মুগ	১০৲	”	১৬৲
খাড়িমসুর	৮৲	”	৯৲
উড়িদ	৭৲	”	৯৲
অরহর	৬৲	”	৯৲
বুট	৭।৹	”	৮৲
মটর	৭৲	”	৭৷৷৹
মসুর	৬৲	”	৭৷৷৹
খেসারী	৫৲	”	৫৷৷৹
তৈলবীজঃ—			
তিসি (শতকরা ৫ বাদ)			৮৸৵

সরিষা	৮৲	হইতে	৯॥০
পোস্ত	১১৲	"	১২৲
তিল	৮৲	"	১১৲
এরণ্ড	৭৲	"	৭॥০
তৈল :—			
সর্ষপ	২২৲	"	২৫৲
তিল	২৪৲	"	২৮৲
নারিকেল	২২৲	"	২৪৲
চীনাবাদাম	২৭৲	"	২৮৲
মসিনা (৫ সের)	৪৵	"	৪॥৵০
সার :—			
রেড়ী খৈল	৪॥০	হইতে	৪৸০
সরিষা "	২৸০	"	৩৷০
চীনাবাদাম	৪৸০	"	৫৲
তিসি	৫৲	"	৫৷৵০
হাড় চুর্ণ			৫৲
সোরা	১০॥	"	১১৲
ঐ	১৪৲	"	১৬৲
হরিদ্রা	৩॥০	"	৭॥০
ঐ মাদ্রাজী	১৭॥০	"	২৬॥০
ঐ পাটনাই	১৩৸০	"	২১৲
জগন্নাথ পুর	১১৲	"	১২৲
তেঁতুল	৩॥০	"	৭৲
চিনি :—			
কাশীর চিনি	২৮৲	"	৩০৲
ইক্ষু গুড়	৮৲	"	৯॥০
খেজুর চিনি দোবরা	২৬৲	"	৩০৲
মরিসার—(লাল)			১৫॥০
ঐ সাদা			১৬৷০
ময়দা	১০৵	"	১০॥৶

আটা ১নং	৯৸০	"	৯৸৴০
২নং	৬৲	"	৬৵০
ভুষি	২৲	"	২৸৵
তুলা :—			
বাঙ্গলা			৪১৲
উমরা			৫০৲
নাগপুরী			৫৪৲
সিমুল তুলা			৪৫৲
পাট :—			
৫নং	১৩॥০	হইতে	১৪৲
রিকেক্‌সন	১১॥০	"	১২৲
ঐ টেবিবল্	৯॥০	"	১০৲
সিমুল তুলা	৪৫৲	"	৫০৲
লাক্ষা—১নং	১৫০৲	"	১৫৮৲
লবণ:—			
১০০ মণ—			
	জাহাজ হইতে,		গোলা হইতে
লিভারপুল	১৩৬৲	হইতে	১৩৯৲
পোর্ট সইড্	১২০৲		
এডেন্	১১৯৲		
করকচ	১১৪৲		১১৫৲
সূতা ৫ পাউণ্ডের বাণ্ডিল—			
১০ হইতে ১৫ নং	৪৲	হইতে	৪৸০
১৫ " ২০ নং	৫৶	"	৫৸
২২ নং		"	৬৵
স্বর্ণ ইং বার প্রতি ভরি			২৭,
কলিকাতা মিণ্ট			২৬৸৴
চীণা পাত			২৭৲
রৌপ্য বার ১০০ ভরি			৯০৸৵
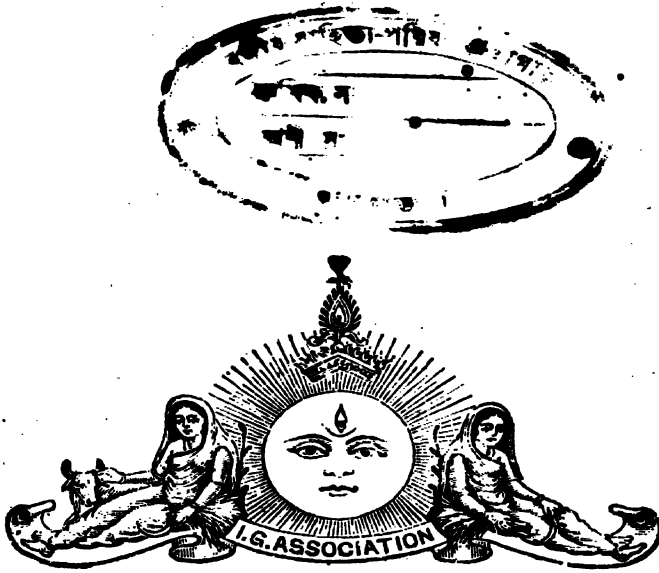
২৩ খণ্ড { কৃষক—আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩২৯ সাল } ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা

অন্ন সমস্যা

ভারতবর্ষে কোন না কোন প্রদেশে প্রায় প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ অনাবৃষ্টি। যে বৎসরে অনাবৃষ্টির জন্য ধান কিম্বা অন্য কোন শারদীয় কিম্বা হৈমন্তিক শস্য ভালরূপ না জন্মে সেই বৎসরই দুর্ভিক্ষের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে যে বৎসরে সুফসল পাওয়া যায়, সে বৎসরেও ভারতবর্ষের বহু সংখ্যক লোক অপর্য্যাপ্ত এবং অসার আহার গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতবর্ষের শস্য উৎপত্তি দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে এখন আর অনাবাদী গরু চরিবার মাঠ কিম্বা ভাগাড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১০ ক্রোর একর জমীতে চাষ হইত, এখন ১৫ ক্রোর জমীতে চাষ হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৫ ক্রোর একর জমীতে ধানের চাষ হইত এখন প্রায় ৮ ক্রোর একর জমীতে ধান হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ২ ক্রোর একর জমীতে গম উৎপন্ন হইত এখন তৎস্থলে ৩ ক্রোর একর জমীতে ইহার চাষ হইতেছে। জমীর পরিমাণ অনুসারে ধান ও গমের ফসলও বৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্নস্থ তালিকায় ইহা পরিষ্কার রূপে দেখান যাইতেছে।

সন	শস্যের নাম	জমি (৫ বৎসরের গড়) একর	উৎপন্ন ফসল (৫ বৎসরের গড়) টণ (২৭ $\frac{1}{8}$ মণ)
১৮৯৯-১৯০০	ধান	৫,০৮,৫৫,০০০	২,১৪,৬৬,০০০
১৯১৯-২০	ধান	৭,৯৫,১৪,০০০	৩,২০,২৫,০০০
১৮৯৯-১৯০০	গম	২,২৬,৪৯,০০০	৬০,২৯,০০০
১৯১৯-২০	গম	৩,০৪,৯৯,০০০	৯২,৮৮,০০০

চাউল ও গম ভারতবর্ষীয় লোকের প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষের উৎপন্ন সমস্ত খাদ্য শস্য একত্র করিলে তাহার একার্দ্ধ চাউল ও এক সপ্তম গম। যদি চাউল ও গম বৃদ্ধি হইল, তথাপি এতদ্দেশীয় লোকের আহার জুটিল না, একথা হয় ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। পাঠকের অবগতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রকাশিত ১৯১৯-২০ সনের শস্য বিবরণী হইতে নিম্নস্থ তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে জানা যাইবে যে ভারতবর্ষে কত পরিমাণে চাউল, গম, যব, জুয়ার, বজরা, মকাই, মরুয়া, বুট, মসুর কলাই প্রভৃতি খাদ্য শস্য ১৯১৯-২০ সনে জন্মিয়াছিল। শস্যের উৎপত্তি আমদানী ও রপ্তানী হিসাব নিকাশ পড়া যদিও সুখকর নয়, তথাপি দেশের শোচনীয় অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য পাঠকদিগকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

খাদ্যশস্যের বিবরণ ১৯১৯-২০ সন।

শস্যের নাম	জমীর পরিমাণ একর	উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, টন (২৭ $\frac{1}{8}$ মণে ১ টন)
চাউল	৭,৯৫,১৪,০০০	৩,২০,২৫,০০০ টন
গম	৩,০৪,৯৯,০০০	৯২,৮৮,০০০ "
যব	৭৬,১৭,০০০	৩১,৬৪,০০০
জুয়ার	২,১৭,৬৫,০০০	৪৯,৩৮,০০০
বজরা	১,৩৬,০৯,০০০	২৩,২৩,০০০
মকাই	৬৪,৬২,০০০	২৩,০৫,০০০
মরুয়া	৪,০০,০০০	১৭,৮৬,০০০
বুট	১,৩০,০৫,০০০	৩৫,৪৩,০০০
অন্যান্য	৩,০০,০০,০০০	৮০,০০,০০০
মোট খাদ্যশস্য	২০,৬৪,৭১,০০০	৬,৭৩,৭২,০০০

গত পাঁচ বৎসরে গড়ে, প্রতি বৎসর, ৪৯,২৬০ টন খাদ্যশস্য ভারতবর্ষে আমদানী

হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ভারতবর্ষের খাদ্যশস্য ৬,৭৪,২১,২৬০ টন, ইহা হইতে বাৎসরিক রপ্তানী গড়ে ২,৬১,৩০০ টন বিয়োগ করিলে ৬,৪৮,৫৮,২৬০ টন, মোটামুটি ৬$\frac{1}{2}$ ক্রোর টন অথবা ১৭৬$\frac{1}{2}$ ক্রোড় মণ অবশিষ্ট থাকে।

এক্ষণে ভারতবর্ষের ৩৫ ক্রোর লোকে কত খাদ্য গ্রহণ করে, তাহার একটা হিসাব করা যাউক। এই হিসাব করা বড় কঠিন, কি পরিমাণে কোন খাদ্য গ্রহণ করিলে, এতদ্দেশীয় মানুষ না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ফেমিন্ কমিশনে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, কোন নিয়মে, অন্ন বিতরণ হইবে, কমিসন্ তাহারও একটা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীর খাদ্য হিসাব করিতে হইলে, আমাদিগকে উপরোক্ত ফেমিন্ কমিশনের নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে হইবে। ইহা বলা আবশ্যক যে, ইউরোপের কোন জাতি উক্ত ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিবে না। কারণ, ইহা তাহাদের নিকট অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সে যাহা হউক, ফেমিন কমিশনের ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইলে।

লোকের বর্ণনা	খাদ্য পরিমাণ (চাউল ডাল প্রভৃতি)
(১) মজুর—যাহারা মাটি কাটে (পরিশ্রমী পুরুষ)	১৬ ছটাক
"　　"　　বহন করে (" স্ত্রীলোক)	১২ "
(২) অকর্ম্মণ্য মানুষ	১০ "
" স্ত্রীলোক	৮ "
১০-১৪ বৎসরের বালক বালিকা	৭ "
৭—১০ " " "	৫ "
১—৭ " " "	৪ "
০—১ " " "	৩ "

তাঁহারা কোন কোন প্রদেশের জন্য উপরোক্ত রসদ অপেক্ষা আর কিছু অধিক রসদ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু গড়পতায় প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে তাঁহারা ১৩ছটাক খাদ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন নিয়মে তাঁহারা এই তের ছটাক খাদ্য হিসাব করিয়াছিলেন তাহা জানি না।

আদম সুমারীর রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসীদিগের ১০০শত লোকের মধ্যে—

১	বৎসর	বয়স্ক	বালক	বালিকা	৩$\frac{1}{2}$	জন
১ হইতে	২ "	"	"	"	১$\frac{1}{2}$	জন
২ "	৫ "	"	"	"	৮$\frac{1}{2}$	"
৫ "	১০ "	"		"	১৪	"
১০ "	১৫ "	"	"	"	১১	"
১৫ "	৫০ "	"	পুরুষ		২৫	"
১৫ "	৫০ "	"	স্ত্রীলোক		২৫	"
৫০ বৎসর উর্দ্ধ বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক					১১$\frac{1}{2}$	

উপরোক্ত রসদ অনুসারে হিসাব করিলে গড় পড়তায় প্রত্যেক জন ১০ ছটাক খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবে। ফেমিন কমিশনারগণ মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি দেশের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপরোক্ত রসদ অপেক্ষা ঐ সকল প্রদেশের রসদ পরিমাণে কিছু অধিক ধার্য্য হইয়াছে। আদমসুমারীর লোক সংখ্যা এবং ফেমিন কমিশনারদিগের রসদ অনুসারে যদি আমরা হিসাব করি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক পরিশ্রমী গড়ে ১১½ ছটাক খাদ্য শস্য গ্রহণ করে।

৫ জন	(১—২ বৎসর)	প্রত্যেক	৩	ছটাক
৮½ ,,	(২—৫ ,,)	,,	৪	,,
১৪ ,,	(৫—১০ ,,)	,,	৬	,,
১১ ,,	(১০—১৫ ,,)	,,	৮	,,
২৫ ,,	(১৫—৫০ ,,) পুরুষ	প্রত্যেক	১৩	,,
২৫ ,,	(১৫—৫০ ,,) স্ত্রীলোক	,,	১২	,,
১১½ ,,	(৫০ হইতে উর্দ্ধ) অকর্ম্মণ্য	,,	৯	,,

তাহাদের এই ব্যবস্থা কেবল দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্য অবধারিত হইয়াছিল। সাধারণ অবস্থায় তাঁহারা নিম্নলিখিত খাদ্য পরিমাণের হিসাব করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অব্দ

মোট লোক সংখ্যা—	...	১৮,০৩, ৫০, ০০০
খাদ্য শস্য মোট—	...	৫,১৫,৩০, ০০০ টন
খাদ্য গ্রহণ—	...	৪,৭১,৬৫, ০০০ টন
অতিরিক্ত খাদ্য শস্য—	...	৪৩,৬৫, ০০০ টন

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক লোক বৎসরে ৭মণ ৫ সের অথবা দৈনিক ১২৬ ছটাক খাদ্য শস্য গ্রহণ করে।

ফেমিন কমিশন ১৮৯০ খৃঃ অব্দের হিসাবে দেখাইয়াছেন—

লোক সংখ্যা—	...	২১, ৫৬, ২৭, ১৮১
খাদ্য শস্য মোট—	...	৬,৮০,৬৯,৯৭২ টন
খাদ্য শস্য গ্রহণ—	...	৫,৮৫, ৩৫, ৮৪৫ টন
অতিরিক্ত খাদ্য—	...	৯৫, ৩৪, ১২৭ টন

উপরোক্ত হিসাবে প্রত্যেক লোক গড়ে ৭ মণ ১৫ সের অর্থাৎ ১৩ ছটাক খাদ্য গ্রহণ করে। ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে খাদ্যের রসদ অতিরিক্ত এই কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। এই দেশের সাধারণ লোক খাদ্য শস্য ব্যতীত কদাচিৎ

দুধ, মাছ, মাংশ প্রাপ্ত হয়। ইহার সহিত আমরা বিলাতের খাদ্য তুলনা করিলে দেখিতে পাইব যে ভারতবাসীর খাদ্যে সারত্ব উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের লোক গড়ে প্রত্যেক বৎসরে ৩১৭ পাউণ্ড গম (১ পাউণ্ড অর্দ্ধ সের) এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ৪০০ পাউণ্ড গম গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন তাহারা গড়ে প্রায় ১১৫ পাউণ্ড মাংশ ও ৪৬ পাউণ্ড পণির গ্রহণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক লোক গড়ে দৈনিক প্রায় অর্দ্ধসের গম ৩ ছটাক মাংশ ও ১ ছটাক পনির গ্রহণ করে। ইহা ভিন্ন মাখন ও দুধ আছে। এই ১২ ছটাক, সারত্বে আমাদের খাদ্যের অন্ততঃ দুই গুণ। স্কটল্যাণ্ডের কর্ম্মঠ কৃষকগণ গড়ে দৈনিক পাঁচপোয়া ওটমিল (যই দানা) তাহা ভিন্ন দুগ্ধ গ্রহণ করে। আয়ারল্যাণ্ডের কৃষকগণ গড়ে দৈনিক চারি সের আলু আহার করে। দুধ তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। তথাকার কৃষক মজুরগণ অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই কিছু না কিছু দুধ, মাখন ও মাংশ প্রাপ্ত হয়। এতদ্দেশে সাধারণ লোকের পক্ষে এ সব খাদ্য ভোজ বলিয়া মনে হইবে। খাদ্যগুণে গম, যব, যই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। ইহারা চাউল ও জনেরা (জুয়ার) অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা কিরূপ আহার করে, তাহা আমরা স্কুলের ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্য দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। সংপ্রতি ইউনিভারসিটি হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৭০ জন বালকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ বা তাহাদের অঙ্গ অপূর্ণ। এমন দুর্দ্দশার কথা কোন দেশে নাই। অনুপযুক্ত আহার গ্রহণই যে এই অঙ্গ হানির কারণ তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের খাদ্যতত্ত্ব নামক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। এই অবস্থায় ফেমিন কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা যদি প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে বাৎসরিক অন্তত ৭ মন খাদ্য শস্য অর্থাৎ চাউল ডাল, গম, যব প্রভৃতি একত্রে ধরিয়া লই তবে ভুল হইবে না, মনে করিব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা আনুমানিক ৩৫ ক্রোর হইবে। এই ৩৫ ক্রোর লোকের জন্য ১৪৪ ক্রোর মণ অথবা ৯ ক্রোর টন খাদ্যের প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষের লোক ১৭৬½ ক্রোর মন অথবা ৬½ ক্রোর টন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৎসরে ২½ ক্রোর টন খাদ্য অকুলন, অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন লোকের খাদ্যের অভাব হইবার কথা। এই পঁচিশ জনকে আধ পেট খাওয়াইতে হইলেও সমস্ত ভারতবাসীকে কম খাইতে হয়। মানুষ ছাড়া গরু মহিষ প্রভৃতি জন্তু যাহারা লাঙ্গল টানিয়া শস্য উৎপাদন করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের কিঞ্চিত ভাগ দেওয়া ন্যায়ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পেটের দায়ে ন্যায় ধর্ম্মের ওজুহাত কেহ মানিবে না, গরু মহিষেরা খাদ্য শস্যের কিছুই পায় না।

বহির্ব্বাণিজ্য হইতে ভারতবর্ষে যে টাকা আসে তাহা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করিতে ব্যয় হয়। এমন কি অনেক বৎসর রপ্তানী জিনিষের মূল্য আমদানী জিনিষের মূল্য অপেক্ষা অনেক কম অর্থাৎ আমদানী জিনিষের মূল্য, না খাইয়াও ঘরের মজুত টাকা হইতে প্রদান করিতে হয়। ইহার প্রতিবিধানের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ বিদেশ হইতে না কিনিয়া ঘরে প্রস্তুত না করিলে, অন্ন সমস্যার জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। বস্ত্র ও চিনির নিমিত্তই বিদেশীগণ আমাদিগের নিকট হইতে অধিকাংশ টাকা আদায় করে। আমরা সর্ব্বসমেত ২০০ ক্রোর হইতে ৩০০ ক্রোর টাকার বিদেশী জিনিষ ক্রয় করি, ইহার মধ্যে ৭০ হইতে ১০৯ ক্রোর টাকা কাপড়ে ও ২০ হইতে ২৫ ক্রোর টাকা চিনিতে খরচ হয়।

উল্লিখিত হইয়াছে যে ভারতবাসীর শতকরা ২৫ জন অর্থাৎ ৮২ ক্রোর লোকের আহারের সংস্থান নাই। তাহাদিগকে আহার দিতে হইলে, বৎসরে ৫৬২ ক্রোর মণ খাদ্যের প্রয়োজন। ইহার মূল্য অন্ততঃ ১৫০ ক্রোর টাকা এই ১৫০ ক্রোরটাকার জিনিষ অধিক উৎপন্ন করিতে পারিলে অথবা ১৫০ ক্রোর টাকা অধিক বিক্রয় করিতে পারিলে, কিম্বা ১৫০ ক্রোর টাকার জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী না করিলে, এই ৮২ ক্রোর অভুক্ত লোকের অন্ন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথম বিধান অর্থাৎ ১৫০ ক্রোর টাকার মাল অধিক উৎপন্ন করা সহজ সাধ্য নহে। দ্বিতীয় বিধান মূল্য বৃদ্ধি। আমাদের রপ্তানী জিনিষের বর্ত্তমান মূল্য ২০০ হইতে ৩০০ ক্রোর টাকা। মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অসম্ভব ; কারণ ভারতবর্ষের প্রধান পণ্য চাউল, গম, বীজ, তুলা, পাট * প্রভৃতি অন্য দেশেও উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের উৎপন্ন শস্য অন্য দেশের শস্য অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র প্রতিবিধান এই যে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় জিনিষ ভারতবর্ষেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ হইতে কাপড় রপ্তানী হইত। এখনই বা কেন ইহা বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে ? ইহা ভারতবাসীর অকর্ম্মণ্যতার ফল মাত্র। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে ঘরের প্রয়োজনীয় চিনি প্রস্তুত হয় না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া ঘরে চিনি প্রস্তুত করিতে উৎসাহিত করিতেছেন ইহাতেও যদি আমাদের চেষ্টা না আসে তবে কাহার দোষ ? অদৃষ্টের দোষ। অক্ষম লোকের অদৃষ্টই একমাত্র অবলম্বন।

---

* অন্য কোন দেশে পাট হয় না সত্য ; কিন্তু পাট তুলার দরে বিক্রয় হইতে পারে না। অন্যদেশে মবিনার সূতা হয়। অন্যান্য সূতা অপেক্ষা পাটের দর সস্তা এই জন্যই পাটের অধিক পরিমাণে কাটতি।

ভারতবাসীর আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক তিন বৎসরে ভারতবর্ষে এক ক্রোর লোক সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং খাদ্য সমস্যা দিন দিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। দেশে শিল্পের প্রবর্ত্তন না করিতে পারিলে, কেবল কৃষির দ্বারা ভারতবাসীর আহার সংস্থানের কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চাষের উপযোগী জমি দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। গরু মহিষে অনেক স্থলে ঘাস পায় না। অচিরে গরু-মহিষের জন্য ঘাষ চাষ না করিলে, ইহারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। স্বদেশভক্ত ব্যক্তিদিগকে দেশের এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যা

এ বৎসরের ন্যায় দুর্ব্বৎসর বঙ্গদেশে শীঘ্র ঘটে নাই। বৎসরের প্রথমেই অনাবৃষ্টি। তজ্জন্য বঙ্গদেশের প্রধান ফসল ধান ও পাট অনেক স্থলেই বপন করা যায় নাই। অনাবৃষ্টির পরেই অতিবৃষ্টির আবির্ভাব হইল। প্রথমতঃ ফরিদপুর হইতে আমরা অতিবৃষ্টির খবর পাই। পরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন স্থলে জলপ্লাবনে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সংপ্রতি উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গেল তাহা বর্ণনার অতীত। রাজসাহী, ও পাবনা জেলার প্রায় ২০০০ (দু হাজার) বর্গমাইলের মধ্যে ঘর বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। মানুষ দূরবর্ত্তী কোন কোন উচ্চ স্থানে গমন করিয়া প্রাণে বাঁচিয়াছে। তথাপি প্রায় চারি পাঁচ শত স্ত্রী পুরুষ ও শিশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। গরু, বাছুর, ঘোড়া ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ও ফসলের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রায় বিষ লক্ষ মানুষ গৃহহীণ ও অন্ন-বস্ত্রহীণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র বিপদের কালিমায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিপদ যে কেবল উত্তর বঙ্গে ঘটিয়াছে তাহা কোন বাঙ্গালীর মনেই স্থান পায় না। ইহা যেন প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরের কথা হইয়াছে। যে যাহা পারিতেছেন তাহা মুক্ত হস্তে সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়া স্বার্থক মনে করিতেছেন। হিন্দু মুসলমান, ছোট বড় মানুষের বৈষম্য ভুলিয়া সকলে এক প্রাণে সাহায্য ভাণ্ডার লইয়া দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন। ভাণ্ডারের নায়ক ত্যাগী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। কলিকাতার ও প্রত্যেক পল্লীগ্রামের যুবক ও বালকবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া অর্থ, বস্ত্র ও চাউল সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্র স্থলে পাঠাইতেছেন।

বাঙ্গালার ডাক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পৌছিয়াছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ; উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব এবং সুদূরবর্ত্তি ব্রহ্মপ্রদেশ হইতে সাহায্য আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত (৩রা নবেম্বর ১৯২২) প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন যে সংগৃহীত অর্থ প্রচুর হইতেছেনা। সপ্তাহে সপ্তাহে পঞ্চাশ হাজার করিয়া টাকা চাই। আচার্য্যের প্রার্থনা পুর্ণ হইবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিপন্ন মানুষের অন্ন নাই বস্ত্র নাই। বস্ত্রের অভাবে লজ্জায় স্ত্রীলোকগণ সাহায্য ভাণ্ডারের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেনা এইরূপ সংবাদ ও পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের এমন ভীষণ দুরবস্থার কথা ইতিপুর্ব্বে কেহ কখনও শুনেন নাই।

বাঙ্গালী ভাই এবং ভগ্নীগণ! বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর হইতে তোমাদের সাড়া পাইতেছি। তোমরা এখন জাগ্রত। তোমাদের আপন ভাই ভগ্নীর বিপদের সময়ে যে যাহা পার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠাও।

বন্যা প্লাবিত স্থান যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে রেলের রাস্তাই এই ভীষণ বন্যার কারণ। রেল কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যয় সংক্ষেপের জন্য রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের জল নিকাশের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণে পুল প্রস্তুত করেন না। যদি রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়া ভয় না থাকিত, তাহা হইলে, যেখানে যেখানে পুল দেখিতে পাই, তথায়ও মাটীর বাঁধ গড়া হইত, সন্দেহ নাই। মাটীর বাঁধ ও লোহার পুলে খরচের অনেক তফাত। যে স্থলে ৫০ ফুট প্রশস্থ পুলের প্রয়োজন সেস্থলে ২৫ ফুট পুলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রেলওয়ে লাইনে বঙ্গদেশের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ নদী মারিয়াছে তাহার—সংখ্যা নাই। যে যে স্থলে রেলওয়ে লাইন জল নিকাশের পথ রোধ করিয়াছে তথায় প্রতি বৎসর জলপ্লাবন না ঘটিলেও ম্যালেরিয়া জ্বরের কেন্দ্র স্থল রূপে পরিণত হয় তাহা এখন সকলেই জানিয়াছেন। যে রেলের রাস্তার দোষে এইরূপ সর্ব্বনেশে ঘটনা ঘটিল তাহার কত্তৃপক্ষগণ প্রজার বিপদের সময়ে কি সাহায্য করেন তাহা জানিতে অনেকেই উৎসুক।

বর্ত্তমানে চাষের ব্যবস্থা এক প্রধান কায। ফসল সব ও গরু বাছুর ধ্বংশ হইয়াছে। কৃষকের গরুবাছুর ও বীজের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে।

খেসারী ভিজা মাটীতে ছিটাইয়া দিলেই জন্মে। খেসারীর জন্য চাষের দরকার হইবে না।

যে জমীতে শীতকালে অল্প অল্প জল থাকে, তথায় বোর ধান রোপণ করা যাইবে। মটর, মসুর, বুট, সরিসা, তিসি, প্রভৃতি ফসল উত্তর বঙ্গে জন্মিয়া থাকে।

এই সময় যই ধান্য ও প্রবর্ত্তন করা উচিত। গোধুম ও যব উত্তর বঙ্গে কিছু কিছু

জন্মিয়া থাকে। সাকরকন্দ আলু উত্তর বিহারে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এই সময়েই সাকরকন্দ আলুর লতা রোপণ করিতে হয়। পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মজাফরপুর জেলা হইতে ঐ লতা আনা আবশ্যক। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচ বিহার হইতে গোল আলুর দেশী বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নাইনিতাল আলু বিলম্বে ফলে ও ইহার বীজ দেশী আলুর বীজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রোপণ করিতে হয়। নাইনিতাল আলুর বীজ বিঘা প্রতি ৫ মন ও দেশী আলুর বীজ মাত্র বিঘা প্রতি ২ মণের প্রয়োজন। গাঁজর, সালগমও সহজে জন্মিয়া থাকে। এই সব বিবেচনা করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

যাহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ঋণ পাইবে তাহারা সম্ভবত চাষের জন্য আপন আপন বলদ খরিদ করিয়া লইবে আর যাহারা ঋণ পাইবে না তাহাদিগের জন্য কো অপারেটিভ্ সোসাইটি হইতে চাষের জন্য বলদের ব্যবস্থা করা উচিত। এই বলদ দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে কাহার ও দুই বিঘা কাহারও বা পাঁচ বিঘা জমি চাষ করান আবশ্যক। কোন পরিবারে কত বিঘা চাষ হইবে তাহার একটা প্রোগ্রাম পূর্ব্বেই করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় কৃষিবিভাগ এবং কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি বিশেষ সাহায্য করিবেন আশা করা যায়। দুর্দ্দিনের সময়ে যাহার নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া যায় তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা নিম্নস্থলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রার্থনা পত্র মুদ্রিত করিয়া আমাদের সকলের কর্ত্তব্য জ্ঞাপন করিতেছি।

জলপ্লাবনে বিপর্য্যস্তদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই আবেদন করিয়াছেন—

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির আবেদন

রাজসাহী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ ৭।৮ হাত জল হওয়ায় বাড়ী ঘর শস্যাদি ত নষ্ট হইয়াছেই, মানুষ এবং পশু অনেক ভাসিয়া গিয়াছে। গত পঞ্চমীর দিন হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় আর পুর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। কতক লোক রেল লাইনে আশ্রয় লইয়া জীবন বাঁচাইয়াছে, আবার কতক বা ঘরের চালায় বসিয়া আছে। তাহাদের মাথার উপর জল, পায়ের নীচে জল। মানুষ ও পশু অনাহারে ও অসুস্থ হইয়া মরিতেছে। মৃতদেহ পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে। জল অপেয় হইয়াছে।

আমরা রিলিফ্ কমিটি হইতে নওগাঁ, সান্তাহার, রাণানগর, আত্রাই ও মাধানগরে কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছসেবক এই কমিটি হইতে প্রেরিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আবার দুর্দ্দৈব যে যাহাদের উঠানে অথই জল তাহাদের দেশে নদীও নাই যে নৌকা পাওয়া যাইবে। কলার ভেলার কাজ হইতেছে। আমরা ছয়খানা নৌকা রেলযোগে পাঠাইয়াছি। এক্ষণে

টিকার আবশ্যক, কাপড়ের আবশ্যক। সকলে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেই জলমগ্ন বিশাল অঞ্চলের কতক লোক বাঁচান যাইবে।

বৃষ্টির জলে দাঁড়াইয়া ঐ যে নরনারী কাঁপিতেছে উহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া আজই কিছু সাহায্য দিন। উহারা আপনাদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় আছে। অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য করিয়া উহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। অর্থ পাইলে অন্ততঃ দাঁড়াইয়া অনাহারে মরা বন্ধ করা যাইবে। তারপর জল নামিয়া গেলে যে মড়কের আশঙ্কা আছে, ভগবান কেবল জানেন তখন কি হইবে।

অনাহারে মৃত্যু কি ভীষণ! যাহারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে আজই তাহাদের নিকট অন্ন প্রেরণ আবশ্যক। মুহূর্ত্ত বিলম্বে অধিক প্রাণহানি হইবে।

কলিকাতা সহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ করিয়া অনেকগুলি কেন্দ্র হইতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দিয়া সেবকগণের হাতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। তাঁহাদের নিকট অথবা সায়ান্স কলেজে আমার নিকট অর্থ ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিবেন। এই কমিটি হইতে অন্য সমস্ত রিলিফ্ অনুষ্ঠানের সহিত একযোগের কর্ম্ম করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কৃষি না শিল্প?

কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলের মুখেই ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতীয় শিক্ষিত যুবকগণের জন্য কৃষি গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে কৃষির উপযুক্ত জমী পাওয়া যাইবে কিনা? বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে পার্ব্বতীয় (উচ্চ) জমী সুলভে পাওয়া যাইতে পারে। প্রচুর বৃষ্টি হইলে তথায় কোন কোন ফসলও জন্মিতে পারে কিন্তু এইরূপ অবস্থায় এই সব পার্ব্বত্য ভূমিতে চাষ বিশেষ লাভজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলায় কোন কোন স্থলে অবাদযোগ্য জমী আছে। কিন্তু বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে এত পরিমাণে জমী কোথায়ও এখন পাওয়া যাইবে না।

আবাদী জমী সর্ব্বত্রই দুষ্প্রাপ্য। কোন কৃষককে অতিরিক্ত সুদে ধার কর্জ্জ দিয়া ডুবাইতে না পারিলে তাহার আবাদী জমী দখল করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে দেশের কোন লাভ হইবে না—একজনের অন্ন সংস্থান বা লাভের জন্য অন্যকে ভিখারী হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে ২৩ ক্রোর একর জমীতে আবাদ হয়; তন্মধ্যে ২০ ক্রোর জমিতে খাদ্য

শস্য জন্মে। ভারতবাসী সকলের আহার যোগাইতে হইলে আরও প্রায় ৮ ক্রোর একর জমীতে খাদ্য ফসল উৎপন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু জমীর অভাব। * তাহার উপর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি আছে। কোন বৎসর কোন প্রদেশে ফসল নষ্ট হইলে তথায় দুর্ভিক্ষে মানুষ মরিতে থাকে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া যায়। এই জন্য চাষের উপর আর অধিক চাপ দেওয়া কিম্বা যাহারা চাষী নয় তাহাদিগকে ধরিয়া চাষী করা কখনও সঙ্গত হইবে না। ভারতবর্ষে প্রায় শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী। কৃষকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা কল্যাণকর হইবে না।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক কৃষক নাই। কৃষিপ্রধান আমেরিকাতে জনসংখ্যার মাত্র ৩৫ জন কৃষিজীবী, পক্ষান্তরে, ধনে ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় শতকরা মাত্র ১০ জন কৃষিজীবী।

শিল্পের জন্যই ইংল্যাণ্ড সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্য লইয়াই শিল্প। অথচ কৃষক দরিদ্র, শিল্পী ধনী। ইহার কারণ কি? কৃষক তো তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতে পারে কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই কৃষক, তাহাদিগকে প্রতিযোগিতায় ফসল বিক্রয় করিতে হয়। তাহাদের অধিকাংশ লোক আবার দুঃস্থ, তাহারা দশদিনও তাহাদের ফসল ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাজেই ক্রেতার দরে তাহাদিগকে ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়।

বর্ত্তমানকালে শিল্পিগণ সবচেয়ে ধনী। কলকারখানা স্থাপন করিতে বহু মূলধনের প্রয়োজন সুতরাং সাধারণ লোক শিল্পী হইতে পারে না। ধনী শিল্পী একটাকা খরচ করিয়া দুই টাকা লাভ না পাইলে সে তাহার জিনিষ বিক্রয় করিবে না। যাহার প্রয়োজন আছে, সে দেড় টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় খরিদ করিতে বাধ্য হয়। কৃষকগণ লোকসান দিয়াও তাহার শস্য শিল্পিগণকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। চাষে লোকসান হয় বলিয়াই কৃষক ধার কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বকালে কৃষি ও শিল্পের একটা সামঞ্জস্য ছিল। তখন কৃষক নিজের খাবার রাখিয়া অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও ফসল শিল্পীকে বিক্রয় করিত, শিল্পী কৃষককে মূল্য দিবার জন্য তাহার শিল্পজাত দ্রব্যের উপর কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিত। শিল্পী এই লাভ হইতে তাহার আহার, পরিধান ও প্রয়োজনীয় অন্য কোন বস্তু খরিদ করিত। যেমন কৃষক তাহার ফসল ধরিয়া রাখিয়া অত্যধিক লাভ করিতে পারিত না, সেইরূপ শিল্পীও ধরিয়া রাখিয়া তাহার জিনিষ হইতে অতিরিক্ত লাভ লইতে পারিত না। কৃষক ও শিল্পীর অবস্থা একই রূপ; কেহ কাহার উপর জুলুম করিতে পারিত না। রাজা বা জমীদার ধনী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কৃষি

* সরকারী রিপোর্টে ১১ ক্রোর একর আবাদযোগ্য পতিত জমী আছে। জল সেচনের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে এই সকল জমী আবাদযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিম্বা শিল্পের সহিত সংশ্রব রাখিতেন না। সেইজন্যই কৃষি ও শিল্পের আদান-প্রদানে তখন সমতা ছিল। এখন শিল্পী ধনী, তিনি দুর্ব্বল কৃষককে ছাড়িবেন কেন? শিল্পী এক টাকায় এক সের তুলা খরিদ করেন, উহা হইতে এক জোড়া কাপড় প্রস্তুত করিয়া কৃষকের নিকট হইতে পাঁচ টাকা আদায় করিয়া লন। কাপড় না পরিলে তো চলে না; ছুরি, কাঁচি, সূঁচ প্রভৃতি সব শিল্পজাত দ্রব্যই প্রয়োজনীয়; যে কোন দরে তাহা ক্রয় করিতে কৃষক বাধ্য। এইজন্য পৃথিবীতে অর্থের অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। কৃষককুল দিন দিন অনাহারে ক্ষীণ হইতেছে ও শিল্পিগণ বিলাসিতায় ডুবিয়া যাইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে আমেরিকা, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কৃষকদিগের অবস্থা এত উন্নত আর রুশিয়া ও এশিয়া দেশবাসী কৃষকদিগের অবস্থা কেন শোচনীয়? ইহার উত্তর এই যে প্রথমোক্ত দেশের কৃষি ধনী লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে নূতন নূতন কৃষি-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া কৃষি উৎপন্ন জিনিষের খরচ হ্রাস করিয়া লাভ করিতেছে, আর অন্য দেশের লোক সেই পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিতে বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত করায় তাহারা লোকসান দিতেছে। ঐ সকল উন্নত দেশে কৃষক ও শিল্পীদিগের সংখ্যার একটা সমতাও হইয়াছে। অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পের উচ্ছেদ হওয়ায় অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী হইয়াছে; এবং অন্যদেশ হইতে অধিক মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য খরিদ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে।

ভারতবর্ষ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য না হইলে এ দেশের লোক আর অধিকদিন বাঁচিতে পারে না। বর্ত্তমানকালের কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্প প্রবর্ত্তন করা, ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য। সৌভাগ্যের কথা এই সময়ে ভারতবর্ষে এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে। তিনি আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন যে, তোমরা ভীত হইও না, দৃঢ় হও, তোমাদের প্রাচীনকালের চরকা ও তাঁতেই এই সকল কল কারখানার দ্বন্দ্বেরযুগে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই আশার বাণীর সত্যতা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাত্মার বাণী সত্য হউক!

বর্ষাকালে আলুর চাষ

সহরের বাজারে কিম্বা গ্রামের হাটে যে কোন তরকারী সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন করা যায়, তাহাই খুব অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। আলু, কপি ও কড়াইসুঁটি এই সকল তরকারির মধ্যে প্রধান। পাটনার তরকারী উৎপন্ন কারীগণ, যাহাদিগকে কোইরি বলে, তাঁহারাই এই বিষয় অগ্রণী। বর্ষার শেষে কিম্বা শীতের প্রারম্ভেই নূতন আলুর সের

১৲ টাকা, একটী কপির দাম • আনা ও কড়াইশুঁটী ১৲ টাকা সের প্রায়ই দেখা যায়। এই দামে মাসাধিক কাল ঐ সকল তরকারি বিক্রয় হইবার পর, ক্রমশঃ উহা কমিয়া কমিয়া, সাধারণ বাজার দরে দাঁড়ায়। একটু কষ্টস্বীকার করিয়া, ঐ সময়ের মধ্যে যাহা লাভ হয় তাহা, ঐ কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার। পাটনায় কোইরিয় বিলক্ষণ ধনীরা, কিন্তু তাহারা নিজ হাতে এই আশু-ফসল উৎপন্ন করিয়া প্রভূত লাভবান হইবার লিপ্সা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষের এই কোইরিদিগকে অধিক বেতনে চাকরি দিবার প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাদিগকে দাসত্ব আনিতে কৃতকার্য্য হন নাই। ইহাদের জমির পরিমান যে খুব অধিক তাহাও নহে, কিন্তু অল্প পরিমান জমিতেই নিজ পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে আশু ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহাদের শ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

অনেকেরই ধারণা বর্ষাকালে আলুর চাষ করা দুরূহ। পাহাড় প্রদেশে দার্জ্জিলিং নৈনিতাল, মসুরী প্রভৃতি স্থানে বর্ষাকালে আলু প্রভৃতির চাষ হওয়া সম্ভব কারণ ওখানে পাহাড়ের ঢালুর জন্য জল দাঁড়াইবার সম্ভবনা নাই, কিন্তু ঐ সকল স্থানে শীতের সময় অত্যধিক শীত, তুষার ও বরফের জন্য কোনরূপ ফসল উৎপন্ন করা দুরূহ। কিন্তু পাটনা, হরিদ্বার প্রভৃতি সমতল ভূমিতে যখন বর্ষাকালে আলু কপি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তখন অন্যান্য উচ্চ সমতল ভূমিতে, ইহা না হইবার কারণ নাই।

বর্ষাকালের আলুর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জমির প্রয়োজন যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষেতে জল জমিতে না পারে। ও জল নিকাষের সকল প্রকার ব্যবস্থা প্রথম হইতেই থাকা প্রয়োজন। এই জমীতে বর্ষায় শেষেই চাষ দিতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং এই সময় একটু গভীর ভাবে চাষ দেওয়া দরকার। যাঁহারা পাঞ্জাব "হল্" ব্যবহার করেন তাঁহাদের পক্ষে এই গভীর চাষ দেওয়া খুব সুবিধা জনক। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস (সেপ্টম্বর অক্টোবর) হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ জৈষ্ঠ (এপ্রিল মে) পর্য্যন্ত ইহাতে বরাবর চাষ দেওয়া দরকার যাহাতে জমি নরম ও ঘাস শূন্য থাকে। শেষ চাষ সমূহ দেশী লাঙ্গল দ্বারাই দেওয়া সুবিধা। অনেক সময় সরিষা কিম্বা অন্য কোন রবি শস্যের পর ও বর্ষার আলু সেই ক্ষেতে উৎপন্ন করা যায় এই সকল তৈয়ারী ক্ষেতে কোইরিয়া ছোট ছোট কেয়ারী করিয়া ও প্রত্যেক কেয়ারির চতুর্দ্দিকে জল নিকাষের পথ রাখিয়া আলু রোপণ করে। কিন্তু জমি যদি খুব উচ্চ হয় ও জল দাঁড়াইবার ভয় না থাকে, তাহা হইলে পুরা ক্ষেতে লম্বা লম্বি জুলি কাটিয়া ও ক্ষেত একদিকে অল্প ঢালু করিয়া, ঐ সকল জুলির মুখে একটী গভীর খাদ করিয়া দিলে সহজেই জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

জমি তৈয়ারী হইবার পর জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসের শেষাশেষি অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টির পরই ক্ষেতে লাঙ্গল দ্বারা গভীর ভাবে ২॥০ ।৩ ফুট অন্তর জুলি কাটিতে হয় ও এই জুলিতে

একর (দেশী ২॥০ বিঘা) প্রতি ২৫০।৩০০ মণ হিসাবে উত্তম গোবর সার বিছাইয়া তাহার উপর এক বিঘাত (৯ ইঞ্চি) অন্তর আলু পুতিতে হইবে। সমস্ত ক্ষেতে সার বিছান অপেক্ষা, প্রত্যেক জুলিতে সার দিলে লাইনের ফসলেরই উপকার হয় ও সম্পূর্ণভাবে মাটী ঢাকা থাকায় বর্ষায় জলে সার ধুইয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। আলু লাইনে সারের উপর বসাইবার পর প্রত্যেক আলুর উপর এক মুষ্টি করিয়া রেড়ি কিম্বা সরিষার খোল অথবা হাড়ের গুঁড়া দিলে, আলু শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। আলুর প্রথমেই যদি ফল বাহির করিয়া পোতা যায়, তাহা হইলে গাছ শীঘ্র বাহির হয়, ও লাইনে ফাঁক পড়িবার সম্ভাবনা কম থাকে। নচেৎ আলাদা আলুর ফল বাহির করাইয়া যে যে স্থানে ফাঁক পড়ে, সেইখানে পুনরায় বসান উচিত। আলু পুতিয়া পাশের মাটী কোদালি দ্বারা জুলির উপর অল্প উচ্চ করিয়া দিতে হইবে যাহাতে আলুর জুলি এখন কিন্তু উচ্চ ও পাশের জমি অল্প নালায় পরিণত হয়। গাছ বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়ায় অল্প অল্প মাটী দিয়া দিতে ক্রমশঃ আলুর জুলি খুব উচ্চ ও পাশের নালা খুব গভীর হইয়া যায়। ইহাতে জল নিকাষের সুবিধা হয়। বর্ষায় আলুর চাষে ঘাস নিড়ানর প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক। বেশী ঘাস হইলে প্রত্যেক বার মাটী চড়াইবার পূর্ব্বে, একবার করিয়া ঘাস নিড়াইয়া মাটী চড়ান উচিৎ, তাহা হইলে আলুর লাইনে ঘাস জমিতে পারিবে না। বেশী বর্ষা অর্থাৎ শ্রাবণের ধারা আরম্ভ হইবার, পূর্ব্বেই ২।৩ বার মাটী চড়ান দরকার; উচিৎ যাওয়া উচিৎ কারণ খুব বর্ষায় মাটি দিবার অবসর পাওয়া যায় না। রেড়ির খোল একর (২॥০ বিঘা) প্রতি ২০ মণ হিসাবে দেওয়া উচিৎ এবং ইহার অর্দ্ধেক আলু পুতিবার সময় ও বাকী অর্দ্ধেক আলুতে প্রথম মাটী দিবার সময় দিলে বিশেষ ফল দর্শে। আলু পুতিবার সময় সুপার-ফস্‌ফেট কিম্বা হাড়ের গুড়া একর প্রতি ৫মণ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত গোবরের সহিত দিয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মাটী দিবার সময় দ্বিতীয়বার খোল দিবার পরিবর্ত্তে সল্‌ফেট-অব্‌-এমনিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃষকেরা গোবর ও খোলেরই প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী। কারণ এই সকল সার সচরাচর সকল সময় পাওয়া যায়। বর্ষায় সময় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার যাহাতে বৃষ্টিতে মাটী ধুইয়া গাছের গোড়া বাহির হইয়া না পড়ে ও কোন রকম ক্ষেতে জল না দাঁড়ায়।

তিন চারি মাসের মধ্যেই এই আলু প্রস্তুত করিয়া ও আশ্বিনের (সেপ্টম্বরের) মাঝামাঝি এই আলু বাজারে বাহির করিতে পারিলে, ১০।১২৲ মণ সহজেই বিক্রয় হয় ও বড় বড় সহরে পাঠাইবার সুবিধা থাকিলে ১৫।২০৲ টাকা মণ অনায়াসে বিক্রয় হইতে পারে। এক একরে যদি খুব কম ১০০ মণ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তিন মাসেই ১০০০, টাকা খরচ বাদ লাভ হইতে পারে। আলুর বীজের দাম সার, মজুরী ইত্যাদি

সমস্ত খরচ একর প্রতি ২০০৲ টাকা অধিক হওয়া উচিৎ নহে। বঙ্গে অঞ্চলে এই বর্ষায় আলুর চাষ সফল হইয়াছে; কিন্তু এই আলু উঠাইবার পরই পুনরায় বীজরূপে ইহা ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ ইহা পুনরায় ক্ষেতে অঙ্কুরিত হইতে প্রায় ৩৪ মাস সময় লাগে, তখন শীতের আলু পুতিবার সময় চলিয়া যায়। সেজন্য এই আলু খাইবার জন্য ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত এবং বীজের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে পুনরায় সেই বর্ষায় সময়, অথবা শীতের শেষে ক্ষেতে জল দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সে সময়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলের সুবিধা থাকিলে আলু চাষ বৎসরের সকল সময়ই করা যাইতে পারে, বিশেষতঃ ধান কটিবার পর জমি নরম থাকিলে তাহাতে পৌষ ও মাঘ মাসেও আলু দেওয়া যায় ও বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে এই আলু তুলিয়া বর্ষায় আলুর বীজ রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, এবং সেই জমীতে পুনরায় ধান রোপণ করা যাইতে পারে।

যে সকল জমি সমুদ্রের সমতল হইতে ২০০০।৫০০ ফিট উচ্চ সে সকল স্থানে এই আশু ফসল উৎপন্ন করিবার বিশেষ সুবিধা।

আশু কপি উৎন্ন করিতে হইলে আষাঢ় শ্রাবণ (জুলাই আগষ্ট) মাসেই ঘরের মধ্যে বাক্সে বীজ পোতা উচিৎ ও পরে সেই চারা উঠাইয়া পুনরায় খুব উচ্চ জমিতে, উপরে চালা দিয়া রোপণ করিতে হইবে। পরে বর্ষায় শেষা শেষি যখন বেশি বৃষ্টির আশঙ্কা আর না থাকে তখন খুব উচ্চ জমিতে উত্তমরূপে সার দিয়া লাইনে লাগান যাইতে পারে। এই ক্ষেতে দুইবার কপি লাগান যায়। প্রথম কপি তৈয়ারী হইবার সময় সময় লাইনের মধ্যবর্ত্তী নালীতে পরবর্ত্তী চারা পুতিলে, প্রথম কপি তৈয়ারী হইতে হইতেই ঐ লাইনের উচ্চ মাটি ভাঙ্গিয়া নূতন চারার গোড়ায় দেওয়া যাইতে পারে।

জমি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিলে বর্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কড়াইসুঁটীও পোতা যাইতে পারে এবং উচ্চ জমিতে জল নিকাষের ব্যবস্থা থাকিলে, বীজের গোড়ায় জল বসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, বীজ চলিয়া যাইবার ভয় থাকে না।

বিস্তৃত জমিতে অল্প সার দিয়া ফসল উৎপন্ন করা অপেক্ষা, অল্প জমীতে অধিক সার দিয়া ফসল উৎপন্ন কর লাভ জনক। যাঁহাদের জমির পরিমাণ অল্প, তাঁহারা হতাশ না হইয়া, এইরূপ লাভ জনক ফসল উৎপন্ন করিলে জমির অভাব অনেকটা দূর হইবে।

মহাত্মার সাবরমতি আশ্রম।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার লিখিত সাবরমতি সত্যাগ্রহাশ্রম সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ গত আশ্বিন মাসের নব্য ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মহাত্মার আশ্রমটী প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষিদিগের আশ্রমের অনুকরণে স্থাপিত হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণের শান্তিপূর্ণ কুটীরের ছবি সাবরমতি আশ্রমে প্রতিফলিত হইয়াছে। সাবরমতি আশ্রম প্রাচীনকালের একটী ঋষিপল্লী বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক আশ্রমবাসী পরিশ্রমী ও ও স্বাবলম্বী। স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে কাহারও অবহেলা নাই। সকলকেই বয়ন করিতে হয়। বয়নই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। তাহা ছাড়া আশ্রমের নিয়মানুসারে কেহ কেহ গোসেবা করিবেন, কেহ কেহ বাগানের চাষবাস করিবেন। প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

আশ্রম দুইভাগে বিভক্ত; একটী সত্যাগ্রহীদের জন্য দ্বিতীয়টী ছাত্রদের জন্য; একটীর নাম সত্যাগ্রহাশ্রম ও অপরটীর নাম সোমনাথ ছাত্রালয়। এই সত্যাগ্রহাশ্রমের জন্যই ক্ষুদ্র সাবরমতি গ্রাম আজ এত সুপ্রসিদ্ধ। প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে এই সাবরমতির এমন কোন ভৌগলিক বিশেষত্ব নাই যাহার জন্য ইহা ভারতবর্ষে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে; কিন্তু ইতিহাস ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। মহাত্মা গান্ধীর কোন শত্রু আছে কি না জানিনা; কারণ মডারেট্ এমন কি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও বলেন যে মহাত্মাজির সহিত তাহাদের নাকি কোন শত্রুতা নাই; সত্য মিথ্যা জানি না; তবে ইহা ঠিক আজ শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলেই এই সাবরমতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে হয় ত এ আশ্রম একদিন ধূল্যবলুণ্ঠীত হইয়া পড়িয়া থাকিবে; ইহার জীবন্ত নির্দ্দেশ কিছুই তখন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে ইহার নাম খোদিত থাকিবে। ভারত-ইতিহাসের এক সঙ্কট সময়ে ইহার অভ্যুদয়; পরিণামে সফল হউক বা বিফল হউক ভারতবাসীর এক বিপদের সময় ইহা একটী সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং সেইমত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। ইহাই সত্যাগ্রহাশ্রমকে চির-অমর করিয়া রাখিবে।

"ছোট ছোট্ সুন্দর অনেকগুলি বাংলো। সুন্দর ইহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সেই বাংলোতে মহাত্মাজি সপরিবারে বাস করেন। এই বাংলোটি মহাত্মাজী নিজে করেন এবং এইখানেই আশ্রমের প্রথম স্থাপনা হয়। প্রথমে এই একটীমাত্র বাংলো ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে ইহারই চারিদিকে অন্যান্য গৃহগুলি হইয়াছে। মধ্যে এক

সুপ্রশস্ত বাগান, এখানে অনেক প্রকার শাক শবজি হয়। বাগানের একদিকে বয়ন বিদ্যালয় ও অফিস, এবং অন্যদিকে আশ্রমের গোশালা। গোশালায় অনেকগুলি গরু আছে; এখান হইতেই আশ্রমে ও ছাত্রাবাসে দুধ সরবরাহ করা হয়; এ দুধ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। আশ্রমবাসীগণকে অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়। মাছ মাংশ বা অন্য কোনপ্রকার উত্তেজক জিনিষ ভক্ষণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ ঘি ও দুধ পায় বলিয়াই তাহারা যেন বাঁচিয়া আছে। এই জন্যই এই গোশালাটী আশ্রমে এত প্রয়োজনীয়।

"প্রত্যেক আশ্রমবাসী ইচ্ছা করিলে সপরিবারে বাস করিতে পারেন; তাঁহাকে তদ্রূপ বাসা দেওয়া হয়; কিন্তু আশ্রমের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নিয়ম যে তাঁহাদিগকে সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে; ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই আশ্রমের প্রধান ভিত্তি এবং মহাত্মা মোহনদাস করমচন্দ গান্ধি স্বয়ংই এই মহান আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। সকল আশ্রমবাসী ও ছাত্রগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে "বাপুজি" বলিয়া সম্বোধন করে; "বাপুজি" মানে বাবা। শ্রীমতি গান্ধিও তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আশ্রমের সকলেই শ্রীমতি গান্ধিকে "বা" (অর্থাৎ মা) বলিয়া ডাকে এবং মহাত্মাজিও তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে হইলে "বা" বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

আশ্রমবাসীগণকে সকালে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করিতে হয়; আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ৪ টার সময় নদীতে স্নান করিতে হয়। শীত হউক গ্রীষ্ম হউক ৪টার সময় স্নান করিতেই হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। সর্দ্দি, কাশি বা ব্রণকাইটিসের ভয় করিলে চলিবে না। আশ্রমের নিয়মাবলীতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে আশ্রমে পীড়িত হওয়া পাপ; শুনিতে কঠিন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কথাটি অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মানুষের রোগ হইয়া থাকে তাহার কিছুই এখানে নাই বলিলেও হয়। আমেদাবাদ সহর আশ্রম হইতে অনেক দূরে, আশ্রমের নিকটেও কোন গ্রাম নাই, নদীর উপরেই বিজন মাঠে আশ্রম নিতান্ত একেলা। আশ্রমের ভিতরে বাহিরে যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিদ্যমান তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় পরিচ্ছন্নতার সহিত পবিত্রতার নিকট সম্বন্ধ আছে। বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, তদুপরি সাত্ত্বিক আহার; ব্যারাম হইবার তত কারণ নাই। মাছ, মাংশ এখানে নিষিদ্ধ; লঙ্কা এলাইচ বা কোন প্রকার গরম মশলা কেহ খাইতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত আহারের যাহা যাহা প্রয়োজন—দুধ, ঘি, চাউল, ডাউল, ময়দা ও শাক শব্জি সমস্তই বিনামূল্যে আশ্রম-ভাণ্ডার হইতে সরবরাহ করা হয়। যাঁহারা আশ্রমে থাকেন তাঁহারা কোন প্রকার

মাহিনা পান না ; কেবলমাত্র আহারীয় দ্রব্য তাঁহারা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। কিন্তু (mess) করিয়া একত্রে আহারাদি তাঁহারা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা পরিবার লইয়া আছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা একাকী আছেন তাঁহারা সকলেই স্বপাক আহার করিবেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে, তাঁহারা কিন্তু নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাইবেন। যিনি একাকী আছেন তাঁহাকে একজনের উপযোগী দ্রব্যাদি দেওয়া হয়, আর যাঁহারা পরিবার লইয়া আছেন তাঁহারা তদনুরূপ দ্রব্যাদি পাইয়া থাকেন। এই তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা, তাহার উপর নিয়মিত পরিশ্রম আছে, ইহা সত্ত্বেও যদি রোগ হয় তবে কি ইহাকে পাপ বলা যায় না ?

"তাঁহাদের পরিশ্রমের কথা বলিতেছি। স্নানের পর সকলে একত্রে প্রার্থনা করিয়া ব্যায়াম করিবেন। তাহার পর প্রত্যেককে নিজের নিজের ঘর পরিষ্কার করিয়া বয়ন-বিদ্যালয়ে যাইবেন ; বয়নই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ ; সকালে ও দুপুরে দৈনিক তাহারা ৮ ঘণ্টা বয়ন করিবেন। এই বয়ন বিদ্যালয়ে কোটের কাপড়, সার্টের কাপড়, ধুতি, সাড়ি, আসন, কম্বল ইত্যাদি সমস্তই তাঁহারা প্রস্তুত করেন। ইহার উপর, তাঁহাদের নিজেদের কাজ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা নিজহস্তে পাক করিবেন নিজের বাসন নিজে মাজিবেন, নিজের কাপড় নিজে ধুইবেন, নিজের ঘর নিজে পরিষ্কার করিবেন। চাকর নাই, ধোপাও নাই, সমস্ত কাজ নিজেকে করিতে হইবে ; কোন প্রকার বিলাসিতা করিতে পারিবেন না। যখন যেখানে যাইবার আদেশ হইতেছে, সেখানে যাইতেছেন ও আদেশানুরূপ কাজ করিতেছেন ; কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবেন না। আমি যখন আশ্রমে যাই তখন মহাত্মা গান্ধির বিচার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে ; আশ্রমবাসিগণ আদিষ্ট হইয়া অনেকেই বরদৌলি গিয়াছেন ; কেহ কেহ বা যাইতেছেন। সেখানে তাঁহারা বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত অনেক বিপদ আসিবে ; কিন্তু ভবিষ্যতের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বাধা বিঘ্নের জন্য তাঁহারা সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত ; ইহাই তাঁহাদের শিক্ষা ও ইহাই তাঁহাদের দীক্ষা। বরদৌলির এই কর্ম্মক্ষেত্রে আজ স্বয়ং শ্রীমতি কস্তুরীবাই গান্ধি তাঁহাদের নেত্রী।

"সত্যাগ্রহাশ্রমের নিকটেই "সোমনাথ ছাত্রালয়।" একটী বৃহৎ দোতালা বাড়ি, প্রায় দেড়শত ছাত্র থাকিতে পারে। স্কুলের জন্য কোন ভিন্ন বাড়ি নাই ; এই ছাত্রাবাসের মধ্যেই তাহাদের স্কুল হইয়া থাকে। আশ্রমের বাহির হইতে কোন ছাত্র এখানে পড়িতে আসে না, ছাত্রেরা এখানেই পড়ে এবং এখানেই থাকে ; সমস্ত খরচ বাবদ প্রত্যেকের মাসে ১৫৲ দিতে হয়। সত্যাগ্রহাশ্রমে যাঁহারা পরিবার লইয়া আছেন তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুলটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঁচ মাইলের মধ্যে আর দ্বিতীয় স্কুল নাই, আর থাকিলেও জাতীয় বিদ্যালয় ব্যতীত অপর কোন স্কুলে তাঁহারা ছেলেমেয়ে পাঠাইবেন না। এই সকল বালক বালিকা এই স্কুলেই অধ্যয়ন

করিয়া থাকে। স্কুলে যাঁহারা শিক্ষকতা করিতেছেন তাঁহারা থাকিবার জন্য ছোট ছোট বাড়ি পাইয়াছেন—সামান্য বেতন ও পান; একাকীও আছেন আবার অনেকে পরিবার লইয়া আছেন। "সোমনাথ মন্দিরে" ছাত্রী থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই; কেবলমাত্র ছাত্র থাকিবে; কিন্তু স্কুলে ছেলে ও মেয়ে সকলেই পড়ে।

"সত্যাগ্রহাশ্রমের সাধারণ নিয়মগুলির সহিত ছাত্রাবাসের নিয়মের কোন পার্থক্য নাই। ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই প্রাতে ৪টার সময় উঠিবে; ছাত্রগণ পালাক্রমে রোজ ছাত্রাবাস ঝাড়ু দিবে; রান্নাঘর ধুইবে, ইন্দারা হইতে জল আনিয়া সমস্ত জলাধারগুলি পূর্ণ করিবে। সেই জলে পাক হইবে, সেইজলে তাহারা থালা বাসন ধুইবে এবং সেই জলই তাহারা পান করিবে। পাক করিবার জন্য দুইজনমাত্র পাচক ব্রাহ্মণ আছে; কিন্তু চাকর একটীও নাই ভৃত্যের করণীয় সমস্ত কার্য্যই ছাত্রদিগকে করিতে হইবে। সত্যাগ্রাহীদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও প্রাতে স্নান করিতে হইবে; প্রার্থনা ও ব্যায়াম শেষ করিয়া তাহারা ৬টার সময় রান্নাঘরে আসে; প্রত্যেক ছাত্রকে দুই একখানি রুটি ও আধসের দুধ দেওয়া হয়; এই দুধ বিশুদ্ধ, কারণ ইহা আশ্রম-গোশালা হইতে ছাত্রালয়ের জন্য খরিদ করা হয়। প্রাতরাশের পর সকলে আপন আপন ক্লাসে চলিয়া যায়; কেহ যায় চরকায় সূতা কাটিতে, কেহ যায় পিঁজিতে, আর কেহ বা যায় বয়ন শিখিতে। উত্তমরূপে সূতা কাটা শিখিলে তাহাকে পেঁজার কাজে (Carding class) পাঠান হয়; পেঁজা শেখা শেষ হইলে তবে বয়ন শিখিতে যাইবে।

"বেলা দশটার সময়ে সকলে আহার করিতে আসিলে, প্রত্যেকেই নিজের আসন নিজে করিয়া লইবে; আহারের পর নিজের থালা বাটি ও গ্লাস নিজে মাজিবে। আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আবার তাহারা আপন আপন ক্ল্যাসে চলিয়া যায়। দুপুরে নিতান্ত অল্পবয়স্কছাত্রদিগকে কিছু সময়ের জন্য অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়; বয়স্ক সকলেই ৪৷৷০ টা পর্য্যন্ত সূতা কাটিবে, পিঁজিবে ও বয়ন শিখিবে। কারণ মহাত্মাজি বলেন "ভারতে এখন শান্তি নাই; আমাদের যুদ্ধ চলিতেছে; তাই তদনুরূপ ব্যবস্থা দরকার।

"তিনি বলেন "আমি নিজে তাঁতী ও চাষী, আমার ছাত্রদিগকে ও আমি তাঁত ও চাষ শিখাইতে চাই। কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে তাহারা যেন বিমুখ বা ক্ষুণ্ণ না হয়; honest profession যে কোন প্রকারই হউক না কেন, তাহাকে তাহারা যেন নিন্দনীয় বলিয়া মনে না করে।"

"বেলা ৫টার সময় আবার আহারের ঘণ্টা পড়ে, ইহা জলখাবারের ঘণ্টা নহে; ইহাই দিনের শেষ আহারের আহ্বান। ইহার পর রাত্রে আর কোনপ্রকার আহার হইবে না। মহাত্মাজীর মতানুসারে রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে ভোজন করা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ভোজন শেষ করা উচিত। এই সন্ধ্যাকালীন আহারের

পর এক ঘণ্টা ছুটি থাকে ; তারপরে আবার সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দিনের কাজ শেষ হইয়া আসে ; তখন সন্ধ্যায় নদীর ধারে কেহ বা গান করে, কেহ বা খেলা করে—বাগানে কেহ বা গল্প করে কেহ বা ভ্রমণ করে। কিন্তু ৮॥ টার পরে আর আলো জ্বলিবে না ; সব অন্ধকার ; সকলেই আপন আপন ঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছে।

"সপ্তাহে একদিন মাত্র তাহাদের ছুটী থাকে ; সেদিন শুক্রবার। কোন কোন ছুটীর দিন শিক্ষকের সহিত তাহারা নিকটস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দেখিতে যায়। এই দিনটী শিক্ষক ও ছাত্র সমভাবেই উপভোগ করে। আমিও একদিন তাহাদের সহিত গিয়াছিলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির সে কি ছুটাছুটি। অনেক ঘুরিয়া আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। তখন বেলা প্রায় ৩টা ; অত্যন্ত রৌদ্র ও অত্যন্ত গরম। আমার অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল। আমি আমার বন্ধুর নিকট প্রস্তাব করিলাম যে তাহার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে বরফ ও লিমনেড আনিয়া সকলকে দিই। তিনি শুনিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন 'কি ? লিমনেড বরফ ? ভারতের কয়জন লোক খায় ? প্রচুর জল আছে ; ছেলেরা পেট ভরিয়া জল খাক, কথাটি খাঁটি সত্য। এখন সোডা লিমনেড দেখিলেই আমার এই দিনকার কথা মনে পড়ে ও নিজের নিকটেই নিজে লজ্জিত হইয়া পড়ি।

এখানে সংযম আছে কিন্তু কঠোরতা নাই, শাসন আছে কিন্তু চাপাচাপি নাই। মহাত্মা গান্ধির কোন্ যাদুমন্ত্রে রুদ্র তাহার রুদ্র মূর্ত্তি পরিহার করিয়া সহজ সরল ভাবে আনন্দে মাতিয়া উঠে।

"আশ্রমের কথা বলিয়াছি, ছাত্রাবাসের কথাও বলিলাম। এখন এখনকার প্রার্থনার কথা কিছু বলিয়াই আজ এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রার্থনা দুইবার হয়, প্রত্যুষে একবার আর সন্ধ্যা ৭ টায় আর একবার। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, শিক্ষকগণ ও আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহীগণ সকলেই এই সময়ে একত্র হন ; মোট কথা আশ্রমে স্ত্রী পুরুষ যাহারা থাকেন সকলেই এই সময় একই স্থানে সমবেত হন। নদীর ঠিক উপরেই মহাত্মাজীর বাংলোর পাশে বাগানের মধ্যে প্রার্থনা হয়। আচার্য্য বলিয়া তেমন কিছুই নাই ; আশ্রমের যিনি সঙ্গীতাধ্যাপক তিনি একটি গান করিয়া প্রার্থনা সুরু করেন। নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভুলিয়া নিজের নাম করিবার জন্য এ গান গাওয়া হয় না। এই গানের একটী উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে ও সমবেত ব্যক্তিগণকে কিছু সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া ; সেইজন্য অধ্যাপকের সহিত সকলেই সমস্বরে গান করিতে থাকে। গানটী সকলেরই মুখস্থ হইয়া যায়। ক্রমাগত ৭.৮ দিন রোজ একই গান অভ্যাস করিয়া আয়ত্ব করা হইলে দ্বিতীয় একটী গান তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ; এই প্রকারে ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট করা হইতেছে। স্ত্রীপুরুষ

বালক বালিকা সকলেই হাত তালি দিয়া যখন সমস্বরে গানটী গাহিতে থাকে, তখন ইহাকে একটী গানের ক্লাস বলিয়া মনে হয়—প্রার্থনা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা মনে করি (ভয় করি ?) ঠিক তাহা নহে ; অথচ গানটী প্রার্থনা বিষয়ক। শিক্ষকের সহিত সকলে একত্রে সমস্বরে গান করিতে, সহজে গানের যে তালমান থাকে, তাহাই যেন যথেষ্ট ; নতুবা তালমানের দিকে ছাত্রদের কোন বিশেষ লক্ষ্য নাই। এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে গেলে প্রার্থনার হানি হইতে পারে। অনেক মন্দিরে দেখিয়াছি গান হইতেছে যেন গানের জন্য, প্রার্থনার জন্য নহে ; গায়কের বিশেষ দৃষ্টি তালমান ও নিজের খ্যাতির দিকে, প্রার্থনার দিকে নহে। গানটী ঠিক গাওয়া হইতেছে কি না তাহাই তাহার ভাবনা, কিন্তু প্রাণের ঝঙ্কার তাহার মধ্যে কতখানি তাহার কিছুই ঠিক নাই। গান তখন হইয়া পড়ে বাহিরের জিনিষ। এই প্রকারে সঙ্গীত ও প্রার্থনা ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়ে, তাহাদের সমন্বয় থাকে না। এই দুইটী জিনিষের সুমধুর সমন্বয় দেখিয়াছি কৃষকদিগের কর্ম্ম শেষে সন্ধ্যা-সঙ্গীতে আর দেখিলাম আশ্রমের প্রার্থনায়। সহজ সরল ভাবে সকলে গান করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে কানের ভিতর দিয়া মরমেও কিছু প্রবেশ করিতেছে ; গান কেবল গান নহে, প্রার্থনা দিয়া ভরা গান ; আবার প্রার্থনাও সেই জন্য নীরব নীরস নহে। এমন মধুর সরস সতেজ প্রার্থনা আমি অল্পই শুনিয়াছি। আমি ছাত্রদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি তাই বেশ ভাল করিয়া জানি যে তাহারা এই প্রার্থনা সময়ের জন্য সত্য সত্যই উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

———

মনোনীত প্রবন্ধ

বাঁশ (বংশ)

মালদহ জেলায় বিস্তর বাঁশ জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য জেলায় কিরূপ হয় জানা নাই। আমাদের এতদঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছুনা কিছু বাঁশ বাগান আছে। বাঁশ অনেক জাতীয় হয়, তন্মধ্যে এ জেলায় মাকলা, জাবা, বড় বাঁশ ভালুকা, বেউড় এই কয়েক জাতীয় দেখা যায়। মাকলা বাঁশে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত সাজ সরঞ্জামাদিই হয়, তদ্ভিন্ন ইহাতে কুলো, চুবড়ী, ধুচুনী, ঝুড়ি, ফুলের সাজি, চালুনী, চেটাই ইত্যাদি বহুবিধ গৃহ কার্য্যের সামগ্রী ও প্রস্তুত হয়, মৎস্য ধরিবার সাজ এতদ্দেশ প্রচলিত ঘনী, দিওব, পোই, অগ্ডা, ভাঁড়, প্রভৃতি তৈয়ার হয়, আরও কৃষকদের মাথার টোকা ও একপ্রকার ছাতা প্রস্তুত করে। পূর্ব্বে যখন বিলাতী ছাতা আমদানী হয় নাই, তখন এই বংশ নির্ম্মিত ছাতাই সকলে ব্যবহার করিত। যৎসামান্য বেত্র দণ্ডের ছাতাও প্রচলিত ছিল। উহার শিকগুলি বেত্র দণ্ডে নির্ম্মাণ করিয়া উপরে কাপড় দেওয়া হইত, ক্রমশঃ নানাবিধ বিলাতীছাতার আমদানী হইয়া সভ্যতা ও বাবু গিরির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উভয় প্রকার ছাতাই উঠিয়া গিয়াছে। আজকাল ইতর ভদ্র সকলেই বিলাতী ছাতাই ব্যবহার করিতেছে, কেবল কৃষকগণ রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণ জন্য বাঁশের টোকা ব্যবহার করে। অপর কয়েক শ্রেণীর বাঁশে কেবল ঘরের খুঁটী মাত্র হয়। তবে স্থান বিশেষে একপ্রকার জাবা আছে, তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী বাখারিও প্রস্তুত হয়। ঐ বাঁশকে কেহ কেহ বাঁশিনী বা ভেলুয়া জাবা কহিয়া থাকে। বড় বাঁশ ও ভালুকা খুব মোটা ও বড় শক্ত, একবার ঘরের খুঁটী দিলে ৩।৪ বৎসরাধিক যায়। ভালুকা বাঁশ ভিতরে ফাঁপা ও ইহার পর্ব্বগুলি এক হস্তের ও বেশী লম্বা হয়। ইহাতে গাভী দোহদোহনের কেঁড়ে ও প্রস্তুত করে। বেউড় বাঁশে বিস্তর কাঁটা হয়। বাঁশের পাতা, শিকড়, কাষ্ঠ, কঞ্চি সমস্তই জালানী কাষ্ঠের কার্য্যকরে। এতদঞ্চলের ডোম ও হাড়ি জাতীয়েরা বাঁশ দ্বারা উল্লিখিত দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ও উহাই তাহাদের একমাত্র জীবনোপায়।

বাঁশ পল্লীগ্রামে গৃহস্থের একটী আবশ্যকীয় বস্তু। কি গৃহ নির্ম্মাণ, কি গার্হস্থ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ, কি রন্ধন, কি লিখন প্রভৃতি কার্য্যে পূর্ব্বে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁশের কঞ্চি ও বাখারি, মোটা কাশ নির্ম্মিত লেখনী দ্বারা লিখন কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমরা প্রাচীনগণের হস্ত লিখিত অনেক পুস্তক দলিল দস্তাবেজাদি ঐ সকল লেখনীর লেখা দেখিয়াছি। কালক্রমে রাজহংস, ময়ুর পুচ্ছ, ষ্টীল পেনাদি প্রচলিত হওয়ায় উক্ত লেখনী লুপ্ত হইয়াছে। চীন দেশে বাঁশ দ্বারা যোদ্ধার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ, নৌকা, মান দণ্ড, পাদুকা, ছত্র, সম্মার্জ্জনী, নৌকার পাইল বর্ষা কালীন দেহাবরণ, ভেলা, পুষ্পাধার, আসন, বাক্স, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে।

বাঁশ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। কোন কোনও উদ্ভিদ বেত্তা পণ্ডিতের মতে তৃণের পূর্ণ বিকাশ মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এক গাছী দুর্ব্বা ও একটী বাঁশের গঠন ও বর্দ্ধন প্রণালী একইপ্রকার।

অগ্নি পুরাণ, অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে বাঁশের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথা ;

"বংশে ত্বকসারঃ কর্ম্মার ত্বচিস্তৃণধ্বজঃ।
শত পর্ব্বা যব কলো বেণু মস্কর তেজনাল॥
বেণব কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্ত্য নিলোদ্ধতাঃ।
গ্রন্থীনা পর্ব্ব পরুষী গুন্দ্র স্তে জনকঃ শরঃ॥"

ত্বকসার, কর্ম্মার, ত্বচীসার, তৃণবীজ, শত পর্ব্ব, যবফল. বেণু, মস্কর, তেজন। বাঁশের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ হয়, তাহাকে কীচক বলে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বাঁশের অনেক নাম আছে, যেমন মহাবল, ধনুদ্রুম, ধানুষ্য, দৃঢ় গ্রন্থি ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে ও বাঁশের কতিপয়গুণ বর্ণিত হইয়াছে যথা ;—

"বংশ সরোহিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তি শোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাগ্র ব্রণ শোথ জিৎ॥
তৎকরীর কটু পাকে রসে রুক্ষো গুণঃ শরঃ।
কষায় কফ কৃৎস্বাদু বিদাহী বাত পিত্তলঃ॥
তদ য বাস্ত সরা রুক্ষোঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাত পিত্ত করা উষ্ণা বদ্ধমূত্রা কফপহাঃ॥"

বাঁশ সারক, হিমবীর্য্য, স্বাদু, কষায় রস, বস্তি শোধক, ও ছেদন, ইহা কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথ নষ্ট করে। ইহার অঙ্কুর কটু, কষায়, মধুর রস বিশিষ্ট, পাকে কটু, রুক্ষ, গুরুপাক, সারক,বিদাহী, কফ, বায়ু, পিত্তকে বর্দ্ধিত করে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, মূত্র রোধক, কফ নাশক, বাঁশ হইতে যে বংশ লোচন জন্মে তাহা একটী লাভজনক পণ্য ও অনেক ভৈষজ্যে ব্যবহৃত হয়।

দোঁয়াশ ও বালুকাময় মাটীতে বাঁশ ভালরূপ জন্মে, বর্ষার প্রারম্ভে বাঁশের "কোঁড়ী"

বাহির হয়। এই সময় বাঁশ রোপণ করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই রোপণর প্রশস্ত সময়। পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক বাঁশের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। বাঁশবাগান মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া দিলে ইহার বৃদ্ধি হয়। খনার বচনে আছে, "চৈতে আগুণ বৈশাখে মাটী, বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি"। অর্থাৎ তিন বৎসরের বাঁশ না হইলে কর্ত্তন করা উচিত নহে।

রীতিমত বাঁশ বাগান প্রস্তুত করিতে পারিলে বেশ লাভবান হইতে পারা যায়। এক এক ঝাড়ে দেড় শতাধিকেরও বেশী বাঁশ হইতে পারে। বর্ষার সময় যখন বাঁশের "কোঁড়া" বাহির হয়, তখন গবাদি পশুতে খাইয়া বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে থোড়ের ন্যায় তরকারীতে খাইয়া থাকে। ইহার বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। যদি বাটীর নিকট বাঁশবাগান করিতে হয়, তবে বাটির পূর্ব্বাংশে রোপণ বিধেয়। খনা বলিয়াছেন, "পূবে বাঁশ, পশ্চিমে হাঁস, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা,"। অর্থাৎ বাটীর পূর্ব্বাংশে বাঁশবাগান, পশ্চিমে পুষ্করিণী, উত্তরে কলাবাগান ও দক্ষিণদিক একেবারেই খোলা থাকিবে। বাঁশ যদি কিছুদিন জলে পচাইয়া গৃহ কর্ম্মাদিতে লাগান যায়, তবে খুব শক্ত হয়, ও তাহাতে ঘুণ বা কোন পোকা ধরেনা। খনার বচনে আছে, "বাঁশ যদি পেকে পড়ে জলে, কি করতে পারে তাকে আর শালে।" বাঁশ একবার লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, এমন কি যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ২।৩ পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে। বাঁশের ব্যবসাও বেশ লাভজনক, ১২।১৪৲ টাকা হইতে ২০।২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি শত বিক্রয় হইতেছে। অনেকে বাঁশবাগান তুলিয়া দিয়া অন্যান্য ফসল করিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ বাঁশবাগানের বংশলোপ হইলে আমরা অনুমান করি অদূর ভবিষ্যতে টাকায় ১টী বাঁশ পাওয়া দুরুহ হইয়া উঠিবে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

আলু

আজকাল কি ধনী কি দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের কাহারও একদিন আলু না হইলে চলে না। বস্তুতঃ আলু তরকারীর একটি প্রধান অঙ্গ। সুক্তা, চড়্চড়ি, ঝোল, ডালনায় কোনও না কোনও আকারে আলু ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মাছ ও দুধ আহারের প্রধান উপাদান ছিল; এবং যখন বাঙ্গালী সহরে ও মসীজীবি হইয়া যায় নাই, তখন দেশে উহাদের অভাবও ছিল না। কিন্তু আজকাল মাছের সের ১।০ ও টাকায় /২॥০ /৩ সের দুধ তাহারও অর্দ্ধেক জল। নেহাৎ অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন অন্য সাধারণ লোকের উপযুক্ত পরিমাণে মাছ ও দুধ নিত্য ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলুই এখন মাছ ও দুধের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা প্রচলনও "দুধে মাছে ভাত" হইতে "আলু ভাতে ভাত" এ পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরন্তু ইহা বলিলেও কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ জন কেরাণী বাবুকে আটটার সময় ডালের জল ও আলু ভাতে ভাত খাইয়া, খাব খাইয়াই বা বলিব কেন, নাকে মুখে গুজিয়া সাহেবের তাড়না ও গঞ্জনা না খাইবার জন্য, ১০টার মধ্যে আফিসে আসিয়া হাজিরা দিতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আলু ১॥০ হইতে ৪॥০ মন দরে বিকাইত কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে ৫৲ হইতে ১০৲ ১২৲ মামুলি দর হইয়াছে। বিশেষতঃ গত দুই বৎসর হইতে আলুর মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। দর বৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে নিম্ন লিখিত কারণগুলিতে আলুর দর অসম্ভব বাড়িয়াছে। প্রথমতঃ আলু বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায় না। পশ্চিম দেশ হইতে আমদানী হয়। পশ্চিমে আলুর ফসল ভাল হয় নাই এবং যাহাও জন্মিয়াছিল তাহাও ভাল না হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জমা করিয়া রাখা যায় নাই, কারণ পচিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ রেলের অতিরিক্ত ভাড়া—এই কয় বৎসরে রেলের মাশুল দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স—যদিও সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সব-চার্জ্জ উঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু রেল কোম্পানী তাহার স্থলে মাশুল বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। চতুর্থতঃ ট্রেণের অল্পতা—এই জন্য আলুর আমদানী সুময় মত হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ বিদেশে রপ্তানী। ষষ্ঠতঃ সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চাষী ও মজুরদিগের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি।

গৌহাটী হইতে চালান আসিয়া তবুও অনেকটা মন্দা কমিয়াছে। এ বৎসরও

পশ্চিমে যে আলুর সুবিধাজনক ফল হইবে, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ ও সরকারী কৃষি বিভাগ সন্দিহান। তবে এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক এমন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিদেশের আমদানী ও রেল কোম্পানীর খামখেয়ালীর উপর রাখা একবারেই উচিত বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন বাঙ্গালা দেশে আলুর উপযোগী জমি যথেষ্ট রহিয়াছে ও আলুর চাষে বিস্তর মেহন্নত করিতে হয় না এবং ইহার আবাদে কৃষকগণ বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আলুর চাষ ছিল না, কিন্তু এখন বৈঁচবাটী অঞ্চল আলুর প্রধান মোকাম। বর্দ্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণাতে আলুর আবাদ হইতেছে বটে কিন্তু এ সকল জেলাতেও আলুর চাষের প্রসার আরও হওয়া উচিৎ। দুঃখের বিষয় পূর্ব্ব বঙ্গ একেবারে উদাসীন! পূর্ব্ব বঙ্গের জমিতে আলুর আবাদ পর্য্যাপ্তরূপে হইতে পারে, কৃষিবিৎগণ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যখন সকলের কর্ত্তব্য যে স্থানীয় কৃষকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া যাহাতে তাহারা আলুর চাষে মনোযোগী হন সেইরূপ করেন। আলুর রেল ভাড়া প্রভৃতি এত অধিক যে পশ্চিমা আলুর সহিত আমাদের দেশের আলু প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। তাহাতে খরিদ্দরেও কৃষক উভয়েই লাভবান হইবেন।

আলু আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল না। তখন পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে আলুর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। কেবল ইংরাজি শিক্ষিত লোকে সখের জন্য আলু ব্যবহার করিতেন। এখনও হবিষ্যাদিতে আলু চলে না। জগন্নাথ দেবের প্রসাদের মধ্যে আলুর স্থান নাই বলিয়া বাঙ্গালী ভক্তগণ কতই না দুঃখ করেন। বিদেশীয় ম্লেচ্ছ দেশজাত বলিয়া পরিত্যক্ত। সাধারণে জানেন যে ইংরাজ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় তরকারীটি আমাদের দেশে প্রচলন করিয়াছেন। কথাটা আংশিক ভাবে সত্য বটে, কিন্তু আলু ইংলণ্ড বা ইউরোপের দেশজাত কৃষি সম্পদ নহে এবং ইউরোপবাসীও তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আলুর ব্যবহার জানিত না।

আমেরিকা দেশই আলুর আদিম জন্মস্থান। ইউরোপের সর্ব্ব জাতির মধ্যে স্পেন জাতিই প্রথমে শক্তিশালী হইয়া উঠেন ও উপনিবেশ স্থাপন, ব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশ বিদেশে গমনাগমন করেন। তাহারা কুইটো দেশ হইতে আলু আপনাদের দেশে লইয়া যান। ১৬০০ শতাব্দীর পুস্তকে আলুর নাম বাটাটা ও পাপা দেখা যায়। কার্ডন নামক স্পেনবাসী ধর্ম্মযাজক পেরু দেশ হইতে স্পেনে আলু লইয়া যান। তথা হইতে আলু ইতালী সেখান হইতে বেলজিয়মে প্রচার হয়। জন হকিন্স যখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবার পর ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন তখন অর্থাৎ ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রথমে আলু লইয়া আসেন। কিন্তু উহা সকরকন্দ ছিল, পরে ১৫৮৫ অথবা ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের সহযাত্রীগণ উত্তর কেরো-

লিনা দেশ হইতে আলু লইয়া আসেন ও স্যার ওয়াল্টার তাঁহার আয়র্ল্যাণ্ডের কর্ক প্রদেশস্থ জমিদারীতে আলুর প্রথম আবাদ করেন। সুবিখ্যাত অভিধান কর্ত্তা স্যামুয়েল বাত্মানের বন্ধু পারকিন্সন তাঁহার পুস্তকে (১৬২৯) লিখিয়াছেন যে তখনও আলু সখের মধ্যে পরিগনিত হইত এবং আলুকে তখন লোকে আলু সখের বা রুটি বলিত, কারণ পেরু দেশের অধিবাসীরা আলু হইতে এক রকম রুটি প্রস্তুত করিত।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ রয়েল সোসাইটী ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে আলুর বহুল প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। ১০০ বৎসর পরে তবে আলুর প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং আজকাল আলু আইরিশ জাতির শতকরা ৭৫ জনের প্রধান খাদ্য। স্কটলল্যাণ্ডের অধিবাসীগণের মধ্যেও "যই" এর পরেই আলু প্রধান খাদ্য বলিয়া ধরা হয়।

খোসা ও শাঁসের রঙ্ হইতে আলুর শ্রেণী বিভাগ করা হয়। আলুর শাঁসেও হলদে ও সাদারঙ্গ থাকে। প্রধাণতঃ তিন প্রকার আলু বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংমিশ্রণের ফলে আলুর অন্যান্য আকারও হইয়া থাকে। এক রকমের আলুর বীজ হইতে অন্য বৎসরে অন্য রকমের আলুও হইতে পারে, কিন্তু মিশ্র আলু এক রকমই থাকে পরিবর্ত্তন হয় না। আলুর চোখ হইতেও আলুর বিভাগ করা যাইতে পারে।

আলু চাষের জমি সাধারণতঃ দুই রকম ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে যথাঃ—পার্ব্বত্য ও নৈনতাল। গৌহাটি অঞ্চলে যথেষ্ট আলু জন্মে। শিলং আসামের পর্ব্বত শ্রেণীর সানুদেশেও মধ্যেও উপত্যকাদিতে নৈনিতালের মত বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট প্রকারের আলু উৎপন্ন করা সহজ সম্ভব। বেলে দো আশ মাটিতে আলু ভাল জন্মে এবং উহার চাষে প্রচুর সার ও জল সেচনের আবশ্যক হয়।

খইল পচা গোবর, ছাই, পুকুর বা নর্দ্দমার পুরাতন মাটি প্রভৃতি আলুর প্রধান সার।

রোপণ আলুর বীজ সংগ্রহ করিবার সময় বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন। উত্তমবীজ না হইলে ভাল ফসল পাওয়া যাইবেনা। যে সব আলু বেশ পাকা ও পুষ্ট হইয়াছে ও যাহার অনেক চোখ দেখা যায় তাহাই বীজরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোটা আলু রোপণ করা যাইতে পারে বা আলুর যতগুলি চোখ আছে ততগুলি কাটিয়া আলাদা করিয়া রোপণ করা যাইতে পারে, অবশ্য গোটা আলু হইতে বেশী ফলন হইবে ও ভাল ফল পাওয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেক টুকরার অন্ততঃ দুটি চোখ থাকা প্রয়োজন, নচেৎ কোন ফল হইবে না। টুকরা গুলি আলুর উপরি অংশের হওয়া দরকার, নীচের অংশ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কাঁচা আলু ও ছোট আলু হইতে যে

বীজ রোপণ করা যায় তাহাতে কোন ফল হইবে না। অবশ্য গাছ হইবে কিন্তু তেমন গুচ্ছা বাঁধিবে না। আলু বপনের সময় হইতে তাহাদের দুইটী বিভাগ করা হয়। প্রথম ফসলের আলু বাগানে ফলন বেশী না হইলেও নষ্ট হইবে না। বিভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আলু রোপন করিলে ফসল ভাল হইবে। এরূপ করিলে আলু পোকায় নষ্ট করিতে না। সারও বেশী লাগিবে না। সামন্য চুণ জমিতে দিলেই চলিবে। কিন্তু ফলন বেশী হইবে বলিয়া, পরের ফসলের আলু কীটদষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক, চাষীর পক্ষে ইহার আবাদ করা সমীচীন। প্রখর রৌদ্রের তাপে আলুর চোখ ফুটিয়া থাকে ও আলু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সারি বন্দী করিয়া আলু বীজ মাটির নীচে পোঁতা উচিত। উপরে ৪ চারি ইঞ্চি মাটির চাপ দেওয়া উচিত। বেশী চাপ দিলে অঙ্কুর উঠিবার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভবনা বেশী। এক এক লাইন আলুর সারি অন্ততঃ ১½ হইতে ২ হাত হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক আলু ১ বিঘত অন্তর দিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে, কারণ যখন গাছ হইবে অনাবৃত বাতাতপ সঞ্চার বহুল জমিতে আলু ভাল হয়। যে জমি অধিক পরিমাণে সূর্য্যের তাপ সঞ্চার করিতে পারে তাহাই আলুর পক্ষে উপযোগী যে জমিতে বহুকাল ধরিয়া লতা গুল্মাদি জন্মিয়া ও পচিয়া আছে, তাহা আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল জমিতে অন্য প্রকার সবজী জন্মে এরূপ দোআশ মাটিতে সার দিয়া আলু রোপণ করা যাইতে পারে। বেলে মাটিতে গোবর, মলমূত্র, পাতা লতা গুল্মাদির পচা সার দিয়া মাটি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আল বপন করা যাইতে পারে। নদীর ধারে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে যেখানে জল আসিয়া ডুবাইয়া দিবার সম্ভবনা নাই সেইখানে বা বর্ষাপ্লাবিত নদী সৈকতে যখন জল সরিয়া যাইবে সেইরূপ স্থানে আলুর চাষের বিশেষ উপযোগী, কারণ আলুর চাষে জল সেচনের সুবিধা হইবে। মোটামোটী দোয়াশ বেলেমাটিতে আলুর চাষ করিবে, সার প্রয়োজন তবে বেলে মাটিতে বিশেষভাবে সার না দিলে সেরূপ ফল পাওয়া যাইবেনা। দামোদর অজয়, তীস্তা, পদ্মা, গঙ্গা ও উহাদের শাখা নদীর উভয়কূলে বিস্তর আলু চাষের উপযুক্ত জমি পড়িয়া রহিয়াছে। লাল কাঁকুরে মাটীতে সার দিয়া সেচনের ব্যবস্থা করিলে আলু উৎপন্ন হইবে। আমাদের দেশে বাঁকুড়া, বীরভূম, চট্টগ্রাম, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় এইরূপ আলুর উপযোগী যথেষ্ঠ জমি আছে। বেহার অঞ্চলের মত পাত কূয়া হইতে জল তুলিয়া সেচনের ব্যবস্থা অল্প খরচে করা আমাদের দেশে আরও সুগম কারণ ৮।১০ হাত নীচেই জল পাওয়া যায়। দোআশ মাটিই আলুর পক্ষে বিশেষ ফল প্রদ হইলেও মোটামোটি ইহা জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, অন্যান্য যে সব জমিতে আক, তামাক রোপন করা যায়, তাহাতে আলু মিশ্রিত হইবে। যে সব জমিতে বা সদা সর্ব্বদা ভিজা অথবা সেঁত সেঁতে থাকে তাহা আলুর চাষের একবারে অনুপযুক্ত, সেই জন্য পরিত্যজ্য।

রাসায়ণিক বিশ্লেষণ—

আলুতে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি বিদ্যমান আছে।

নাইট্রোজিন—২,১

শ্বেতসার—১৮,৮

শর্করা—৩,২

কেট—০,২

লবণ—০,৭

জল—৭৫,০

কোন কোন আলুতে শ্বেত সার কম থাকে শত করা ১৩,৩০ শ্বেত সার এবং কোন কোন আলুতে শ্বেত সার শত করা ২৫ ভাগের বেশী পাওয়া যায়। ভস্মের ৫৯,৮ অব পটাস, ১৯,১ অব ফস্‌ফরিক অসিড।

বিলাতে বাগানে একটি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া দুই ফুট গভীর খাদ খনন করিবার পর তাহাতে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মানুষ বা পশুর মল মূত্রাদি ফেলা হয় তাহাতে ঐ জমির সার ভাল হয়। তাহার উপর ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি ফেলিয়া গোটা আলু ঘন ঘন করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয় এবং আলুগুলির উপর পচা পাতা, খড় প্রভৃতি দিয়া চাঁপা দেওয়া হয়। এইরূপভাবে রাখিলে ১ মাস মধ্যে আলুর অঙ্কুর উদ্গম হয়। কোন কোন স্থলে মাটির উপরে একটী চালি রাখা হয়। চালি উঠাইয়া লইলেই আলুর স্তবক গুলি এক সঙ্গে উঠিয়া আসিবে।

ডাল পালা বাহির হইবার পর যখন তাহারা আন্দাজ এক বিঘত পরিমাণ জমির উপর উঠে, মূল ডাটাটী রাখিয়া বাকী ডাটা খুলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয়, কারণ তাহাতে রস বিক্ষিপ্ত না হইয়া আলুর পুষ্টি সাধন করে। কোন কোন স্থলে মূলা ও আপুর বীজ অল্প পরিমাণ ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ৬ ইঞ্চি হইতে এক বিঘত পরিমাণ ডাঁটা বাহির হইলে আলুর প্রধান ডাঁটাটি রাখিয়া বাকী গুলি কর্ত্তন করা হয়। তাহাতে যদিও দুই চারি দিনের জন্য আলুর তেমন বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পরে আলু ও মূলা দুইই সুন্দররূপে হয় ও তাহার আস্বাদ ভাল হয়।

ব্যাধি—আলু নানান রকমে ব্যাধি গ্রস্থ হয়। আলুর পাতাতে প্রথমে বীজাণু প্রবেশ করে ও তাহার পর ডাঁটা ও ডাঁটার মধ্য দিয়া আলুর খোসা ও তাহার পর শাঁসে খাইয়া আলু নষ্ট করে, সেইজন্য আলুর বপন করিবার সময় বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া আলুর বীজ লওয়া উচিত, কারণ আলু পোকা দ্রষ্ট হইলে সমস্ত আলুই ঐরূপ হইবে। আলুর খোসায় চাকা চাকা দাগ, কালোদাগ আলুর শাঁসে নীলরঙ্গের দাগ, পাতাগুলি শুকাইয়া যাওয়া পাতা কোকড়ান, পাতায় কালোদাগ প্রভৃতি হইতে বুঝিতে

হইবে যে আলু রোগ দুষ্ট হইয়াছে। যতদূর সম্ভব ঐ সমস্ত চিহ্ন সরাইয়া লইয়া ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলা কর্ত্তব্য কারণ ক্ষেত্রের অন্য স্থানে ফেলিলে, সেখান হইতে বীজাণু আসিয়া আলুকে আক্রমণ করিবে। যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ঐ সকল রোগ দুষ্ট পাতা ডাঁটা প্রভৃতি লইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া ভাল। বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আলুর ব্যাধি নিবারণের জন্য অনেকে দুই ভিন্ন ভিন্ন জাতির আলু হইতে মিশ্রণ করিয়া আলুর চাষ করিতেছেন এবং যদিও দু'এক বৎসর ফল তাহাতে ফল পাইয়াছেন বটে, কিন্তু পরে আবার সেইরূপ হইয়াছে। আমেরিকায় ১৫ গ্যালন জলে ½ পাইণ্ট ফর্ম্মালিন মিশাইয়া সেইরূপ জলে বীজ দুই ঘণ্টা রাখিয়া বপন করিয়া থাকেন। কিন্তু রোগ দুষ্ট আলু বীজ বপন করা অপেক্ষা বপন করিবার পূর্ব্বে যত্ন করিয়া বীজ সংগ্রহ করাই আমাদের মতে প্রশস্ত পন্থা।

আলুর চাষের পর আলু উঠাইয়া গোলায় রাখিবার পূর্ব্বে যত্ন না করিবার ফলে আমাদের দেশে অনেকক্ষতি হয়। আলু পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বেশ সুপুষ্ট পাকা আলুর ডাঁটা পাতা প্রভৃতি ছড়াইয়া ফেলা উচিত, কারণ ঐ পাতা ও ডাটা হইতে বীজাণু আলুকে প্রবেশ করে ও তাহাকে নষ্ট করে। আলুগুলিকে জমা করিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া উচিত। কখনও ভিজা বা সেঁত সেঁতে জমিতে আলু রাখা কর্ত্তব্য নহে। শুকনা খটখটে জমিতে আলু রাখা কর্ত্তব্য। যদি জমির উপর বালি ছড়াইয়া তাহার উপর, আলু রাখিয়া আলুর উপর বালির চাপা দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে আলু নষ্ট হইবেনা। জমি হইতে ১ ফুট উপর মাচা বাঁধিয়া তক্তা ফেলিয়া তাহার উপর আলু নষ্ট হইবে না। মধ্যে মধ্যে আলু দেখা উচিত। কোন একটি আলু নষ্ট হইলে তাহাকে তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে, কারণ একটী পচা আলু হইতে গাদার সমস্ত আলু পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। আলুর খোসার উপর সাদা সাদা দাগ দেখিতে পাইলেই তাহা গাদা হইতে সরাইয়া ফেলা উচিত, কারণ পরে ঐ আলু গুলি পচিয়া যাইবে ও গাদা নষ্ট করিবে গন্ধক চুর্ণ প্রচুর পরিমাণ আলুর উপর ছড়াইয়া পরে গাদায় তুলিলে আলু পচিবে না।

পক্ষীচাষ বা পুল্ট্রী ফার্ম্মিং

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ছোট ছানাদের পক্ষে Insect pouder বিশেষ উপযোগী, কিন্তু বড় বা ধাড়ী পাখীদের জন্য Roughon lice ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লণ্ডনে স্প্রাট্ পেটেণ্ট ও আমেরিকায় বহু পাখীর উপকরণ ব্যবসায়ীগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ কীট নাশক গুঁড়া বা চূর্ণ সস্তাদরে বিক্রয় করিয়া থাকে; আমার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিয়া ব্যবস্থা করিলে আমি এই সকল আনাইয়া দিতে পারি। এখন আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দরকার যে বহু সংখ্যায় মূর্গী, হাঁস, ছাগলাদিখাদ্যের জন্য উৎপাদন করা; তাহা করিতে হইলে আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষকদের এবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তজ্জন্য জাতীয় শিক্ষা সংঘের নায়কগণ অথবা বন্ধুবর শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস বা ডাঃ সার নীলরতন সরকার বা ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের নায়কগণ মনোযোগ করেন এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ এ বিষয়ে প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন তাহা হইলে আমার মনে হয় যে অনেকটা প্রকৃত কাজ অগ্রসর হইতে পারে।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং সম্বন্ধে অনেক কথা বক্তব্য আছে; তাহা পাঠক জানিতে যদি ইচ্ছা করেন তবে মল্লিখিত "গোপাল বান্ধব" পাঠ করুন; ইহা আমার নিচে ১।০ মূল্যে প্রাপ্তব্য। প্রত্যেক গৃহস্থ বঙ্গবাসীর ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য, এবং মল্লিখিত প্রবন্ধ সমূহ যাহা ইংরাজি ও বাঙ্গলায় ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করুন; আমাকে সডাকপত্র দিলে এইগুলির নিদর্শন বলিয়া দিতে পারি। সেইজন্য আমার স্বদেশবাসী ধনী দরিদ্র রাজা মহারাজা গৃহস্থ সকলের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই ত্যাগ স্বীকারের দিনে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত সমাজে ও নিম্ন কৃষককেন্দ্রে প্রচার করিয়া দিন ইহার দ্বারায় তাঁহারা প্রকৃত দেশের মঙ্গল বিধান করিবেন।

Roughon lice নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত করিয়া লইবে।—

বিলঘুঁটে অর্থাৎ ধুলা রহিত শুষ্ক গোবরের ঘুঁটে অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা কাল থাকিতে থাকিতে ধুলা চাপা দিয়া নিবাইবে; এবং পরে ঠাণ্ডা হইলে তাহা চূর্ণ করিয়া মিহি চালুনীতে ছাঁকিয়া, দুই সের ওজন লইয়া, তাহাতে সরু কড়া তামাক গুঁড়া মিশাইবে, কড়া তামাক পাতা রৌদ্রে শুখাইয়া চূর্ণ করিয়া সরু চালুনীতে ছাঁকিয়া লইবে। দুই সের ঘুঁঠাছাইর সহিত একসের দোক্তা গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহার সহিত দেড় ছটাক বা তিন আউন্স ফেনাইলে বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহার সহিত পুনশ্চ অল্প পরিমাণ সূক্ষ্ম গন্ধক চূর্ণ মিশাইলে উৎকৃষ্ট "রপ্‌থঅন্ লাইস" হয়;

এইগুলি বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং আবশ্যক মত ব্যবহার করিবে। মার্কিণ দেশের কৃষকেরা এই গুঁড়া খুব বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ছানাদের জন্য ব্যবহার করিবার জন্য এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্ব লিখিত, সকল উপকরণ গুলি অর্দ্ধ মাত্রায় লইয়া ব্যবহার করিবে অর্থাৎ ফেনাইলে ও গন্ধক অর্দ্ধ মাত্রায় ব্যবহার করিবে। পাখীদের এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে কাগজ বা তক্তা বা টীনের চাদরের উপর হাতে ধরিয়া মাখাইবে ; পোকাগুলি মাটীতে পড়িলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। বোল্‌পুরের মিঃ মীক (সনামধন্য আইসাটুইড্) ও এই মতের ও ঔষধের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে তাহা পরে অবগত হইবেন।

আমাদের ভারতের মত বড় মহাদেশের মধ্যে অনেক উত্তম উত্তম স্থান আছে যেখানে পক্ষীচাষ লাভ জনক রূপে করা যাইতে পারে। এইজন্য সভা সমিতি, প্রচার কার্য পুস্তক পাঠ, হাতে কলমে কাজ দেখা অশিক্ষিত বালকদের শিক্ষাদান ও চক্ষে দেখা প্রয়োজন এবং সময়ে সময়ে ভ্রমণশীল লেক্‌চারও শোনা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের চাষা ভাইগণ শুনে খুবই সুখী হবেন যে বাঙ্গলায় কেন ভারতের দানবীর চিরস্মরণীয়, গরিবের বন্ধু সার রাসবিহারি ঘোষ তাঁহাদের শেষ উইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমার কথায় আস্থা প্রদান করিয়া ভ্রমণশীল কৃষি লেক্‌চারশিপ্ দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় যে মুর্শিদাবাদ, বোগড়া, পুর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের যত বড় বড় নবাবদের তাঁহার উদাহরণ অনুকরণ আরও কিছু দান করিলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীগণ যাহাই করেন তাহা সুচারু এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাঁহারা মুর্গীর উন্নতি কল্পে প্রচার করে সভা সমিতি স্থাপন দ্বারা প্রত্যেক জাতীয় মুর্গীর উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। খাস বিলাতে ইউটিলিটী পুল্‌ট্রীক্লাব, ন্যাশান্যাল পুল্‌ট্রী ক্লব, ও প্রত্যেক কাউন্টিতে কৃষক সমিতির সঙ্গে পক্ষি চাষের উন্নতি বিধায়িণী সমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। রেডিং, হার্পার এডন্‌স্ কুলে, ইয়র্ক, সাসেক্‌স্ প্রভৃতি স্থানে এই বিষয় শিক্ষাদিবার পুল্‌ট্রীজার্ণেল, ফেদার্ড-ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি পত্রিকা প্রচারিত হইয়া থাকে।

আমেরিকা পক্ষিচাষের প্রধান দেশ। এখানে রিলাইএবল্ পুল্‌ট্রী জার্ণেল, ও আমেরিকান পুল্‌ট্রী এসোসিয়েশান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমাদের দেশের ধনী ইংরাজিনবীস সন্তানগণের এই পত্রিকা ও সমিতির মেম্বর শিপ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহার ফল বহুবিধ। পত্রিকা পাঠে জ্ঞান জন্মিবে, এবং পৃথিবীর পুল্‌ট্রী জগতের নববিকার ও চাষীগণের সহিত পরিচয় হইবেও ইচ্ছা ও আবশ্যক হইলেও পাখী আনান যাইতে পারিবে। আমাকে পূর্ব্বে সডাক পত্র দিলে আমি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

আমাদের ভারতের খাদ্য সম্ভার যেরূপ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহাত হইবেই তাহা বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। ইহার ফলে আমরা সখের জিনিষের উপর অর্থ ব্যয় করিয়া দিন দিন গরিব হইয়া পড়িতেছি তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছেন। যদি দেশের মধ্যে ডেয়ারি ফারম ও পক্ষীচাষ স্বল্প স্বল্প মূলধনে প্রবর্ত্তন করিয়া আমরা বিদেশ হইতে ১০।২০ কোটী টাকা যদি আমেরিকার মত ঘরে আনিতে পারি তাহা হইলে মন্দ হয় না।

তাই বলি যে হে ভাই বঙ্গবাসী দেশবন্ধু সার রাসবিহারি ঘোষ মহাশয়ের দানের ফল প্রাপ্তির জন্য তোমরা শীঘ্র ত্বদীয় উপযুক্ত ছাত্র ও দেশমান্য শিক্ষা বিভাগের অগ্রণী সার আশুতোষকে এ বিষয়ে জানান দাও। তিনি এবিষয়ে মনোযোগ করিলে তোমাদের জন্য ডেয়ারি ও পুল্‌ট্রী শিক্ষার ব্যবসা সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দররূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বিশ্বাস।

এ সম্বন্ধে সকল কথাই আমি পূর্ব্বে ২ পত্রে বলিয়াছি। তবে ২।৪ কথা শেষে শিক্ষা নবীষকে বলা প্রয়োজন; তাহা বার ২ পূর্ব্বে ২ পত্রেও বলিয়াছি এবং পরবর্ত্তী পত্র সমূহে তাহার ও আমার স্বদেশবাসী ভারতবাসী যিনি পাখি চাষ প্রারব্ধ করিয়া দেশের জাতীয় ধন ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিতে চাহেন, তাঁহাকে বলিব আমাদের দেশের মুসলমান চাষাগণ সামান্যভাবে পাখি চাষ করেন বটে কিন্তু তাহাতে দেশে পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় জাতীয় ধনাগম হয় না।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং একটি খুব লাভের ব্যবসা বলিতে হইবে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রতিকূল অবস্থারগুণে ও নানা অভাবনীয় কারণে ইহার পরিচালন লাভ করা আমাদের দেশে একরূপ সুদূর পরাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে দৈনিক বসুমতীস্তম্ভেমল্লিখিত "আমাদের গোরক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে বিশেষ উপকার ও জ্ঞান লাভ হইবে। তাহা গোপালবান্ধবে সহৃদয় পাঠক পাঠ করিতে পারেন।

বড়, সুটোল, পুরুষ্ট ডিমের বেশী দাম বাজারে পাওয়া যায়। আরোগী মুর্গীই ডিম দেয়; রোগী পাখি ডিম দেয় না; সেই জন্য ঝাকের পাখিদের স্বাস্থের প্রতি বার ২ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। পাশ্চাত্যদেশে এবং মার্কিণ দেশের উন্নত ও শিক্ষিত কৃষকগণ পত্রের দ্বারা পাখিচাষ এবং গোচাষ ও কৃষি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। ওহিওর "পুল্‌ট্রী স্কু" এবং মিনাপোলীশের কৃষি বিদ্যালয় এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ আমাকে সডাকপত্র লিখিলে আমি এই সকল বিদ্যালয় হইতে কৃষি এবং পাখিচাষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। আমাদের দেশে এসব কিছুই নাই। বম্বাই, কোয়েমচেটোর, কানপুর, সায়ালপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানের কৃষি বিদ্যালয়ে এই কলাবিদ্যা সব শিক্ষা করিবার

কোন ব্যবস্থা নাই ; বাঙ্গালার অভাগা কপালে একটা কৃষি স্কুল বা কলেজ পর্য্যন্ত নাই। নিউক্রনজ উইকের অধ্যাপক লুই ক্যানঙ্গাস্ সিটির অধ্যাপক কুইনবেরী, অধ্যাপক স্লাপ, অধ্যাপক পার্ক প্রভৃতি আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত "পাখিষাষ" শিক্ষক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল কলা বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের দেশের সহস্র-২ মুসলমান বালকগণ কুড়ে ও অলস জীবন কাটাইয়া দেশের দৈন্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের পাখি-চাষ ও পালনের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি দেশে থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কত পরিমাণ জাতীয় ধনভাণ্ডার পূরণ করিতে সমর্থ হইত, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের "জাতীয় শিক্ষাসংঘ" বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কগণ যদি কৃষি এবং পাখি-চাষের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দেশীভাষায় পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভ্রমণশীল কৃষি শিক্ষকের শীঘ্রের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের এরূপ অন্নসংকট হইত না। মহাত্মা গন্ধি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তথা মহানুভবগণ প্রমুখ এই পদদলিত দীন দেশের বন্ধুগণ নিম্নকৃষকদের হিতার্থে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সময় সম্পাদক তথা এই লেখক এই সকল বিষয়ে দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু সময় না আসায় সে দিকে কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই।

আজ দেশের লোক দারিদ্র্যের পীড়ণে, অনাহারের কষাঘাতে এদিকে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে বলিয়া এত কথা বলিলাম এবং ধারাবাহিক প্রবন্ধে এই অত্যাবশ্যকীয় কলাবিদ্যা আলোচনা করিয়া দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। যদি আমার ভাই স্বদেশবাসীগণ ও কৃষকবন্ধুগণ এদিকে চেষ্টা করে কাজে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আমার মনে হয় যে কত দীন কৃষক পরিবার অন্নসংস্থান করিয়া ছেলে পিলেদের প্রতিপালন করিতে পারে, বলা যায় না। আমি আশা করিয়া মাননীয় মিঃ প্রভাস চন্দ্র মিত্র বা মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাঁহাদের হাতে "পালিত ও ঘোষের" অর্থ স্তূপীকৃত আছে, প্রকৃত কৃষকদের শিক্ষোপযোগী কৃষিশিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবেন। একটা কথা যতই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় যে "বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা, কলকজায় প্রবর্ত্তন এদেশে করিলে দেশের খুব হিত হয় ; সে কথা কাগজে কলমে দেখিতে ও পড়িতে খুব ভাল বটে কিন্তু দেশের জল বায়ু, মাটী, অধিবাসীগণের শিক্ষা, সমাজবন্ধন, তাহাদের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এইগুলি দেশে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে ; যে সব অন্তরায় এ সম্বন্ধে আছে তাহা দূর করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সকল কথাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি। ত্যাগী শ্রীযুক্ত সুবাশচন্দ্র বসু প্রমুখ দেশের প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষগণের দৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে ? তাঁহার মত নিস্বার্থ নিরব কর্ম্মবীরগন কি দেশের বিশাল কৃষককুলকে

উন্নত ও শিক্ষিত করিবার পথ উন্মুক্ত করিবেন কি? তাই বলি যে আমার দেশের লোক "গোপালবান্ধব" ও "পাখিচাষ" পাঠ করুন; এইগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করান; এবং ঐ সকল পুস্তকের ছাপাইয়া সাধারণে বহুল প্রকাশের ব্যবস্থা করুন এই আমার প্রার্থনা; একটু অর্থলালসা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া দেশের লোকের প্রতিভাই বাঙ্গালী দেখ; গান্ধী মহাত্মার শিক্ষা ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

পাখী চাষ সম্বন্ধে অনেক কথাই ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। ২০০ টি মুর্গী ও ৯০টা পাঠা লইয়া ছোট খাঁট রূপে বেশ একটি পাখির ব্যবসা চালাইয়া একটি ছোট গৃহস্থ পরিবার প্রতিপালন করা যাইতে পারে। এই অসহযোগীতার ধুলায় দেশটা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে দেশে অধিক দৈন্য আসিতেছে, চকরার দিকে লোকের মন ধাবিত হইয়েছে। সংবাদ পত্র সকলের ফিরিওয়ালা সহরে খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু গো, পাখি বা মাছি চাষেরদিকে আমাদের দেশের কয়জন লোক মন দিয়াছেন বলুন দেখি? কাজেই যে দেশের লোকের মধ্যে এত অবসাদ, নূতন জিনিষ মাথায় লইবে না, এত অপরিবর্ত্তনশীল, সেখানে চির দুঃখ, দৈন্য আসিয়া ঘিরিবে না ত কি?

ডিম পাড়াঘরগুলি পৃথক হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার মধ্যে মর্দ্দা গুলিকে কদাচ স্থান দিবে না। এই ঘর গুলিতে খাঁচা বাসা বসাইবে (trap nest) সে কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যে ঘর গুলিতে বৎসর বৎসর ছানা পালনকরা হয়, সেইগুলি কলোনিগৃহ বা পরিবর্ত্তনশীল খোঁপ করিবে যাহাতে আবশ্যকমত একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া গিয়া বসাইতে পারা যায়; এইরূপ করিলে সংক্রামক রোগ ধরে না তাহাও অপর পত্রে বলিয়াছি। এইরূপ ৪০ ফিট লম্বা এবং ২০ ফিট চৌড়া গৃহে ২০০ হইতে ২২৫টা পাখি রাখা যাইতে পারে। আমেরিকার অন্তর্গত নিউ ব্রুনজুইক, নিউজার্স প্রভৃতি অঞ্চলে এইরূপ খোঁপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কৃষক চাহে একটা বড়ঘর না করিয়া ১০ × ১২ ফিট পরিমাণের ২টা ঘর করিয়া ঐ সংখ্যক মুর্গী পোষণ করিয়া বেশ লাভবান হইতে পারে।

তাহার পর কোন জাতীয় পাখি নির্ব্বাচন করা উচিত সে বিষয়ে ২।১ কথা বলিব। যে মোরগ বা মুর্গী রাখিবে নিজের ঘরে বা পালে, সেই গুলিকে বেশ পরীক্ষাও নির্ব্বাচন করিয়া রাখিবে যাহাতে তেজী, শক্ত, ও উত্তম স্বাস্থ্যকর পাখি থাকে। যদি ডিমের জন্য পাখি রাখা হয় তবে বেশী ডিম দাত্রী জাতীয় পাখি রাখিবে। আমাদের দেশে এইরূপ পাখি রাখা বড় হয় না, এবং এরূপ পাখী পাওয়াও দুষ্কর। যে পাখী বেশী ডিম দিবার জন্য উৎপাদিত হইয়াছে এইরূপ পাখি নিজ ঝাঁকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। যদি ডিম, করার (roaster) বা মেজের (tabele) এর জন্য পাখি রাখা অভিপ্রায় হয় তবে প্লিমথ রক্, ওয়াণ্ডোট্ অর্পিঙ্গটন এবং রোড আইল্যাণ্ড

(বড় জাতীয় পাখি পোষা সমীচীন তাহা পূর্ব্বে ও বলিয়াছি ; যদি কেবল ডিম প্রাপ্তি ইচ্ছা হয় তবে সাদা লেগ্‌হর্ণ জাতীয় পুষিবে। পড়ে শুনে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করে ২০০ মুর্গী ১০০ পাঠা (pullet,) একবৎসরের কম বয়স্ক মুর্গী) এবং ১০০টি জোয়ান মুর্গী (yearleicy) লইয়া শিক্ষানবিশ ব্যবসা আরম্ভ করিবে। পুলেটগণ, জোয়ান বা বৎসরী অপেক্ষা এবং বৎসরীগণ মুর্গী বা দুই বৎসরীগণ অপেক্ষা শতকরা ১০ হইতে ২০ পার সেণ্ট বেশী ডিম দিয়া থাকে ; সেইজন্ম দুই বৎসরীগণকে তৃতীয় বৎসরে হাটে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে ; সে কথা যেন শিক্ষানবীশের স্মরণ থাকে ; তাহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রেও বলিয়াছি।

এখন খাদ্যের বিষয় ২।১ কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। ৫ ভাগ মককাচুর্ণ ১ ভাগ গম চূর্ণ ২ ভাগ জই চূর্ণ ও ২ ভাগ যব চূর্ণে বেশ স্যাচ্ বা খুঁটে খাবার খাদ্য হয় ; অথবা ৬ ভাগ মককা, জই তিন ভাগ এবং গম ১ ভাগ মিশাইয়া খাইতে দিবে শুষ্ক জাউ বা dry mush নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিন খাইবার জন্য মুর্গীদের সামনে রাখিয়া দিবে, চোকর, গমচুর্ণ, মককাসিদ্ধ, জই চূর্ণ এবং মাংস টুকরা সমান ভাগে মিশাইয়া খাইতে দিবে অথবা চোকর এবং গম চূর্ণ প্রত্যেকে দুইভাগ, জই চুর্ণ এবং তিসি বা মসিনা সিদ্ধ এবং মক্কাসিদ্ধ প্রত্যেকটি একভাগ এবং মাংস টুকরা ২ ভাগ মিশাইয়া দিবে। পাখী যত ছাড়া থাকিবে ততই হৃষ্টপুষ্ট হইবে এবং খাদ্যের বিল ততই কম হইবে কারণ ছাড়া অবস্থায় তাহারা নিজেদের খাদ্য খুঁজিয়া আহরণ করিয়া লয় ১০০টা মুর্গী মোটামুটি আবশ্যকমত ১০ হইতে কুড়ি পাউণ্ড খাদ্য প্রত্যহ আবশ্যক করে।

আমেরিকা মধ্যবিত্ত চাষীরা ৪৫০০৲ টাকা মুর্গী ২০০ টা এবং কলকারখানা, পাত্র পুস্তকাদিতে খরচ করিয়া এবং ৩৫০০৲ টাকা খরচায় লাগাইয়া বৎসরে ২২০০৲ টাকা লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে জমী বাদে ৫ হাজার টাকায় বেশ একটি পাখী চাষের কারখানা চলে ; তবে চাই নিকটে বাজার, বিশ্বাসী সেবক ও পুস্তক এবং কল কব্জা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

কাপাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিম্ন ভূমিতে কাপাস প্রায় জন্মে না এবং কাপাসের মাটী ধুলার মত প্রস্তুত করিতে হইবে। ছোট ছোট চৌকাতে বীজ রোপন করিয়া চারা প্রস্তুত হইলে, চারাগুলি

আন্দাজ ১½ বিগৎ বা এক হাত পরিমাণ বড় হইলে সেই গুলিকে মাদা করিয়া সারবন্দী রোপন করিলে গাছ বেশ রোয়া হইল। বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে চৌকার বেশ ভালরূপ সার দিয়া বীজ বপন করিলে আষাঢ়ের প্রথমেই এবং শ্রাবণ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বীজ পূর্ব্বোক্তরূপ সার দিয়া চৌকায় বপন করিলে সেই চারা আশ্বিনের প্রথমে খেতে বসাইবার উপযুক্ত হয়; পোতা হইতে ১ বা ১½ মাসের মধ্যে চারা তুলিয়া বসাইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। বীজ বুনার পূর্ব্বে চৌকা শুষ্ক হইলে জল দিয়া বেশ ভিজাইয়া কোপাইয়া লইতে হইবে এবং জমীতে বেশ করিয়া গোময় সার বা উদ্ভিদ্-সার বা ক্যানিট দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে; অথবা গুয়েনো বা হাড়চূর্ণ বা ক্যাল্সিয়াম আর্সেনেট্ বা কার্বন বাই সাল্ফাইড্ প্রয়োগ করিয়া মাটী প্রস্তুত করিয়া লইবে। চূণ এবং অঙ্গার ঘটিত সার জমীতে দিলে কাপাসে পোকার উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। কাপাসের গাছে পোকার উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য গাছ বড় হইলে ইহার পাতায় চোঁর্দ্রো দ্রাবণ বা কেরোসিন ইমালসান পিচ্কারী দ্বারা নিশ্চয়২ প্রযোজ্য। ইহার কিরূপে ন্যাপ্স্যাক্ পিচকারী সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা মল্লিখিত প্রবন্ধ ১৯ ভাগ কৃষকের ১৩৯ পৃ দেখ। কাপাসের চাষ উচ্চ জঙ্গলী ভূমিতে ছোটনাগপুর ও গয়ার চাষারা জঙ্গল, পাতা ঘাস, আগাছাদি পুড়াইয়া উত্তমরূপ চাষ দিয়া কুড়ী কাপাষের বীজ রোপন করিয়া বেশ ফসল উঠাইয়া থাকে। কাপাষের জমিতে প্রতি একারে শত করা ৫০h, c ফস্ফরিক এসিড এবং এমোনিয়া ও পটাশ সার দিতে হয়। পটাশ সার বেশী দিলে পাতাই বেশী বাড়ে, ফলন কম হয়। বুনিবার সময় ৮ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি অন্তর বীজ মাদার উপর ড্রিল সাহায্যে বুনিবে। প্রতি একারে ৩০০ পাউণ্ড এসিড্ ফশ্ফেট্ দেওয়া কর্ত্তব্য। বপন করিবার, বীজগুলি ঘন গোবর জলের সহিত সামান্য তুঁতে মিশাইয়া অন্ততঃ ১২ ১৮ ঘণ্টা ডুবাইয়া বা ভিজাইয়া ঠাণ্ডা স্থানে রক্ষা করিবে, তাহা হইলে বীজের খোলা শীঘ্র আটিয়া গাছ অঙ্কুরিত হইবে এবং পোকারও উপদ্রব গাছে ও তুলার ফলে কম হইবে। বীজগুলি বৈকালে চৌকায় তিন ইঞ্চি অন্তর ১ ইঞ্চ গভীর বপন করতঃ উপর হইতে ঝুরো আলগামাটী হাত দিয়া চালিয়া দিয়া সামান্য বসাইয়া দিবে, এইরূপ করিলে মাটীর "যো" নষ্ট বা শুষ্ক হইবে না। বীজ উৎকৃষ্ট ও সজীব হইলে এবং এইরূপ ধীরে ধীরে উপরের মাটী হাত দিয়া চাপিয়া দিলে মাটী বীজ গুলীর উপর সমানভাবে চাপ পাওয়ায় ৫।১০ দিনের মধ্যে গাছ গুলি অঙ্কুরিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। বীজ বপনের পর ২৩ দিন অন্তর আবশ্যকমত অল্প ২ জল সেচন করিয়া মাটী ভিজা রাখিতে হইবে, যাহাতে "যো" শুখাইয়া বীজের অঙ্কুর নষ্ট হইয়া না যায়। সে বিষয় খুব সাবধানতা আবশ্যক। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর গাছ বাড়িতে থাকিলে মাঝে ২ নিড়াইয়া দেওয়া, আবশ্যকমত জল সেচ দেওয়া এবং কীটও অন্যান্য শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন; বিশেষ যত্ন করিলে

গাছ গুলি এক হইতে দেড় মাসের মধ্যে এক বা দেড় ফিটের উচ্চ হইলে তুলিয়া ক্ষেত্রে দাড়ের বা লাইনবন্দী মাদার উপর সারি করিয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। গুচ্ছকাপাস আকারে বার্ষিক কাপাস অপেক্ষা দীর্ঘ ও বৃহত্তর হয়, সুতরাং নাড়িয়া পুতিলে প্রচুর শাখা প্রশাখার অধিক পরিমাণ ভূমি আবৃতকরতঃ অপর্য্যাপ্ত ফলবান হইয়া থাকে।

চাষ করিতে হইলে নিম্নলিখিত খনার বচনটি স্মরণ করিয়া কাজ করিবে,

থাটে খাটায় লাভের গাঁতী,
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতী।
ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে গভাত জোভাত॥

নিম্ন ভূমিতে কার্পাস চাষ ভাল হয় না। কাপাসের ফলন বেশী হয় না, বস্তুতঃ, উত্তমরূপ কর্ষিত এবং চূর্ণীকৃত মাটী না হইলে তুলার চাষ সুফলপ্রদ হয় না, সেইজন্য খনা বলেন :—"

শতেক চাষে মূলা
তার অর্দ্ধেক তুলা॥
তার আধা ধান।
বিনা চাষে পান॥

উচ্চ ভূমিই তুলার চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সসার দোঁআঁশ মাটিতেই তুলা চাষে সাফল্যলাভ ঘটে, লাল ও কাল মাটী যুক্ত জমীতে এবং বালি-মাটীতে তুলার চাষ পক্ষে প্রশস্ত বর্দ্ধমান ও গয়াঁ জেলায় লাল মাটীতে লৌহ সংযুক্ত আছে (Iron Peroxide); এই মাটী তুলা চাষ পক্ষে অনুপযোগী নহে। এই মাটীতে কাল তুলা বেশ জন্মায়। কিন্তু মাটীতে সার দিতে হয়। যে মাটীতে ফস্‌ফরিক এসিড্, পোটাস এবং নাইট্রোজেন সমভাগে বিদ্যমান, সেই মাটীই তুলা চাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তুলার জমীতে তুলা বীজ চুর্ণ বা নাইট্রেট্ অব সোডার সার দেওয়া প্রয়োজন। এক একর জমীতে ২০ পাঃ নাইট্রোজেন, ২০ পাঃ পোটাশ ও ৭০ পাঃ ফস্‌ফরিক এসিড্ ঘটিত সার দিলে দেওয়া কর্ত্তব্য; ইহার অনুপাত ১ঃ ১ঃ ৩½ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গাছের গোড়ার মাটী কাটিয়া "আলবন্দী" করিয়া দিলে জল নিকাশের সুবিধা হয় এবং ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে গাছ "ঝাড়বন্দী" হইয়া ফলন বেশী হয়। আমেরিকা হইতে Trice cotton বীজ আনাইয়া এইরূপ বিধিতে চাষ করিয়া আমি বেশ উত্তম দীর্ঘতন্ত্রী বেশী ফলন তুলা পাইয়াছি। তুলা চাষও কীটের উপদ্রবাদি বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ আমার দেশের শিক্ষিত চাষাভায়েদের তথা জমীদারদের এবং কৃষির উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে সম্পর্কিত আমার স্বদেশবাসীদের গোচর করিয়া তাহার পর উপরোক্ত বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিব।

যশোহরের উজ্জল তারকা সার প্রফুল্ল কুমার রায় খদ্দর ও দেশী হাতে বুনা কাপড়

ব্যবহার করিবার জন্য "চরকা" শিল্প পল্লীর গৃহে গৃহে প্রচলন করিবার জন্য দেশের বহুস্থানে, সভায় সমিতিতে, মিটীংএ, বৈঠকে প্রচার করিতেছেন। সেটা ভাল কথা। তিনি দেশের প্রায় সকল দেশহিতৈষী কাজে নামটি ধার দিয়া বসিয়া আছেন; সেইগুলি কেমন করিয়া তিনি যথাযথ honestly পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাহা আমাদের কাছে একটি বি"ম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যাহা হোক, তিনি সার আশুতোষ রয়, সার নীলরত্ন, সার দেবপ্রসাদ, বাবু হীরেন্দ্র নাথ প্রমুখ মহোদয়গণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় শিক্ষাসংঘ ও বিদ্যাপীঠের মেরুদণ্ড, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা কার পালিত, সার রাসবিহারি খয়েরা রাজ, সিংহ ষ্টেট প্রভৃতি দেশের বহুলোকের টাকা লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা দেশের কৃষকদের প্রকৃত হিত ও উন্নতি হয় এইরূপ কৃষিশিক্ষা দেশে প্রবর্ত্তনের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী কৃষককুল জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি না?

আমাদের দেশে সুলভ কৃষিশিক্ষা প্রচারের কি ব্যবস্থা তাঁহারা এত টাকা লইয়া বসিয়া আছেন করিয়াছেন। আমাদের চাই আমেরিকা ডেনমার্ক আদি পাশ্চাত্য দেশের মত ভ্রমণশীল সুলভ দেশীয় ভাষায় কৃষিশিক্ষা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গৃহপালিত পশু ও পক্ষিচাষ, সংজনন, ব্যবসা দেশে প্রবর্ত্তন, কৃষির উন্নতি মক্ষিকা চাষ, গোপালন আদি বিদ্যা। ইহার কোনটারই ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। সার আশুতোষের কি এদিকে আশুদৃষ্টি পড়িবে? কৃষি বিভাগের স্কীম যাহা মাননীয় নবাব সাহেব দেশে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন বা সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা কতদুর আমাদের দেশের, অশিক্ষিত অপরিবর্ত্তনশীল চাষা সম্প্রদায়ের দ্বারা অবাধে পরিগৃহীত ও অনুসরিত হইবে তাহা বলিতে পারি না। বিলাত আমেরিকা ও বঙ্গের মাটী ও চাষী এক নহে! তাহার পর আমাদের মধ্যে "প্রপাগণ্ডা" কাজ কোথায়, উপরোক্ত কলা বিদ্যা শিক্ষণোপযোগী পুস্তক কোথায়? নাটক, নভেল, উপন্যাস রহোন্যাস, কবিতা, মরা পাথরের কোষ্ঠি, ইতিহাস, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ আদি শাস্ত্রের পুস্তকে দেশ প্লাবিত কৃষি বিজ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষা সম্বন্ধে বাবু চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর মেদিনীপুরে ১৯২২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে "জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বেশ সুচিন্তিত যে কথাগুলি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, তাহার দিকে যে দেশের হিতকামী মহোদয়গণের আশুদৃষ্টি পড়িবে কি? আমাদের দেশে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ দেশ মাতৃকায় বরেণ্য সুসন্তানগণ কি এবিষয়ে আশু কৃপা দৃষ্টি দান করিবেন কি? বিজ্ঞানই জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র, বিজ্ঞানে জাতীয় শিক্ষার পরিণতি। বিজ্ঞানের সাহার্য্যেই মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মার্কিণ দেশের কৃষি বিভাগ স্থানীয় কৃষকদের কার্পাস চাষ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বই ছাপাইয়া অবৈতনিক বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে দেশে সাধারণ কৃষকদের ইহার চাষ শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই উপকার হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষি বিভাগ নামে মাত্র, এ সব দিকে তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। ইহার বপন, কীট নাশ, সংগ্রহ, বিক্রয় বীজ ছাড়ান, বীজ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্ব্বে মার্কিণ দেশীয় দি আইল্যাণ্ড দেশীয় কার্পাসের বিষয় এই পত্রে আলোচনা করিব। এই কার্পাস গসিপীয়াম বারবা ডেন্সী "(Gosshpiem Barbadense) পরিবারভুক্ত। এই কার্পাসের আদি নিবাস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। এই কার্পাস জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা এবং ফ্লরিডা দি দেশে বহুল উৎপন্ন হয়। মার্কিণ দেশের অন্তর্গত সাউথ কেরোলিনার অন্তঃপাতী চার্লস্টনের বাজারে পৃথিবীর উত্তম জাতীয় দুগ্ধ ফেণনিভসাদা কোমল ও দীর্ঘ প্রসারি কার্পাস আসিয়া থাকে। আমার সহিত ব্যবস্থা করিলে আমি এই তুলা বীজ আনাইয়া দিতে পারি। কার্পাস খেতে বরবটী, সীম, বীন মাট্ কড়াই ধন্‌চে, আদি সবুজ সারের গাছ দিয়া জমীর উর্ব্বরতা বাড়াইবার এবং rotation of crops দিয়া তাহা কার্পাস চাষের উপযুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। সময়ে সময়ে জমীকে "জিরান" দেওয়া হয়; আমাদের দেশের চাষীরাও এই প্রকার প্রথায় কার্পাস চাষ করিয়া থাকে। আমেরিকার কৃষি বিভাগের ৭৮৭ নং বুলেটীন যত্নে পাঠ করিলে সি আইল্যাণ্ড কার্পাস চাষ সম্বন্ধে সব বিষয় জানা যাইবে। কার্পাস গাছের গোড়ায় humus (জো) সকল সময়েই থাকা প্রয়োজন সেইজন্য মাটীতে ভালরূপে সার দিবার প্রয়োজন হয়। ক্যানিট্, চূর্ণ, এসিড ফস্ফেট্, কার্পাস বীজ চূর্ণ, পোটশ আদি সার দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন কোন চাষী একার প্রতি ১০০ হাত হইতে ২৫০ পাউণ্ড ২-৮-২ মাত্রার সার প্রয়োগ করিয়া বেশ ভাল তুলার ফলন করিয়াছে। ২-৮-২র অর্থ যে সার এমন ভাবে মিশ্রিত করিবে যাহাতে শতকরা দুই ভাগ এমোনিয়া, আটভাগ ফস্ফরিক এসিড এবং দুই ভাগ পটাশ থাকিবে। জমীর মাটীর উপাদান দেখিয়াও সম্যক নির্ণয় করিয়া সার মিশাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কার্পাস মাটী এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে: যাহাতে শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড ৮ ভাগ এবং পটাশ ৪ ভাগ আছে।

ডিক্সী লোনষ্টার, কুক্, ট্রাইস্, হিন্‌সন্, শীড্রক্ সসনমুশ্‌কী, রিভার্স (Revers) প্রভৃতি জাতীয় কার্পাস জগদ্‌বিখ্যাত। এই সকল কার্পাস বীজ চার্লস্টনের বাজারে অথবা রিভার্স ভ্রাতাদের কাছে লিখিয়া আবশ্যক হইলে আমাদের দেশে চাষ করিবার জন্য আনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কুক্, গ্রীফিন, ক্লাভ্‌ল্যাণ্ড, রাসেল, ভুরাঙ্গে জ্যাক্‌সন, কলম্বিয়া ফষ্টার, শ্লোয়েক, রাউল ট্রেটজাতীয়

জাতীয় কার্পাস প্রসিদ্ধ। কাপাসের গাছে, শিকড়ে ডাটায় প্রভৃতি স্থানে বহু প্রকার কীট আক্রমণ করিয়া গাছকে মারিয়া ফেলে, মাকড়সা, প্রজাপতি, পিঁপড়া প্রভৃতি অনেক পোকা হইয়া শত্রু আসিয়া গাছকে নষ্ট করে। ইহার জন্য কীট নাশক দ্রাবণ, তৌর্ব্রোদ্রাবণ আদি যাহার বিষয় সকল কৃষি পুস্তক পাঠক অবগত আছে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব-বর্ষ আমার লিখা প্রবন্ধ হইতে কৃষক হইতে খুঁজিয়া সেরের (Spray) বা ঝরার ব্যবস্থা করিলে পোকার আক্রমণ হইতে গাছকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।

১। পোটাশিয়াম সালফাইড্, ১ আঃ to ২ গ্যালন জলে মিশাইয়া পিচকারী দিবে, কেরোসিন ইমালশান, চুণ-গন্ধক দ্রাবণ, ইত্যাদি এই সকল বিষয়ে সডাক পত্র দিলে যন্ত্র ও কীটনাশক ঔষধের পিচকারী আদি আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে আশ্বিন ও জৈষ্ঠ এই দুই সময়ে বপনের কাল দেখা যায়। আশ্বিন বা ভাদ্রের শেষে অর্থাৎ হস্তা নক্ষত্রের বৃষ্টিপতনের পর যখন অপর সকল প্রকার রবি ফসল উপ্ত হয় সেই সময় এবং জৈষ্ঠে মৃগশীরা নক্ষত্রের পর কাপাস বীজ দেশ ও কাল ভেদে আমাদের দেশে বীজ বপনের প্রথা দেখা যায়। মার্কিনী কার্পাস বর্ষায় ভাল জন্মিবে সেইজন্য আশ্বিনেই তাহাদের বপন শেষ করা কর্ত্তব্য। যে সকল দেশে বেশী বর্ষা হয় সেই সব দেশে আশ্বিন বপনই সমিচীন ও যুক্তি যুক্ত। আশ্বিন হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কার্পাসের ফুলফল হইয়া থাকে, এ কয়মাস বৃষ্টি কম পড়ে; সেই জন্য জলে তুলা নষ্ট হইয়ায় সম্ভাবনাও কম। কিন্তু ফাল্গুন চৈত্রের উপ্ত গাছে শ্রাবণ ভাদ্রের মধ্যে ফুলফল আরম্ভ হইলে পরিশ্রম ও ব্যয়ইসার, বর্ষায় তুলা ভাল জন্মে না; সেইজন্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই মৈশর বুড়ি আদি দেশীয় কাপাসের বপন কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বর্ষার জলে গাছ বাড়িবার সুবিধা পায় এবং তদন্তে ফলনও বেশী পরিমাণে হয়। পাঞ্জাবাদি ভারতের উত্তর অঞ্চলে চৈত্রমাসে কার্পাস বুনিয়া ভাদ্র আশ্বিন বরাবর একটি ফসল উৎপন্ন করিয়া, পুনরায় গাছ গুলিতে যথোপযুক্ত সার ও জল সেচনাদি পাইট করিয়া নূতন শাখা প্রশাখা কাণ্ড বাহির হইল পরবর্ত্তী চৈত্র বৈশাখে আর একটি ফসল উঠাইয়া থাকে, ইহাতে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় ফলন বেশী হয় না বরং কম হয় এবং তুলাও "নিরেশ" হয়। যেখানে এইরূপ চাষের সুবিধা আছে, বাঙ্গলাদেশে বুড়ী আদি জাতীয় কাপাস বুনিলে এইরূপ দুইটা ফসল পাইতে পারা যায়। গুল্ম ও বৃক্ষ শ্রেণীর কাপাসের ফলন প্রথম বৎসর বড় অধিক হয় না কিন্তু জৈষ্ঠ মাসের মধ্যে ইহাদের বুনা শেষ করিলে ও বর্ষায় গাছ বাড়িবার সুবিধা পাইলে প্রথম বৎসরেই মার্কিকের সমপরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বাঙ্গলার কোন কোন জেলায় যেমন ২৪ পরগণা, নদীয়া, দীনাজপুর বর্দ্ধমান আদি স্থানে ভাদ্রেই ফসল উঠাইয়া লইবার পর কাপাসের চাষ চাষীরা দিয়া থাকে।

সাধারণতঃ তিন প্রকারের কাপাসের চাষ হইয়া থাকে। ১। ছিটাইয়া বুনন, ২। সারি গাঁথিয়া বপন ৩। চারা রোপণ। এ সকল বিষয়ে বেশী বলা অনাবশ্যক যাহারা কৃষী তাহারা সবই এসম্বন্ধে বুঝে। তবে এই কথা বলা দরকার যে কার্পাসের মাটী খুব ধুলার মত প্রস্তুত করা দরকার এবং জল সেচের ও সার দিবার ব্যবস্থা বেশ করা চাই। বীজ ড্রীল দিয়া সমান দূরে ফাঁক ফাঁক বোনাই সমিচীন। চারা রোপণে কাপাসের ফলন বেশী হয়। আদৌ চারা প্রস্তুত না করিয়া তৈয়ারি খেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ২।৩ হস্ত অন্তর ছোট ছোট মাদা বাঁধিয়া প্রত্যেক মাদায় ২।৩ টী বীজ বপন করতঃ আবশ্যক মত সার দিয়া জল সেচন ও অন্যান্য পাঠ করিলেও গাছ তৈয়ার হইতে পারে বীজ উৎকৃষ্ট হইলে বিঘা প্রতি আমাদের দেশে বার্ষিক জাতীয় তিন পোয়া গুল্মজাতীয় দেড় পোয়া ও বৃক্ষ জাতীয় তিন ছটাক হইলেই যথেষ্ট কিন্তু ছিটাইয়া বুনন করিলে ইহার দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণ বীজ আবশ্যক হয়। ছিটাইয়া বুননের দোষ গাছ কোথায়ও ঘন কোথায়ও পাতলা বহির হয়; সেইজন্য ড্রীল দিয়া বীজ বুনাই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে আর যাহা বক্তব্য আছে তাহা পর পর প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার MRAS.

ভারতবর্ষের গরুর তালিকা

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ

প্রদেশ ও সন	ষাঁড় ও বলদ	গাভী
বঙ্গদেশ		
১৯১২-১৩	৮,৯০২,২০৪	৭,০৯৫,৬৯৬
১৯১৮-১৯	৮,৯০২,৪০৪	৭,০৯৫,৬৯৬
মাদ্রাজ		
১৯০৯-১০	৬,১৫২,২৯৭	৫,০১২,৬৮১
১৯১৪-১৫	৬,৭৪৮,৬৮৪	৫,৩৮১,৫২৫
বোম্বাই		
১৯০৯-১০	২,৭২৬,৯৪৭	১,৫৮৯,৮৩৮
১৯১৫-১৬	৩,২০৮,৩৫৪	১,৯৫০,৩৫৪

প্রদেশ ও সন	ষাঁড় ও বলদ	গাভী
সিন্ধু		
১৯০৯-১০	৫৯৮,৪৯৫	৭১৬,৮০০
১৯১৫-১৬	৬১৯,৭৬৪	৭০৪,৭৭৯
আগ্রা		
১৯০-৮	৭,১৯৫,৫৬১	৪,৫৮২,১১[illegible]
১৯১৪-১৫	৭ ২৬৪,৫০১	৪,৭১২,৮৯১
অযোধ্যা		
১৯০৮-৯	৩,২২৪,৯২৫	২,০২৩,৭০৮
১৯১৪-১৫	৩,৩৪৯,১৩৯	২,১৪০,৭২১
বিহার ও উড়িষ্যা		
১৯১২-১৩	৫,৭৫০,৩৪৩	৫,১৪২,৮৮৬
১৯১০-১৪	৬,৫০৪,১৩৯	৫,৭৪৯,৪৭৭
পাঞ্জাব		
১৯১২-১৩	৪,২২০,৯৮৯	৩,৩৬৪,৪৪১
১৯১৩-১৪	৪,৫৮৯,০৬১	৩,৬৬৯,০৮৯
আপার ব্রহ্ম		
১৯১৭-১৮	১,২৮৩,৫৬০	৮৭৩,১১১
১৯১৮-১৯	১,৩৮০,৯৪৬	৮৬১,৫৬৬
লোয়ার ব্রহ্ম		
১৯১৭-১৮	১,১১২,৩০৮	৪০৪,৮৫৩
১৯১৮-১৯	১,০৯৬,৮২৯	৪৭৩,০২৬
মধ্য প্রদেশ		
১৯১৫-১৬	৩,২৪৫,০২৩	২,৬৭২,৬৪৪
১৮১৯-১৯	৩,১২৫,৫৫৬	১,৫৯৪,৯৩২
বেরার		
১৯১৫-১৬	৮০১,৪৯৫	৬০০,৩৬৬
১৯১৮-১৯	৭৬১,৫৩৮	৫৮১,২৭৭
আসাম		
১৯০৯-১০	৮৮১,৭৬৯	৭৬১,৭৬০
১৯১৪-১৫	১,১৬৭,১৩৬	৯৭৫,৩৫০

প্রদেশ ও সন	ষাঁড় ও বলদ	গাভী
উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ		
১৯০৮-০৯	৪২২,২৪০	৩৩৬,৭০৬
১৯১৩-১৪	৪৩৭,৩১৯	৩৫৭,৭৫৪
আজমির ও মারোয়ার		
১৯১৪-১৫	১০৪,০৭৫	১৩৪,৭৫৪
১৯১৮-১৯	৯২,২৭২	৯৯,৮০৭
প্রদেশ ও সন	ষাড় ও বলদ	গাভী
দিল্লি		
১৯১০-১৪	৩৭,৯৭৮	৩২,৭৭৭
১৯১৪-১৫	৩৭,৯৭৮	৩ ,৭৭৭
কুর্গ		
১৯০৯-১০	৪৮,৩৫৭	৩৮,৫৯০
১৯১৪-১৫	৪৫,৫৫৬	৩৫,৬৪৪
মধ্য ভারতবর্ষ		
১৯১৪-১৫	২,২০০	১,৮০০
১৯১৮-১৯	২,১৫০	১,৭৫০
সমষ্টি		
১৯০৯-১০	৪০,৫৩০,৩৪১	৩১,৫৩০,৩৪১
১৯১৩-১৪	৪৭,৫০৪,৫১৩	৩৬,৪৭৭,১৭২
১৯১৮-১৯	৪১,৩৩৩,৩১৬	৩৭,৪১৩,৭৮২

ভারতবর্ষের গরুর তালিকা

করদ ও মিত্র রাজ্য

ষ্টেইট্ ও সন	ষাড় ও বলদ	গাভী
হায়দরাবাদ		
১৯১৯-২০	৪,০০৭,৪৪৯	২১,৫৭৫,১৭৩
মহিশুর		
১৯১৪-১৫	১,৬৩১,৮৭১	১,৬৮১,৩৪১
১৯১৮-১৯	১,৬৮৩,২৩৯	১,৬১০,৭৫১

প্রদেশ ও সন	ষাঁড় ও বলদ	গাভী
বরোদা		
১৯১৮-১৯	৩৭৮,৪৩৭	২৪৪,৯০৯
পুদুকোটাই		
(prdukkathai)		
১৯১৮-১৯	৮৭,৬৮৭	৬৭,১৬৬
বাঙ্গানা পল্লি		
Bangano palle		
১৯১৪-১৫	৬,০১৯	২,০৬৬
১৯১৮-১৯	৫,৭৮২	২,২৯৯
সন্দুর		
১৯১৮-১৯	১,৭২৮	১,৯৩৫
কোচিন		
১৯১৪-১৫	৫৩,৭১২	৫০,৬৬৩
১৯১৮-১৯	৪৮,২৩৬	৪৮,৬৫৩
ত্রিভাঙ্কুর		
১৯১৯-২০	১৩৭,৬৬৪	২০২,০৯২
রাতলাম		
(Ratlam)		
১৯১৯-২০	১৯,৫৪৭	২২,৬০০
গোয়ালিয়ার		
১৯১৪-১৫	৯০৩,৪৭৬	৮৭৪,৩৪
১৯১৮-১০	৯৬০,০৯৮	৮৪৬,৭০৩
ইন্দোর		
১৯১৪-১৫	২৬৬,৭২৬	৩৫৫,৬৪৪
১৯১৮-১৯	২৭১,৮৮৮	৩১০,৪০৯
ঘোবত		
(gobat)		
১৯১৯-২০	৮,৯২০	৭,৫৪১
ভুপাল		
১৯১৪-১৫	২২৯,৩১৯	২১৩,৮৪২
১৯১৮-১৯	২১৯,৯২৯	২৩৪,৬৮৪

প্রদেশ ও সন		ষাঁড় ও বলদ	গাভী
শৈলানা (sailana)			
১৯১৯-২০		৯,৬৭৭	১৩,৬৮৭
panna (পান্না)			
১৯১৯-২০		৭৩,৯৫৩	১২৮৪৫৭
রাজগড়			
১৯১৪-১৫		৩৫,৩০৩	৫১,৩৪৬
১৯১৯-১৯		১৪,৬৮৩	৪৬,৪২০
আলিরাজপুর			
১৯১৯-১০		১৯,৮৩৭	১২,৯২১
piplola			
১৯১০-১০		৩,০৬০	২,৪৪০
বারথানি (a)			
(barrani)	১৯১৮-১৯	৩৬,১৯০	২৭,৯৫১
নরসিংহগড়	১৯১৮-১৯	২৯,১২২	৪৭,৩৩১
মাইহার	১৯১৯-২০	২০,৭০০	১৯,৫৯০
নাগোদ	১৯১৮-২৯	২৪,৮৫৭	৩৪,৯৬১
ছটারপুর	১৯১৯-১০	৩৯,১৬৩	৫৬,১৬৮
বগলা (bagli)	do	৫,২১৬	৫,৬৭৮
ষ্টেটইউ ও সন		ষাড় ও বলদ	গাভী
ধর (dhar)	১৯১৯-২০	৬০,৩০৮	৪৪,৬৩৭
বিকানীর	১৯১৮-১৯	৭৩,০৮০	২২৭,১৯০
মারবার	১৯১৮-১৯	৭৬,১৪৬	৯১,৮৪১
জয়পুর	১৯১৮-১৯	১০৫,৮৬৮	১৯৩,৬২১
কিশনগড়	১৯১৮-১০	১৭,৯৭৬	৪৮,২৮৯
আলোয়ার (alaar)	১৯১৮-১৯	১১৯,০১৮	১৬৪,১৮২
ভরতপুর	১৯১৮-১৯	৯২,৬৬৩	১১৮,৪২৯
ঝালাবার	১৯১৯-১৯	১৯,৮৩৫	৪৭,৩০৩
২০ক	১৯১৮-১৯	১০৮,৪৮৭	১১২,৪১৮

প্রদেশ ও সন		ষাঁড় ও বলদ	গাভী
কোটা	১৯১৮-১৯	২১৩,৩৫৮	২০৭,১১৩
বান্দী (bundi	১৯১৮-১৯	১০২,০৯৩	৩৪,৪৪১
বোম্বাই ষ্টেট	১৯১৮-১৯	৪৫,৭৫১	১৬৭,৩৯৮
সমষ্টি			
১৯১০-১১		৩,৭০৯,৫০৮	৩,৯৮৯,১০৫
১৯১৪-১৫		৪,০০৭,৮৩২	৪,৯৫৭,৫৯২
১৯১৮-১৯		৪,৭৫২,৭৫১	৪,৮৭৪,৩৯২
সর্ব্বশেষ সমষ্টি—			
১৯১৮-১৯		৫৪,০৮৬,০৬৭	৪২,২৯২,০৭৪

বঙ্গদেশে আমন ধান্য

প্রথম বিবরণী। ১২২ ২৩ খৃঃ অব্দ

(সরকারী রিপোর্ট হইতে গৃহীত)

১৯২০—২১ সনে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে গড়ে যত আমন ধান হইয়াছিল, তাহার ১৯-৭ অংশ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমন ধান চাষের প্রথম সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু মে মাসের শেষ ভাগে সুবৃষ্টি হওয়ায় ধান চাষের পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি বশতঃ হৈমন্তিক ধান্যের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাও মে মাসে বৃষ্টি হওয়ায় অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছিল। জুন মাসে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় হৈমন্তিক ধান্যের অবস্থা আরও আশাপ্রদ হইয়াছে এবং আমন ধান্যের চারা স্থানান্তরিত করার পক্ষে ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিক জলে উৎপন্ন ধান্যের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। জুলাই মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও সাময়িক রৌদ্র হওয়ায় সমস্ত শস্যের আগাছা পরিষ্কার ও তাহা স্থানান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর বঙ্গে আগষ্ট মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টি বশতঃ প্লাবন হওয়ায় আমন ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। নদী প্লাবন বশতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নভূমির হৈমন্তিক ধান্যের অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে। বর্ত্তমান আবহাওয়া ধান্যের পক্ষে অনুকূল

বলিয়া আশা করা যায়। রোপণ ধান্তের অবস্থা খুব হৈমন্তিক ধান্তের অবস্থা মন্দ নহে। জেলার কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীরদেওয়া বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে এ বৎসর ১,৫ ৫,৭৪, ৫০০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৫,৮৫০,২০০ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল।

এ বৎসর একটী জেলাতে খুব ভাল ফসল ও ছয়টা জেলাতে সাধারণ পরিমাণে ফসল ও সতরটা জেলাতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহা শতকরা ৯০ হইতে ৮০ অংশ ও অবশিষ্ট চারিটা জেলাতে শতকরা ৭৫ হইতে ৫৪ অংশ ধান্ত উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জেলা	সাধারণতঃ যেরূপ পরিমান জমি চাষার তাহার পরিমান। একর	কত জমাতে আমন ধান্তের চাষ হইয়াছে ১৯২১-২২, একর	১৯২২-২৩ একর	সাধারণতঃ উৎপন্ন ধান্তের শতকরার হিসাব ১৯২১-২২,১৯২২-২৩
২৪ পরগণা	১,০,৪১,৫০০	৭২৬,১০০	৭১৩,৮০০	৯২,৮৩
নদীয়া	১-৬,৮০০,	২১৩,৪০০,	২১১,৬০০	৫৮,৫৮,
মুরশিদাবাদ	৩৫১,৪০০,	২৯৮,০০০,	৩০৭,৩০০	৭৫,৯২
যশোহর	৫৬৮,১০০,	৪৬৩,৯০০,	৪৭৫,৩০০	৮৩,৭৫
খুলনা	৮২৬.২০০,	৭১৩,১০০,	৭৭৮,১০০	৯২,১০০
বর্দ্ধমান	৮৭৪,৮০০,	৬৬৫,৭০০,	৭১২,৮০০	৭৫,৯২
বীরভূম	৬০৪,৭০০,	৫২৫,৮০০,	৫২৬,০০০	৫৯,১০০
বাকুড়া	৬৫৪,০০০-	৬৪৪,০০০,	৬৪০,০০০	৬৭,১১৭
মেদিনীপুর	১,৫৩৭,১০০	১,৩৯৮,৫০০,	১,৪৬২,৩০০	১০৮,৮৩
হুগলী	২৭৬,৭০০-	১৯৭,৩০০-	২০৪,৫০০-	৬৭,৯২
হাওড়া	১১৭,৩০০	১২৩,৪০০-	৯৭,৪০০-	১০০,৫৪
রাজসাহী	৮২২,৭০০-	৬৭৫,৭০০-	৭৩৫,৬০০,	৯২,৯২
দিনাজপুর	১,১২০,৩০০,	৯২৯,০০০,	৯৭২,৭০০,	১০০,৮৮
জলপাইগুড়ী	৪৬৭,৪০০	৩৯২,৬০০-	৪১১,০০০	১০০,৯২
দারজিলীঙ	৫০,৯০০	২৬,৬০০	১৯,১০০	১১৭,৯২
রংপুর	৮২২,৩০০,	৬১৭,৯০০	৬৩৪,৪০০-	১২৫,৮১:৫
বাগুড়া	৩০৩,০০০,	৪৪৮,০০০,	৪৫০,০০০-	৮৫,১০০
পাবনা	৫৬৬,০০০	৪০০,০০০,	৩৯২,০০০,	৮৩,৮৩,
মালদহ	৩২৬,২০০,	২৪২,৭০০,	৩২৭,০০০	৭৯,৯২

জেলা	একর	একর	একর	উৎপন্ন ফসলের শতকরা হিসাব ১৯২১-২২	এবং ১৯২২-২৩
ঢাকা	৬৪৭,৯০০,	৭০৩,৯০০,	৬'৯৮,৫০০,	৯০	৮৭
ময়মনসিংহ,	১,৪৫৫,৫০০,	১,৪২৯,০০০,	১,৪১১,৫০০,	১১৭	৮০
ফরিদপুর,	৭৭০,১০০,	৭৬১,৪০০,	৭৪৫,২০০	১০০	৬৫
বাখরগঞ্জ,	১,২০০,৩০০,	১,৩৪২,০০০,	১.০০০,০০০,	১০০	১০০
চট্টগ্রাম	৪১৮,৪০০,	৪২১,৮০০	৪২৮,৮০০-	১০০	৯২
ত্রিপুরা	৭৮৭,০০০,	৭৯৬,৪০০,	৮০৬,৪০০,	১৩৩	১০০
নোয়াখালী	৭০৫,০০০,	৬৩০,০০০.	৬৩০,৩০০,	১০০	১০০,
পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম	৪৭,৫০০	৪৬,০০০,	৪৬,৫০০,	৭৫	৮৩
মোট	১৭,৪৮৮,৫০০,	১৫,৮৫০,২০০,	১৫,৫৭৪,৫০০,	১০০	৯২

ভাদই শস্য

সরকারী প্রাথমিক বিবরণ

১৯২২-২৩

১৯২০-২১ খ্রীঃ অব্দে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে,সেই বৎসর গড়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যত আউশধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, একমাত্র বঙ্গদেশে তাহার ৬'৪ অংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

১৯২১ সনের নবেম্বর মাস হইতে ১৯২২ সনের মে মাস পর্য্যন্ত,দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি ছিল। এইজন্য আউশধান্য ও তৎকালীন উৎপন্ন কোন শস্যের জন্য ভালরূপে ভূমি কর্ষণ হইতে পারে নাই। সেজন্য বপন কার্য্য ভালরূপে সাধিত হয় নাই। তাহার ফলে শরতকালে উৎপন্ন শস্যের ভূমির পরিমাণ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে আবাদ অপেক্ষাকৃত অধিক হ্রাস হইয়াছে। এপ্রিল ও মে মাসে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় বপন কার্য্যে কিছু সুবিধা হইয়াছিল। মে মাসের শেষ ভাগে বপন কার্য্য শেষ হইয়াছে। জুন মাসের বৃষ্টি শস্য-বৃদ্ধি পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল। জুলাই মাসে উত্তর বঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য স্থানে সুবৃষ্টি হইয়াছিল। জুলাই মাসের শেষ ভাগে উত্তর বঙ্গে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় নদীপ্লাবনে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে পাকা ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আগষ্ট মাসে উত্তর বঙ্গে অতি অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় মেদিনীপুর বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় নিম্ন ভূমির ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মৌটের

উপর, উচ্চ ভূমিতে ভাল ফসল ও নিম্ন ভূমিতে মধ্যমপ্রকার ফসল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এবৎসর ভাদই শস্য ৫,৯০২,৮০০ একর ভূমিতে চাষ হইয়াছে গত বৎসর ৬,৪৭৭,০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে, এবৎসর ৫,১২৬,৭০০০ একর জমিতে আউশধানের চাষ হইয়াছে এবং ৫,৬০৭,৩০০ একর জমিতে গত বৎসর উক্ত ধানের চাষ হইয়াছিল।

জিলার কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হিসাব অনুসারে সাধারণতঃ যে পরিমাণ জমিতে ভাদই শস্যের চাষ হয়, এবৎসর তাহার শতকরা ৭৬ অংশ জমিতে ও গতবৎসর ৮৫ অংশ জমিতে উক্ত শস্যের চাষ হইয়াছে। আউশ ধানই ভাদই শস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবৎসর উক্ত শস্যের চাষও উপরোক্ত হিসাব অনুসারে হইয়াছে।

জিলা শস্যের নাম	কতজমিতে উক্ত শস্যের সাধারণতঃ চাষ হয় একর	কতজমিতে উক্ত শস্যের চাস হইয়াছে একর ১৯২১	১৯২২	উক্ত শস্যের শতকরা হিসাব ১৯২১	১৯২২
২৪ পরগণা আউসধান,	৭৩,৪০০,	৪৯,০০০,	৪৭,৪০০,	৭৪	৭২,
অন্যান্য শস্য (ভুট্টা, ডাল শাক সব্জী খাদ্য শস্য ইত্যাদি	১০,৬০০	৬,৫০০	৮,৪০০,		
নদীয়া আউসধান	৪৯১,১০০,	৪৭৫,৮০০,	৪৭০,০০০,	৮১	৫৭.
অন্যান্যশস্য ভুট্টা, ডাল, শাক সব্জী, ফল খাদ্য শস্য ইত্যাদি	৩২,৮৫০,	৩৭,২০০,	৩৩,০০০,		
মুর্শিদাবাদ আউসধান	২২৯,৭০০,	১৫৯,৫০০,	১৬৭,৩০০	৫৯	৫৮
অন্যান্যশস্য (জোয়ার, ভুট্টা, ডাল, শাক সব্জী, ফল ঘাস জাতীয় শস্য ইত্যাদি	৩১,৫০০	২৩০০০,	১৭৭,৩০০		
যশোহর আউশধান	৪০৭,৩০০,	৩৫১৭০০,	৩২৩৯০০,	৮৩	৬৭
অন্যান্য শস্য ডাল, ভুট্টা, শাক সব্জী, ঘাস ইত্যাদি	৩৭,৭০০,	১৯,৩০০,	১২৩০০,		
খুলনা আউশধান	১৭,৮০০,	১৩,৩০০,	১৪,০০০,	৯২	৮৪
অন্যান্য শস্য ডাল, শাক সব্জী, ফলমূল ঘাস ইত্যাদি	১৫.৯০০.	১২,৪০০,	৮,৮০০,		
বর্দ্ধমান আউশধান	১৪০,০০০	৮৫,২০০,	৭৯,৪০০,	৮৩	১০৬
অন্যান্য শস্য ভুট্টা, ডাল, ফলমূল, ঘাস ইত্যাদি	১৭,১০০	১৩,০০০	১২,৭০০		

বীরভূম আউশধান	১৪৪,২০০	১১০,০০০,	১১১,০০০	৬৭ ৯০
অন্যান্য শস্য ভুট্টা, খাদ্যশস্য, শাক সব্জী, ফল, ঘাস ইত্যাদি	১৫,৬০০,	১০'৭০০	১২,২০০	
বাঁকুড়া আউশধান	২১,৯০০,	১৭,৩০০,	৯,৬০০	৭৬ ৬৪
অন্যান্য শস্য (জোয়ার, ভুট্টা, ডাল শাক সব্জী, ঘাস ইত্যাদি)	২২,০০০,	৪০,৮০০	২২,৪০০	
মেদিনীপুর আউশধান	২৬৫,৪০০	২৭৫,০০০	৩৮,৭০০	১০০ ৮৩
অন্যান্য শস্য (ভুট্টা, ডাল বাজরা শাক সব্জী, ফলমূল ইত্যাদি)	৮৫,৩০০	৪৪,০০০	৩৮,৭০০	
হুগলী আউশধান	৫৪,৭০০,	২৪,৪০০	২৩,১০০	৯১ ৮৩
অন্যান্য শস্য ভুট্টা, ডাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি)	৯,৭০০	৪,৭০০	৪,০০০	
হাওড়া আউশধান	৮,৯০০	১০,০০০	৮,৫০০	১০০ ৩৯
অন্যান্য শস্য ভুট্টা, ডাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি	৮,০০০	৭,৯০০	৬,১০০	
রাজসাহী আউশধান	১৬৮,১০০	১৭৫,৭০০,	১৭১,১০০	৮২ ৮২
(অন্যান্য শস্য ডাল, খাদ্য শস্য, মাস ভুট্টা ফলমূল ইত্যাদি)	১৭,৩০০	১২,৯০০	১২,৯০০	
দিনাজপুর আউশধান	১৩০,৭০০	২০৫,৯০০	১৪৯,৩০০	৮৫ ৭৫
অন্যান্য শস্য (জোয়ার বাজরা ভুট্টা, ডাল, ফলমূল শাক সব্জী ইত্যাদি)	৫,৯০০,	৫,১০০	৩,৭০০	
জলপাইগুড়ী আউশধান	১৬৩,৭০০	১৩৭,৭০০	১৪৬,[illegible]০০	৭৫ ৯১
(অন্যান্য শস্য ভুট্টা, ডাল, শাক সব্জী ইত্যাদি)	২১,৪০০	১৪,২০০	১৫,১০০	
দার্জ্জিলিং আউশধান	৭,২০০	৩,৭০০	৩,৭০০	৯১ ৯৮
অন্যান্য শস্য যথা ভুট্টা, ডাল, খাদ্য শস্য শাক সব্জী ইত্যাদি)	১১৫,২০০	১১৯,০০০	১১৯,১০০	

রংপুর আউশধান	২৮২,৫০০,	৩৩১,৪০০,	৩০১,২০০	৯৩	৯০
অন্যান্যশস্য যোয়ার,ভূট্টা খাদ্যশস্য, শাক সব্জী, ফল ইত্যাদি	৯৮,৩০০,	৩১,২০০	৩১,২০০		
বগুড়া আউশধান	১৪০,০০০	১৩৮,০০০	১৪০,০০০	৯৮	১০০০
অন্যান্যশস্য যোয়ার, বাজরা, মাক্কাই, শাকসব্জী ফলমূল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি	৬,৮০০	৫,৪০০,	৫,৫০০		
মালদহ আউশধান	২৭৮,৬০০	২৩৩,৪০০	১৭০,০০০	৭৮	৪৭
(অন্যান্যশস্য যোয়ার বাজরা মাকাই ডাল, শাকসব্জী ফল মূল ইত্যাদি)	৮৪,৯০০	৩৬,৩০০	৫০,৪০০		
পাবনা আউশধান	১৪০,০০০	২০২,৩০০	১৭০,৭০০	৬৭	৫৮
(অন্যান্যশস্য মাকাই, ডাল খাদ্যশস্য ইত্যাদি)	৪,১০০	২২,৮০০	১৮,৫০০		
ঢাকা আউশধান	২৩৮,৭০০	৩০০,৫০০	২৭৬,৫০০	৯৫	৭৯
ডাল খাদ্যশস্য ইত্যাদি	৩৭,২০০	২৫,৪০০	২৫,৪০০		
মৈমনসিংহ আউশধান	৩৯০,৬০০	৭৪৫,০০০	৭১০,০০০	৮২	৭৮
অন্যান্য শস্য যথা ডাল, ফল, শাক সব্জী, মূল ইত্যাদি	১১৩,৫০০	১১২,০০০	১২০,২০০০		
ফরিদপুর আউশধান	২৩৩,৫০০	২৪০,৮০০	২৩৬,৫০০	৬৫	৩৯
(ফলমূল, শাক সব্জী ডাল ইত্যাদি)	২৫,৮০০	২০,৫০০	১৮,৪০০		
বাখরগঞ্জ আউশধান	১৩৬,০০০	৩১৮,০০,	২৫০,০০	৯৪	৭২
অন্যান্য শস্য যথা ডাল ফল মূল শাক সব্জী ইত্যাদি	১৪২,৪০০	১৫২,২০০,	১২১,৪০০		
চট্টগ্রাম আউশধান	২০২,০০০	১৯৪,৬০০	১৯৪,৬০০	৬২	৯২
অন্যান্য শস্য যথা ভুট্টা, ডাল, ফলমূল, শাক সব্জী, চা, ইত্যাদি	১৩,৭০০	১৪,৩০০	১৪,৩০০		

ত্রিপুরা আউশধান	৩১২,৮০০	৩১৭,৪০০	৩০৫,৩০০	৪২	৪২
অন্যান্য শস্য যথা খাদ্য শস্য, ডাল, ফলমুল, শাক সব্জী ইত্যাদি	২৪,৯০০	২০,৬০০	২০,৬০০		
নোয়াখালী আউশধান	২০৪,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০	১০০	৮৩
ফলমুল ডাল ইত্যাদি	৩,০০০	৩,০০০	৩,০০০		
পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম আউশধান	১৮৮,০০০	১৬৬,০০০	১৬৪,০০০	৯১	১০০
(ভুট্টা, ডাল খাদ্যশস্য ইত্যাদি)	১৩,১০০	১০,৯০০	১২,৪০০		
মোট	৬,১৪১,১০০	৬,৪৭৭,০০০	৫,৯০২,০০০	৮৫	৭৬

বাজার দর

(কার্ত্তিক)

চাউল			মূল্য
আতপ পাটনা নং ১ (সীতা)		প্রতিমণ	৯॥০
ঐ	নং ২	”	৯।০
ঐ	নং ৩	”	৭॥০—৮।০
খুদ		”	৩॥০—৪৸৴০
সিদ্ধ চিনি সকর		”	১২৲—১৩৲
বাঁক তুলসী		”	৮॥০—৯৲
দাদখানী		”	৯৲—৯৸০
পাটনা		”	৭॥০—৮৲
বালাম		”	৬৸০—৭।০
নাগ্রা		”	৭৲—৭॥৴০
রাঢ়ী		”	৫৸০—৬।০
ভুদুকলমা		”	৬৲—৭৴০
সিলেট		”	৬৲—৭৴০
কজিলা		”	৪॥০—৫৲
চাউলের কুড়া		”	৸০—১৲

যব যই প্রভৃতি

	প্রতিমণ	মূল্য
যব	”	৩॥০—৪॥০
যই	”	৪॥০—৪৸০
ভুট্টা	”	৩।০—৩॥০

গম

			মূল্য
গম	(সাধারণ)	প্রতিমণ	৫৲—৭৲
ঐ	ক্লাব নং ২	(শতকরা ২½ ভাগ বাদ)	৬॥০
ময়দা নং ১		প্রতিমণ	৯॥০
ঐ নং ২		”	৯।০
সাধারণ		”	৯৲
সুজি		”	৯॥০
আটা নং ১		”	৯৶০
ঐ নং ২		”	৮'০
ঐ নং ৩		”	৪॥০
ভুষি		”	২৸০

কলাই, মটর, ডাল,

সাদা মটর	”	৫৲—৬।০
মটর	”	৪৲—৪।৶
খেসারী	মটর	৩৲—৩৸০
কুলতি	”	৩৲—৩,০
মসুর	”	৩৸০—৫।০
অরহর	”	৪৸০—৫॥০
বুট	”	৪৲—৫॥০

ডাইল

মুগ	ডাইল	প্রতিমণ	৯৲—২০৲
খাড়ি মসুর	”	”	৮৲—৯।০
অরহর	”	”	৫৸০-৮॥০
বুট	”	”	৬৸০-৭।০
মটর	”	”	৬॥০-৭॥০
মসুর	”	”	৬৲-৭৲
খেসারী	”	”	৪৸০-৫।০

মসল্লা

হরিদ্রা,	মছলিপট্টন	”	২২৲-৩০৲
”	মাদ্রাজ	”	২২৲-২৮৲
”	পাবনা	”	২০৲-২৩৲
”	দেশী	(জগন্নাথপুর)	১৭৲-২০৲
শুট (আদা)		”	১১৲-১২৲
তেতুল		”	৩৸০-৭৲

বীজ

	প্রতিমণে	মূল্য
তিসি (শতকরা ৫ বাদ)		৯৵০
সর্ষপ	শ্বেতী	৯৲-৯॥০
ঐ	লোটনী	৮৲-৯৲
রাই	”	৭॥০-৮॥০
পোস্ত	”	১১৲-১২৲
তিল	”	৮৲-১১৲
রেড়ি	”	৮৲-৮৸

তৈল

সর্ষপ	”	২৩৲-২৬৲
নারিকেল	”	২৫৲-২৬৲
তিল	”	৩০৲-৩৫৲
বাদাম	”	২৪৲-২৬৲
তিসি	”	৩০৲-৩২৲
রেড়ি	”	২৩।৵০-২৭৲

সার

	প্রতিমণে	মূল্য
খইল রেড়ি	”	৫।০
ঐ সর্ষপ	”	২৸০-২৸৵০
ঐ তিসি	”	৫॥০
ঐ মহুয়া	”	১॥০
ঐ চীনাবাদাম	”	৪৲
হাড়চূর্ণ	”	১০৲

লবণ

লবণ লিভার পুল	১০০ মণের	১২০৲
ঐ এডেন	”	১০৫৲
ঐ স্পেইন	”	১১৫৲

চিনী

চিনি	প্রতি মণ	
কাশীর চিনি	”	২৩৲-২৪৲
ভেলি গুড়	”	৮৲-৯৷৹
দোবরা	”	২৩৲-২৪৲
খেঁজুর গুড়	”	১০৲-১০৷৹
ইক্ষু গুড়	”	১০৷৹-১১৷৹
চিনি	প্রতি মণ	মূল্য
কাশীপুর নং ১	”	১৭।৹
ঐ সাধারণ	”	১৬।৹
জাভা	”	১৪৷৵৹-১৪৸৹

তূলা

	প্রতি মণ	মূল্য
দেশী উৎকৃষ্ট	”	৪০৲
উমরা	”	৪৮৲
ওয়ার্দ্ধা	”	৫২৲
শিমূল তুলা	”	২৫৲-৩০৲

সূতা

মিলের সূতা	প্রতি ২½ সের	মূল্য
নং ১০½	”	৩৸৵৹-৪৵৹
১২½	”	৪।৹-৪৷৹
১৪½	”	৪৷৹-৪৸৹
১৬½	”	৪৷৶৹-৪৸৶৹
২০½	”	৫।৵৹-৫৷৵৹
২২½	”	৫।৵৹-৫৷৶৹

পাট

পাট	”	
টি, আর	”	১১৷৹
৬ নং	”	১৩৷৹
৫ নং	”	১৪৷৹

২৩শ খণ্ড { কৃষক—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল } ৮ম সংখ্যা

বৈদিক যুগের যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃষিচর্য্যা

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্, এ,

যদিও পৃথিবীর নানাদেশে নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং সেই সকল ধর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে মহান্ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির উদ্দেশ্য অভিন্ন; সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন মঙ্গল সাধন। কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও বিভিন্ন মানবজাতির চিন্তা প্রণালীর বিভিন্নতায় ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির এত বিভিন্নতা সজ্ঘটিত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্", অর্থাৎ মতভেদেই মুনির মুনিত্ব। যিনি বিশ্বহিতে রত হইয়া চিন্তা প্রণালীর ও বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণতা প্রদর্শন করিতে না পারেন তিনি মুনি-নামের যোগ্য হইতে পারেন না। মানব মানবের উপর প্রভাববান্ হইতে পারে একমাত্র মনোবৃত্তির উৎকর্ষে। পাশব শক্তিপ্রভাবে মহাবীর সিকন্দর বহুদেশ জয় করিয়া ও ধ্বংসলীলার অভিনয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মানবমনের অন্তরতম স্থানে তাঁহার বীরত্বমহিমার সহানুভূতি অনুভূত হয় নাই। দিগ্বিজয়লীলার উদ্দাম প্ররোচনায় দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, জনপদের পর জনপদ ধ্বংসসাৎ করিয়াও তিনি একজন প্রবল দস্যু নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ত্যাগ-ব্রত বুদ্ধদেবের বিশ্বহিতৈষণা অর্দ্ধ জগৎ জুড়িয়া মানবচিত্তের নিগূঢ়তম প্রদেশে ভক্তির উৎস ছুটাইয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই রাজন্য-

বংশোদ্ভূত শাক্যমুনির মঙ্গলময়ী মনোবৃত্তির অলৌকিক প্রভায় কত সহস্র সহস্র বিবেক-বিহীন মার্গভ্রষ্ট মানব পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই আর্য্যধর্ম্মের যজ্ঞানুষ্ঠানপদ্ধতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াও তিনি অবশেষে তাঁহাদেরই [illegible] ধর্ম্মে [illegible] অবতারের অমর আসন লাভ করিয়াছেন। এই প্রকারেই অসাধারণ প্রতিভাশালী বিশ্বহিতৈষী মহাপুরুষের চিন্তাবৃত্তির নিকট সাধারণ মানবচিত্ত বশীভূত হয় এবং তাঁহার বিশ্বহিত সাধনের উপায়ভূত বাণীসমূহ ভগবদ্বাণীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করে। কিন্তু যে সমাজে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ও অভ্যুত্থান হয় সেই সমাজের প্রভাবও অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার চিন্তাবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে। এই প্রভাবই হইল সমাজবিশেষের জন্মগত সংস্কার। এই সংস্কার ভেদ করিয়া না উঠিতে পারিলে একদিকে যেমন কোনও মনস্বীর মঙ্গলপ্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, অন্তদিকে সেইরূপ এই সমাজগত সংস্কারের সহিত সম্পর্ক না রাখিতে পারিলেও তাঁহার প্রতিভা সাধারণের মধ্যে সমাদৃত হয় না। বিমানমার্গে সমুচ্ছ্রিত, বহুধা বিস্তৃত, বহু মানবের আশ্রয়-স্বরূপ বটতরুর মূল ভূগর্ভেই সুপ্রোথিত থাকে। এই কারণে জাতিবিশেষের ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে সেই জাতির জাতীয় চরিত্রের চিত্র স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মকার জাতি বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে, দস্যুগণের মধ্যে কালীর নিকট নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, বিসূচিকা ও বসন্তচিকিৎসক আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ শীতলামাতার অর্চ্চনা করে। এইরূপে মানবজাতির কর্ম্মপ্রণালী ও ধর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যেও তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালীর একটা সুস্পষ্ট ছাপ আছে। সেই ছাপটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকর্ম্ম। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রাগৈতিহাসিক মানবগণ যখন মৃগয়া ও বনফলসংগ্রহ ভিন্ন অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সেই সময়েই আর্য্যগণ কৃষি কর্ম্ম করিয়া অন্ন সংস্থানের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই গৌরব করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন। তাঁহারা যে মৃগয়া করিতেন না তাহা নহে। তবে কেবলমাত্র মৃগয়াই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিলনা। সে যুগে যে সকল জাতি কেবলমাত্র বন্যমৃগ বধ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন, তাঁহাদের অপেক্ষা মৃগয়াবিষয়েও আর্য্যগণ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঘরে রাখিয়া পশুপালন করিতেন। কিন্তু কৃষিকর্ম্মই ছিল তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য; তাই 'আর্য্য'শব্দের মৌলিক অর্থ কৃষক। আমাদের বেদের মতে কর্ম্ম ত্রিবিধ;—প্রশস্ত, অপ্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ। পরিবারাদি পোষণ প্রশস্ত কর্ম্ম, চৌর্য্যাদি অপ্রশস্ত এবং ব্যাপীকূপাদি খনন বা সেইরূপ কোনও জনহিতকর কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। বিশ্বজনীন হিত সাধন করিতে পারে

বলিয়া যজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। যজুর্ব্বেদ বলেন যে যজ্ঞের ফলে দেশ বহুন্ন হয়, অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ ও মেঘ হইতে সুবৃষ্টি হয় বলিয়া যজ্ঞের ফলে দেশে অন্নের প্রাচুর্য্য সংঘটিত হয়। অপর কথায় বলিতে গেলে সুবৃষ্টির জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, কেননা তাহাতেই তাঁহাদের কৃষিকর্ম্মের সহায়তা হয়। সেইজন্যই তাঁহারা এমন দেবতার অর্চনা করিতেন যিনি বৃষ্টিদান করিতে পারেন। তাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র মেঘ সমূহের নেতা, মরুদ্গণ তাঁহারই সহায়, বরুণ জলের অধীশ্বর এবং মিত্র-দেব কৃষকের মিত্র।

বৈদিক যুগের আর্য্যগণের আহার-নিদ্রাদি দৈনন্দিন কর্ম্মসমূহও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল। তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন তাহাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত এবং যজ্ঞই ছিল সর্ব্বকর্ম্মের কেন্দ্রীভূত উদ্দেশ্য। তাই পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম, অঙ্কনবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, রাজনীতি, সমস্তই যজ্ঞ বা ধর্ম্মচর্চার অঙ্গীভূত ছিল। গাভী ও বৎসগণকে পৃথক পৃথক পথে ছাড়িয়া দিবার জন্য বৃক্ষশাখা ছেদন কালেও যজুর্ব্বেদের ঋষি বলিয়াছেন :—

"হে শাখে! যজ্ঞের ফলে দেশ বহুন্ন হইবে, সেই আশায় যজ্ঞের অঙ্গ বৎসাপাকরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে ছিন্ন করিতেছি। ১।১।১।" *

আবার সেই যজুর্ব্বেদীয় ঋষি গাভীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"হে গাভীগণ! আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি তৎসাধনার্থ সবিতা দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত-তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ১।১।৪। এই বলিয়া যে পথে বৎসগণের সহিত চাক্ষুষ না হয় সেই পথ প্রদর্শন করিবে।" † এইপ্রকার প্রত্যেক কার্য্যের সহিত যে জ্ঞর সম্পর্ক স্থাপন করাই সে যুগের ঋষিগণের রীতি ছিল।

আবার যে কোনও বিষয়কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে প্রথমেই যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে সে কার্য্য অনুমোদিত হইত না। কৃষিকার্য্যের জন্যও একই রীতি প্রচলিত ছিল। একালে হিন্দুসমাজে কৃষিকার্য্য অতি হীন কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও উচ্চজাতি কৃষিকর্ম্ম করিলে জাতিচ্যুত হয়। কিন্তু বৈদিক যুগে তাহা ত হইতই না, অধিকন্তু অধ্বর্য্যু যজ্ঞানুষ্ঠান সহ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া না দিলে কোনও যজমান কৃষিকার্য্য করিত না। আর সে কালের যজমানগণ সকলেই আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ছিলেন। প্রথমে শূদ্রগণ কৃষিকর্ম্ম জানিত না কেবল কারিকরের কার্য্য করিত। কিন্তু কালক্রমে তাহারাই কৃষিকার্য্যের,

---

* সত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ।

† সত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ। সেকালে গাভীগণের বন্ধন থাকিত না।

একমাত্র পরিচালক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমীর যজুর্ব্বেদের অনুবাদ হইতে বৈদিক যুগের কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানের বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র এবং পর কণ্ডিকাত্মক দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্য চিতির শ্রোণি-ভাগের পশ্চিমে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতি প্রস্থাতার উত্তরপূর্ব্বে ষট্ বা দশ অথবা চতুর্ব্বিংশতি বৃষে চালিত ঔদুম্বর সীর অভিমন্ত্রণ করিবে—

" কৃষি কর্ম্মাভিজ্ঞ, অগ্নিক্ষেত্রবিৎ, ধীমদ্গণ দেবলোকে সুখ পাইবার অভিলাষে সীর-যোগ করিয়া থাকেন, প্রতি বৃষভযুগে একৈক যুগ বহন করাইয়া থাকেন। ১।

" কৃষকগণ সীরযোগ করুক, যুগ-বাহী বৃষভ গুলির স্কন্ধে যথাযোগ্য যুগগুলি ন্যস্ত হউক, এইরূপ হইলে পর তোমরা (ঋত্বিকগণ) মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [যা ওষধী···ইত্যাদি] বীজবপন কর, অনন্তর সঞ্জাত ওষধিগুলি ক্রমে পরিপুষ্ট হউক, পরে পরিপক্ক হইলে তৎ সমস্ত সৃণির (=দাত্র, দা', কাস্তে) দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের অতি সমীপে (=গৃহে) উপনীত হউক। ২।

"ঐ চিতির পরিশ্রিৎ সমীপে চারিদিকে চারি মন্ত্রে সীর (=লাঙ্গল) কর্ষণ করিবে—

" হে সুন্দর ফাল! তোমরা সুখে ভূমি কর্ষণ কর—হালধারীরা বৃষভগণের সহিত সুখে গমন করুক; হে শুনাসীর দেবদ্বয়! বৃষ্টি দ্বারা সেচন করতঃ আমা-দিগের এই কৃষ্ট ভূমিতে জনিষ্যমান ফল সকল সুপক্ক কর। ১।

"বিশ্বে দেবদেবীগণ এবং মরুদ্গণ কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত এই সীতা (=লাঙ্গলের রেখা, "সীতা লাঙ্গল পদ্ধতির"-মহীধর) অমৃতোদকে সম্যক সিক্ত হউক। হে সীতে! সমস্ত ক্ষেত্রজাত ওষধি সকল, অমৃতোদকে পরিপুষ্ট হইলে সতেজ হইবে, অতএব তুমি অমৃতোদক সংগ্রহে আমাদিগের অনুকূল হও। ২।

"ফাল বিশিষ্ট, সুদৃঢ় ও লঘুভার, লাঙ্গলে গমনক্ষম, বেগবান্, হৃষ্ট পুষ্ট গো, মেষ ও অশ্ব যোজনা করা হইতেছে; ভরসা করি ইহাদের দ্বারা সোমযাজী এই যজমানের ভূ-কর্ষণ কার্য্য সুন্দর নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ৩।

"হে কাম দুঘে সীতে! মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, পূষা এবং মদীয় প্রজাবর্গের ভোগার্থ ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর। ৪।

"এই মন্ত্র পাঠ করতঃ লাঙ্গল হইতে বৃষভগণকে বিমুক্ত করিয়া ঈশান কোণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। [এই লাঙ্গল ও বৃষভবৃন্দ মৃত্যু সমাপ্ত হইলে অধ্বর্য্যুর প্রাপ্য হইবে॥

"হে অহন্তব্য, দেবকার্য্যের উপযোগী বৃষভগণ! তোমাদিগকে লাঙ্গল হইতে বিমুক্ত করিতেছি; তোমাদের প্রসাদে আমরা ক্ষুৎপিপাসারূপ দুঃখপারাবার পার হইয়া

থাকি, এবং তমসা করি পরম-জ্যোতিও প্রাপ্ত হইতে পারি। ১।" যজুর্বেদ ১।৬৭-৭৩ কণ্ডিকা।

"এই প্রকারে ভূকর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে বৃষমোচনের পর "জুহু" দ্বারা পঞ্চবার ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কৃষ্ট ভূমির মধ্যগত কুশস্তম্বের উপর এই মন্ত্রে উর্দ্ধ-হস্তে হবন করিবে।

"অযবের (=মাষ কলাইএর) সহিত বর্ত্তমান সংবৎসর দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন। ১। অরুণীর সহিত বর্ত্তমান উর্বী দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক প্রদত্ত হইতেছে; তাঁহারা সুপ্রীত হউন। ২। দংসের সহিত বর্ত্তমান অশ্বিদেবদ্বয়ের তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে; তাঁহারা সুপ্রীত হউন। ৩। এতশের সহিত বর্ত্তমান সূর্য্য দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন। ৪। ইতার সহিত বর্ত্তমান অগ্নিদেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন। ৫।" * সত্যব্রতের অনুবাদ ১। ৭৪ কণ্ডিকা

এই আহুতির পর বীজবপন কার্য্য। তাহার মন্ত্র :—

"হে ওষধি সমূহ! তোমরা প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছ। বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ তোমাদের উৎপত্তির সময়। তোমাদিগ-হইতেই এই জগৎ প্রতি পালিত হইতেছে। আমরা তোমাদিগের প্রধানতঃ সপ্ত প্রকার [ব্রীহি, গোধূম ইত্যাদি] ভেদ অবগত আছি, এবং তদ্‌বিশেষে শত শত প্রকার [শালি, নীবার আদি] ভেদ অবগত আছি। ১।

"হে অম্বর! তোমাদিগের শত শত প্রকার ভেদ আছে এবং ঐ শত শত প্রকারের ও সহস্র সহস্র প্রকার বীজ আছে; তোমাদের সত্তাতেই এই জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; এই যজমানকে যেন কখন ক্ষুৎপীড়িত হইতে না হয়। ২।" ১। ৭৫-৭৬ কণ্ডিকা, সত্যব্রতের অনুবাদ।

এই ত গেল কৃষি বিষয়ক যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা। যজুর্ব্বেদের মতে ভূকর্ষণ ও বীজ বপন কার্য্য এই ভাবেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু কেবলমাত্র এই যজ্ঞানুষ্ঠানই কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান ছিল। লাঙল দিয়া চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় কৃষি দেবতার অর্চ্চনা ও স্তোত্র পাঠ হইত। ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের সপ্ত পঞ্চাশত্তম সূক্তই এই কৃষি বিষয়ক স্তোত্র। এই সূক্তের চারি দেবতা,-ক্ষেত্রপতি, শুন দেবতা, শুনাসীর দেবতা ও সীতা দেবতা। বামদেব ঋষি। নিম্নে এই সূক্তের রমেশ দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ দিলামঃ—

১। আমরা বন্ধু-সদৃশ ক্ষেত্রপতির (=কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেবের) সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব। তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন। কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

২। হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য, মাধুর্য্যোপেত, ও প্রভূত জল দান কর। যজ্ঞের স্বামিগণ আমাদিগকে সুখী করুন।

৩। ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্য মধু যুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা শত্রুকর্তৃক অহিংসিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিব।

৪। বলীবর্দ্দ সমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য্যকরুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহ সমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ (তাড়ণী, চাবুক) সুখে প্রেরণ কর।

৫। হে শুন! হে সীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ তাহা দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।

৬। হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন।

৮। ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক। রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক। পর্জ্জন্য মধুর জল দ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুনা সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

শুন ও সীর বা শুনাসীর দেবতাদ্বয়। কৃষিকার্য্যের সহায় দুইজন দেবতা। শৌনক বলেন শুন দ্যু-দেবতা, অর্থাৎ তাঁহার মতে শুন ইন্দ্র। সুতরাং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য। সীর শব্দের অন্য অর্থ লাঙ্গল। শুক্লযজুর্ব্বেদ (১২।৬৮) টীকায় মহীধর 'সীরাণি হলানি' লিখিয়াছেন। আর এই অর্থেই সীর শব্দের বহুল প্রয়োগ। সুতরাং এই দুইটী শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ হইতে এই অনুমান হয় যে সীর সম্ভবতঃ সীরাধিষ্ঠিত দেবতা। শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ হলধর দেব সম্ভবতঃ ইঁহারই পরিণতি। কিন্তু শুন শব্দের তেমন কোনও একটা কোনও অর্থের অনুমান করা যায় না। তবে ইনিও যে কৃষিবিষয়ক কোনও উপকরণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ বৈদিক সাহিত্যের সর্ব্বত্রই ইঁহারা একত্র কৃষিদেবতারূপে আহূত ও স্তুত হইয়াছেন।

ফসল পরিপক্ব হইলে সৃণি বা দাত্রের দ্বারা সেই ফসল কাটিয়া শকটের সাহায্যে গৃহে আনিয়া উদূখলে পেষণ পূর্ব্বক শূর্পদ্বারা ঝাড়িয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া তাহা দেবতাদিগের হবিঃ স্বরূপে যজ্ঞে ব্যবহার করা হইত। তাহারও নানা প্রক্রিয়া, নানা অনুষ্ঠান। সে-সকল কথা স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

এ পর্য্যন্ত যে-সকল বৈদিক অনুষ্ঠানের কথা বলা হইল তাহাতেই বুঝা যাইবে যে বৈদিক যুগে কৃষিকার্য্য ঋষিগণকর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইত। একালের ন্যায় সেকালের ঋষিগণ কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে হীনতা প্রাপ্ত হইতেন না। অন্যান্য বিষয়কর্ম্মের ন্যায় কৃষিকর্ম্মও গৌরব যুক্ত কর্ম্ম ছিল। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেও কৃষিকর্ম্মের স্থান ছিল। কৃষি ব্যতীত যখন জীবন যাত্রা চলে না তখন তাহাকে হীন কর্ম্ম বলিবার হেতু কি? আজকাল সহরে ব্রাহ্মণ সন্তান জুতার দোকান, তেলের কারবার, সোনারূপার দোকান, কাঠের দোকান ও অন্যান্য নানাবিধ হীন কর্ম্ম করিয়াও পল্লী সমাজে লাঞ্ছিত হন না। কিন্তু বিশ্ব পালনের ভারপ্রাপ্ত বিষ্ণুদেবতার প্রধান সখার হলধরের অস্ত্র স্পর্শ করিলে কলির ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন কেন? বঙ্গভাষায় 'চাষা শব্দ বর্ব্বরতার বাচক হইলেও সংস্কৃতে 'আর্য্য' শব্দ আভিজাত্যের বাচক ছিল। প্রাচীনকালে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে যে 'আর্য্যপুত্র' আখ্যায় সম্বোধন করিতেন সেই শব্দেরই বঙ্গানুবাদ "ওগো ও চাষার ছেলে" আজ কালপ্রভাবে বর্ব্বরতার বাচক হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? আমি বলি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির উপর এই কালপ্রভাবই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু। সুতরাং এখন যে যুগ পড়িয়াছে তাহাতে কালপ্রভাবজাত এই অমূলক কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে না পারিলে আমাদের আর অব্যাহতির উপায় নাই। তাই বলি ভাই আর্য্যগণ! আবার পূর্ব্ব-কালের আর্য্যশব্দের ন্যায় আধুনিক কৃষক শব্দের মধ্যে আভিজাত্যের গৌরব খুঁজিয়া বাহির করুন। কালক্রমাগত অমৌলিক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে কৃষি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করুন। লক্ষ্মীশ্রী পল্লীতে পল্লীতে ফিরিয়া আসিবে! গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তা চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে। সোনার বাঙ্গলার ক্ষেতে আবার সোনা ফলিবে!
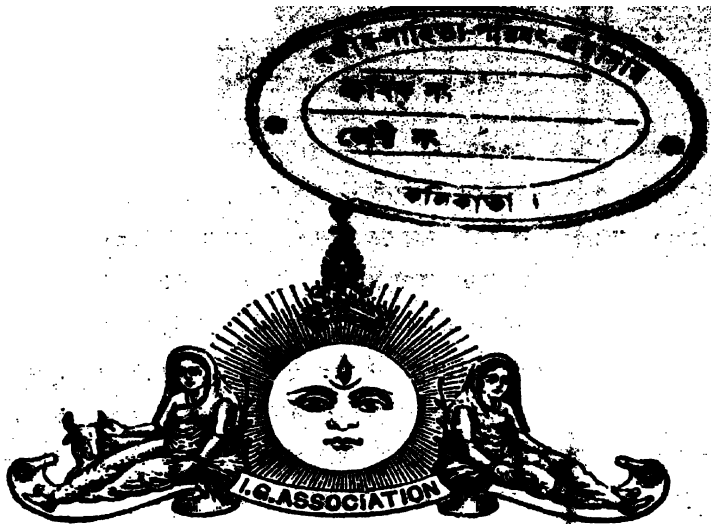
যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য্য

বাণিজ্যই জাতীয় উন্নতির মূল মন্ত্র। Industrial Commissionএর বিবরণীতে প্রকাশ যে ভারতীয় বাণিজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে ভারতীয় কৃষির উপর নির্ভর করি[illegible]ছে। তার উপর কৃষিজীবি ভারতের কৃষককুলই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় যে কি উপায়ে এই অবস্থার প্রতীকার করা যাইতে পারে।

কৃষিতত্ত্ববিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার কলেজস্কয়ারের রাজনৈতিক বক্তা পর্য্যন্ত সকলেই বলেন যে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি ভিন্ন ভারতের মোক্ষলাভের আর কোন উপায় নাই (যদিও তাঁহারা বক্তৃতা করিয়াই খালাস হন)। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী বলিতে সাধারণতঃ তাঁহারা বোঝেন—আমাদের মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল, মই, কাস্তে, ফেলিয়া দিয়া বিলাতি যন্ত্রপাতি ও কলকজার (Scientific agricultural implements) সাহায্যে চাষ করা। নজীর স্বরূপ তাঁরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের চাষীদের কথা বলেন। কলকজা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করিলে অল্পব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। এবং তাদের দেশের মত অল্পব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিলেই আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হইবে। এই সঙ্গে তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন যে এতবড় ভারতবর্ষে বছরে মাত্র তিন লক্ষ টাকার কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি Europe ও America হইতে আমদানী হয়। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য agricultural implements এর ভারতে বহুল প্রচলন আবশ্যক।

যোগ—। কিন্তু এইখানে আমাদের একটি বলিবার কথা আছে। Europe ও Americaর কৃষি সহায়ক কলকব্জা আমাদের দেশে ঠিক খাপ খাইবে কি? ঐ দেশের কলকব্জার সাহায্যে চাষ এদেশে চলিবে কি?

তাঁহারা হয়ত বলিবেন "তাদের দেশে যে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী চলে কেন তাহা আমাদের দেশে চলিবে না? (যেমন শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্য নীতিতে তাহাদের দেশের বাণিজ্য বর্দ্ধন বিস্তার ও প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে তেমনই আমাদের দেশেও করিবে) ইহার উত্তরে আমরা বলি যে—Europe America প্রভৃতি দেশ ও ভারত—দেশ কাল পাত্র হিসাবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ সব দেশের আবহাওয়া, কর্ষিত জমির অবস্থাও পরিমাণ, কৃষকের অবস্থা, অভাব, অনুযোগ ও প্রয়োজন, এবং তাদের চাষের সুযোগ ও সুবিধার সহিত আমাদের কর্ষিত জমির অবস্থা ও পরিমাণ কৃষকের অবস্থা অভাব অনুযোগ ও প্রয়োজন এবং চাষের সুযোগ ও সুবিধার কোন মিল নাই সুতরাং বিভিন্ন দেশ কাল পাত্র অনুসারে—কৃষিও কৃষকের অবস্থা অভাব সুবিধা ও প্রয়োজনের মধ্যদিয়া, তাদের দেশে যে সকল কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সে সকল তাদের দেশের কৃষির পক্ষে সুন্দর সুবিধা জনক ও উপযোগী হইলেও আমাদের দেশে দেশ কাল পাত্র অবস্থা অভাব সুবিধা ও প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য ঐ সকল যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা সুন্দর সুবিধা জনক ও উপযুক্ত নাও হইতে পারে। সুতরাং ঐ বিষয়ে কৃষিতত্ত্ববিৎগণের গবেষণার প্রয়োজন। Europe ও Americaর কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আমাদের দেশে প্রচলনের চেষ্টার পথে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষম অন্তরায় দৃষ্ট হয়।

(১) কৃষকের দারিদ্র্য। আমাদের দেশের কৃষক কুলের আর্থিক অবস্থা বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। "লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগে" প্রবাদটি তাদের পক্ষেই প্রযোজ্য। তাহারাই শস্য ও আহার্য্য উৎপন্ন করিয়া নিজেরা অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়। Europe ও Americaর কৃষককুলের মত বহু অর্থব্যয়ে ঐ সকল কল ও যন্ত্র সমূহ ক্রয় করা, ও ক্রীত কল কব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অনেক সময় পেটের দায়ে এক মাত্র সম্পত্তি জীর্ণ হাল ও শীর্ণ বলদ দুটিকেই তাদের বিক্রয় করিতে হয়।

(২) আবাদী জমির অল্পতা। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আমাদের দেশে গড়পরতা কৃষক প্রতি আবাদী জমির পরিমাণ কত। বাংলাদেশের ধান্য জমির সহিত যাদের চাক্ষুষ পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে জমির অবস্থা কিরূপ। এইখানে রামের ১ বিঘা; তার পাশে দশ ক্রোশ দূরের অধিবাসী হরির দেড়বিঘা—তার পাশে শ্যামের দশ কাঠা ৩১৫ ছটাক। ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব ত নাই বরং জমির সীমানা লইয়া শত্রুতা। দশ ক্রোশ মাঠের মধ্যে দশ বিঘা জুড়ে দশ খানিও নাই। সুতরাং—এ ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা দ্বারা extensive agriculture সম্ভব নয়।

(৩) যন্ত্রপাতি ও কল কব্জার সাহায্যে extensive agriculture প্রচলিত করিতে হইলে যে জমি এখন ২২ কোটী কৃষকের মধ্যে—বিভক্ত রহিয়াছে তাহা সাত কোটী কৃষকের হস্তগত হইবে এবং অবশিষ্ট ১৫ কোটী কৃষক ভূমিহীন ও জীবিকা হীন হইয়া পড়িবে। বহু বিঘা জমি একত্রে চাষ ভিন্ন কল ও যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করিয়া সুবিধা নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে হয় আবাদী জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে নচেৎ—অবশিষ্ট ১৫ কোটী কৃষকের অন্ত জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এ দুইটীই বোধ হয় অসম্ভব।

তবে এখন কি উপায়?—আমরা কি চিরদিনই এই হাল মই ও কাস্তে লইয়া থাকিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদেশী Europe ও Americaর লোকেরা আমাদের দেশের জমির বা কৃষকের অবস্থা অভাব ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং তাদের বিভিন্ন অভাব অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্ট কৃষি সহায়ক কল ও যন্ত্রপাতি আমাদের দেশের অনুরূপ হইবে না বলিয়া যে কখনও বৈজ্ঞানিক কল কব্জার সাহায্যে কৃষি করিয়া অল্পব্যয়ে ও পরিশ্রমে অধিক উৎপন্ন করিতে পারিবে না তাহা নয় আমাদের দেশের জমির যেরূপ অবস্থা তাহাতে extensive agriculture সম্ভব নয়—সম্ভব intensive agriculture. এখন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার আবশ্যক যাহা আমাদের কৃষি ও কৃষকের—অবস্থা অভাব ও প্রয়োজনের অনুরূপ যাহা সাধারণ, সুবিধাজনক ও অল্পমূল্যে বিক্রীত। যাহা দেখিয়া কৃষককুল ভয় না পাইয়া বরং আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের অবস্থা অভাব সুবিধা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত এরূপ কৃষিতত্ত্ববিদ্ ও ইঞ্জিনিয়ার গণের গভীর গবেষণার ফল স্বরূপ যে সকল কৃষি সহায়ক কলকব্জা ও যন্ত্র সমূহ উদ্ভাবিত হইবে—তাহার প্রচলন দ্বারাই আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি সম্ভব।

কৃষিকার্য্য ধননীতি

কৃষি কার্য্য করিয়া লাভবান হইতে হইলে সর্ব্বদা ধননীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ বাণিজ্যের সহিত কৃষির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাঁচামালের জন্য বাণিজ্য বহুল পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষি—দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া ধন সৃষ্টি করে আর বাণিজ্য—কৃষিজাত দ্রব্য—ক্রয় বিক্রয় করিয়া সৃষ্ট ধন বৃদ্ধি করে। কৃষির উদ্দেশ্য দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য—কৃষির দ্বারা অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য অভাব নিরাকরণ করা নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরানুখাপেক্ষী না হইয়া—দেশের অর্থ যাহাতে পরদেশে না গিয়া নিজের দেশেই থাকে তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। আর সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ও কাঁচামাল উৎপাদনের দ্বারা বাণিজ্যের

সুবিধা ও অন্য দেশের অভাবের প্রতে লক্ষ্য রাখা। কোন দেশে কোন দ্রব্যের অভাব ও অধিক কাটতি সেই দ্রব্য (আমাদের প্রয়োজনে লাগুক বা না লাগুক) অল্পব্যয়ে উৎপন্ন করিয়া সেই দেশে রপ্তানি করিয়া লাভ করা যায় কি না সে দিকে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যেমন পাট, চা, কফি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু এই সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিয়া দেশের ধনাগম ও বাণিজ্য বিস্তারের সাহায্য করিতে হইবে। ধন নীতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু প্রচুর উৎপন্ন করিলেই কৃষকের অবস্থা ভাল হয় না। ধননীতি না বুঝিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করিলে দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় ও উৎপাদনের ব্যয়ের তুলনায় লাভ হয় না। এর জলন্ত উদাহরণ পাট। পৃথবীর মধ্যে একমাত্র বাংলা দেশেই পাট জন্মায়। কিন্তু সব দেশেরই পাটের প্রয়োজন। এমন প্রয়োজনীয় জিনিষের এক চেটিয়া ব্যবসা পাইয়াও বঙ্গের কৃষককুলের অবস্থা ভাল না হইয়া যে দিন দিন হীন হইতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন। কোথায় বিক্রেতার কথা অনুসারে ক্রেতা চলিবে না ক্রেতার কথা অনুসারে বিক্রেতাকে চলিতে হইতেছে। এর কারণ অর্থনীতি জ্ঞানের অভাব।

কৃষি সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু কি বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে? প্রায়ই দেখা যায় যে অল্প ইংরাজি শিক্ষিত কৃষক সন্তান অর্দ্ধবাবু হইয়া ত্রিশঙ্কুর মত মধ্য পথে অবস্থান করে—না পারে লাঙ্গল ধরিতে না পারে কলম চালাইতে। তাহাদের এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভদ্রলোক বা কেরানি না হইয়া ভাল কৃষক হইতে পারে। স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া সেখেন নিজেকে হীন না মনে করে এবং অল্পব্যয়ে ও পরিশ্রমে অধিক উৎপন্ন করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—নিজের ভূমি নিজে কর্ষণ করিলে সম্মানের হানি হয় না। শ্রমহীনতা সম্মানের লক্ষণ নয়। শ্রমেতেই সম্মান আছে। মিতব্যয়িতা শিক্ষার একটি প্রধান বিষয়। সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায় বড়ই অমিতব্যয়ী। যদি কেহ একটি টাকা লাভ করে, সেটি সঞ্চয়ের চেষ্টা না করিয়া ইলিষ মাছ কিনিয়া আনে। তাহা ছাড়াও বঙ্গের কৃষককুল দিন দিন বিলাসী ও শ্রম বিমুখ হইয়া পড়িতেছে। ইহা কিন্তু সর্ব্বনাশের কথা।

এই সব শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে কৃষি কেন্দ্র স্থাপিত করিতে হইবে। এই সব কেন্দ্র স্থাপনের উপরেই কৃষির উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে কৃষকদিগকে উত্তম বীজ, বিবিধ প্রকারের সার ও কৃষিসহায়ক যন্ত্র সমূহ সরবরাহ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সাধারণ কৃষি বিজ্ঞানও অন্যান্য আনুসঙ্গিক শিক্ষা দিতে হইবে। কেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পাইতে পারে।

দালাল বা middle man দের হাত হইতে কৃষক সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার জন্ত এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা directly মাল বিক্রয় করিতে পারে অথবা তাদের উৎপন্ন মাল জমা রাখিয়া অর্থঋণ গ্রহণ করিতে পারে ; পরে কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষগণ বাজার দর সুবিধা হইলে সেই জমায়েত শষ্য বিক্রয় করিবেন। এইরূপ controll পাট সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই পাট প্রথম ওঠে অমনি পাটের মহাজনগণ মৎলব করিয়া দর কমাইয়া দেন। দরিদ্র কৃষকের এরূপ ক্ষমতা নাই যে বাজার দর চড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সে পাট ধরিয়া রাখে। খাজনার জন্ত জমিদারকে ঋণেরজন্ত মহাজনকে সে পাট দেখাইয়া কোনরূপে শান্ত রাখিয়াছে ; কাজেই অল্পমূল্যেই সে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যদি কৃষক ৫।৬ মাস পাট ধরিয়া রাখিত তবে সে তাহা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত ; কি তাহা হইবার নয়। পাটের ব্যবসায় কলিকাতার মহাজন ও কলওয়ালারা দিন দিন আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইতেছে আর যে বেচারী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শষ্য উৎপন্ন করে সে অর্দ্ধাশনে সারাবৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরিতেছে। কয়েকবার America তুলার অবস্থাও আমাদের পাটের অবরূপ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ধননীতি বোঝে controll করিতে জানে তাই আজ America তুলার উপরে সমস্ত পৃথিবীর তুলার বাজার দর ও piece goods এর দর নির্ভর করিতেছে।

Europe America প্রভৃতি দেশের কৃষি ও পালন প্রভৃতি কার্য্য সমবায় প্রণালীতে (Cooperative credit system) অতি সুচারুভাবে পরিচালিত হইতেছে। সমবায় প্রণালীমতে—ঋণ গ্রস্ত দরিদ্র কৃষককুল ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়কে সুদখোর মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত প্রত্যেক জেলার স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক বা Co-operative credit Soceity খোলা ও কৃষক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়কে তাহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাঙ্ক বা Co-operative credit Society হইতে কৃষকগণ অল্পসুদে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাংলার নানা স্থানে co-operative credit Society খোলা হইয়াছে। সুযোগ্য কার্য্যকুশল শ্রীযুক্ত বাবু যামিনী কুমার মিত্র মহাশয় তাহার কর্ণধার। তাঁহাদেরই কার্য্য কুশলতায় দেশের জনসাধারণ এই সমবায় প্রণালীর উপকারিতা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে। বস্ত্রবয়ণ প্রভৃতি দেশের শিল্পের উন্নতি জন্ত এই প্রণালীমত কিছু কিছু কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে কৃষি ও গোপালন প্রভৃতি কার্য্য এই সমবায় প্রণালি যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে দেশহিতৈ পরায়ণ ব্যক্তিগণের উৎসাহী হইয়া co-operative credit societyকে সাহায্য করা প্রয়োজন। সুদূর ভবিষ্যতে আমরা co-operative credit societyর বহুল বিস্তার ও সফলতার আশা করিতেছি

কৃষি ও গোপালন—

কৃষির সহিত গোমহিষাদি পালনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভারতে কৃষিকার্য্য সর্ব্বত্রই গোমহিষাদির সাহায্যে হইয়া থাকে আমাদের দেশের গোমহিষাদির অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।—যে দেশে প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজীবি—সেদেশে ১০০ জন লোকের মাত্র ৬০ টি কর্ম্মী গরু। তাহার উপর আবার শারিরীক দুরবস্থার জন্য ও জাতিগত অবনতির অধিক পরিশ্রমও দুর্গদানে অক্ষম। অথচ আমাদের দেশে গো মহিষাদির উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। এদেশের লোক বোঝে না যে শুধু গো রক্ষিনী বা গোহত্যা নিবারণী সভা করিলে বা চাঁদা করিয়া পিঁজরা পোল করিয়া দিলেই গোজাতির—উন্নতি হয় না। সেই সঙ্গে গো পালন সর্ব্বাগ্রে দরকার। ১৯২০—২১ সালে এক সহর কলিকাতাতেই ১২০০০০০ খানি বড় গরুর চামড়া ছিল। ১৯১৯—২০ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৩১ ৩১০০০০০ পঁয়ত্রিশ কোটী একত্রিশ লক্ষ টাকার—গো মহিষাদির চর্ম্ম-বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে + মোটা মুটি হিসাব করিলে দেখা যায় যে ঐ বৎসর প্রায় তিন কোটী পশু বিনষ্ট হইয়াছিল। যে দেশে এত পরিমাণ গো মহিষাদি পশু হত্যা হয়, অথচ তাহাদের-পালনের কোন ব্যবস্থা বা চেষ্টা নাই— সে দেশের ভবিষ্যৎ যে কি ভীষণ তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবেনা। গোপালন একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার-Europe, America Australia প্রভৃতি দেশে গো পালন শিক্ষা দেওয়ায় যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে এবং বহু চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক পশু পালন লইয়া গবেষনায় ব্যাপৃত আছেন। যদিও আমাদের দেশে গো-জাতির চিকিৎসার জন্য কোন কোন স্থানে গভর্ণমেণ্ট সেই-কর্ত্তৃক—Veterinary cottage স্থাপিত আছে কিন্তু রোগের তুলনায়-তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অপর্য্যাপ্ত। পূর্ব্বে-গোজাতি হিন্দুদের প্রধান ধনের মধ্যে গণ্য ছিল। এখনও দরিদ্র কৃষকের শীর্ণ গো মহিষাদিই একমাত্র ধন। সুতরাং যাহাতে গো মহিষাদির জাতি গত উন্নতি ও বংশ বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা ব্যধি ও অকাল মৃত্যু হইতে নিস্তার পায়—সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণের-একান্ত চেষ্টা—অবিলম্বে আবশ্যক। আমাদের দেশে গো মহিষাদির জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যেরও, অত্যন্ত অভাব।—পূর্ব্বে—দেশের নানা স্থানে গোচারণের জন্য বৃহৎ বৃহৎ—কাঁচা ঘাস পরিপূর্ণ-মাঠ--পতিত থাকিত এবং নিকটস্থ গ্রামের-গো মহিষাদি—সেই ক্ষেত্রে চরিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমান আহার করিতে পারিত। কিন্তু এখনও দিন দিন সেইরূপ গোচারণ ক্ষেত্রের এমন অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে গোচারণ ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। শুকনা বিচালি সঙ্গে একটু খইলের ছিটা বা এইরূপ কিছু এখন গোমহিষাদির একমাত্র খাদ্য হইয়া পড়িয়াছে।—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য পাওয়া ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারণে গোচারণ আবশ্যক।—আলো ও ফাঁকা হাওয়া-

এবং ব্যায়াম যেমন মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন সেইরূপ তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যহ মাঠে চরা একান্ত প্রয়োজন।—কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে দেখা যায় যে দুগ্ধবতী গাভী সকল প্রায়ই গোয়ালের বাঁধা থাকে, ফাঁকা মাঠে চরিতে পায় না। ইহা কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ। দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য খারাপের—সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধপায়ী শিশুগণও-ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া নানাবিধ রোগগ্রস্থ হয় ও অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এই গো মহিষাদির অবস্থার উন্নতির উপায়-কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

ইক্ষুর চাষ

ইক্ষুর পুরাবৃত্ত

পৃথিবীর কোন দেশে, কবে ইক্ষু প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, অথবা কোন জাতি প্রথমে ইক্ষুর চাষ করিয়াছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ইক্ষুর প্রচলন আছে, এবং ভারত হইতেই যে চীন দেশে ইক্ষুর চাষের প্রথম প্রবর্ত্তন হয় তাহার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিষ্টার বসু,তাহার একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থ-রাশিতে বহুল পরিমাণে ইক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং ওয়াট সাহেবের Dictionary of commercial Product of India নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে ইক্ষুর বহুল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পাই যে তৎকালীন ভারতে ইক্ষুর প্রচলন ছিল,—কথিত আছে শ্রীরাম চন্দ্র দুর্গা পূজায় ইক্ষুর রস ব্যবহার করিয়া ছিলেন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান হইতে প্রমাণিত হয় যে ইক্ষুর আদি উৎপত্তি স্থান হয় ভারতবর্ষ নয়, পলিনেসিয়া, ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দিতে দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষ দেখিতে পান ও তাহা নিজ রাজ্যে লইয়া ইহার প্রচলন করেন, তাহার পর ভারতবর্ষ হইতে পারস্য দেশে ইক্ষু চাষের প্রচলন হয়, এবং তৎপরে আরবগণ কর্ত্তৃক পারস্য বিজীত হইলে তাহারা মিশর ও সিরিয়গণ ইক্ষু লইয়া যায়, খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিশরের উর্ব্বর ভূমিতে বহুল পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, মূরগণ কর্ত্তৃক ইউরোপ বিজয়ের সহিত ইক্ষুর চাষ আফ্রিকার ভিতর দিয়া স্পেনে প্রবর্ত্তিত হয়।

এবং বর্ত্তমানে একমাত্র স্পেন দেশে বহুল পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন। হয় মধ্য যুগে ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থল ভিনিস নগরে সিরিয়া, মিশর, সাইপ্রস্, সিসিলি প্রভৃতি দেশ হইতে বহুল পরিমাণে ইক্ষু শর্করা রপ্তানি হইত, পঞ্চদশ শতাব্দিতে তুরস্ক ও ভিনিসের যুদ্ধের সময়ে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ইক্ষু শর্করার বাণিজ্য ভিনিস হইতে লুপ্ত প্রায় হয়, তৎপরে পর্টুগীজ কর্ত্তৃক ইক্ষুর চাষ ম্যাডেরিয়া ও ক্যানারি দীপপুঞ্জে প্রবর্ত্তিত হয়, কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে ক্রমে ক্রমে ইক্ষুর চাষ ব্রেজিল দেশে ও ওয়েষ্ট ইনডিস্ দীপ পুঞ্জে প্রচলিত হয়।

আবহাওয়া :—ইক্ষুর চাষের জন্য কি প্রকার আবহাওয়ার প্রয়োজন তাহা সম্যক রূপে অবগত হইতে হইলে, জগতের যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হয়, সেই সকল দেশের আবহাওয়া—পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। Equator নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই ইক্ষুর চাষ ভাল হয়।

ভারতবর্ষ ফিজি যবদ্বীপ লোনিজিয়ানা মরিশাস্ কুইনল্যাণ্ড সিহ্নি পেরু, পোর্টোরিকো ব্রেজিল মিশর প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে।

বার্ব্বার সাহেব বলিয়াছেন যে রৌদ্রতাপ ও আর্দ্র বায়ু মাত্র এই দুইটাই ইক্ষু চাষের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অনাবৃষ্টি এবং শুষ্ক বায়ু ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ হানিকর।

Distric gozetter পাঠে আমরা জানিতে পারিব যে রাজসাহী বিভাগ এরূপ ভাবে অবস্থিত যে ইহার সে স্থানে অত্যধিক উত্তাপ অথবা অত্যধিক শৈত্য হইতে পারে না। মার্চ্চ মাসে শীতকালের উত্তর বায়ুর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। মার্চ্চের শেষ ভাগ এবং পুরা এপ্রিল মাস ধরিয়া উষ্ণ পশ্চিম বায়ু বহিয়া থাকে। সে সময় প্রায়ই ঝড় বায়ু হইয়া থাকে।

মে মাসে দক্ষিণ বায়ু এবং জুনে মনসুনের প্রারম্ভে হইতে অক্টোবরের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্বে বায়ু বহিতে থাকে।

এ দেশের স্বাভাবিক উত্তাপ জানুয়ারীতে ৬৩ ডিগ্রী। ক্রমে ইহা বর্দ্ধিত হইয়া এপ্রিল মে জুন মাসে ৮৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মনসুনের সময়ে ইহা সাধারণত ৮৩ ডিগ্রী হয় এবং নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৭২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। এপ্রিল মাসে উচ্চতম ৯৬ ডিগ্রি এবং জুলাই ও আগষ্ট মাসে উর্দ্ধতম ৭৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হয়—। জানুয়ারী মাসে নিম্নতম ৫৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

জমি কতবার এবং কিরূপ ভাবে কর্ষণ করিলে ইক্ষু চাষের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হয় তাহা এখনও পরীক্ষায় স্থির হয় নাই। তবে কৃষকেরা সাধারণতঃ বর্ষাকালে জমি পতিত রাখে এবং বর্ষার শেষে কর্ষণ আরম্ভ করে ও মই দেয়। এইরূপ ছয় বার মই ও লাঙ্গল দেওয়ার পর জমি ইক্ষু চাষের উপযুক্ত হয়।

আমাদের মতে বর্ষার সময় ইক্ষুর জমিতে শণ ও পাট বুনিয়া তাহার পর ঐ শণ গাছে ফুল দেখাদিলে পুনরায় গাছ শুদ্ধ ঐ জমি চাষ করিতে হইবে এবং কিছু চুন দিয়া ঐ শণ ও পাট গাছ জমির ভিতর পচাইতে হইবে। বর্ষার শেষে পুনরায় জমি চাষ করিয়া এক পাল গো মহিষাদি (সংখ্যায় ৫০টির কম নহে) ঐ ইক্ষুর ক্ষেত্রে অন্ততঃ কুড়ি দিনে জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। পাল প্রথমে দশদিন আবদ্ধ রাখিয়া ঐ জমিতে লাঙ্গল দিতে হইবে এবং ক্ষেত্র এক সপ্তাহ জমি পতিত রাখিয়া আবার ১০ দিনের জন্য গো মহিষাদি আবদ্ধ রাখিয়া লাঙ্গল দিতে হইবে। এইরূপে দুইবারে ২০ দিন পাল আবদ্ধ রাখিয়া লাঙ্গল দিলে গো মহিষাদির মল ও মূত্র রৌদ্র বৃষ্টিতে অপচয় না হইয়া ইক্ষুর ক্ষেত্রেই সঞ্চিত হয়। এইরূপে প্রস্তুত ক্ষেত্র ইক্ষু চাষের পক্ষে খুব সুফল ও উপযোগী।

সার—ইক্ষুর চাষে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস হয় সেজন্য ইক্ষু ক্ষেত্রে রীতিমত সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত সার দিলেও সুফল হয় না। সাধারণতঃ চাষীরা সমস্ত কৃষিকার্য্যে অজ্ঞানতা ও অর্থাভাব বশতঃ ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে গোময় ও গোমূত্র দেয় এবং ইক্ষুর চাষে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিঘা প্রতি ১০ দশ মণের বেশী গুড় উৎপন্ন করিতে পারে না। অথচ সরকারী কৃষিকার্যে বিঘা প্রতি ২৫ মন গুড় অনায়াসে উৎপন্ন হয়। আবার অতিরিক্ত পরিমাণে সার দিলে উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুতের উপযোগী ইক্ষু হয় না এবং পরিমাণেও ফসল কম হয়—। ইক্ষু ছেদন ও বপনের মাঝে সময় খুব অল্প হওয়ায় অতিরিক্ত সার দেওয়ার ফলে অনাবশ্যকীয় সাকসব্জী প্রভৃতি আগাছা জন্মায় এবং ইক্ষুর পুষ্টি হইতে অধিক সময় লাগে ও বেশী পরিমাণে অপক্ক ইক্ষুর উৎপন্ন হয়—। ইক্ষুর চাষ করিতে হইলে এ বিশয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে।

Wilke সাহেব ইক্ষু-ক্ষেত্রে সার দেওয়ার জন্য জমিতে গো-মহিষাদি আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলেন। এইরূপ প্রথা মধ্য প্রদেশে ও যুক্ত প্রদেশে চলিত আছে। কিন্তু বিখ্যাত কৃষি তত্ত্ববিৎ-বারবার সাহেব বলেন যে ইক্ষুর জন্য খোলই উৎকৃষ্ট সার ; অন্য সারে-ফল বিশেষ ভাল হয় না। ক্লার্ক ও ব্যানার্জি'—সাহেব ইক্ষুর জন্য বিঘা প্রতি প্রায় ১২ মণ নাইট্রোজেন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁরা পরিক্ষা কাটিয়া ইক্ষু-রোপনের পোষকতা করেন। পরিক্ষা কাটিয়া ইক্ষু-রোপনের কথা পরে বলিব।

রাজসাহী কৃষি বিভাগে ইক্ষুর জন্য কোন বিশেষ রকমের সার দেওয়ার বাঁধা বাঁধি-নিয়ম নাই। তবে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১০ দশ মণ রেড়ির খোল পাঁচ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং ৩০০ তিনশ মণ গোবর দেওয়া হয়।

মিষ্টার মুখার্জি' তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে আমেরিকার কৃষকগণ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশাইয়া এক প্রকার সার প্রস্তুত করিয়া ইক্ষু-ক্ষেত্রের জন্য ব্যবহার করেন। প্রতি একারে অর্থাৎ তিন বিঘায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লিখিত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়—

Super Phosphate of Lime	৫ মণ
Sulphate of Amonia	১২ মণ
Sulphate of Potash	[illegible] মণ

কাপাস

(৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে যে বিষম অন্নবস্ত্র সংকট উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞান বলেই তিরোহিত করিতে হইবে এবং এইরূপ সংকট অপরাপর দেশে উপস্থিত হইলে বিজ্ঞান বলে অপসারিত হইয়াছে ; আমাদেরও বিজ্ঞান সাহায্যে তাহাই করিতে হইবে। এসম্বন্ধে অনেক কথা বক্তব্য আছে, তাহা কৃষকের পাঠকগণ মল্লিখিত প্রবন্ধাবলী বিগত দশ পনের বৎসরে বহুল পাঠ করিয়া থাকিবেন তাহার পুনরুল্লেখ অত্রস্থানে নিষ্প্রয়োজন। যদি আমার দেশের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সহজে ফুলগাছ চাষ, কৃষি, পাখিচাষ, পশ্বাদি সংজনন, মক্ষিকাচাষ, দুগ্ধ ব্যবসা, পুষ্প চাষ, তরিতরকারি ও সব্জী চাষ, মাটকড়াই বা চীনাবাদাম চাষ, মেষ, গো, অশ্ব, খচ্চর, শূকর ইত্যাদি চাষ বা ব্যবসা ডাক যোগে শিক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে কানজাস্ সিটীর পুল্ট্রী স্কুল, কিম্বা মিনাপোলিশের কৃষিস্কুল অথবা প্রেজীণ্ট হিলের "এমারিকাণ ন্যাশানেল স্কুল অব এনিমেল বৃডিং" অথবা কালিফর্ণিয়ার বিশ্ববিত্যালয়ের অন্তর্গত কৃষি বিভাগের Extention Service Lecture Shipএ ভর্ত্তি হইয়া ডাক যোগে শিক্ষা লাভ করিতে পরামর্শ দিই। আমাকে পূর্ব্বে সডাক পত্র দিলে আমি ইহাতে ভর্ত্তি হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। আমি ইহাদের ভারতীয় এজেণ্ট হইতেছি। মাস মাস ও সমগ্র-শিক্ষার সমুদয় ফিশ্ ও এক্ সচেই পাঠককে বহন করিতে হয়। তাঁহারা পুস্তক ও শিক্ষা ডাক যোগে দান করিয়া পাকা কৃষক তৈয়ার করিয়া সনও শেষে পারদর্শিতা অনুসারে সার্টিফিকিট্ দিয়া থাকেন। এইরূপ শিক্ষিত চাষা আমাদের দেশে বহু সংখ্যায় তৈয়ার হইলে তাঁহারা দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত চাষীদের কাছে গিয়া ভ্রমণ শীল স্বেচ্চার শিপ্ ও শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা নবযুগের বৈজ্ঞানিক চাষ-বাস বিধি শিক্ষা জন-সংঘের মধ্যে বিকীর্ণ করিবার বেশ অবসর পাইতে পারেন। আমাদের দেশের শিক্ষা ও কৃষিবিভাগের তথা বিশ্ববিত্যালয়ের দৃষ্টি কি আশু এদিকে পড়িবে? যাহারা [illegible] শিক্ষা চান তাঁহাদের ম্যাডিসন কুপার ক্যালিফিয়া, নিউইয়র্কের [illegible] যোয়ার্স পত্রিকা আনাইয়া পাঠ করিতে বলি। আমাদের দেশের চাষাদের বা তাহাদের [illegible] শিক্ষা প্রাপ্ত অভিমানী সন্তানদের চাষা নামে পরিচিত

হইবার সে আকাঙ্খা কোথায় ? তাহাদের কৃষি আদি খাদ্যদানকারী বিদ্যা শিখিবার ও অনুসরণ করিবার আঠাইবা কোথায় ? তাই না আমাদের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে ! ! !

এখন কাপাস চাষের কথা যাহা বাকী আছে বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। খুব তাঁল করিয়া ধুলাবৎ কর্ষিত মাটির খেতে সার দিয়া পাটা দিয়া খেতকে বিশ্রাম দিবে; ফাল্গুন মাস হইতে খেতের কর্ষণ করিলে জমীর ঘাস ও আগাছা প্রভৃতি প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে শুখাইয়া মরিয়া যায়, সুতরাং বর্ষার জঙ্গল জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না; বৈশাখের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথমে ভালরূপে বৃষ্টি হইলে সমস্ত খেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ২॥০ বা ৩ হস্ত অন্তর এবং আধ হস্ত উচ্চ শিধা দাঁড়া বা আইল বাঁধিয়া তাহার উপর ২॥০ বা তিন হস্ত অন্তর চারাগুলি পুতিয়া দিয়া গোড়ার মাটী ঈষৎ চাপিয়া দিবে। বৈকালেই গাছ রোপণ করিবে এবং মাটা সমেৎ গাছগুলি চারার খেত হইতে তুলিবে কিন্তু পুতিবার সময় মূল শিকড় সামান্য কাটিয়া দিলে গাছের খুব তেজ হয়, ঝাড়াল হয় এবং পাশে বাড়ে; গাছগুলি পুতিবার সময় গর্ত্তের মধ্যে এক মুঠা করিয়া পুরাণ পচা গোবর সার দিলে গাছের তেজ হয় ও খুব বাড়ে। গাছ ধরিয়া যাইলে মূল ডগা ছাঁটিয়া দিলে গাছ ঝাড়াল হয় ও পাশে বাড়িলে ফলন অধিক হয়। কাপাস বৃক্ষও এইরূপে বপন করিবে কিন্তু তাহার ব্যবধান ৪।৫ হস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নীরস বা বালি-শাঁশ মাটিতে গাছের তেজ কম হয় বলিয়া ব্যবধান কম করা যাইতে পারে; যে সকল মাটী সহজ ও বেশ সারের দ্বারা সজীব করা হইয়াছে, সেই সব জমীর জন্য কাপাস গাছ ৫।৬ হাত ব্যবধান করিয়া পুতিবে নচেৎ গাছ বড় হইলে ফলন কম হইবে। বর্ষায় কাপাস চাষ করিতে হইলে খেতে দাঁড়া বাঁধিতে হইবে, কারণ ঐ পথ দিয়া অতিরিক্ত বর্ষার জল নির্গত হইয়া যাইবে, গাছের কোন অনিষ্ট হইবে না। গাছ জমিয়া যাইলে ও তলায় ঘাস জন্মিলে বর্ষায় কেবল মধ্যে মধ্যে নিড়ানি চালাইয়া দিবে। গাছগুলি দেড় বা দুই হাতের উচ্চ হইলে ডগা কাটিয়া দিবে তাহা পূর্ব্বেই বলেছি। তাহাতে গাছ পাশে বাড়িবে, ঝাড়াল হইবে এবং ফলন বেশী হইবে। এইরূপ ২।১ বার ২০।২৫ দিন অন্তর ডগা কাটিয়া দিবে। কাপাস খেতে যেন জঙ্গল না হয় তাহার প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে গাছে ফল ফুল ধরিতে আরম্ভ করিলে খেতে যাতায়াত কম করিবে কারণ সদা যাতায়াতে গাছের ঝাড় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকেও ফুল গুলিও ঝরিয়া পড়ে। তবে জঙ্গল হইলে খুব সাবধানে নিড়াইয়া দিবে, যাহাতে জঙ্গল না বাড়ে ও মাটি সমচালে বসিয়া না যায়। শীতকালে মাটী নিরস হইলে মধ্যে মধ্যে সেচ দিবে। চৈত্রি ফসল প্রাপ্তির গাছের জন্য হইতে জমি কর্ষণ করিয়া আশ্বিনের প্রথমে দাঁড়া বাঁধিয়া বীজ বা চারা রোপণ করিবে। শীতকালে জমীর স্বাভাবিক নীরসতাবশতঃ দাঁড়ার আল আলগা করিয়া মাটি ধরাইয়া দিতে হইবে এবং গাছের গোড়ায়

শুষ্ক হইয়াছে বোধ হইলে মাঝে মাঝে বা মাসে মাসে একবার বা দুইবার করিয়া আবশ্যকমত জল সেচন করিতে হইবে। ফল সবুজবর্ণ ও উত্তমরূপ পুষ্ট হইলেই অর্থাৎ ফল পরিপক্ক হইবার প্রায় ১ বা ১৷৹ মাস পূর্ব্ব হইতেই জল সেচ বন্ধ করিবে নচেৎ শেষ পর্য্যন্ত জল সেচে তুলা পল্‌কা বা স্বল্পায়ী হইয়া থাকে।

দেশী অল্পজাতীয় কাপাসের উপরোক্ত দুই উপায়ে অর্থাৎ দুই সময়ে (জৈষ্ঠ ও আশ্বিনী) চাষ হইতে পারে। তবে শুভ্র কাপাসের জৈষ্ঠী বুননই শ্রেষ্ঠ কারণ তাহাতে গাছ বেশ বাড়িয়া প্রথম বৎসরেই বার্ষিকের সমপরিমাণ ফলন হইয়া থাকে; কিন্তু আশ্বিনী বুননে অতি অল্প পরিমাণে তুলার ফলন হইয়া থাকে। বিদেশী কাপাসের মধ্যে মার্কিনী জাতীয় আশ্বিন বুননই সমীচিন ও যুক্তিযুক্ত যেহেতু বর্ষায় ইহারা ভাল জন্মে না, বিদেশীর গুণ কাপাসও আশ্বিন মাসে বপন করা কর্ত্তব্য; তবে বর্ষায় চেষ্টা করিলে ক্ষতি নাই। পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে মৈশরী কাপাসের দেশীয়ের মত চাষ হইয়া থাকে। মৈশরী কাপাস বালি যাঁশ উচ্চ জমীতেই ভাল জন্মে এবং বেশী জল প্রয়াসী বলিয়া মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া শুষ্ক হইলেই সেচ দিতে হয়। মার্কিণ কাপাসের জল অপেক্ষা হিম, সার ও রৌদ্রই বেশী প্রয়োজন হয়। শ্রেণীবদ্ধভাবে বুনন বা চারা নাড়িয়া রোপন ব্যতীত বীজ ছিটাইয়া বুনন করিলেও গাছের যথাযোগ্য পূর্ব্বলিখিতরূপ পাট করিলে ফলন ভাল হয়।

সকল জাতীয় কাপাস গাছকে ছাঁটিয়া দিতে হয়; তবে বাংগী, বুড়ী, ওলনা প্রভৃতি শুভ্র জাতীয় কাপাস এবং যে সকল জাতীয় কাপাস অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে তাহাদিগকে বৎসরান্তে ছাঁটিয়া (pruno) দেওয়া আবশ্যক হয়। ছাঁটিয়া না দিলে গাছের তেজ হয় না, ফল ছোট হয়, তুলা পরিমাণে কম হয় এবং গুণে অপকর্ষতা লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে গাছ ছাঁটিবার বড় প্রয়োজন হয় না; গাছ নিস্তেজ হইয়া আসিলে দ্বিতীয় বৎসরের শেষেও ছাঁটা উচিত।

ফল তুলিয়া লইয়া চৈত্র ও বৈশাখেই গাছ ছাঁটিয়া (pruning) দিতে হয়। তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরী বা কাঁচী দ্বারা অপরিপক্ক ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে হয়। এরূপভাবে ডাল ছাঁটিবে যেন ফাটিয়া না যায়। ছাঁটিবার আগে বসা মাটী বেশ করিয়া কোপাইয়া বা কোদ্‌লাইয়া দিবে ও মাটীতে কিছু সার মিশাইয়া জল সেচ দিবে। সার মাটীতে ছড়াইয়া না দিয়া গাছের গোড়ায় দিলে গাছের বেশী উপকার হয় এবং সারও কম খরচ হয়। এই পাইট ছাঁটিবার পরে বা পূর্ব্বেও করা যাইতে পারে। চাষী যেন সদাই স্মরণ রাখেন যে তুলার জমী একটু আল্‌গা হওয়া প্রয়োজন। একেবারেই বেলে বা একেবারে কর্দ্দমময় জমীতে কাপাস চাষ করিলে ভাল তুলা জন্মায় না, অধিক সার যুক্ত দোয়াশ ভূমিই ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে জমীতে বৎসরে ৩০ বা ৪০ ইঞ্চি জলপাত হয়, তাহাই কার্পাস চাষ

পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া আমার মনে হয়। বিঘা পিছু ২ বা ২॥০ সের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হয় কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য জমীতে কিছু বেশী বীজের দরকার হয়। পশ্চিম দেশীয় 'তাড়ি' বা বিলাতী কেস্ ড্রীলার ডিল সাহায্যে বীজ বুনলে অনেক খরচা কম পড়ে ও কাজ বেশী ও সুচারু রূপ হয়।

তুলার মাটীর গভীর চাষ আবশ্যক। উত্তম বীজ নির্ব্বাচনের উপরই কাপাসের উত্তম ফলন নির্ভর করে। ভারতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কাপাস চাষ প্রসার লাভ করিতেছে। কাপাস চাষের উন্নতি উত্তম কর্ষণ বা চাষে, উত্তম বীজে, এবং বৈজ্ঞানিক মতে উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। এক একার জমীতে অর্থাৎ আমাদের দেশের তিন বিঘা দশ কাঠা জমীতে ১৫০ পাউণ্ড হইতে ৩০০ পাউণ্ড সূত্রে পাওয়া যায় এবং ৪ হইতে ৬ মণ বীজ পাওয়া যায়। ইহাকে পশ্চিমে 'বীনোলা, বা কাপাস বীজ বলে; ইহাতে উত্তম সার হয় এবং খুব পুষ্টিকর পশু খাদ্যও বটে। ইহা গোরস বৃদ্ধিকর নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য। আমাদের দেশে এক একার জমী চাষ করিতে ২৫।৩০ টাকা ব্যয় হয় এবং ঐ জমীতে ৯০।৯৫ টাকার তুলা ও বীজ দুয়ে মিলাইয়া পাওয়া যায়। ভাল ও মন্দ কাপাস সংগ্রহ করিয়া বাছাই করিতে হয়। কাপাস সংগ্রহ ঠাণ্ডার সময়েই করা সমীচিন। পরিপক্ক ও সতেজ বীজকে রৌদ্রে শুখাইয়া কলসীতে স্থাপন করিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

বাবু নিবারণ চন্দ্র চৌধুরীর কৃত "কাপাস চাষ" পুস্তক তথা নবম ভাগ কৃষি সম্পদের চতুর্থ সংখ্যার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুহ লিখিত "তুলার চাষ" এবং শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু কৃত" "সরল বয়ন' পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষিত তুলা চাষীর পাঠ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। অশন ও বসন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বস্ত্র যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে তাহার জন্য দায়ীকে? জীবন রক্ষার জন্য খাদ্য সামগ্রীর এবং শীতের সময়ে দেহ রক্ষা ও লজ্জা নিবারণের জন্য আমাদের নিত্যই বসনের প্রয়োজন; অসনের অভাব হইলে আমরা অর্দ্ধ পেটা বা এক সন্ধ্যা বং সামান্য উদরে দিয়া বহুকাল জীবন ধারণ করিতে পারি কিন্তু বসন বিনা মুহূর্ত্ত মাত্রও আমরা থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র সংকটের জন্য কে দায়ী? আমার মনে হয় যে ইহার জন্য আমরাই প্রধানতঃ দায়ী। দেশের মোটা কাপড়ে আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়া, স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয় উন্নতির কথা আমরা এক কালীন ভুলিয়া গিয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া আমরা বিলাত ও মার্কিণ দেশীয় বণিকের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল আপাত মনোহর ও সুলভ মূল্যের অনুদিন স্থায়ী বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়া বিলাসিতার চরম সীমায় পঁহুছিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছি তাহারই ভোগ আজ ভুগিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছি। আমাদের দুর্বুদ্ধি ও ... ভিতাই আমাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য দেশীয়

কাপড় ব্যবহার করিয়া আমাদের ঢাকাই, বাজী প্রভৃতি জাতীয় কাপাস চাষের যোগাড় কুঠারাঘাত করিয়া দেশের তাঁতী, জোলা ও যুগী কুলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশে দৈন্য আনিয়াছি। আমাদের তাঁতী গিয়াছে, যুগী জোলা সবই গিয়াছে, চাষাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। দেশের দৈন্য দূর করিবার একমাত্র উপায় চরকা প্রবর্ত্তন, ঘরের ব্যবহার্য্য কাপড় ঘরের লোকের দ্বারাই বুনান; কৃষির দিকে ফিরে যাওয়া, গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি করা। গৌণ জাতির বৈজ্ঞানিক গোজনন, দুগ্ধ ব্যবসায়, উত্তম ঘৃত মাখন, ক্ষীর ননী উৎপাদনে বহুদীর্ঘ ঔৎকতা পরিহার পূর্ব্বক জাতীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করা, ও শিক্ষা করা, সংঘবদ্ধ হইয়া এই সকলের অনুশীলনের চেষ্টা করা, কৃষকের কৃষির উন্নতি, সার প্রস্তুত করণ, সার দান, বীজ নির্ব্বাচন ও রক্ষণ, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ, উত্তম হাল চাষের অস্ত্র স্বল্প মূল্যে দেশে প্রবর্ত্তন করা, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের পাখি চাষ, পশু চাষ, শূকর, ঘোড়া, মেষ, আদি গৃহপালিত পশু চাষ, ও তাহাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নতি বিধান করন ও সংজনন শিক্ষা লাভ ও দেশে সেই কলবিদ্যা বিস্তার এবং প্রবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন ; ইহা করিলেই দেশের দৈন্য দূর হইবে, নচেৎ কদাচ নহে। আমাদের দেশের কোন কোন জেলায় "ডিষ্ট্রিক্‌ট্ কটন্ কমিটী 'নামে"কোন কোনও জেলায় দুই একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু উহাদের কার্য্য প্রণালী কদাচ আশাপ্রদ নহে। যাহারা বীজ চায় তাহারা পায় না, বরং কোন কোন স্থানে বস্তার বীজ বস্তাতেই পচিতেছে নিঃস্ব চাষীদের কথাকে শুনে ? আলু বীজের জন্য দেশের সংবাদ পত্রে যে কি আন্দোলন ২।১ বৎসর পূর্ব্বে এমন কি গত বৎসরেও হইয়াছিল তাহা কাহার অজানিত আছে। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের আলু বীজ ক্রয় ও বিক্রয় সরবরাহ সম্বন্ধে কেলেঙ্কারির কথা দপ্তরে পর্য্যন্ত ও উঠিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর কি সংস্কার করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী চাষাগণ কি জিজ্ঞাসা একবার কৃষি সচিবকে করিতে পারে না ?

ভারত জাত কাপাসই এক কালে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ধারোয়ার, সুরাট, ব্রোচ, হিঙ্গনঘাট, টিনেভেলী প্রভৃতি দেশীয় কাপাস বিদেশী বাজারে খুব আদরেই বেশী দামে বিকাইয়া থাকে। এক কালে পূর্ব্ব বঙ্গজাত তুলার মশলিন, মলমল্ তনিব, মিশর, জেনোয়া, ভেডো, মরক্কো কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের হাটে "বিকাইত অগ্নি মূল্যে" এবং এই দেশের নৌ বাহিনীই ভারতীয় পণ্য সম্ভার লইয়া মীন ও সূর্য্য কেতন উড়াইয়া "সদর্পে ভ্রমিত বঙ্গ ও আরাম সাগর বক্ষ"। প্রাচীনকালে গারো, বাজী ও ব্রহ্মনী কাপাসের চাষ এদেশে খুবই হইত। এমন সবই রূপ কথার পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাপাসিয়া, কাপাস পাড়া, কাপাস ডাঙ্গা, কাপাস টিকরী, কাপাস খোলা, কাপাস-বনী কাপাস কর্ণা, কাপাস বেড়ে, প্রভৃতি নামে

[illegible] অনেক গ্রাম নগর আছে, যাহারা পুরাতনযুগের কাপাস চাষের পরিচয় দিতেছে। ঢাকা জেলার কাপাসিয়া থানা বিশেষ পরিচায়ক তাহা পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন কিন্তু সুদূর অতীতের তুলার আমদানী রপ্তানীর বস্ত্র প্রস্তুত হইত; বাঙ্গালার তুলায় [illegible] সরু, মোটা এবং মাঝারি সকল প্রকারই কাপড় বয়ন হইত। যাহা তখন হইত, এখনও হইতে পারে; তবে এখন উহা কিছু সময়সাপেক্ষ হইয়া দাড়াইয়াছে। পৃথিবীর বিষুবরেখার উত্তরে ৪০° ডিগ্রী এবং দক্ষিণে ৩০° বা ৩৫° এই দুই অক্ষরেখামধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে কাপাস চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্বে বঙ্গের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ব্রহ্মপুত্র দেরব দ্বীপ প্রদেশ, ত্রিপুরা, ভুরশুট, মঙ্গলবাড়ী, শান্তিপুর, বনগ্রাম, মাটিতে, যশোহর, ফরাশডাঙ্গা, কুমারহাটী, নবদ্বীপ, চন্দ্রকোণা, সুতানটী, রায়বাঘিণী, সোমশপুর, তারকেশ্বর, জাড়াযোড়া, শ্রীরামপুর, বড়া, বৈদ্যবাটী, লেওক্যাহুলী, বর্দ্ধমান, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থান তুলা, সূতা এবং বস্ত্র শিল্পের প্রধান আড্ডা বলিয়া দেশে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশেই তুলার চাষ হইয়া থাকে। মার্কিনী তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সভ্য জগতে নিম্নলিখিত জাতীয় তুলা বাজারে বিশেষ পরিচিত:—১। আপল্যাণ্ড বা মার্কিণ দেশীয়। (ক) গসিপিয়াম হির্‌সুটাম্। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং গাছ গুল্ম জাতীয়। আমেরিকার সর্ব্বত্র এবং ভারতের ধারোয়ার ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ইহার চাষ হইয়া থাকে। (খ) হির্‌সুটাম রিলিজিওসাম্:—(দেব কাপাস) ইহাকে রাম কাপাসও বলে এবং সন্ন্যাসীগণ দ্বারা প্রথমে ইহার চাষ এদেশে প্রবর্ত্তিত। ইহার চাষ ভগবান রামচন্দ্রের সময়েও ছিল বলিয়া আমার মনে হয় কারণ তাহা না হইলে, এইরূপ নাম করণ কেন হইয়াছে। ইহার আঁশ কোমল। এই তুলা গাছকে "ডানকিন" কাপাসও বলে। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

নৈসর্গিক বা ছাড়া অবস্থায় বন্য পাখিগণ নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করে; কিন্তু গৃহপালিত পশু ও পাখিগণ বন্দি অবস্থায় বহু প্রকার রোগ গ্রস্ত হইয়া থাকে। আমি বহুবার বলিয়াছি যে গৃহপালিত পাখিগণকে খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় রাখিতে হইবে; সে বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। হাঁস মুর্গী এবং অপর গৃহপালিত পাখিদের ছানাগুলি সচরাচর অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সেইজন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাহাদের গুহ্যদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এই সময় তাহা বদ্ধ হইয়া গিয়া বেদনাতে অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিয়া থাকে এবং হাইতোলে এবং অবশেষে যাতনায় প্রাণত্যাগ করে। এসকল বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পক্ষীদের কদাচ অপর্য্যাপ্ত ভোজন করাইবে না; তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কদাচ রোগের আক্রমণ দেখা যাইবেনা। আমাদের দেশের পক্ষীর মধ্যে যাবতীয় রোগের উদ্ভবের কারণ অযত্ন, খাদ্যাভাব খাদ্যের প্রচুরতা (অর্থাৎ আবশ্যকের বেশী) স্যাঁৎসেঁতা (damp ময়লা বা কাদা অপরিচ্ছন্নতা, ঘেঁস (over crowding) অস্বাস্থ্যকর গৃহে বা স্থানে বাস অবিশুদ্ধ পানীয়জল পোকা বা উকুন, পরিচ্ছন্নতার অভাব নির্ম্মল বায়ু চলাচলহীন গৃহে বাস এবং জলে ভিজা, বলিয়া আমার বোধহয়। জলচর পক্ষীগণ জলে ভিজিলে বড় ক্ষতি হয় না বটে কিন্তু মুর্গী বিশেষতঃ অত্যধিক পালক যুক্ত জাতিগণ জলে ভিজিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ গ্রস্ত হয়; সেইজন্য রোগ প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাহা পক্ষী গৃহে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধনতা অবলম্বন করিবে। পালের মধ্যে নবানীত পাখীটা বা পাখীগুলিকে অন্ততঃ একমাস ১॥০ মাস কাল পৃথক রাখিবে এবং তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবে। মুখাভ্যন্তর, ডানা, পর, পা, নখ, নাক চক্ষু, মাথা, কান প্রভৃতি গুহ্যদ্বার ইত্যাদি সবস্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে যাহাতে কোনরূপ রোগ গ্রস্ত না থাকে এবং পালকের অভ্যন্তরে পোকা না থাকে। গলা, নলী টাংরা, পা, গাট প্রভৃতি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া নবনীত পক্ষীকে পাল হইতে দূরে এবং পৃথক ঘরে রাখিবে এবং মেজেতে কার্ব্বলিক পাউডার বা ফেনাইল পাউডার ছড়াইবে দিবে। ফেনাইল পাউডার নিম্নলিখিত উপায় প্রস্তুত হয়; ৮ আউন্স বিশুদ্ধ তীব্র ফেনাইলের সহিত তিন বা চারি সের ছাঁকা ছাই বা চাপা বালীর সহিত মিশাইলে প্রস্তুত হয়, অথবা এক পাউণ্ড ফেনাইলের সহিত দশ পাউণ্ড ছাঁকা ছাই চূর্ণ মিশাইলেও বেশ কার্য হয়।

[illegible]—মুর্গী জাতির অনেকগুলি সাধারণ ও সহজ আরোগ্য ব্যারাম

হয় দেখিতে পাওয়া যায়; পালক উঠা ও পালক ঝাড়া সামান্য রোগ পর্য্যায়ে একটি প্রধান রোগ; আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই সময় মুর্গী বা মোরগ জাতীয় পাখীগণ শীতের শেষে বসন্ত কালের প্রারম্ভে পালক ঝাড়িয়া থাকে; এদেশে ইহা তত মারাত্মক নহে, কিন্তু শীত প্রধান দেশে এইগুলি মারাত্মক হইয়া থাকে। বড় পালকযুক্ত জাতিগণের ছানা গুলির যখন ক্রমশঃ পালক উঠিতে থাকে, অথবা মুল্টিং (moulting) বা পালক ঝাড়ার পর যখন ধাড়ী পাখীগুলির পালক উঠিতে থাকে তখন তাহারা নিস্তেজ ও ঘেঁটুরে (stueted growth) হইয়া যায়। এই সময়ে তাহাদের গরমে রাখিবে এবং ঠাণ্ডা ও স্যাঁতো হইতে অন্তরিত করিয়া বিশেষ যত্নে রাখিবে। রোগীর লেজ ও ডানার উগমনে পাখাগুলি কাটিয়া দিবে; এই সময় ইহাদের ভালরূপ গরমউৎপাদক ও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে এবং মধ্যে মধ্যে পিঁয়াজও রশুন কুচি ও ভোজনের সহিত দেওয়া একান্ত আবশ্যক জানিবে। পানীয় জলের সহিত ডগ্লাশ্ মিক্শ্চার (Douglas mixture) বা প্যারিশের কেমিক্যাল ফুড্ (Parrish's chemical food) এবং খাদ্যের সহিত পুল্ট্রী পাউডার আন্দাজমত মিশ্রিত করিয়া দিবে। ইহার প্রস্তুত বিধি পরে বিবৃত করিবা ইহা সপ্তাহে তিন বারের বেশী দিবে না এবং বাসা ও পাখীর গাত্রে কীটনাশক গুড়া (Rough on lice) দিয়া ঝাড়িয়া দিবে এবং ধুলা বা গর্দ্দায় লুটিতে দিবে; পালক ঝরা রোগীকে পালের অপর মোরগ বা মুর্গী হইতে পৃথক রাখিলে ভাল হয়; আমাদের দেশে পালকগণ ইহার প্রতি তত লক্ষ্য করেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের পালকগণের এদিকে খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। পালক ঝরা পাখীদের সকালে ননী তোলা বা খাঁটী দুগ্ধে ভিজান জই বা গম চূর্ণ সকালে খাইতে দিবে এবং সপ্তাহে দুই বার মাত্র তিসি ঘটিত (gluten feed) খাদ্য দিবে এবং উপরোক্ত রূপ ডগ্লাশ মিক্শ্চার ও পুল্ট্রী পাউডার দিবে। ফেরিসাল্ফেট্ অর্দ্ধ পাউণ্ড ডাইলুট্ সাল্ফিউরিক্এসিড অর্দ্ধ আউন্স এবং অর্দ্ধ গ্যালন জল মিশাইলে উত্তম "ডগ্লাশ্ মিক্শ্চার" প্রস্তুত হয়; কলিকাতা বড় ঔষধ বিক্রেতাদের দোকানে বা মফস্বলে ডাক্তার খানায় এই সকল উপকরণ গুলি পাওয়া যায়। এই প্রস্তুত ঔষধের এক আউন্স অর্দ্ধ গ্যালন পানীয় জলের সহিত বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা এক বড়চামচপূর্ণ এক পাইটজলে মিশাইয়া খাইতে দিলে বেশ কাজ চলে। পালক ঝরার সময় পাখীদের যথেষ্ট উদ্ভিদ্খাদ্য দিবে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এইরূপ খাদ্যের অভাবেই এই রোগ ঘটে আমাদের দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম, কারণ আমাদের দেশের ছাড়া পাখিগুলি ইচ্ছা ও আবশ্যক মত বহুদূর চরিয়া স্বাস্থ্যানুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করে। সেইজন্য পালে এই রোগ প্রবেশ করিলে পাখীদের আবদ্ধ ঘেরার মধ্যে রাখিবেনা এই সময় rough on lice বা keating's Insect powder বা বাজারে বিক্রীত বহুরূপ পোকানাশক গুঁড়া পাওয়া যায় (তাহাদের দাম খুব সুলভ) তাহা বিলাত বা আমেরিকা হইতে আনাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে; এবং এই সময় এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করাও বিধি জানিবে।

পখীচাষ

এ সম্বন্ধে সব কথাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছিএখন যদি কাহারও দেশের ৮।।০কোটী অধিবাসীর কল্যাণ চিন্তার পথ বা উপায় থাকে তবে আমি উপরোক্ত দুইটী বিষয় অনুসরণ করিতে দেশের লোককে অনুরোধ করি। আমাদের মত নিঃস্ব দেশের অসহায় অধিবাসীগণের উপরোক্ত দুইটী পন্থা ছাড়া জীবনধারণের আর অন্য পন্থা নাই। তাই বলি যে কৃষির উন্নতি, গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি পাখিচাষে মনোনিবেশ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। গোরক্ষার জন্য ফাঁকা আয়োয়াজ করিলে চলিবেনা। প্রকৃত খাঁটী পাকা কাজ চাই, তাহাতে হেমেন্দ্র প্রসাদ, নিবারণ দত্ত, অমূল্য আঢ্য, লীলা নন্দ চট্টোপাধ্যায়, হাসানন্দ, এই লেখক, নানাভাতী, পৌরাণিক, উডবোথং, গ্রীভস্, এবং রাধাচরণ ও লাজ পাতের মত কর্ম্মী চাহি; আগে প্রতিকুল অস্বামীক বিধিগুলি সোজা করিয়া, চারণ উদ্ধার বা রক্ষা করিয়া তবে গোহন বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে নচেৎ বাবু সুখবীর সিংহের মত লাল গিরিধারী লালের বিলের ও সেইরূপ ভাগ্যে ঘটিবে বলিয়া আমার ভয় হয়। যাহা হোক যাহা বলিবার তাহা লালা গিরিধারী লাল জীবে বলিয়াছি এখন তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়।

যদি কৃষির উন্নতি করিতে হয় তবে দেশে বৈজ্ঞানিকদেশের অবস্থানুযায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, শ্রমলাঘব কারী কল কব্জার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; পাখী চাষ বা দুগ্ধ ব্যবসায় অথবা ডেয়ারি ফার্ম্মিং এ দেশের লোকের শিক্ষা এবং বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। এই সকল কাজের সহায়ক শিক্ষা বিস্তার ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালা গৃহস্থ, বড় লোক নিঃস্ব শিক্ষিত চাষার ছেলে এবং মধ্যবিত্ত লোকদের মল্লিখিত প্রবন্ধ গুলি এবং গোপাল বান্ধব যত্নে পাঠ করিতে বলি।

রাজা মহারাজা কোম্পানি বা সংঘ কাহারও কৃষির, পাখি চাষের বা ডেয়ারি কারবের জন্য গো, মেষ, শূকর, পাখি, গো, অশ্বাদি বা কল কব্জা, লাঙ্গল বিদে বা যাহা যাহা আবশ্যক হয় অনাইবার যদি প্রয়োজন হয় তাহা আমার নামে সডাক পত্র দিলে সুলভে আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। বাক্‌আই, কান্দি, সাইফার, হল মেমথ, বার্গেস, প্র্যাট্ ইত্যাদি মেকের ডিম ফোটান কল, ক্রীমারি প্যাকেজ কোম্পানির ডেয়ারি আসনাদি, কল, সার্পলের দুধ মাড়া কল ইত্যাদি বা পশু পাখি সবই আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এখন পাখি চাষ সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিব।

মার্কিন দেশের কর্ণেলের কৃষিবিদ্যালয়ের মুর্গী চাষের প্রধান শিক্ষক মিঃ স্কনার তাঁহার পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন যে ভারতের মত বিশাল দেশে এবং তদ্দেশীয় বুদ্ধিমান চাষা বালকদের লইয়া কল সাহায্যে খুব লাভ জনক মুর্গী চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে ভারতের গরম জল বায়ুর দেশে একটি সাইফার বা বাক আই কল লইয়া বেশ কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে; বড় কল বসাইলে প্রেরীষ্টেট্ বা হলম্যামথ বা ক্যাণ্ডির নির্ম্মিত কল সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী বলিয়া আমার মনে হয়।

আমাদের দেশের স্বদেশী নেতাদের কৃষি এবং ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক উন্নতির দিকে মন দিতেছেন। সে দিন রাম মোহন লাইব্রেরীতে দেশবন্ধু মিঃ চিত্তরঞ্জনের অধিনায়কত্বে বেশ একটা সভা বা মিটিং ও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু "কাজের কাজ" কি হইল জানি না। সে দিকে কি দেশ নায়কগণ আশু মন দিবেন? যোগাযোগ করিয়া কৃষি ডেয়ারি এবং পক্ষিচাষ শিক্ষার জন্য একটা পপুলার লেক্চার শিপ স্থাপনের ব্যবস্থা করুন না কেন? এতেই যে আসল কাজ হইবে বিগত ১৯২১ সালের ১৯ এপ্রেল মাসে ৮ রায় নন্দলাল বসুর বাটীতে বাবু নিবারণ চন্দ্র দত্তের উদ্যোগে গোশালা স্থাপনের যে মিটিং হয়, তাহাতে আমি বলি যে মানুষের "চা খানা "হোটেল খানার" মত গোরুদের জন্যও এই নগরের পাড়ায় পাড়ায় হোটেল খানা "খুলিতে হইবে এবং বৃষ সংকট নিবারণের জন্য পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে পাড়ায় পাড়ায় আবশ্যকমত "জনন বৃষ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং সহরের অধিবাসী গণের "শুষ্ক গাভী" সংকট দূর করিবার জন্য দূরে গোরুর হোটেল খুলিতে হইবে; ইহাতে সকল শ্রেণীর লোকের যোগদান, সহানুভূতি দান, অর্থদান এবং মধ্যবিত্ত লোকেদের এই কোম্পানির অংশ খরিদ, গোদান এবং এই গোবীমা কোম্পানির সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দান ও বর্দ্ধন কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে "গো বীমা শীর্ষক মল্লিখিত প্রবন্ধ হাবড়া হইতে প্রকাশিত আলোচনা পত্রিকায় বিগত ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা পাঠ করিলে সবিশেষ জানা যাইবে।

তাই বলি যে, দেশের যে অবস্থা দিন দিন হইতেছে, কৃষক কুলের যেরূপ অন্ন সমস্যা দিন দিন জটিল ও কঠিন হইতেছে, তাহাতে দেশের শুভ চিন্তক (নেতৃবর্গ ও ইকনামিক দুরবস্থার সমীক্ষকদের এদিকে শীঘ্র দৃষ্টিপাত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আরও বলি যে আর মিটিং বা রিজোলিউশানে পেট ভরিবে না, কাজ চাই।) হেমেন্দ্র প্রসাদ, নিবারণ চন্দ্র, ব্রজেন্দ্র কিশোর, যতীন্দ্র নাথের মত কর্ম্মী লোক সকল অগ্রসর হউন, রাজা মহারাজা ধনী দরিদ্র হিন্দু জৈন শিখ, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী মাড়োয়ারি সকলকে লইয়া কাজ করুন।

পালের মধ্যে যে মুর্গী সচরাচর ১৪০।১৫০ টা ডিম বৎসরে না দেয়, তাহাদের রাখা উচিত নহে, তবে এটা বলা আবশ্যক যে পাশ্চাত্য দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক ডিম দাত্রীকে (বৎসরে ১৮০-১৯২) ঝাঁকে রাখা হয়। কর্ণেলের মুর্গী ফারমে একটি মুর্গী প্রথম বৎসর ২৪২, দ্বিতীয় বৎসরে ১৯৮ এবং তৃতীয় বৎসরে ২২৫টি ডিম ১৯০৯-১২ সালের পরীক্ষায় দিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইহাদের খাদ্য দিবার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে পর পত্রে সবিস্তার আলোচনা করিব।　　　　ক্রমশঃ।

অধ্যাপক—প্রকাশচন্দ্র সরকার।

পাখি চাষ বা পুল্‌ট্রী ফার্ম্মিং—

পাখি চাষ সম্বন্ধে সব কথাই একরূপ বলিয়াছি। পরবর্ত্তী পত্র সমূহে, চিকিৎসা এবং পাখি চাষের ভিন্ন ২ শাখা গুলি সবিশেষ আলোচনা করিব। হাঁস, রাজ হাঁস, গিনি ফাউল, সোয়ান পেরু প্রভৃতি পালক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমার দেশের কুড়ে কুপণ গামী বালকবালিকারা এবং তাহাদের অজ্ঞ পিতামাতারা দেখুন যে আমাদের দেশের গরীব ছেলেদের জীবিকা ধারণের কি সুন্দর পন্থা আছে; কেবল পরিশ্রম, শিক্ষা এবং একটু উৎসাহ ও সামান্য পয়সার দরকার। আমাদের দেশের মিছা চিৎকারকারী দেশ হিতৈষী যদি প্রকৃত দেশের দিকে চাহিয়া দেখেন, যদি প্রকৃত দেশ মাতৃকার কল্যাণ খোঁজেন, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষা বিস্তারে পথ প্রদর্শক হন এই আমার মত দীনের আকাঙ্খা।

অনেক লোকে আমাকে মধ্যে ২ বাচনিক এবং পত্রের দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে দেশী অথবা বিলাতী মুর্গী লইয়া কাজ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য? আমার মনে হয় যে, যে ব্যক্তি একান্তই শিক্ষা নবীস, তাহার পক্ষে ১০।২০টা দেশী মুর্গী লইয়া "হাতে খড়ি" করা সমিচীন; তারপর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সহিত কারবার ক্রমশঃ ২ বাড়ান দরকার। পালের মাথায় খাঁটী মোরগ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। দেশী অপেক্ষা বিলাতী খাঁটী মোরগ দিয়া কাজ করাই আমার যুক্তি যুক্ত বলিয়া বলিয়া মনে হয়। 'বিলাতী মুর্গী কিছু বেশী' দামী হইলেও, তাহা আনাইয়া কাজ করিলে দামের জন্ত কিছু আটকায় না। ২।৩ বার ছানা তুলিতে পারিলেই সুদ শুদ্ধ টাকা উঠিয়া যাইবে। বিলাতী মুর্গীর ডিম বড়, খাইতে দেশী অপেক্ষা

বেশী সুস্বাদু, বাজারে বেশী দামে পাওয়া যায় এবং উত্তম মেষের পাখি বলিয়া পরিগণিত ; সেই জন্য দেশীর সঙ্গে বিলাতী লইয়া কাজ করিলে উত্তম ফল আশা করা যায় ; কারণ এইরূপ পালনে ও কারবারে দেশী মুর্গীর ডিমদাত্রী গুণ বর্দ্ধিত হইবে এবং দেশী ছোট ঘেঁটুরে মুর্গী জাতিরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে।

ছানা গুলি ডিম বা কল হইতে বাহির হইলে তাহাদের ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কোন খাদ্য দিবে না ; পরে যদি বাতাস বেশী ঠাণ্ডা হয় তবে তাহাদের ব্রুডারে রাখিবে। এই ব্রুডারের টেম্পারেচার ঠিক করিয়া লইবে এবং ছানাদের রাখিয়া ৯৮ ডিগ্রীতে প্রথম সপ্তাহ চালাইবে। খোঁড়া, অঙ্গহীন ছানাদের পালন করিবে না, কারণ তাহাতে লাভ নাই। স্বাস্থ্যবান তেজস্বী ছানাদেরই পালন করিবে। তাহার পর ব্রুডার বা কৃত্রিম ধাইমা বা হোভারের তাপ প্রত্যেক সপ্তাহে ৫ ডিগ্রী করিয়া কমাইয়া আনিবে। ছানা গুলি ১॥০ মাসের হইলেই আর তাপ গৃহ বা ধাইমার ভিতর পালন করিবে না। এ সকল কথা পূর্ব্ব ২ এবং পরবর্ত্তী পত্রেও সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক তাহা যত্নে খুঁজিয়া পাঠ করিবেন। সদ্য প্রসূত ছানা গুলির পরিপাক যন্ত্র বড়ই কোমল (tender) হইয়া থাকে ; সেই জন্য ইহাদের খাদ্য দান ব্যবস্থা খুব বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে, নচেৎ সহজেই ব্যাম্বরাম প্রসার হয় এবং এক কালীন শত ২ ছানা অকালে মরিয়া গিয়া চাষীকে নৈরাশ সাগরে নিক্ষেপ করে। টক্, বাসী, দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার খাদ্য কদাচ ছানাদের দিবে না। ধাইমার মধ্যে প্রথম ১৮ বা ২৪ ঘণ্টা রেখে আবশ্যক ও পূর্ব্ব লিখিত মত তাপ দিবে, তাহার পর মিহি ক্ষুদ বা গমচুর্ণ ও মককা সিদ্ধ সামান্য হলুদ মাখাইয়া পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিবে। ছানাদের কৃত্রিম উপায়ে যত পার পালন করিবে এবং কচি ছানা যুক্ত মুর্গীর সহিত ও এই সকল সদ্যজাত ছানা গুলিকে রাখিতে পারা যায়। ছানা গুলিবাজ, শিকরা, সাপ, ইন্দুর, বিড়াল প্রভৃতি শত্রুর হাত হইতে সদাই রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। ঢাকা বা টাপা ব্যবহার করিবে বা তারের জাল্তী দিয়া ঢাকা দেবদারু কাঠ সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লইবে। কীটসেল-ম্যান বার্গেশ বা অপর মেকারদের লিখিয়া এরূপ তারের জাল্তী আনান যাইতে পারে।

সদ্য জাত ছানাগুলিকে ধাইমা হইতে বাহির করিয়াই যখন দেখিবে যে মাটী বা বালী ঠুকরাইতেছে তখন মাটীতে হাড় চুর্ণ, মোটা বালী কাঁকর, নির্ম্মল জল পৃথক চেট্কো (flat) পাত্রে দিবে ; পর দিন জই চুর্ণ, জই সিদ্ধ বা মকা চুর্ণ সিদ্ধ খুব অল্প অল্প দিনে তিন বার করিয়া ছানাদের খাইতে দিবে। পরবর্ত্তী ৫ দিন দিনে পাঁচবার করিয়া নিম্নলিখিত খাদ্য খাইতে দিবে :—৪ ভাগ মকা চুর্ণ ও সমভাগ গম চুর্ণ এবং তাহার অর্দ্ধ ভাগ ক্ষুদ্র পিনহেড্ জই চুর্ণ মিশাইয়া দিবে ; এবং ডিম খুববেশী সিদ্ধ করিয়া কুঁচি করিয়া

দিবে। সপ্তম দিনে কিছু ননী তোলা দুধে চোকর মুড়্‌কী মাখা করে উপরোক্ত খাদ্যের সহিত দিবে। আট হইতে চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত চোকর এবং উপরোক্ত শষ্যচূর্ণ ওলট্ পালট্ করিয়া দিবে এবং তাহার পরে ২।২॥• মাস পর্য্যন্ত চোকর ৫ ভাগ এবং তিসি সিদ্ধ, মকা সিদ্ধ, জই চূর্ণ মাংসের কুঁচি, হাড় চূর্ণ প্রত্যেকটি এক ভাগ করিয়া মিশাইয়া খাইতে দিবে।

মধ্যে মধ্যে বড় বড় পালে দেখা যায় যে মুর্গী বা ছানা গুলা আপোষে লড়াই করিয়া একটি আধটিকে জখম করিয়া ঐ হতটিকে ভোজন করিয়া ফেলে; ইহা সংক্রামক বদ অভ্যাস। এই রোগ গ্রস্ত পাখিদের পৃথক করিয়া রাখিবে এবং তাহাদের জৈবিক ঘটিত খাদ্য দিবে অর্থাৎ মাংস বা animal food দিবে অর্থাৎ মাংস কুঁচি, হাড় চূর্ণ গেঁড়ী গুগ্‌লী চূর্ণ চোকর ঘটিত খাদ্য দিবে। আবার ছানা মুর্গীগণ বা পাঠঠাগণ শ্বেত আমাশা রোগে অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া চাষীকে প্রভূত লোকসানের দায়ী করে। ইহার উদ্ভবের কারণ অপরিষ্কার থাকা; সেই জন্য ঘর ও খোঁপগুলি পুতি বিমুক্ত করিবে, দাঁড় ও ঘর গুলির কীটনাশ করিবে এবং পাখিদের ঘোল বা মাঠা (Saur milk) দিবে খাইতে অপর খাদ্যের সহিত মিশাইয়া। এই রোগ বড়ই মারাত্মক ও সংক্রামক। আক্রমিত রোগীদের নষ্ট করিবে বা স্থানান্তরিক করাই বিধি বলিয়া জানিবে।

আড়াই বা তিন মাস হইলে ছানাগুলি মধ্য হইতে পুরুষ ও মেদীদের পৃথক করিবে। সংজন সময়েই কেবল পুরুষগুলি মেদীদের সঙ্গে সংযোগ করিবে। কিরূপ পুরুষ ও মেদী সংযোগ করা কর্ত্তব্য তাহা সব এই সকল পত্রে পূর্ব্বে ও পরে বলিয়াছি। আমাদের দেশের মুর্গী পালকগণ এই সকল নীতি পালন করেন না বলিয়া আমাদের দেশের মুর্গী এত দুর্ব্বল নিস্তেজ ও অল্প ডিমদাত্রী হইয়া অবনতির মুখে শনৈ অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। আমেরিকার ৬২৪ নং কৃষি বুলেটিনে লিখিত বিধির দ্বারায় ছানা পালন করিয়া অনেক কৃষকবালক বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বাসী শুষ্ক রুটীর টুকরা, ঘোল, বা দধি, শক্ত ডিম সিদ্ধের কুঁচি, ১ চা চামচ মাত্র সোডা, মকা সিদ্ধ, মাংসের কুঁচি, ২।৪টা অনুর্ব্বর ডিম, একত্রে মুড়কী মাখা গোছ করিয়া নব প্রসূত ছানাদের খাইতে দিবে। কয়লার গুড়া, হাঁড় চূর্ণ, মাছের বা পাঁঠার বা অপর পশুর বোদড়া বা নাড়ী ভুঁড়ি কুঁচি দিলে প্রানিজ খাদ্যের কাজ করে।

আবশ্যক হইলে কল কব্‌জা, পুস্তকাদি যন্ত্র, তার, জাল্‌তী, গাভী পাখি, ইত্যাদি ডেয়ারি ও পুল্‌ট্রী ফার্ম্মিং এর যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম উপকরনাদি আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি এবং সডাক পত্রে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। •

দুগ্ধ-ঘৃতাদির দুর্ভিক্ষ

নানাবিধ কারণ

দেশে ঘি দুধ ছানা মাখন আদির পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সময় বিশেষে আবশ্যকমত অতিরিক্ত দুধ সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইলেও বেগ সহ্য করিতে হইতেছে।

আইন আকবরিতে দেখা যায়, আকবর বাদসাহের আমলে এক আনায় এক সের ঘৃত আর ॥৵০ আনায় এক মণ দুধ পাওয়া যাইত। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এক সের দুধ অর্দ্ধ আনায় বিক্রীত হইত। এখন /১ ঘৃতের দাম ২॥০ টাকা, দুধ কলিকাতায় টাকায় তিন চারি সের, মফস্বলে ছয় সের। ছানার মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাও প্রয়োজন অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

যেরূপ দিনকাল পড়িতেছে, তাহাতে ঘৃত দুগ্ধ দধি আদি আর মিলিবে না। এখন আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে জমাট দুধ (Condensed Milk) এবং মাখন পনির আমদানি হইতেছে, আর তাই খাইয়া আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রাণধারণ করিতেছে, যুবক দল চা-পানের নেশা পরিতৃপ্তি করিতেছে।

যেরূপ ভাবে গব্যরসের তিরোভাব ঘটিতেছে, সেইরূপ চলিলে ৫০ বৎসরের পর বিদেশ হইতে আমদানি জমাট দুধ দেখিয়াই দুধের পরিচয় লইতে হইবে বলিয়া মনে হয়। এই দুর্দ্দশার কারণ কি, কেনই বা দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখেই এই অন্তর্দ্ধান ব্যাপার সংঘটিত হইল? চিন্তাশীল মাত্রেরই ইহা চিন্তার বিষয় হইয়াছে। প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া সত্বর ইহার উপশমের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নচেৎ ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীর ধ্বংসের পথ অধিকতর উন্মুক্ত হইবে, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা বাড়িয়াই চলিবে।

গোচারণ ভূমির অভাব, এই অভাবের একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। * * * গরুগুলি উপযুক্ত খাদ্য পায় না। লোকে আর ভগবতী ভাবিয়া পূর্ব্ববৎ গাভীর সেবা করে না। অযত্নে প্রদত্ত আহার্য্য ও পানীয়ের অভাবে গোজাতি ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে, বিবিধ রোগ প্রবল বেগে গোজাতিকে হীনবল করিতেছে, চিকিৎসার চিকিৎসকের অভাবে ও বহু অকালমৃত্যু ঘটিতেছে।

মাংসের জন্য অবাধ-গোহত্যাও ইহার অন্যতম কারণ। চামড়ার লোভে সর্ব্বত্র মুচিগণ বিষ খাওয়াইয়া যে সকল গরু মারিয়া ফেলে, তাহার সংখ্যাও কম নহে। এই সকল গরুর চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। রপ্তানি চামড়ার মূল্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এদিকেও মনোযোগ দিতে হইয়াছে। উত্তরোত্তর রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৯১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে দুই কোটি টাকার চামড়া রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯০১ সালের দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার চামড়া বিক্রীত হইয়াছে। ১৮৯৯—১৯০০ এবং ১৯০০—১৯০১ সালে দুই বৎসরে তিন কোটী কুড়ি লক্ষ টাকার চামড়া বিদেশ গিয়াছে।

গোপ্রজননোপযোগী উৎকৃষ্ট বৃষের অভাবও একটা উপযুক্ত কারণ বলিয়াই মনে হয়।

হিজলী-হিতৈষী

বাগানের মাসিক কার্য্য

মাঘ মাস

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূঁয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের ফুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি

করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদেরও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান :—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর পিঙ্কস্, ফ্লাক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

২৩শ খণ্ড { কৃষক—পৌষ, মাঘ, ১৩২৯ সাল } ৯ম ১০ম সংখ্যা

গৃহস্থ-সহায় কৃষি।

("কৃষকে"র জন্য লিখিত)

বর্ত্তমান অন্ন সমস্যার কারণ বহুবিধ। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রমের ভয়ই একটি প্রধান মূল কারণ। কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে ও মফঃস্বলের সমস্ত বড় বড় সহরে যে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রমশঃ মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে ও দামে সংকুলান করিতে না পারিয়া মাত্রায় আহার্য্যের পরিমাণ যে বাধ্য হইয়া কম করিতে হইতেছে তাহা সকলেই জানেন—কিন্তু তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা কয়জন করিয়া থাকেন? আমাদের স্বভাবই এরূপ যে আমরা নিরবে অসুবিধা ভোগ করিতে পারি। অল্প বিস্তর প্রয়াসে সে অসুবিধা যে দূর করা যাইতে পারে তাহা আমরা ভাবি না, কিম্বা চেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে টুকু উদ্যম ও অধ্যবসায় দরকার হয় সে টুকু আমাদের নাই।

জমির ফসল সমান থাকিয়া লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা কৃষিকেন্দ্র নয় এরূপ স্থলে (যথা সহর) অধিক সংখ্যায় লোক একত্রিত হইলে খাদ্যাভাব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশে উভয় কারণই এখন কার্য্য করিতেছে। একদিকে ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের হার যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না, তেমনি অন্যদিকে সহরে ও কলকারখানা প্রভৃতির স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আহার্য্যের অনাটন মোচন করিবার জন্য তিন প্রকার উপায় সাধারণতঃ অবলম্বিত হওয়া

থাকে, যথা :—১। উন্নত চাষ প্রণালী, বীজ ও উপযুক্ত সার দ্বারা ফসলের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা ; ২। অধিক পরিমাণে জমি চাষ করা ; ও ৩। দেশের সাধারণ ক্ষেত্র ও উদ্যান জাত ফসল ব্যতিরেকে প্রত্যেক গৃহস্থের চেষ্টায় নিজ নিজ আবশ্যক মত শাক সব্জী ও ফল মূল আদি উৎপাদন করা। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের উপায় দ্বারা আহার্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সরকারি ও বেসরকারী অনেক চেষ্টা হইতেছে ও এইবিধ চেষ্টায় সরকারী সাহায্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন ; কিন্তু তৃতীয় প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই নিজের দরকার মত দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণ জমিতে উৎপাদন করিতে পারেন। এস্থলে প্রধান প্রয়োজন স্বাবলম্বন। যদি বহুকাল হইতে অর্জ্জিত নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থেরা নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান কষ্টের কারণ অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

বিষয়টা যে বিশেষরূপে ভাবিবার যোগ্য তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন বিলাতে খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অসংকুলান হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সরকারী আইন কানুন দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থকেই স্বীয় বাস্তু সংলগ্ন ভূমিখণ্ড চাষ আবাদ করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছিল। এমন কি সহরেও, যেখানে একবারেই জমির অভাব, সেখানেও লোকে টবে ২।৪টি আবশ্যকীয় গাছ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিত। ইহাতে যে ফল কিছুই হয় নাই হয় তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ ইহার ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদনের মাত্রা আজকাল বিলাতে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অবস্থা বিলাতের বড় বড় সহর ও সহরতলী বাসীর অপেক্ষা আরও শোচনীয়। এতদ্দেশে নিরামিষাহারির সংখ্যা অধিক। যাঁহারা মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন তাঁহাদেরও ব্যবহারের মাত্রা এত কম যে কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে নিরামিষাহারী বলিলেও চলে। সুতরাং শাক সব্জী ও ফল মূলাদিই যে আমাদের দেশে প্রধান আহার্য্য হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দুধ, ঘি ও মাছ সাধারণ লোকের পক্ষে কমই যুটিয়া উঠে। আমাদের প্রধান আহার্য্য ডাল, ভাত ও তরকারী। ডাল ও ভাত উভয়ের জন্যই আমাদিগকে ক্ষেত্রজ ফসলের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য টোঙ্গর, বরবটি, মটর প্রভৃতি বাস্তু জমিতে কিম্বা বাগানে সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করিয়া আমরা কতকটা ডালের অভাব মোচন করিতে পারি। কিন্তু শাক সব্জীর মধ্যে যে গুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয় সে গুলি উৎপাদন করা স্বল্পায়াসসাধ্য। আমাদের সাধারণ খাদ্যের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ শাক সব্জী। সহরে এবং এমন কি মফঃস্বলেও অনেক স্থানে ইহা গৃহস্থকে কিনিয়া খাইতে হয়। গৃহস্থালি হিসাবে তাহাতে দুই আনা হইতে চারি আনার কম পড়ে না এবং সব সময় আবশ্যক মত দ্রব্যও পাওয়া যায় না। যদি এই

পরিমাণ দ্রব্যও গৃহস্থেরা নিজে উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের যথেষ্ট উপকার হয়, অথচ উক্ত প্রকার দ্রব্যের বাজার দর সুলভ হয়।

গৃহস্থ-সহায় কৃষির সহিত ব্যবসায়িক কৃষির তফাৎ এই যে প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা লোকে সাক্ষাৎভাবে নিজের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ শেষোক্ত প্রণালীতে ক্ষেত্র অথবা উদ্যানে যে ফসল উৎপাদিত হয় তাহা ব্যবসায়ের জন্য। ব্যবসায়ের হিসাবে ক্ষেত্র ও উদ্যানে ফসল উৎপাদন করিতে হইলে মূলধন, জমি, মজুর, কাটতির বাজার প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা থাকা আবশ্যক। গৃহস্থ-সহায় কৃষিতে তাহার কিছুই আবশ্যক হয় না। নিজের বাস্তু অথবা গৃহসংলগ্ন সামান্য জমি, গৃহস্থালীর আবর্জ্জনা সার, সামান্য পরিমাণে বীজ ও পরিবারস্থ সকলের সমবেত চেষ্টা হইলে এরূপ কৃষিকার্য্যে ফলবান হওয়া সহজ সাধ্য। যাঁহারা একবারেই ভূমি-বিহীন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সমস্ত নগরের উপকণ্ঠবাসী ও মফঃস্বলের অনেক সহরবাসীর গৃহের সহিত যে অল্প বিস্তর জমি আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই সমুদয় ভূমিখণ্ডকে অযথা পতিত না ফেলিয়া রাখিয়া অথবা ব্যবহারিকমূল্যহীণ বাহারের গাছে সজ্জিত না করিয়া খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছণীয়।

অযত্নউৎপাদিত হইয়াও লাউ, কুমড়া, ডাঁটা প্রভৃতি অনেকের সংসার নির্ব্বাহের সহায়তা করিতেছে। যদি সেই পরিমাণ জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করা হয় তাহা হইলে অনেক রকম ও সমধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের বাজার কৃষি (Market Gardening) তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই প্রথায় সহর তলীতে অথবা বড় বড় গঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে সামান্য পরিমাণ জমি চাষ করা হয়। উৎকৃষ্ট সার, বীজ ও চাষ প্রণালী দ্বারা উৎপাদনের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এক ফসল উঠিয়া গেলেই তাহার স্থান দ্বিতীয় ফসল অধিকার করে ও এরূপ ফসল নির্ব্বাচন করা হয় যাহা গৃহস্থের অত্যাবশ্যকীয়, চাষ অপেক্ষাকৃত সহজ ও বিক্রয়ের মূল্য লাভকর। গার্হস্থ কৃষি ব্যবসায়ের জন্য না হইলেও উক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। কারণ কোন কোন গৃহস্থকে অনুযোগ করিতে শোনা যায় যে বাড়ীতে চাষ করিয়া বিশেষ সুবিধা হয় না, তাহাপেক্ষা বাজারে সুলভ মূল্যে শাক সব্জী পাওয়া যায়। এইরূপ অনুযোগের মূলে হয় শ্রমের অপচয় কিম্বা অনভিজ্ঞতা কিম্বা উভয়ই বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় কৃষি কার্য্যেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

যে পরিমাণ কৃষি জ্ঞান হইলে গৃহস্থ নিজে নিজের আহার্য্য দ্রব্যাদি সুচারুরূপে উৎপাদন করিয়া লইতে পারেন তাহার জন্য স্কুল কলেজে যাওয়া অনাবশ্যক। উত্তম

চাষীর নিকট কিম্বা যে সমুদয় গৃহস্থ অনেক দিন হইতে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের নিকট এরূপ শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। উভয় স্থলেই প্রধান অন্তরায় এই যে যে সব প্রণালী সাধারণতঃ অবলম্বিত হয় সে গুলির বর্ত্তমান কৃষি বিজ্ঞানের-উন্নতির সহিত কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। অথচ বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি গুলি মোটামুটি রূপে জানা গৃহস্থের একান্ত আবশ্যক। যে সমস্ত দেশে শিক্ষিত ভদ্র-ব্যক্তিগণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন সেরূপ দেশে সাধারণ গৃহস্থের কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। দুঃখের বিষয় এতদ্দেশে সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। যাঁহারা স্কুল কলেজে কৃষি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশই চাকুরিতে নিযুক্ত। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত ক্ষেত্র কিম্বা উদ্যান দেখিয়া যে অন্যে উপকার লাভ করিতে পাবে এরূপ অবস্থা এখনও হয় নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে অভিজ্ঞ না হইলেও কতিপয় ভদ্র সন্তান আজকাল কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন। অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ঘুঘুডাঙ্গায় জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি কার্য্যকরী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা অন্নাভাব মোচণের উদ্দেশ্যে সাধারণ ও বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত যুবক এবং বালক বালিকাগণকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত উপযুক্ত কৃষি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কৃষিশিক্ষায় বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ড লইয়া গৃহস্থের আবশ্যকীয় ফসলাদি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিবেন ও ফসল প্রধানতঃ শিক্ষক ও ছাত্র গণের ব্যবহারার্থ দেওয়া হইবে। খরচ খরচা হিসাবেই ফসলের মূল্য ধরা হইবে; তাহার উপর যে সামান্য লাভাংশ ধরা হইবে তাহা উক্ত শিক্ষালয় পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হইবে। ফলতঃ এখানে কৃষি-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এই হইবে যে গৃহস্থ নিজের জমিতে, নিজের অভিজ্ঞতায় আপনার আবশ্যক মত ফল মূল, শাক সব্জী প্রভৃতি যেন উৎপাদন করিয়া লইতে পারেন। বারান্তরে আমরা এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

ইক্ষু-চাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রোপণ প্রণালী।

ইক্ষুর সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি রোপণের সময় ও ধরণের উপর নির্ভর করে। রাজসাহী জেলায় খেরি জাতীয় ইক্ষু সেপ্টেম্বর মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রোপণ করা হয়। ভিন্ন প্রকারের ইক্ষুর ছেদনের সময় বিভিন্ন। পেরী জাতীয় পাতলা ইক্ষু ছেদনের সময় ডিসেম্বর হইতেই প্রশস্ত এবং অন্য প্রকারের মোটা জাতের ইক্ষু জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কাটা আবশ্যক। একারণ ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে ইক্ষু রোপণ অসঙ্গত নয়। রোপণের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ফেব্রুয়ারী মাস এবং ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাণ্ডা থাকিলে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রোপণ করা চলিতে পারে। সামান্য শীত থাকিতে রোপণ করিলে চারাগুলি দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

মে মাস হইতে অক্টোবরের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ইক্ষুর সতেজ বৃদ্ধির সময়, এই সময় বায়ু আদ্র থাকে। শীতকাল আরম্ভ হইলে ইক্ষুফসলের আর বৃদ্ধি হয় না। দেখা যায় যে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চমাসে রোওয়া ইক্ষু শতকরা ৪০ ভাগ shoot Borer কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অথচ শীতের পূর্ব্বে রোওয়া ইক্ষুর মোট শতকরা ১০ ভাগ ঈদৃশ আক্রান্ত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা আরও স্থির হইয়াছে যে অক্টোবর মাসে রোওয়া ইক্ষু ১৩ মাস পরে কাটা হইলে প্রতি একারে ৯৪৭০ মণ গুড় পাওয়া যায় এবং ১৫ মাস পরে কাটা হইলে ৯৯০০ মণ পাওয়া যায়। এদিকে নভেম্বর মাসে রোওয়া ইক্ষুর ১৩ মাস পরে গুড়ের হার ১০৪০০ মণ ও ১৪ মাস পরে ১১৩৪৪ মণ। এইরূপে সচরাচর ইক্ষু ফসল যতকাল জমিতে রাখা হয়, তাহাপেক্ষা অধিক কাল রাখিলে গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং আবাদ প্রভৃতি করিবার জন্ত ও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কোন কোন অভিজ্ঞ বলেন যে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে রোওয়া ইক্ষু বেশ পুষ্টিলাভ করে; সমস্ত শীতকাল বর্দ্ধিত হইয়া মার্চ্চ মাসে চতুপার্শ্বের জমী ছায়াযুক্ত করিবার উপযোগী হয়। এইরূপ ছায়া হইলে জুন মাস অর্থাৎ বর্ষাপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রখর সূর্য্য তাপ সহ্য করিতে সক্ষম হয়। আমাদের মনে হয় যে যেসকল কৃষকেরা অল্প পরিমাণ জমী চাষ করে তাহাদের পক্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে রোপণই প্রশস্ত।

বিভিন্ন প্রকারের ইক্ষু এবং বিভিন্ন প্রকারের জল হাওয়ার হিসাবে ইক্ষু রোপণের

প্রথাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। পাতলা আখ সাধারণতঃ খুব কাছাকাছি রোওয়া হয় কিন্তু মোটা জাতের আখ দূরে দূরে রোপণ করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গালা দেশে, বিশেষতঃ রাজসাহী জেলায়, খাত্রড়া ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তথায় ৯ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর পগার কাটিয়া তন্মধ্যে ১২" হইতে ১৮" ইঞ্চি অন্তর ইক্ষু চারা রোপণ করা হয়। কিন্তু রাজসাহী জেলায় চলিত এই প্রথানুসারে রোপণে অতিরিক্ত বীজ আবশ্যক হয় এবং মাটী দেওয়া ও আগাছা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত অধিক ব্যয় হয়। কৃষকেরা সাধারণতঃ শেষোক্ত দুইটি আবশ্যকীয় কার্য্যে অবহেলা করে। পাতলা ইক্ষু কিরূপ দূর দূর বসান উচিত এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে কোন ধারাবাহিক পরীক্ষা হয় নাই।

যুক্ত-প্রদেশে কানপুর ক্ষেত্রে এবিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ইক্ষু চারা ১৮ এবং ২৭ ইঞ্চি অন্তর রোওয়া হয় এবং ১৮ ইঞ্চি অন্তর রোওয়া ইক্ষু হইতেই অধিক পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল।

মোটা মোটা ইক্ষু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন রোপণ প্রণালীর ব্যবস্থা করেন; পরীখা খনন করিয়া রোপণ অনেকেই পছন্দ করেন এবং এ প্রথার সাপক্ষে বলিবার অনেক আছে। সাজেহানপুরে পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে অগভীর পরীখা খনন পূর্ব্বক চারা রোপণই কোন কোন; বিশেষতঃ ঈষৎ পীতাভ জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা। কেননা এরূপ উপায়ে ইক্ষুর অঙ্কুরোদগম বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি একারে ফসলও বেশী জন্মায়। পরীখাগুলি দুই ফুট চওড়া হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক পরীখার মধ্যস্থল হইতে অপর পরীখার মধ্যস্থলের মধ্যে ৪ ফুট ব্যবধান দরকার। বর্ষাকালে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। পরীখা কাটা অক্টোবর হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ হওয়া উচিত; নবেম্বর মাস শেষ হইয়া গেলে কদাচ পরীখা খনন পূর্ব্বক রোপণের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। রোয়ার দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে পরীখা খনন করিলে কার্য্যের কোনই সুবিধা হইবে না। অধিকন্তু সব পণ্ড হইবে। পরীখা প্রথমে ৬ ইঞ্চি গভীর করিয়া কাটিয়া ২ ফুট বিস্তৃত পরীখার উভয় পার্শ্বে মাটীর আইল দিতে হয়। ৬ ইঞ্চি গর্ত্ত করিবার পর পুনরায় ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত কাটিয়া গোবর, সহরের আবর্জ্জনা ও খোল প্রভৃতির সার দেওয়া আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে পরীখা খুঁড়িয়া দিলে ভাল হয়। ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে প্রতি একারে প্রায় ৩৫ মণ খোল অথবা ১২০ হইতে ১৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সার দেওয়ার আবশ্যক। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ হইতে মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইক্ষু রোওয়া হয়। ইক্ষু চারার সতেজ বৃদ্ধির জন্য জমিতে উপযুক্ত উত্তাপ সঞ্চয়ের পূর্ব্বে রোওয়া উচিত নয়। শীতকালের বৃষ্টি হইতে উপযুক্ত জলীয় বাষ্প না পাইলে পরীখাতে জল সেচন করার আবশ্যক হইতে পারে। প্রতি একারে ৬০০০ হইতে ৮০০০ চারা রোপণের নিমিত্ত আবশ্যক। চারাগাছ

২ ইঞ্চি ৬ ফুট হইলে পরীখাগুলি ক্রমে ক্রমে মাটীর দ্বারা পূর্ণ করা হয়। মে মাসের মাঝামাঝি হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাটী দেওয়া শেষ হওয়া উচিত। ইক্ষু চারা ৪ ফুট অন্তর লাঙ্গল দ্বারা পগার কাটিয়া রোপণ করা দরকার। খোল ও হাড় চুর্ণের সার পগারে দেওয়া হয় এবং একজন মজুর কোদালী দ্বারা সার মিশ্রিত করিয়া দেয়, এবং পগার প্রস্থে একটু বড় করিয়া দেয়; তৎপরে একদল লোক চারাগুলি ৯ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিয়া যায়। কুইন্সল্যাণ্ড দেশের রোপণ প্রণালী এদেশে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চারাগুলি ৬ ফুট অন্তর দু সারি অগভীর খানা খুঁড়িয়া রোওয়া হয়। দুটী সারি কাছাকাছি হওয়ায় কেবলমাত্র ১৮ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে এবং কার্য্যতঃ ৩ ফুট অন্তর রোপণ করা হয়। ইহাতে গাদা করিবারও ব্যয় সংক্ষেপ হয় এবং মধ্যে অন্যান্য ফসলও চাষের জায়গা থাকে। আমরা এই ৩ ফুট গভীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে হলুদ রোপণ করাইয়া থাকি। উহা ছায়া ভাল বাসে এবং ইক্ষু চাষের ব্যয়ের কিয়দংশ ইহা হইতে পাওয়া যায়। এখন ও এ বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হয় নাই।

যুক্তপ্রদেশে তিন ফুট অন্তর রোপণ করিয়া খুব ভাল ফসল পাওয়া গিয়াছে।

মূল রোপণ

বিশেষজ্ঞরা বলেন ইক্ষুর মূল ইক্ষু উৎপাদনের জন্য বেশ ব্যবহৃত হইতে পারে। ডাক্তার বারবার্ এ মতের সমর্থন করিয়াও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মূল গুলি তুলিয়া কাটিয়া রোপণ করাই যুক্তিযুক্ত। সাধারণতঃ এই সকল মূল গুলি খুঁড়িয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয় অথবা ভূমিতে থাকিয়া পচিয়া যায়।

এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রতি একারে চারার বাবৎ খরচ প্রায় শতকরা ৫ টাকা কম হইবে। এক একার জমীর জন্য ৫০০০ মূলের দরকার এবং এক একারের মূল হইতেই পাঁচএকার জমী রোওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আরও বিশেষ সুবিধা এই যে সমস্ত জমীতেই সমান ফসল জন্মায় এবং কোন জায়গা খালি পড়িয়া থাকিতে পায় না। কিন্তু রোগাক্রান্ত ক্ষেত্র হইতে মূল লওয়া মোটেই উচিত নয়।

ইক্ষু চাষে বীজ রোপণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক একার জমীতে কতগুলি চারা রোওয়ার জন্য আবশ্যক এবিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা আবশ্যক।

বিভিন্ন প্রকারের ইক্ষু হিসাবে চারার সংখ্যা প্রতি একারে বেশী কম হয় এবং রোপণের ধাঁজা হিসাবে চারার সংখ্যার তারতম্য হয়। সরকারী ক্ষেত্রে প্রতি একারে ৪ইঞ্চি পরিমাণ ৯০০০ টুকরা আবশ্যক হয়। বাঙ্গালা দেশের জমীতে কত চারা আবশ্যক এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন রীতিমত পরীক্ষা হয় নাই। ৬০০০ টুকরা চারা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। মেসার্স ক্লার্ক এবং ব্যানার্জ্জী, প্রতি একারে ছয় হইতে আট হাজার, চারা রোওয়ার পক্ষপাতী। চাষারা সাধারণতঃ ১২০০০ হইতে ১৫০০০ চারা কিন্তু দেয়।

[ক্রমশঃ]

সম্পাদকীয়

কৃষির সহিত কয়েকটি শিল্পের ঘনিষ্ঠতা খুবই অধিক। যেমন গুড়, তৈল, খদ্দর প্রস্তুত ইত্যাদি। চিনি, তৈল ও বস্ত্র সুলভ হইতে হইলে এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইতে হইলে একদিকে যেমন আক্ তৈল শস্য ও তুলার উন্নত জাতি সমূহের যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হওয়া আবশ্যক, তেমনি চিনি, তৈল ও বস্ত্র উৎপাদনের কল কব্জা ও প্রস্তুত প্রণালীর ও উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দরকার। আমরা এস্থলে বড় বড় কল কারখানার কথা বলিতেছিনা। কুটীর শিল্পে ব্যবহার যোগ্য কল কব্জারই প্রথমে সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্থানান্তরে আমাদের সরকারী শিল্পবিভাগের কার্য্যাবলীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কৃষি-শিল্পে শিল্প-বিভাগের মনোযোগ আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই, অথবা অতি সামান্য মাত্রায় হইয়াছে। একথা বলিলে চলিবে না যে বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে গ্রাম্য ব্যবহার উপযোগী হাতে চালান কল কব্জা চলিবার আর আশা নাই। কুটির শিল্পের ভবিষ্যত ভারতের ন্যায় দেশে উজ্জ্বল বলিয়াই মানিতে হইবে। এখনও সহস্র সহস্র উন্নত আখমাড়ার কল চলিতেছে; সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত দেশী ঘাণির কোচিন নারীকেল তৈলের প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও জগতের বাজারে বিরল; এবং স্থানীয় কার্পাস হইতে প্রস্তুত খদ্দর যে কি রিমাণে বস্ত্রাভাব মোচন করিতে পারে তাহাও বিগত তিন বৎসরের খদ্দর আন্দোলনে দেখা গিয়াছে। দেশের এখন নিতান্ত প্রয়োজন —সুলভ, সহজে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যোগ আখমাড়া কল, উন্নত প্রকার গুড় প্রস্তুতের সাজ সরঞ্জাম, সুলভ গো মহিষে চালান উন্নত ঘাণি, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চরকা, তাঁত ইত্যাদি। যতদিন না এইরূপ যন্ত্রাদির বহুল প্রচার হয় ততদিন ভারতের কাঁচা মাল বিদেশে অপরিমিত চালান হইতে থাকিবে কিম্বা বড় বড় কারখানাওয়ালাদের হাতে যাইবে। ফলে ইহাই হইবে যে কয়েকজন ধনী মিলিত হইলেই ইচ্ছামুক্রমে উপরোক্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির দর বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। ছোট ছোট কল কব্জার সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিনি, তৈল অথবা বস্ত্র প্রস্তুত হইলে দর অধিক বাড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়। গ্রাম্য ব্যবহারিক অবস্থায় (Rural Economics) ইহা একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না। সুখের বিষয় যে বেসরকারী কার্য্যকলাপ এই ক্ষেত্রে ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ণ সমাধান এখনও বহু দূরে এবং বহু আয়াস সাধ্য।

কৃষির অন্যতম অন্তরায় কীট। সাধারণ কৃষক কীটকে দৈব বিড়ম্বনা বলিয়াই আশ্বস্ত থাকে এবং তাহার প্রতীকারের বড় একটা চেষ্টা করেনা। কিন্তু সামান্য কীট

যে পরিমাণে মনুষ্যের অপকার করে ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশু তাহার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রায়ও করেনা। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সমস্ত উন্নতিশীল দেশেই কীট নিরাকরণের জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে ও তাহার ফলে জনসাধারণ কীট দ্বারা অনিষ্ট নিবারণে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। এ দেশে সে হিসাবে কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি বিভাগের কীটতত্ত্ববিৎ ফ্লেচার সাহেব কীট দ্বারা ভারতে কি পরিমাণ অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার একটা অনুমান করিয়াছেন। সাধারণতঃ ফসলের ১০০ ভাগের ১০ ভাগ পোকায় নষ্ট করে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা আদৌ অসঙ্গত নয়। এক্ষণে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যদি ১৬,৮২,৪২,৭৩,০০০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে কীট দ্বারা নষ্ট ফসলের মূল্য উপরোক্ত হিসাবে, কিম্বা কিছু কম করিয়া ধরিলে ১,৮০,০০,০০,০০০৲ টাকা হয় দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর অরণ্যেও কীটের উপদ্রব কিছু কম নয়। ভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ বনভূমি দ্বারা অধিকৃত। ইহার আয়তন প্রায় ২½ লক্ষ বর্গমাইল। নিতান্ত সামান্য মাত্রায় ধরিলেও বর্গ মাইল প্রতি যে আরণ্য দ্রব্য পোকা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহার মূল্য ১০০৲ টাকা হইবে। এই হিসাবে ভারতীয় বনভূমিতে ১২৫,০০,০০০৲ টাকার ফসল কীটে নষ্ট করে। কীট যে শুধু উদ্ভিদের উপর আক্রমণ করিয়াই সন্তুষ্ট তাহা নহে। মনুষ্য ও অপরাপর শ্রেণীর জীবও কীট-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। এমন কতিপয় রোগ আছে যথা ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি, যাহা সাক্ষাৎ অথবা গৌণ ভাবে কীটের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। হিসাব করিলে দেখা যায় যে বৎসরে প্রায় ১৬ লক্ষ লোক কীট-জনিত রোগে মারা যায়। যদি প্রত্যেক লোকের মূল্য অতি সামান্য মাত্রায় ১০০৲ টাকা করিয়া ধরা যায় তাহা হইলে মনুষ্য ক্ষয়ের মূল্য এক কোটি আট লক্ষে দাঁড়ায়। ইতর শ্রেণীর জীব যথা গবাদি পশু প্রভৃতি কীট দ্বারা মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। কীট জনিত রোগে শুধুই যে পশুপক্ষি মরিয়া যায় তাহা নহে; বাঁচিয়া থাকিলেও তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত দুগ্ধ, মাংস, ডিম, চামড়া প্রভৃতি অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা নিকৃষ্ট প্রকারের হইয়া থাকে। গৃহ-পালিত পশুপক্ষী ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য ন্যূনকল্পে অন্ততঃ ৪৭,৭৯,৫০,০০০৲ টাকা হইবে। পোকার উপদ্রবে ইহার শতকরা ৮ভাগ নষ্ট হয় অনুমান করিলে কিছু অধিক ধরা হইবে না। এই হিসাবে অন্ততঃ ৩৮,২১৬,০০০৲ টাকা নষ্ট হয়। এখন পাঠক বর্গেরা দেখুন যে কীটকুল দ্বারা কি বিশাল অপচয় সাধিত হইতেছে :—

ক্ষেত্র ও উদ্যান জাত ফসল—	১,৮০,০০,০০,০০০৲
আরণ্য ফসল—	১,২৫,০০,০০০৲
মনুষ্য ক্ষয়—	১৬,০০,০০,০০০৲
পশ্বাদি ক্ষয়—	৩,৮২,৩৬,০০০৲
মোট—	২,০১,০৭,৩৬,০০০৲

কীট দ্বারা বৎসরে ২০০ কোটির উপর অর্থক্ষয়! কীটের উপদ্রব যে একবারে কখনও নিবারিত হইবে তাহা বাতুলের আশা। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষায় ও সমবেত চেষ্টায় যে অনেক পরিমাণ ক্ষতি নিবারণ করা সাধ্যায়ত্ত তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আমাদিগের কৃষক-বৃন্দ যাহাতে এ বিষয়ে মনোযোগী হয় তজ্জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে।

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানাস্থান হইতে বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় এবং তৎ সমুদয় উক্ত ইনষ্টিটিউট সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করিয়া বিবরণী প্রকাশ করেন। এইরূপ ভাবে ভারতেরও অনেক দ্রব্য এইস্থানে পরিক্ষীত হইয়াছে ও তাহাদের বিবরণ ইনষ্টিটিউটের 'বুলেটিণ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথায় অনেক ভারতীয় দ্রব্যও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য ইনষ্টিটিউট্ প্রতি বৎসর ভারত সরকারের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাইতেন। বর্ত্তমান বৎসর ভারত-গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে উক্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য ভাণ্ডারে অর্থাভাব। কিন্তু ইনষ্টিটিউট্ দ্বারা ভারতের যে কিছু কাজ হইত না তাহা বলা যায় না। ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষাগারে গবেষণার ফলে কতিপয় ভারতীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ বণজ ঔষধ প্রভৃতি, আজকাল বিলাতী বাজারে পরিচিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কাঁচা মাল সম্বন্ধে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে পরীক্ষা ও মৌলিক অনুসন্ধান আবশ্যক। সেরূপ কার্য্য করিবার ঠিক কোন গবেষণাগার এ দেশে এখনও নাই। চির-স্মরণীয় জেম্‌সেদ্‌জী টাটা-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়াণ ইনষ্টিটিউট্ কতকটা এই শ্রেণীর জিনিষ। কিন্তু তাহাতে কাঁচা মাল অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা অধিক হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতার যাদুঘরের (Indian Museum) Economic and Art Section এর পরীক্ষাগারেও পূর্ব্বের ন্যায় অধিক মাত্রায় ভারতীয় ব্যবহারিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয় না। এরূপ অবস্থায় এতদ্দেশে বিশেষ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের সহযোগীতা ত্যাগ করা সমিচীণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

দেশের ও দশের কথা

মান্দ্রাজে ফলের চাষ ঃ—নিলগিরি পর্ব্বতের অনেক স্থান সাধারণতঃ ফল উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। আধুনিক প্রথায় ফল চাষ ও সংরক্ষণের জন্য মান্দ্রাজ সরকার অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কমুরে চিনা নাসপাতি ও ক্রাব আপেল চাষ হইতেছে; কালারে কমলা ও বাতাবী লেবু এবং স্যাপোডিলা প্রভৃতির গাছ মন্দ হয় নাই। কিন্তু ম্যাঙ্গোষ্টিণ উৎপাদনের চেষ্টা সফল হয় নাই।

বঙ্গে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ ঃ—বঙ্গদেশে আয় ব্যয়ের সঙ্গে যে অত্যধিক তফাৎ ও ব্যয় সঙ্কোচের জন্য গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত কমিটি সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম অনেকেই জানেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে জনৈক বেসরকারী সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ডোনাল্ড জবাব দেন যে আগামী বজেটে ৪৮,৮৮,৮৯৫৲ টাকা খরচ কমান হইয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সংক্রান্ত সংক্ষেপ নিম্নরূপ :—

অরণ্য	৬০০০০৲
জলসেচন	১৬৯০০০৲
কৃষি	২৫৭৬৪৮৲
শিল্প	২,৯৬,৮৪৬৲
মোট	৭,৮৩,৪৯৪৲

এক্ষণে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির অনুমোদন ও কাউন্সিলে আলোচনার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কত ব্যয় সংক্ষেপ হয় দেখা যাউক। অন্যায় খরচ কম হইয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু কৃষি শিল্পাদির উন্নতির জন্য যে সমুদয় অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যকীয়, অর্থাভাবে সে গুলি না হইতে পারিলে দেশের উন্নতির পক্ষে যে গুরুতর বিঘ্ন ঘটিবে তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

খাদ্য শস্যঃ—পূর্ব্ব পক্ষের তুলনায় ডিসেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে খাদ্য শস্য ও দাইলের মূল্য শতকরা ৪ ভাগ কম হইয়াছিল দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ ফসল হিসাবে অরহর ডাল ও ভুট্টা শতকরা ৮, যব ৭, চাউল ৪, ছোলা ৩, গম ২ ও জোয়ার ১ ভাগ কমিয়াছিল। ঘৃত ও লবণের দামও ১ ভাগ এবং চিনির দাম ২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত অঙ্কাদি নিখিল ভারতের পক্ষে প্রযুক্ত; বঙ্গদেশে চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৮ ভাগ সস্তা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান পলিটেকনিক্ অ্যাসোসিয়েসন্ ;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা কিছু দিবস হইতে কার্য্যকরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। যাহাতে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন স্কুল প্রভৃতিতে সমবেত চেষ্টায় কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হয় ও যাঁহারা পূর্ব্বেই এইরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক কাজ কারবারে জীবন যাপন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি উক্ত নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহার সভাপতি রাজা হৃষিকেশ লাহা এবং নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে সভ্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে ;—সমবায় সমিতি সমুদয়ের রেজিষ্ট্রার রায় বাহাদুর যামিনীনাথ মিত্র, মেসার্স জে, ডোনোভান, গোকুল চাঁদ বড়াল, বি, সি, সিংহ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, টেকনোলোজিক্যাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জে, সি, ঘোষ, "ক্যাপিটাল"—সম্পাদক মিঃ পি, লভেট্, "হিন্দুস্থান"-সম্পাদক মিঃ এল এম, গুপ্ত, "বসুমতী"-সম্পাদক মিঃ এচ, পি ঘোষ, ও "কমার্স্যাসিয়াল অ্যাডভার্টাইজার"-সম্পাদক মিঃ বি, রায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সমিতির পৃষ্টপোষক হইবেন আশা করা যায়।

বিলাতে ভারতীয় হাই কমিসনার :—ভারতের তরফ হইতে যিনি বিলাতে হাই কমিসনার থাকেন তাঁহার পদ যেরূপ গৌরবের তেমনি দায়িত্ব-পূর্ণ। এতদিন পর্য্যন্ত এই পদে শ্বেতাঙ্গরাই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই পদ ভারতবাসীকে দেওয়ার জন্য বিশেষ আন্দোলন কিছু দিন হইতে চলিয়াছিল। সুখের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মনোরঞ্জণের জন্য সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটের কৌন্সিলের মেম্বর, প্রথিত-নামা অর্থবিজ্ঞানবিৎ মিঃ দাদিবা, এম, দালালকে এই পদে সম্প্রতি নিযুক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাচন যে অতি উত্তম হইয়াছে তাহা শ্বেতাঙ্গেরাও পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বিলাতে মহাপ্রদর্শনীতে পাট :—ভারতীয় পাটকল সমিতির একটি আধুনিক অধিবেশনে ইহা স্থির হইয়াছে যে ১৯২৪ সালের প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বিশেষরূপে প্রদর্শন করা হইবে। ইহার জন্য সমিতি ২৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সরকারি শিল্প-বিভাগ :—বঙ্গদেশের শিল্প-বিভাগের ১৯২১ সালের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষিজাত শিল্পের উল্লেখ ইহাতে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যে সমুদয় কার্য্যের প্রস্তাবও হইয়াছে তাহার অধিকাংশই মুলতুবী আছে। উন্নত জাতীয় গাভী ও ছাগল লইয়া দুধের কারবার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে ১ লক্ষ টাকার কম খরচ পড়িবেনা ; ইহা এখনও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীণ। ফল সংরক্ষেনের মতলব পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঙপুরের তামাক দ্বারা চুরুট

প্রস্তুতের এখনও কিছুই হয় নাই। কদলি ও কদলিজাত দ্রব্যাদির ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক বিষয়। শিল্প বিভাগ মনে করেন যে যথেষ্ট পরিমাণে কলা পাওয়া দুরূহ। পাঠকেরা এসম্বন্ধে বিশেষ তথ্য 'কৃষক'সম্পাদক লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধে পাইতে পারেন—Commercial Possibilities of Indian Plantains by N. B. Dutt-"Indian Industries and Power"—April, 1922. প্রাণীর অস্থি প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মোটের মাথায় শিল্প বিভাগ হইতে গতপূর্ব্ব বৎসরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ কল্পে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয় নাই।

ঘরে বসিয়া ব্যবসায়—কোন একজন বিখ্যাত শ্রমশিল্পবিৎ কতকগুলি জিনিষের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত জিনিষ অতি অল্প মূলধনে ঘরে বসিয়া প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে লাভও বিস্তর হয়। তিনি যে তালিকা দিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলির নাম করিলাম :—

(১) মোজার কলের সাহায্যে মোজা, ছেলেদের ফ্রক প্রভৃতি প্রস্তুত ; (২) নানা রকমের রুমাল ; (৩) কাগজ, ছেঁড়া চট এবং মাটি দ্বারা নানাবিধ খেলনা ; (৪) সূতা রং করা ; (৫) বিড়ি ও সিগারেট ; (৬) কাগজ এবং সিল্কের হাত পাখা ; (৭) কাগজের এবং কাপড়ের নানা রকম ফুল ; (৮) সতরঞ্চী ও মাদুর ; (৯) পাট ও শণ দ্বারা সরু মোটা নানা রকমের দড়ি ; (১০) বেত এবং বাঁশ দ্বারা নানাবিধ জিনিষ ; (১১) হাতের তাঁতে কাপড় বোনা ; (১২) চরকা কাটা ; (১৩) নানাবিধ কার্য্যের জন্য বিভিন্ন রকমের বুরুস ; (১৪) প্যাটেণ্ট ঔষধ ; (১৫) কাগজ কাটিয়া তদ্দারা খাম ; (১৬) পিন কুসন ; (১৭) সাইনবোর্ড লেখা ; (১৮) ঝিনুক প্রভৃতি হইতে বোতাম ; (১৯) লেস্ বোনা ; (২০) সাবান প্রস্তুত প্রভৃতি। পাঠশালায় ছেলেদের লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন সমবায় সমিতির সভ্যগণ এই দিকে একটু মনোযোগ দিয়া দেখিতে পারেন। বাড়ীতে নিজেরা এবং মেয়েরা অতি সহজে এই সব কাজ করিতে পারেন। আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত সমবায় সমিতি সমূহের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। "ভাণ্ডার"

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

বাজার দর। চাউল বালাম ৬৷৷০ হইতে ৬৸৵০, ঐ নাগরা ৬৵০ হইতে ৬৸০, ঐ বাঁকতুলসী, মাজা ৭৷৷০ হইতে ৮৲, আটা বি আসল ৮০, ঐ নকল ৭৵০, ময়দা ১নং ৮৴০, সুজি ৭৸০, ৮৷৴০, ঘৃত শ্রীমার্ক। ৯০৲, ঐ খুর্জা ৮২৷৷০, ঐ ভাদুয়া ৯৪৲, সরিষা তৈল, কলের ২২৲ হইতে ২৩৷৷০, ঐ কাণপুর ২৬৲, নারিকেল তৈল, কোচিন ২৫৲, ঐ কলের ২৪৲, রেড়ী তৈল ২১, খোল, সরিষার ২৫০, ঐ রেড়ীর ৪৷০, কেরোসিন, হাতী

মার্কা ৭৷৷০, মুগ, সোণা ৭৲ হইতে ৭।০, ঐ হালি ৬।০ হইতে ৬।০, ছোলা ৩৷৶০ হইতে ৪৷৷০, মাষকলাই ৪৷০, অরহর, নূতন দেশী ৩।০ হইতে ৩৷৷০, মটর সাদা ৩৸৵০, ঐ পায়রা ২৸, সরিষা ৭৷৷০ হইতে ৭৸০, সুপারি, জাহাজী গোটা ১১৲ হইতে ১১৷৷০, ঐ দেশী ১৮৲ হইতে ১৮৲, লঙ্কা, পাটনাই নূতন ২২৲ হইতে ২৩৲, জিরা ৩৪৲ হইতে ৩৯৲, মরিচ ২০৷৷০ হইতে ২১৲, পাট, পূর্ব্ববঙ্গ ৪নং ১২৷৷০, ঐ রিজেকসন ১০৲, সোণা কলিকাতা মিণ্ট ২৮৷৷/০, ঐ চীনাপাত ২৬৷৵০, রূপা ১০০৴০ ভরি ৮৩৸৵০ আনা। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৩২৩।

কৃষিজমিতে প্রজার স্বত্ত্ব—প্রজা-স্বত্ব আইনের (Bengal Tenancy Act) সংস্কার করা স্থির হইয়াছে। এই সময়ে শাস্ত্র-সিদ্ধ প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সত্য কথা কয়টি আমরা জন-সাধারণের এবং সরকার বাহাদুরের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

কৃষকের আবাদি জমির মালিক কৃষক স্বয়ংই, রাজা কি জমিদার তাহার জমির মালিক নয়। "ন রাজ্ঞো ভূধনং," "ন স্বং ভূর্দীয়তে ন সা," "ভূমি রাজার নিজস্ব সম্পত্তি নয়, ভূমি তাহার দানের বিষয় নয়"—এই সকল সায়নবাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। "অসৌ পৃথিব্যাং সম্ভূতানাং ব্রীহ্যাদীনাং রক্ষণেন নির্ব্বিষ্টস্য কস্যচিৎ ভাগস্য ঈষ্টে, ন ভূমেঃ"—"রাজা (অসৌ) পৃথিবীতে উৎপন্ন ধান্যাদির রক্ষা করাতে তাহার প্রাপ্য (নির্ব্বিষ্টস্য) একটি ভাগের মাত্র তিনি প্রভু, তিনি ভূমির প্রভু নহেন"—শবরস্বামীর এই সকল বাক্যের অর্থও পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন। এখন বিচার করিয়া বলুন ভূমির মালিক বলিয়া রাজা কি জমিদার কিছু খাজনা—'rent' in the sense of "unearned increment"—পাইতে পারেন কি না। এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, রাজা অথবা জমিদার যদি সত্যসত্যই চোরাদি হইতে এবং অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি হইতে ধান্যাদি রক্ষা করেন, এবং গবাদির খাদ্যের জন্য গোগ্রাস জমির ব্যবস্থা করেন, তবে তাহার ক্ষতিপূরণ বা পারিশ্রমিক স্বরূপ রাজা বা জমিদার সেই ধান্যাদির একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবেন। সেই অংশ, মনু বলেন, উৎপন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, অথবা দ্বাদশ অংশ। কিন্তু রক্ষা না করিলে এবং গবাদির খাদ্যের জন্য গোগ্রাস ভূমি না যোগাইলে, রাজা বা জমিদারের সে ক্ষতিপূরণ বা পারিশ্রমিক বা "বলি" (তাহাকে খাজনা বলা ভাষার অপব্যবহার মাত্র) সে বলি পাইবার অধিকার আছে কি না, পাঠক বিচার করুন। বিলাতে যেমন চাষি জমির কোনও সরকারী রাজস্ব (Land-Revenue) নাই, পাঠক দেখিয়াছেন ভারতেও তাহা ছিল না।

এ কথাও এস্থলে আমাদের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, এবং পাঠকগণেরও তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মুসলমান বাদশাহ অথবা নবাবগণ হিন্দুশাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন নাই। মুসলমান নবাব অথবা বাদশাহগণ

সকল সময়ে পূর্ণ মাত্রায় শাস্ত্রবিধি পালন না করিয়া থাকুন' এ কথা অতি সত্য যে, তাঁহাদের আমলে রাজা এবং আবাদকারী কৃষিজীবী প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী বলিয়া কোন চিরস্থায়ী মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী, জমিদার অথবা তালুকদার স্থান পায় নাই। এমন কি 'আইন আকবরীতে' দেখা যায় যে, আকবর বাদশাহের আমল পর্য্যন্ত দেশে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্থান পায় নাই। কোন মুসলমান বাদসাহই তাহাদের দ্বারা রক্ষিত ঐ উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশবিশেষ ভিন্ন, অথবা সেই নির্দ্দিষ্ট অংশের মূল্য ভিন্ন, জমির খাজনা বলিয়া কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ইহা দ্বারা দেখা যায়, যে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থাই মুসলমান আমলেরও প্রজাস্বত্ববিষয়ক ব্যবস্থা ছিল। এই সকল কারণও উল্লিখিত শাস্ত্রবিধিকেই প্রকৃত ভারতীয় সনাতন প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধি মনে করা কর্ত্তব্য। আশা করা যায়, সরকার বাহাদুর পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধ প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধি সকলের বিরুদ্ধ কোন বিধিকে নূতন প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনে স্থান দিবেন না। সরকার বাহাদুর দেখিবেন যে, সরকার নিজে, অথবা কোন জমিদার, অথবা তালুকদারই যেন চোরাদি হইতে এবং অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি হইতে প্রজার শস্যাদি রক্ষা না করিয়া, সভ্য দেশ সকলের মত দুর্ভিক্ষ-ম্যালেরিয়াজনিত অকাল মৃত্যু হইতে প্রজাগণকে রক্ষা না করিয়া, এবং প্রজাগণের পালিত গবাদি পশুর জন্য গোগ্রাস ভূমি না যোগাইয়া, যেন প্রজার নিকট হইতে কোন খাজনা দাবি না করিতে পারেন।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত—"আনন্দবাজার"

সম-সাময়িক জগত।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ চিনির কারখানাঃ—পাঠক গণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে কিউবা দ্বীপে প্রভূত পরিমাণে ইক্ষু জন্মাইয়া থাকে। ইহা পৃথিবীর যেমন একটি প্রধানতম ইক্ষু-চাষের ক্ষেত্র তেমনি উক্তদেশে যেটি চিনির কেন্দ্র-কারখানা সেটিও অতুলনীয়। তাহাতে বৎসরে দেড় লক্ষ টণ (১ টণ=২৭১/৪ মণ) চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতে এইরূপ কারখানা যে এখনও স্বপ্নের অগোচর তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে আপাততঃ এদেশে ১৮টি চিনির কারখানায় পরিশুদ্ধ চিনি প্রস্তুত হয়; কিন্তু ঐ সমুদয় কলের চিনি একত্রিত করিলে ৩৭, ৬৩৪ টনের অধিক হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একা কিউবা যে পরিমাণ চিনি উৎপাদন করে সমগ্র ভারত তাহার ১০০ ভাগের১৭ ভাগ চিনি উৎপাদন করিতেও সমর্থ নয়।

কিউবায় যে সুদক্ষ চাষীতে আখ্ চাষ করে, তা নয়। সেখানেও সাধারণ চাষীর দ্বারা চাষ হয় ও মজুরের সংখ্যাও তেমন বেশী নয়। কিন্তু কিউবা দ্বীপ গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত; এখানে আখ্ আগাছা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একার প্রতি ফলনের হার ২০ টন; ভারতবর্ষের ঠিক দ্বিগুণ। এক ঝাড় আখ্ হইতে ছয়বারফসল লইতে পারা যায়। এই সমস্ত কারণে আখের দাম খুব কমই পড়ে। অন্যদিকে সে দেশে স্থানীয় গুড় তৈয়ারী প্রথা একবারেই না। সমস্ত আখ্ই কারখানাতে আসে। সুতরাং কারখানায় কাঁচা মালের অভাব কখনই হয় না। এই সমস্ত কারণে উৎপাদিত চিনির মূল্য কমই পড়ে।

একই কারখানায় উৎপাদনের মাত্রা যত অধিক হয় খরচ ততই কম পড়ে। ভারতে কারখানা প্রতি উৎপাৎনের মাত্রা অধিক হওয়ার প্রধান প্রতি বন্ধক আখের অভাব। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র কারখানা গুলিও উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচা মাল পায় না। সময়ে সময়ে কল বন্ধ করিতে হয়। গুড়ের প্রচলন অধিক হওয়ায় জন্য পরিশুদ্ধ চিনির কারখানায় অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিমাণেই ইক্ষু যায়। যত দিন না ইক্ষু চাষের সমধিক প্রসার হয় ততদিন আমাদিগকে শর্করার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

মোক্সথ্যান্‌ঃ—আধুনিক তত্ত্ব-জগতে একটি নূতন দ্রব্য লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। উদ্ভিদটি ঠিক নব আবিষ্কৃত কি না বলা যায় না; কারণ এ পর্য্যন্ত উহার সঠিক বৈজ্ঞানিক নাম প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা বাজারে ঐই নূতন তত্ত্বর প্রবর্ত্তন করিতেছেন তাঁহারা ইহার গুণ অসাধারণ বলিয়া বলিতেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বন্য এদেশে

ইহা প্রথমে পাওয়া যায়। গাছটি আনারস জাতীয়। মলয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১ লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হইতেছে। লম্বা লম্বা পাতাগুলি আনারস অথবা মুর্গার ন্যায়; কিন্তু পাতা ছেঁচিয়া আঁস্ বাহির করিতে তত কষ্ট পাইতে হয় না। তন্তু শণ অপেক্ষাও দৃঢ়তর; শুক্লাভ শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট।

এই তন্তু-প্রচারের জন্য বিলাতের বড় বড় অভিজ্ঞ ও তন্তুজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারকগণ অগ্রসর হইয়াছেন। Arghan Development Syndicate নামক একটি বড় কোম্পানি গঠিত হইয়াছে। ক্যাম্বিস্, দড়ি, কাছি, জাল, সুতলি, মোটা সূতা, কল চালাইবার বেষ্টনী (belt) প্রভৃতি নানাবিধ কাজে ইহাকে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী পত্রিকা Manchester Guardianএ প্রকাশ যে ভারত, সিংহল, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে আরঘাণ চাষের বন্দোবস্ত হইতেছে ও উৎকর্ষাদি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় এই তন্তু উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষ নাগাত ইহা বোধ হয় বাজারে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আরঘাণ শুধু যে ক্যাম্বিস্, চট, প্রভৃতি মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত তাহা নহে। প্রবর্ত্তকেরা বলেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্মতম বস্ত্রও ইহা হইতে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। সূতা তৈয়ারীর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে অর্দ্ধসের আরঘাণ হইতে ৩৫০০—৭৫০০ গজ সূতা প্রস্তুত হয়। আরঘাণের সহিত তুলা বেশ মিশ খায়। ইহাকে ধোয়া ও রং করাও অতি সহজ। বস্তুতঃ আরঘাণের জন্য যে সমস্ত গুণ দাবী করা হইতেছে যদি তাহার অর্দ্ধাংশও সত্য হয় তবে বর্ত্তমান জগতের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুতের চারিটি প্রধান তন্তুর—রেশম, পশম, তিসি ও তুলা—যে আর একটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রবর্ত্তক কোম্পানি গাছটির নাম গোপন রাখিয়াছেন কেন? অবশ্য চাষের বিস্তার হইলেই গাছ সকলের নজরে পড়িবে ও তাহার নাম ও স্বরূপ নির্ণয় করিবার কোন কষ্টই থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় একমাত্র স্বার্থ বজায় রাখা ভিন্ন কোম্পানির স্বীয় দত্ত নামে নূতন তন্তু প্রচারের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এরূপ অনেক তন্তুর প্রচার আগে হইয়াছে, অথচ আমাদের সেই অতি পুরাতন তুলাই এখন ও জগতে প্রধান তন্তুরূপে বিরাজ করিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় তুলা চাষ:—ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপাদনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা আফ্রিকায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; ভারতেও তাঁহাদের চেষ্টা কম চলিতেছে না। এখন তাঁহারা দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন যে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়ার উপরও তাঁহারা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে পারিবেন। অষ্ট্রেলিয়ায় তুলা চাষ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউ সাউথ্ ওয়েলস্ ও কুইন্সল্যাণ্ডেই তুলা চাষের জমির পরিমাণ অধিক। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশেও চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বিগত বৎসর

সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩০০০ গাঁট তুলা অষ্ট্রেলিয়ায় হইয়াছিল। এ বৎসর প্রায় ৪০০০০ গাঁট হইবে ও আগামী বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ গাঁট হইবে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। গুণের হিসাবেও এই তুলা উত্তম; মার্কিন মাঝারি শ্রেণীর তুলার সমকক্ষ; যাহা শতকরা ৯৫ ভাগ বিলাতী কলে ব্যবহৃত হয়। দামের হিসাবে এই তুলা সুলভ—কারণ জমিতে সার দিতে হয় না; উৎপাদনের মাত্রা অধিক ও চালানের সুবিধা যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য যে অষ্ট্রেলিয়ার বারিবিহীন স্থানে তুলা হয় না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রদেশ ব্যতীত দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়ার যে সমুদয় স্থানে বারিপাত অধিক, কিম্বা জলসেচনের ব্যবস্থা আছে সেই গুলিই তুলা চাষের কেন্দ্র। এ সকল স্থানে তুলা সাধারণতঃ ভালই হইতেছে। তাহার উপর সরকার আবার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সমস্ত উৎপাদিত তুলা তাঁহারা কিনিয়া লইবেন। এই সরকারী ঘোষনার ফলে ছোট ছোট চাষীরাও তুলা চাষে মনোনিবেশ করিয়াছে। ১৯-২৫ সাল পর্য্যন্ত তাহাদের তুলা বিক্রয় করিবার কোন বিঘ্নই নাই। স্বাধীন দেশে সকলই সম্ভবপর। তুলা চাষ বিস্তারের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেছেন যদি এতদ্দেশে তাহার সিকিও হইত তাহা হইলে উত্তম কার্পাস অভাবে বড় বড় কলওয়ালাগণকে অথবা সামান্য তাঁতিগণকে ভুগিতে হইত না।

বিলাতে মহাপ্রদর্শনী:—১৯২৪ সালের প্রথমাংশে বিলাতে লণ্ডন নগরে যে মহাপ্রদর্শনী খোলা হইবে তাহা আমাদিগের পাঠক বর্গেরা বোধ হয় অবগত আছেন। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কেবল মাত্র ব্রটিশ্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহে উৎপাদিত কাঁচা মাল ও শিল্পাদি প্রদর্শিত হইবে। ইহার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ্ হইতে বিশেষ উদ্যোগ চলিতেছে। একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন—সাম্রাজের রাও বাহাদুর বিজয় রাঘব আচারিয়ার। তিনি ইতি মধ্যে বিলাতে গিয়া প্রদর্শনী কমিটির সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া আসিয়াছেন এবং এখানে প্রদর্শনীতে পাঠাইবার দ্রব্যাদি মনোনীত করিয়া আবার বৈশাখ মাস নাগাত বিলাত যাইবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শনীর ব্যয় সংকল্পে মোট ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ও বঙ্গদেশে ও সে দিন কৌন্সিলে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

লণ্ডন সহরে উইম্ব্লে নামক স্থানে এই মহাপ্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রায় চারি শত বিঘা ব্যাপিয়া গৃহাদি প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ তিন হাজার মজুর খাটিতেছে। ভারতের জন্য ১ লক্ষ বর্গফুট স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং অবিলম্বে নির্ম্মাণ কার্য্য ও আরম্ভ হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অসীম সম্পদ প্রদর্শনের যে কোন ত্রুটি হইবে না তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণও এই সুযোগে তাঁহাদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি দেখাইয়া চরম মাত্রায় বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উন্নত দেশ সমূহই বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে ফল লাভ করিতে পারিবেন। ভারতের শিল্পের যে বিশেষ

কিছু সুবিধা হইবে তাহা বোধ হয় না। তবুও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এ সম্বন্ধে লোকের যথেষ্ট আগ্রহ। শিল্প সম্বন্ধে যাহাই হউক, ভারতের কাঁচা মালের উপর বিদেশীয় বণিকগণ যে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে, তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে কাঁচা মাল যে সমধিক হইবে তাহা ও নিঃসন্দেহ। এই সমস্ত মাল বিলাতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য জাহাজওয়ালাগণ ভাড়া অনেক কমাইয়া দিবেন ও বিলাতে ভারতীয় ট্রেড্‌কমিশনার প্রদর্শক দিগের বিশেষ সহায়তা করিবেন। আরও শুনা যাইতেছে প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগের একটি প্রধান দর্শনীয় দ্রব্য হইবে—ভারতীয় গ্রাম। ইহাতে পল্লী চিত্র বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া যে সব ইংরাজ কখনও ভারতে আসেন নাই-তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করা হইবে।

চাউলের নূতন ব্যবহার ঃ—মার্কিনে ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে যে প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপাদিত হয় তাহা অনেকে জানেন। এই স্থানের জনৈক মণিষী দুইটি প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন যদ্বারা খাদ্য হিসাবে চাউলের ব্যবহার সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ১ম। স্বাভাবিক সংরক্ষণ প্রণালী। ইহাতে চাউলের সমস্ত উপাদানই দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে ও কীট দ্বারা নষ্ট হইবে না। ২য় চাউলের যাবতীয় পুষ্টিকর গুণ বজায় রাখিয়া উহাকে তরল অবস্থায় পরিণত করা ; ইহাতে শুধু চাউলই উৎকৃষ্ট খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আজকাল যে নানা প্রকার যৌগিক খাদ্য হইয়াছে তরল চাউল তাহার অন্যতম উপাদান হইতে পারিবে।

পত্রাদি।

বঙ্গে কৃষি শিক্ষা

মাননীয় 'কৃষক'—সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু,

মহাশয়,

আমাদের এই বিশাল বঙ্গদেশে নানা ব্যবসায়িক, ব্যবহারিক এবং অর্থ নৈতিক কারণে দেশের লোকের একটু দৃষ্টি কৃষির দিকে পড়িয়াছে; সেটা ভাল কথাই বলিতে হইবে; কিন্তু দেশের অবনতিপ্রাপ্ত মরণোন্মুখ কৃষির নিম্ন গতি রোধ করিয়া উন্নতির পথে লইতে হইলে কৃষক কুলের কৃষিবিষয়ক শিক্ষা চাই; গোবলের অবাধ হত্যা, বিদেশে রপ্তানি বন্ধ, বিষ প্রয়োগ বন্ধ বা রহিত করা চাহি এবং নব আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন গোচারণর গুলি রক্ষা এবং স্থান বিশেষে আবশ্যক মত নব গোগ্রাস রচনের ক্ষমতা সংঘ বা সমিতির বা ডিঃ বোর্ডের আইন বলে পাওয়া চাহি; এবং প্রজা সত্ব আইনের সমীকরণ এরূপ ভাবে হওয়া চাহি যাহাতে প্রজা এবং জমীদারে বিদ্বেষ ভাব আদৌ বর্দ্ধিত বা পোষিত হইতে না পারে। সেকালের রাজায় প্রজায় সদ্ভাব বা ভ্রাতৃভাব আর আজকাল দেখা যায় না; জমীদার প্রজাকে পুত্রবৎ পালন করেন না, সদাই শুষিতে ব্যস্ত, এবং প্রজানিষ্পেষিত ধন সহরে আনিয়া বিলাসিতায় অযথা ব্যয়ে অনুরক্ত। প্রজাও তঞ্চকতা পূর্ণ হইয়াছে, জমীদারকে পূর্ব্ববৎ পিতৃ নির্ব্বিশেষ দেখে না; কাজেই দেশে অশান্তি, দৈন্য; তাহার পর রাজায় প্রজায় কোন সদনুষ্ঠান, যাহা দেশের মঙ্গল জনক, উভয়ের সমবেত চেষ্টায় আজকাল প্রায়ই সম্পাদিত হয় না। সবই সৎ শিক্ষার অভাব। দেশের রাজা বা আমরা স্বয়ং এই সাধারণ সুলভ কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছেন বা করিয়াছি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাঠকগণকে 'কর্ম্মী'তে প্রকাশিত "আমাদের কি কর্ত্তব্য, এবং "বঙ্গের কৃষি এবং কৃষিশিক্ষা"; 'সাহিত্য সমাজ পত্রিকায়' প্রকাশিত "আমাদের কৃষি এবং কৃষিশিক্ষা"; এবং 'কৃষকে' ঐ সম্বন্ধে মল্লিখিত প্রবন্ধ গুলি যত্নে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কৃষি-বিভাগের সহৃদয়তায় চুঁচড়া, ঢাকা, এবং রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে দেশে কৃষি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কৃষি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে বটে, কৃষিসচিব মহাশয়ও এ বিষয়ে কম যত্ন ও আগ্রহ দেখাইতেছেন না; কিন্তু দেশে কিরূপ কৃষি শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রচলন প্রয়োজন তাহা মাননীয় কৃষি সচিব, নবাব সাহেব, উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশে সেরূপ শিক্ষা দিবার লোক বিরল, যে ২।৪ জন আছেন তাঁহাদের

উপর. শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের কর্তৃপক্ষদের আস্থা এবং বিশ্বাস কোথায়, এইরূপ শিক্ষা দেশে বিস্তার করিতে সহায়তা করে সেরূপ পাঠ্য পুস্তকই বা বঙ্গ সাহিত্যে কৈ ? নবেল নাটক, বিদ্বেশ-সূচক রহোচ্ছাস উপন্যাসে দেশ প্লাবিত ; কিন্তু শিল্প, পাখিচাষ (Poultry Farming) গো পালন, গোচাষ (Dairy Farming) ইত্যাদি সম্বন্ধে গোপালবান্ধব, গোধন আদি ২।১টি পুস্তক ছাড়া পাঠ্য বই বঙ্গ সাহিত্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর পুস্তকলেখকদের শিক্ষা বিভাগ বা কৃষি বিভাগ বা সাধারণের পক্ষ হইতে পৃষ্টপোষকতা বা সহায়তা কৈ ? যদি জাতি রূপে বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হয় তাহা হইলে এই সকল অত্যাবশ্যকীয় গৃহ শিল্প-শিক্ষা-প্রদ পুস্তকগুলিকে শিক্ষা বিভাগ বা কৃষি বিভাগের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠ্য রূপে আশু নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। মাননীয় নবাব সাহেব বা মিত্র মহাশয়ের দৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে ? পাখি-চাষ শিক্ষা, গো-রক্ষা, গো জাতির উন্নতি, তাহার দুগ্ধ দায়িকা গুণের উৎকর্ষ সাধন ও বর্দ্ধন—সে বিষয় শিক্ষা করিবার সাধারণ কৃষকের কি ব্যবস্থা দেশে আছে। জাতীয় শিক্ষা সঙ্ঘ বা কৃষি বিভাগ বা শিক্ষা বিভাগ এই সকল দেশের হিতকর ও আবশ্যকীয় জটিল বিষয় গুলির সমাধানের এতাবৎ কিছুই করেন নাই। সাধারণ কৃষি শিক্ষার বা ঐ শিক্ষা বিস্তারের বা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রকৃত পক্ষে কেহই কিছু করেন নাই। এদিকে কি তাঁহাদের আশু দৃষ্টি পড়িবে ? দেশের কৃষক কুল চাহে সুলভ ভ্রমণশীল কৃষি শিক্ষক এবং ডিমনস্ট্রেশান কৃষি ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষা। কৃষি সচিব দেশে যে বিলাতী শিক্ষা পদ্ধতির অভিনয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা আদৌ দেশের হিতকর হইবে না। কেবল দেশের পয়সা নষ্ট—ও কাজে অসাফল্য। শিক্ষা সংঘের সার নীলরত্ন সরকার, সার প্রফুল্ল রায়, বাবু বসন্ত কুমার বসু বা প্রভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ দেশ নায়কদের কৃপা দৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে ? চাই দেশে সার সমাধান, দেশের গোবলের রক্ষা। সে দিন "হিজলী-হিতৈষী" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র দুগ্ধ ঘৃতাদি গব্য খাদ্য সামগ্রীর হ্রাসের কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। দেশের কৃষির উন্নতি কথা রক্ষা করিতে হইলে গোবলের রক্ষা চাই ; তাহা করিতে হইলে উত্তম বৃষ রক্ষা চাই এবং তজ্জন্য চারণ এবং বৃষ আইন পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের দেশেও প্রবর্ত্তিত হওয়া আশু কর্ত্তব্য। সে দিকে কি সরকার বাহাদুর বা দেশ নায়কগনের দৃষ্টি শীঘ্র পড়িবে ? এইরূপ আইনের খশড়া ভারতীয় গো কনফারেন্স সার জন উড্রোফের অধিনায়কত্বে সংকলন করিয়া দেশের লোকের মতামত চাহিয়া বিগত ২।৭।২১ এবং ২২।৬।২১ তারিখের সার্ভেণ্ট ও ২৪।৬।২১ তারিখের ইংলিসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ—তাহার প্রতি দেশের নেতাদের কৃপাদৃষ্টি আজ ও পড়ে নাই। চারণ আইনটি দেশে প্রবর্ত্তন করা বড় সহজ নহে ; ইহাতে অত্যন্ত জটিল আইন এবং অর্থ নৈতিক প্রশ্ন মিশ্রিত আছে ; তাহার সমাধান করা সহজ নহে। "জ্যোতি," "হিজলী-হৈতৈষী,"

"কাল্না হিতৈষী" আদি পত্রিকা গুলি তথা হিন্দী "ভারত মিত্র," "পাটলী পুত্র," "ব্রক্‌স্‌প্রেস্‌," "অভ্যুদয়" আদি সংবাদ পত্র গুলি এই জটিল প্রশ্নের সমাধান জন্য বহু প্রবন্ধ প্রকাশ সময়ে সময়ে করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত দেশের কোন কাজ হয় নাই। ভারতের প্রধান কর্ম্মবীর সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি "কাঁউ প্রোটেক্‌শান্‌ লীগের" ভাগ্য বিধাতা, কি এই প্রশ্নের মিমাংসা করিয়া দেশের মধ্যবিত্ত ও নিঃস্ব কৃষককুলের হিত সাধন করিবেন না? তাহার মত কর্ম্মী এদিকে হস্তক্ষেপ না করিলে কদাচ দেশের কল্যাণ নাই বা এই জটিল প্রশ্নের সুমিমাংসা হইবে না।

নিঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

"নিখিল ভারত আশ্রম"—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, স্বনাম ধন্য ইন্দুভূষণ সেন, সুপরিচিত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গনের নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকে গড়ে প্রায় ২০০ অনাথ আতুর রোগী এই আশ্রমে সাহায্য পেয়ে এসেছে। গত ১৯২১ সালে মোট ২৮৬০০, টাকা অর্থাৎ গড়ে ২৪০০ টাকা মাসিক ব্যয় হয়েছে। ইহার ভিতর "বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দদের নিকট হতে গড়ে মাসে মাত্র ৪০০ টাকা পাওয়া গেছে; বাকী বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা বিদেশী অর্থাৎ মাড়োয়ারী, গুজরাটী, ভাটীয়া, দিল্লীওলা, মুসলমান প্রভৃতি ব্যক্তি বর্গের নিকট হইতে পাওয়া যাচ্ছিল।

১৯২১ সালের শেষভাগ হইতে নানা কারণে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দাঁড়ায়। এতদিন উঠেই যেতো; কেবলমাত্র শুকদেব বাবু (অধ্যক্ষ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এই দীপটার ক্ষীণ শিখা কোনও রকমে জেলে রেখেছিলেন। প্রায় ১২০০০৲ টাকা ঋণ পড়ে, তার মধ্যে শুকদেব বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোনও রকমে ৫০০০৲ টাকা শোধ করেছেন; বাকী এখনও ৭০০০৲ টাকা। মিশনারীরা "Industrial Home" নাম দিয়ে চালাতে রাজী রয়েছেন—তাঁরা সমুদয় ধার শোধ দেবেন; আজ যদি কলিকাতার মত জায়গায়, সহরের বুকের উপর এতগুলি ছেলে মেয়ের এরূপ অবস্থা হয়, বাঙ্গালীর বিশেষতঃ হিন্দুর organization লয়ে সেই জায়গায় চালায়, তাহলে হিন্দুধর্ম্মের হিন্দুর মনুষ্যত্বের কি গৌরব বৃদ্ধি হবে। আশা করি দেশের জনসাধারণ ধনীমানী মহানুভব ব্যক্তিরা ভেবে দেখবেন। আশ্রমের আফিস—৩১ কালীঘাট রোড ভবানীপুর কলিকাতা।

(আশ্রমের পরিচালকগণ কর্ত্তৃক আমরা উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি—কৃঃ সঃ)

ইক্ষু—চাষ।

(২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

চাষের জমির পরিমাণ।

বাঙ্গলাদেশে এখন প্রায় ২½ লক্ষ একার জমীতে ইক্ষুচাষ হইতেছে। ১৯০৪-৫ সালে রাজসাহী জেলায় ৯২ ২০০ একার জমীতে ইক্ষুচাষ হইতেছিল। এখন রাজসাহীতে কেবলমাত্র ১৮০০০ একার জমীতে ইক্ষুচাষ হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অর্থাভাবে ও লোকাভাবে ইক্ষুচাষের কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। কৃষিবিভাগের কর্ত্তা, মিলিগান, সাহেব বলেন ধাতব পদার্থবিশিষ্ট বালী জমী ইক্ষুচাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বারশন সাহেব গুরুদাসপুরে ইক্ষু শীর্ষক পুস্তকে কাদামাটীকেই ইক্ষুচাষের পক্ষে অনুকূল বলিয়াছেন। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্থলে এবং রাজসাহী জেলায় সাধারণতঃ তিন প্রকারের জমী আছে; যথা:—বারীন্দ, মাকড়া, পাথুরে জমী; অর্থাৎ সাধারণ পলী এঁটেল মাটী; এই জমীতে বৎসরে একবার ধান্য হয়।

নূতন জলী জমী—রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটীয়রে এইপ্রকার জমী নদীতীরবর্ত্তী জমী নামে অভিহিত হইয়াছে। রামপুর বোয়ালিয়া, পাবনা, চারঘাট, রাজাপুর, লালপুর এবং বাজিতপুর ও ওয়ালিয়া থানার স্থানে স্থানে এইরূপ দোঁয়াস জমী দেখা যায়; ইহাতে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয় ও ইক্ষুচাষের পক্ষে ও ইহা বিশেষ উপযোগী।

বজ জমী—লম্বা ডাঁটা বিশিষ্ট ধান্য এইপ্রকার জমীতে জন্মায়। উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকার জমীকেই সকলে ইক্ষুচাষের বিশেষ উপযোগী বলেন। এইপ্রকার জমীতে অল্পলাভজনক ফসল না করিয়া আরও অধিক পরিমাণে ইক্ষুচাষ করা আবশ্যক। এই সকল জমীতে সরকারী ক্ষেত্রের ন্যায় ভাল ইক্ষু ফসল জন্মাইতে পারে। বার্ণস সাহেবের মতে চুণযুক্ত জমী ইক্ষুচাষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং নূতন পলীজমীতে এই চুণের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। হাওয়াই দেশের জমী পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে তথায় যথেষ্ট চুণ, লৌহ ও যবক্ষার আছে। হাওয়াই দেশের জমী ইক্ষু চাষের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী এবং ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে রাজসাহী জেলার জমীতেও লৌহ ও চুণের অংশ যথেষ্ট পরিমাণ থাকায়

এস্থানেরও অধিকাংশ জমীতে ইক্ষুচাষ করা যাইতে পারে। আরও এক বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। বারীন্দ জমীতে ছয়মাসের মধ্যে ধান্য জন্মায়, অবশিষ্ট ছয়মাস ঐ সকল জমী পতিত থাকে। এই সময় ঐ সকল বারীন্দ জমীতে ইক্ষুচাষ করিতে পারিলে জমী হইতে পুরা ফসল আদায় করা যাইতে পারে। মিঃ বসু, কৃষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর, বলেন যে পুরাণ পলী জমী অর্থাৎ বারীন্দ জমীতে ইক্ষু চাষ করিলে রোপণকার্য্য জুন বা জুলাই মাসে করা উচিত—নতুবা ফেব্রুয়ারী মাসে রোপণ করিলে প্রথম প্রথম জলসেচন আবশ্যক হইবে। সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া আমি অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে রোপণ প্রথার প্রচলন করিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু ঐ সময় রোপণ করিলে ফসল সম্যক পরিপুষ্টির জন্য চোদ্দমাস কিম্বা আরও বেশী সময় যায়।

চারার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি।

চারা রোপনের প্রায় কুড়িদিন পরে অঙ্কুরগুলি হইতে কোমল অঙ্কুর উদ্ভব হয়। মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে এই জেলায় মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি পড়িয়া জমির উপরিভাগ একপ্রকার কঠিন আবরনে আচ্ছাদিত হয়। সেই শক্ত মাটির আবরণটা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, নচেৎ ইক্ষুর কোমল ডগাগুলি উহা ভেদ করিয়া তেমন জোরে মাথা তুলিতে পারে না।

চারাগুলি যখন এক কি দেড় ফুট লম্বা হয়, তখন Planet Junior নিড়ানী দ্বারা জমির মাটি নিড়াইয়া দিয়া প্রথম ফসলের মধ্যস্থানে চাষ করিতে হয়। ইহাতে জমির আদ্রতা যেমন রক্ষা হয়, তেমনি আগাছা নষ্ট হয়। কিন্তু জমি যদি খুব আগাছা পরিপুর্ণ হয় তাহা হইলে একবার উহাকে নিড়াইয়া দেওয়া দরকার।

Ratoon শস্যের পক্ষে ফসল তুলিয়া নেওয়ার পরেই জমির আলগুলির উপর দিয়া হাল চাষ করা আবশ্যক। এই কর্ষণের ফলে আলগুলি ভাঙ্গিয়া যাইয়া মাটির ভিতর বাতাস ও সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে। তারপরে এক ফসলা বারিপাত হইলে জমি কোদলাইয়া দিতে হয়; তাহাতে জমিতে গলিত পাতার সার প্রবিষ্ট হয়।

এই কার্য্যের পর এক মাস অতীত হইলে একবার Planet Junior নিড়ানী দ্বারা অন্তর্চাষ করিতে হইবে। দরকার হইলে আর একবার জমি নিড়াইয়া দেওয়া যায়।

এক একর জমি কোদলাইয়া দিতে দৈনিক ১৫ জন মজুর আবশ্যক। Planet Junier Hoe, দুটি বলদ ও দুজন মজুর এক একর জমি চষিতে পারে। সাধারণতঃ প্রণালী কাটিয়া জল সেচন ইক্ষুক্ষেত্রে করা হয়না, কিন্তু ও মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসেও দু একবার জল সেচন করিতে পারিলে ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য করা হয়। তাহার পরের সোপানের কাজ হইতেছে কোমল ইক্ষুগুলিকে

বাঁধিয়া দেওয়া। কারণ এই প্রকার বন্ধন করিয়া দিলে পোকা, শেয়াল ও অন্যান্য উৎপাতের হাত হইতে ছোট গাছগুলি রক্ষা পাইতে পারে।

ইক্ষু মূলে বৃষ্টির জল জমিয়া পুরান পাতার নীচে অঙ্কুর উঠিতেছে ও শিকড় নামিতেছে দেখা যায়—আর্দ্র জলবায়ুর দেশে সাধারণতঃ এইরূপ জন্মিয়া থাকে। মাঝে মাঝে এই সব অনাবশ্যক অঙ্কুর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।

উত্তরবঙ্গে এই ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রথা এখন লোকে জানেনা। শক্তির অপব্যয় নিবারণের জন্য বর্ষারম্ভেই এই কার্য্য করা উচিত।

অনাবশ্যক অঙ্কুরোদ্গম প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য প্রতি একারে ৩৭ টাকা খরচ হয়। এই খরচা কুইনস্ল্যাণ্ড দেশে প্রচলিত রোপণ প্রথা প্রচলন করিলে অর্দ্ধেক হয়। এই অনাবশ্যক অঙ্কুরোদ্গম নিবারণ করিলে ইক্ষু ফসলে রীতিমত সূর্য্যালোক পায় এবং ইক্ষু শীঘ্র পাকিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ মিঃ কারবেরী বলেন যে ইহাতে sucrose (শর্করার) অংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধা এই যে ইহাতে শৃগালের অত্যাচার হইতে ফসল রক্ষা করা শক্ত হয়।

ফসল কাটা

চাষারা বিচার করিয়া ইক্ষু ফসল কর্ত্তনের সময় নির্দ্ধারণ করে না এবং সত্য সত্যই রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত ফসল সুপক্ক হইয়া ছেদনের উপযোগী হইয়াছে কিনা বলা বড় শক্ত। সাধারণতঃ ফসল ১০-১১ মাস ক্ষেতে থাকে। ইক্ষুর উপরের পাতা শুকাইয়া যাওয়াই ফসলের পরিণতির লক্ষণ। ইক্ষু ফসল অতিরিক্ত পক্ক হইলে শর্করার অংশ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু তাহাতে কেবল নিম্নশ্রেণীর গুড় উৎপন্ন হয় এবং পরিমাণও কম পাওয়া যায়।

ইক্ষু সুপক্ক হইবার সময় নির্দ্ধারণের উপরই ইক্ষুর মূল্য নির্ভর করে। শীতের পূর্ব্বে যে সকল ইক্ষু সুপক্ক হয় তাহা হইতে বেশ উচ্চশ্রেণীর বিশুদ্ধ রস উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীতারম্ভের পর যে সকল ইক্ষু বিলম্বে সুপক্ক হয় তাহাদের রস ভাল হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুপক্ক হওয়া হইতে দেখা যায় যে কয়েক প্রকারের ইক্ষুচারা রোপণ করিলে ছেদনের সময় একমাস কাল দীর্ঘ করা যাইতে পারে। ডিসেম্বর মাসের

প্রথমেই খেরী জাতীয় ইক্ষু ফসল কাটা যাইতে পারে। এদিকে ছোট জাতির ইক্ষু মার্চ্চমাসে কাটিলেই হয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে খেরী ইক্ষুর ফসল সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে তুলিয়া ফেলা উচিৎ, এবং মোটা ইক্ষুর ফসল জানুয়ারীর মাঝামাঝি কাটিয়া নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ইক্ষুর চারা অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রোপিত হইল সে গুলির কর্ত্তনের সময় ১৩ কি ১৪ মাস পরে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে আরম্ভ হয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে ইক্ষু ফসল আরম্ভ ও শেষ করিবার জন্য আমরা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় পাই।

ইক্ষুগুলি কোদালি দ্বারা মাটি ঘেঁসিয়া কাটা উচিত; অথবা ২ কি ৩ ইঞ্চি মাটির ভিতর প্রোথিত অংশকেও কোদালী দ্বারা কাটিয়া নেওয়া উচিত। যদি Ratoon ইক্ষুর ছিন্নাবশিষ্ট গোড়া গুলি মাটির উপর আসিয়া যায় এবং তাহা হইতে ডগার উদ্ভব হয়। তাহা হইলে আগামী বৎসরের ফসল মোটেই ভাল হয় না। ভূপতিত ও অপরিপক্ক ইক্ষু হইতে Glucoseর শতকরা বেশী পাওয়া যায়। এই প্রকার ইক্ষু-রস হইতে চিটা গুড় হয়। সুতরাং এই প্রকার গুড় তৈয়ারী ও বিক্রয় পৃথকরূপে করা উচিত।

রাজসাহী জেলার চাষারা সাধারণতঃ গড় পড়তা প্রতি বিঘা এই ১০-১২ মণ গুড় উৎপন্ন করে। প্রতি একরে ৩০-৩৬ মণ)।

শীর্ষের নিকটবর্ত্তী অংশের কয়েক ফিট হইতে ইক্ষু কাটিয়া লইলে তাহা হইতে ভাল ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইক্ষু দণ্ডের সর্ব্বোচ্চ গাইটটা বাদ দিতে হইবে। ইক্ষু দণ্ডের উপরের অর্দ্ধাংশে শর্করার ভাগ অল্প থাকে এবং উহা হইতে অল্প পরিমাণ নিম্ন শ্রেণীর গুড় উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ অর্দ্ধাংশ রোপণ কার্য্যে প্রয়োগ করা বিধেয় ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। তর্জ্জণীর সামান্য চাপে এই ইক্ষু দণ্ড গুলির প্রকৃত অবস্থা অর্থাৎ এ গুলি রোপণোপযোগী কিনা জানা যাইতে পারে। সাধারণতঃ অনতিপক্ক ইক্ষুর মধ্য ভাগ স্থানান্তর লইয়া যাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লাল, পচা ইক্ষু হইতে টুকরা না লওয়া উচিত; ইক্ষু কাটিলে তাহার মধ্যস্থিত লাল গোলাকার দাগ হইতে উহা পচা কিনা অনায়াসে বোঝা যাইতে পারে।

ইক্ষু চারা নানা স্থানে প্রেরণের আবশ্যক হয়; এ কারণ চারা গুলি রীতিমত বস্তাবন্দী করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণের উপযোগী করা আবশ্যক। অনেক সময় বস্তাবন্দীর দোষে চারা গুলি উৎপাদান অযোগ্য হইয়া পড়ে। নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে চারাগুলি সতেজ থাকিতে পারে:—

(1) ইক্ষু চারার কাটা ডগাটী paraffin wax এ ডুবাইয়া লইলে স্থানান্তরে

লইয়া যাইবার সময় ঐ ডগার রস উপিয়া গিয়া ডগাটী শুষ্ক হয় না।

(২) যাহাতে আখের গাইট গুলি পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে আঘাত না পায় সে বিষয় দেখা দরকার।

(৩) যাহাতে কাটা উগা দ্বারা কোনরূপ রোগ প্রবেশ করিতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত।

তিনটী বা চারটী বড় বড় টুকরা একত্র করিয়া কোন রকম জিনিষ যেমন খড় প্রভৃতি দ্বারা বাঁধার দরকার। অত্যন্ত গ্রীষ্মে স্থানান্তর লইয়া যাইবার সময় মাঝে মাঝে জল সেচনের দরকার; ইহাতে আখ গুলি একেবারে শুকাইয়া যায় না। বাঁধার সময় টুকরাগুলি যেন আলগা না থাকে, তাহাতে ইতস্ততঃ সঞ্চালনে গাইট গুলি নষ্ট হইয়া যায়। খড় দ্বারা মোড়ার পর ইক্ষু গুলি থলিয়ায় বস্তাবন্দী করা উচিত।

——

জল হাওয়া ও ফসল।

সাধারণ অবস্থাঃ—মাঘ মাসের শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ধান কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। এবারে ফসল ভাল হইয়াছে, আশা করা যায়। আলু তোলা, জলদি তৈল বীজ ও দাউল শস্য প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। চাউলের দাম সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাঘের শেষে বৃষ্টি স্থানে স্থানে হইয়াছে, কিন্তু এসময় আরও বৃষ্টি দরকার। যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বাংশে গোধূম, ছোলা ও ইক্ষুর অবস্থা ভাল। আখ্ মাড়া আরম্ভ হইয়াছে ও আগামী বৎসরের আখের জন্য জমি তৈয়ারী হইতেছে। এবার আখ সম্ভবতঃ খুব ভালই হইবে। পঞ্চনদে প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং রবি ফসলের অবস্থা যদিও এখন ভাল তবু বেশী বৃষ্টি হইলে তাহার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। মধ্য প্রদেশে তিসি, গোধূম ও ছোলা উত্তম জন্মিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য প্রযুয্য। আসামে ধান, তুলা ও আখের ফসল ভাল হইয়াছে, কিন্তু সরিষা ও রাই ভাল হয় নাই।

বিহার ও উড়িষ্যাঃ—এই প্রদেশের আগামী ভাদুই ফসল সম্বন্ধীয় শেষ বিবরণীতে দেখা যায় যে অতি বৃষ্টির দরুণ উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে শুধু বপনের সময়ের যে দেরী হইয়াছিল তাহা নহে, ফসলের পুষ্টিরও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছিল। ভুট্টা অনেক জেলাতেই ভাল হয় নাই, বিশেষতঃ পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায়। বন্যায় চাম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে বিশেষ পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে। সমস্ত ভাদুই ফসল ধরিলে গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর উৎপাদনের জমির পরিমাণ ৩৫৪,২২২ একর কমিয়া গিয়া ৮০,৬৪,৮০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ফলনের অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নয়। বালেশ্বর, সম্বলপুর রাঁচি ও সিংভূমে ফসল সাধারণ অপেক্ষাও ভাল, ছয়টি জেলায় সাধারণ অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু সাহাবাদ ও গয়া জেলার অবস্থা খুবই খারাপ। বিঘা প্রতি ৩ মণ করিয়া চাল ধরিলে এবৎসর হৈমন্তিক ধান্যে ২,৩৯, ৩৫, ৯০০ হন্দর চাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক।

ইক্ষু ফসলঃ—সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে বর্ত্তমান বৎসর বঙ্গদেশে ২০,৩০০ একর পরিমিত জমিতে আখ্ চাষ হইয়াছে। এই জমি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩০০ একর কম। ফলনের হার প্রায় শতকরা ৭৯ ভাগ হইবে। ইহাও পূর্ব্ব বৎসর

অপেক্ষা ৩ ভাগ কম। বিঘা প্রতি উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ ৩৬১/২ মণ ধরিলে এবৎসর প্রায় ২১২,৫০০ টন গুড় হইবে। বঙ্গদেশে আখের গুড় ব্যতীত খেজুরের গুড়ও যথেষ্ট পরিমাণ হয়। এই গুড়ের পরিমাণ এবার বোধ হয় ১৩১৯০০ টন হইবে। গত বৎসর অপেক্ষা ইহা ১২,৪০০ টন অধিক। মোটের মাথায় দেখা যাইতেছে এবৎসর গুড় উৎপাদনের পরিমাণ ১৪,৬০০ টন কমিয়া গিয়া ৩৪৪,৪০০ টনে দাঁড়াইবে।

বাঙ্গলায় এই প্রায় ৩১/২ লক্ষ টণ উৎপাদিত গুড়ের সহিত ভারতে আমদানি পরিশুদ্ধ চিনির পরিমান তুলনা করিলে আমাদের শর্করা-সমস্যা সমাধান যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় চিনি আমদানির হিসাব :—

বীট চিনি	২৫০	হন্দর
বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইক্ষু জাত চিনি	৯,২৯৬	"
মরিচ দ্বীপের　ঐ	১৬৪,৭৯৩	"
যব দ্বীপের　ঐ	৩২,৯৫,৪৪২	"
চিটে	১০,৬৩,৫৯৪	"
অন্য প্রকার	৩৯,৯৭৩	"
মোট	৪৫,৭৩,৩৪৮	হন্দর

বলা আবশ্যক যে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসরে ৩১ লক্ষ হন্দর কম চিনি আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও যে পরিমাণ গুড় দেশে উৎপন্ন হয় তাহা দেশের অভাবের পক্ষে অতি সামান্য। সরকারী শর্করা সমিতির চেষ্টায় ফলে শর্করা উৎপাদনের মাত্রা কিছু কিছু বাড়িতেছে বটে কিন্তু এখনও ভারতের অভাব মোচনের মত শর্করা দেশে উৎপাদিত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। অন্য দেশের তুলনায় এতদ্দেশে চিনি প্রস্তুত গৌণ কায বলিয়াই বিবেচিত হয়। জগতের যে সমুদয় প্রধান প্রধান ইক্ষু চাষের কেন্দ্র হইতে কলিকাতা বন্দরে লক্ষাধিক হন্দর চিনি আসে তাহাদের নাম :—যবদ্বীপের সোরবায়, সেমারাং ও প্রোবোলিঙ্গ ; মরীচ দ্বীপের চিরিবোঁও পেসারোকাঁ এবং তেগাল। এ সমুদয় স্থানে কি আখের ফসল বাড়াইবার জন্য ও কি শর্করা প্রস্তুতের উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বহুদিন হইতে রীতিমত চেষ্টা চলিতেছে।

পাঞ্জাবের তুলা ফসল :—ভারতের তুলার মধ্যে পঞ্চনদের খাল-উপনিবেশ সমূহে যে তুলা উৎপাদিত হয় তাহা অন্যতম। ১৯২২ সালের বিবরণীতে দেখা যায় যে উক্ত স্থানে প্রধানতঃ দুই জাতীয় তুলা উৎপাদিত হয়—'মার্কিণ' ও

'দেশী'। নিম্ন চেনাব উপনিবেশে 'মার্কিণ' তুলার চাষ কমিয়া যাইতেছে এবং 'দেশী' তুলা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে গত ২।৩ বৎসর মার্কিণ তুলার ফলন তেমন ভাল হয় নাই। দেশী তুলার ফলন প্রায় সমানই আছে। মার্কিণ তুলার চাষ প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া গেলেও মোট চাষের জমির পরিমাণ দেশীর জমি অপেক্ষা অধিক :—যথা মার্কিণ ১১৮,৩১১ একর ও দেশী ৯২,৭৪৭ একর। মার্কিণ তুলার '৪ এফ' নামিত উপজাতি হইতে উৎকৃষ্ট তুলা পাওয়া যায়। ইহার চাষের প্রসার এখনও অধিক হয় নাই। নিম্ন দোয়াব উপনিবেশেও অবস্থা প্রায় এইরূপ। এখানেও মার্কিণ তুলার চাষ শতকরা ১২½ কমিয়া গিয়াছে ও দেশী তুলা সেই হিসাবে বাড়িয়াছে। চাষের জমির পরিমাণ :—মার্কিণ ১৬২,০২৭; দেশী ৩৪,৫৬২ একর। মার্কিণ তুলার জমির মধ্যে ৯০০০ একরে '২৮৫এফ' ও অবশিষ্টাংশে '৪এফ' উপজাতীয় ফসল জন্মিয়াছে। প্রথমোক্ত উপজাতির কাটতি খুব এবং ইহার চাষ শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। কেবল বীজের অভাবের জন্যই বাড়িতে পারিতেছে না। পঞ্চনদে কার্পাসের সহিত অপর ফসলও উৎপাদিত হয়। এইরূপ মিশ্র ফসল উৎপাদন প্রথা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় অনুসৃত হইতেছে। যন্ত্রাদির মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় প্রস্তুত। কার্পাস চাষে খাল উপনিবেশের অনেক চাষিই যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজন বিদিত। ভবিষ্যতে ইহাঁরা অধিকতর লাভের আশা করেন।

তুলার চাষ: ১০ ২২-২৩-সালের নিখিল ভারতের তুলা ফসল সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে মোট ২১১, ১৯,০০০ একার জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ইহা শতকরা ১৪ ভাগ অধিক। প্রায় ৪ মন ৩৫সেরএ একগাঁট তুলা হয়। অনুমান করা হইয়াছে যে ৫১,৯৬,০০০ গাঁট তুলা উৎপাদিত হইবে। ইহাও পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা শতকরা ১৬ ভাগ অধিক। কিন্তু যে পরিমান তুলা ১৯২১-২২ সালে কলে ও অন্যান্য স্থলে ব্যবহৃত ও রপ্তানি হইয়াছিল, অর্থাৎ ৫৯, ৭২,০০০ গাঁট, তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় এবার উৎপাদনের মাত্রা শতকরা ১৩ ভাগ কম হইবে।

বঙ্গদেশে অতি সামান্য পরিমাণেই তুলা উৎপাদিত হয়। এই সম্বন্ধে প্রকাশিত শেষ সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে সমস্ত ভারতের তুলাচাষের জমির অনুপাতে বাংলার তুলার জমি মোটে শতাংশের ০'২ অংশ। সাধারণতঃ জলদী ও নাবি, দু রকম তুলাচাষ হয়। মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও ত্রিপুরায় জলদী শ্রেণীরও বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে জলদী ও নাবি উভয়েরই চলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে জলাভাবে জলদী তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু পরে অনেকটা সুবিধা হয়। ত্রিপুরায় আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফুলের সময় জল হইয়া ফসল অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নাবী

তুলাও অতিবৃষ্টির জন্য বৃদ্ধিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভাল জন্মায় নাই। মোটের মাথায় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা তুলার জমি কিছু বেশী—জলদী ৭০,২৯৮ ও নাবি ১৫০০ একার। ফসলও জলদী তুলায় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিক হইবে, অর্থাৎ ১৭,০৩৬ গাঁট। কিন্তু নাবী তুলায় ফসল কম হইবে অনুমান করিয়া ৪৫০ গাঁট বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি জেলা ব্যতীত অন্য জেলাতেও তুলা চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু জমির পরিমাণ ৮০০ বিঘার অধিক হইবেনা। তুলা উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশই বাংলায় সর্ব্বপ্রধান; ৫০০০০ একার এই জেলাতেই অবস্থিত। তৎপরে জমির আধিক্য অনুসারে যথাক্রমে ত্রিপুরা, মৈমনসিংহ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর।

বর্ত্তমান ধানের ফসল ঃ—১৯২২-২৩ সালের আমন ধানের (শীতকালের) সরকারী বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এবৎসর শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ফসল হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় পুরা ফসল হইয়াছিল। সকল জেলাতেই ধান কাটার কায শেষ হইয়া গিয়াছে। এবারে মোট ধান্যের জমির পরিমান ১৬২,০৯, ৯০০ একার; পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কিছু বেশী। ফসল হিসাবে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ত্রিপুরায় সাধারণ অপেক্ষাও বেশী হইয়াছে। ৮টি জেলায় ফসল সাধারণের মত, ৭টি জেলায় তদপেক্ষা কিছু কম। বাকি ছয়টি জেলায় ধান তেমন ভাল জন্মায় নাই। কিন্তু রাজসাহী ও ফরিদপুরে অবস্থা খারাপ, সচরাচর যাহা হয় তাহার অর্দ্ধেকের কিছু উপর হইয়াছে। একার প্রতি ১২½ মণ ধরিয়া এবার মোট ৭২,৯৪, ৫০০ টন চাউল বঙ্গদেশে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে আমনধানের জমি সমস্ত ভারতের ধানজমির অনুপাতে ১৯·৭ অংশ।

—–—

দু'চার কথা।

এ পোড়া দেশের মুখে ছাই।
আসল কাজে কেহই নাই॥

হক্ কথা যদি বলি তা' হলেই দলাদলি,
বল্ মা তারা কোথা দাঁড়াই।

বাজে কাজে গলাবাজি হিঁদুর পরবে কাজি,
ধরে চেপে রাজার দোহাই।

জল বিনা নাহি ধান কোথায় বা ডাকে বান
দেখে শুনে প্রাণ আই ঢাই।

দেশ শুদ্ধ পাপে ভরা টলমল্ বসুন্ধরা,
না হলে কেন ফসল নাই।

সবে চায় দিতে ফাঁকি ও দিকে ডুবলো চাকি,
সে দিকে কাহার লক্ষ্য নাই।

বাপে দেয় ছেলে ফাঁকি ভাই দেয় ভায়ে ফাঁকি
মনে করে চালাক সবাই।

চাল বল ডাল বল আটা বল দুধ বল
তেল ঘিয়ের ত কথা নাই।

কারো কি নাই ধরম বল্‌তে লাগে সরম,
ভ্যাজাল ছাড়া জিনিষ নাই।

হতেছে আইন যত বাড়ছে ভ্যাজাল তত
মরি নিয়ে দেশের বালাই।

নূতন রোগের সৃষ্টি নাই কারো তাতে দৃষ্টি,
কেমনে বল প্রাণ বাঁচাই।

হাকিম ডাক্তার যারা হার মেনে যায় তারা,
চেষ্টা বই আর গতি নাই।

রোগ ধর্‌তে না পারে হার্ট ফেল অম্নি বলে,
পেঁতের না মেলে দাওয়াই।

পড়েছে এম্নি আকাল মা বাপে বেচে ছাবাল
শুনে আহা প্রাণে মরে যাই।

নিজ হাতে কর চাষ　　　কর ঘর কেটে বাঁশ
　　খর জ্বাল তাতে লাজ না'ই।
ছাড় যদি এ সুযোগ　　　কপালে অনেক ভোগ,
　　দেবে দোষে অদৃষ্ট দোহাই।
ব্যবসার ধার ধারনা　　　নক্‌রির গুমরে বাঁচনা,
　　সাধে কিহে বলি মুখে ছাই।
ধার ক'রে সাজ বাবু　　জোটেনা ভাত দুবেলা তবু,
　　এতেই দেখে কে বড়াই।
মনিবের ভাল বাসা　　　মোল্লার মুরগি পোষা
　　চুণ খস্‌লেই গুড়্‌ বাই।
যদি এ দু'চার কথায় চোখ্‌ না কা'রো ফোটে, হায়
　　তা হলে বুঝবো আশা নাই।

শ্রীযোগেন্দ্র লাল বসু।

সরকারী কৃষি।

বঙ্গের কৃষিবিভাগের ১৯২১-২২ সালের কার্য্য-বিবরণীর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

উচ্চতম-কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ৬ জন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে, যথা :—চুচূঁড়া ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ, দার্জ্জিলিং জেলার অধ্যক্ষ এবং তত্ত্ববিশেষজ্ঞ, রসায়ণ তত্ত্ববিৎ ও ব্যবহারিকউদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ প্রত্যেকের একজন হেড্ অ্যাসিটাণ্ট। মিঃ পি, সি, চৌধুরী ভারতীয় কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ এন, গুপ্তকে বিশেষ ভাবে কৃষিশিক্ষা বিষয়ক কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছে।

সবরের কৃষিকলেজ শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। অতঃপর বাঙ্গালীকে উচ্চ কৃষিশিক্ষার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, কারণ বঙ্গে কৃষিকলেজ নাই। এবৎসর ১২ জন বাঙ্গালী সবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ঢাকায় উচ্চ কৃষি-শিক্ষার জন্য যে Agricultural Institute স্থাপিত হওয়ার কথা হইতেছিল অর্থাভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ঢাকা ও চুঁচুড়ায় যে দুইটি বাঙ্গলা কৃষিস্কুল আছে তাহার কার্য্য মন্দ চলিতেছেনা। এই দুইটি অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে পরিণত হইবে ও তাহাতে প্রধান শিক্ষার বিষয় হইবে :—(১) নিজের জমির চাষ আবাদ ; (২) কৃষিবিভাগে কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শকের কাজ করা ও (৩) প্রস্তাবিত প্রাথমিক স্কুল সমূহের শিক্ষকতা। এতদ্দেশের উপযুক্ত কৃষিশিক্ষা বিষয়ে অনেক আলোচনার পর কৃষিসচিব স্থির করিয়াছেন যে প্রাদেশিক কৃষিশিক্ষাগার সমূহ উচ্চ, ও মধ্যম ও প্রাথমিক এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে একটি করিয়া প্রাথমিক স্কুলও রাজসাহী ও রঙ্গপুরে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা সত্বেও অর্থাভাবে সরকার কিছুই করিতে পারেন নাই।

কৃষিগবেষণা বিষয়ে কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। কাকিয়া বোম্বাই পাটের ন্যায় R 85 ও D 154 নামক দুইটি নবজাতিও উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে। বেড়েলা ও মুর্গা তন্তু সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। কচুরী পানা নিরাকরণ সম্বন্ধে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। প্রসিদ্ধ আমনধান, ইন্দ্রসালের সমকক্ষ আর তিনটি জাতি পাওয়া গিয়াছে। চুঁচড়াতে দেখা গিয়াছে যে 'দুধসার' ধান নাগরা অপেক্ষা শতকরা ১৪গুণ অধিক ফলে। ইহা 'ইন্দ্রশাল অপেক্ষা আগে পাকে এবং বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযুক্ত হইবে। তুলা উৎপাদন সম্বন্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে কতিপয় পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু এখনও শেষ

হয় নাই। বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ইভান্স এ সম্বন্ধে একটি আবশ্যকীয় পুস্তিকা লিখিয়াছেন। এসম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং সরকারী ২য় ব্যবহারিক উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ কোন্ কোন্ জেলায় তুলা জন্মিতে পারে তাহার তদন্ত করিতেছেন। চুঁচড়া, ঢাকা ও মৈমনসিংহে কয়েক জাতীয় তুলা পরীক্ষার জন্য উৎপাদিত হইতেছে।

ভারতীয় শর্করা সমিতির মতে বাঙ্গলায় আপাততঃ ইক্ষুচাষের পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার আশা খুবই কম। কিন্তু বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে জল হাওয়ার হিসাবে ভবিষ্যতে এরূপ বৃদ্ধি হওয়ার কতকটা সম্ভাবনা আছে। খেজুর তাল প্রভৃতির গুড় সম্বন্ধে যে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অনেকদিন বন্ধ আছে। আবার ইহা আরম্ভ হওয়ার কথা হইতেছে।

প্রত্যেক জেলাতেই একটি করিয়া কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন সরকারের উদ্দেশ্য হইলেও ভাণ্ডারে ধনাভাব প্রযুক্ত তাহা হইতে পারিতেছেনা। উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের চেষ্টার সহিত কয়েকটি বেসরকারী বীজ ক্ষেত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রেরই বীজ যে উত্তম তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ খারাপ বীজ সরবরাহে অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকি যে ৩২টি ক্ষেত্র জমিদারগণ অথবা সমবায় সমিতি সমূহ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের বীজ মন্দ নয়। বিভাগের ইন্দ্রসাল ও কটকতারা ধান, কাকিয়া বোম্বাই পাট ও হলুদে টাণা আকের বীজের এত ঘাটতি যে সমস্ত স্থানে যোগাইয়া উঠিতে পারা যায় নাই।

কৃষিবোর্ডের এবার সংস্কার হইয়াছে। অনেক বেসরকারী সভ্য হইয়াছেন। কৃষি সমবায় সমিতিগুলির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে সমবায় প্রথায় জলসেচনের চেষ্টা চলিতেছে ও এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য সরকার একজন ইঞ্জিনিয়ারকে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রঙ্গপুর গোশালায় গাভীর উন্নতি সাধনকল্পে যে চেষ্টা অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে অনেক উন্নত গাভী প্রজনন সম্ভবপর। পূর্ব্বে গড়পড়তায় ৩০০ দিনে গাভী প্রতি মোটে ৫০০ পাঃ দুধ হইতে তিন বৎসর ক্রমোন্নত প্রজননের ফলে রঙ্গপুর গোশালায় উৎকৃষ্ট গাভীগুলির দুগ্ধের মাত্রা ৩০০০ পাঃ এ দাঁড়াইয়াছে। উচ্চবংশীয় ষাঁড় দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে সহজে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার কল্পনা হইতেছে। যতই উচ্চবংশীয় হউক, উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে গাভী অধিক মাত্রায় দুধ দিতে পারিবেনা—ইহা বুঝিয়া পশুখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্ট মনযোগ দিয়াছেন।

রেসম চাষের কেন্দ্রগুলি অতঃপর ব্যবসায়ের হিসাবে না রাখিয়া যাহাতে সেগুলিকে লোকে রেসম কীট প্রজনন ও পালন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

ভেপু—মেদিনীপুর জেলায় ধান গাছের "ভেপু" রোগের বিষয় সম্বন্ধে সাধারণকে সতর্ক করিয়া সরকারী কীট তত্ত্ববিৎ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

বাদামী রঙের একরকম মাছির মত পোকা ধানগাছে সচরাচর এই রোগ আমদানী করিয়া থাকে। পোকাগুলি দেখিতে অনেকটা মশার মত। ইহারা ধানগাছে আশ্রয় লইলে গাছের কাণ্ডের স্থলে একটি লম্বা ফাঁপা নল বাহির হয় এবং পুষ্পোদ্গম অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ফাঁপা নলটি কাণ্ডের জায়গায় দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে পোকাগুলি যাহা অনিষ্ট করিবার তাহা শেষ করিয়াছে এবং নলের মধ্যে ডিম পাড়িতে সুরু করিয়াছে। সাধারণতঃ কাণ্ডের মাথার দিকে একটা ফুটো করিয়া পোকাটা বাহির হইয়া পড়ে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যখন ধানের চারাগুলি কচি থাকে তখনই প্রায় এই পোকাদের উপদ্রব বাড়ে। চারাগুলি বাড়িয়া শক্ত হইয়া গেলে এ পোকার দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘুচিয়া যায়। এই পোকাগুলির জীবন ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ বোঝা যায় নাই। ইহারা কখন যে ডিম পাড়ে এবং কেমন করিয়াই বা কাণ্ডের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে তাহা সঠিক জানা যায় নাই ইহাদের আক্রমণ নিবারণের উপায় নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। কেন না অনিষ্ট ধরা না পড়িলে ইহারা গাছের মধ্যে ঢুকিয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার অবসর থাকে না। তবে যে স্থলে এরূপ আক্রমণ লক্ষ্য করা হয় সেখানে আবাদের প্রথমাবস্থাতেই রোপণ কার্য্য শেষ করা বিধেয়। যাহাতে চারাগুলি ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই একটু বড় হইয়া উঠিতে পারে এবং যাহাতে পোকাগুলি কচি গাছ পাইয়া তাহাদের মধ্যে ডিম পাড়িবার অবকাশ না পায় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সার সংগ্রহ।

বিলাতে ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধি ঃ—কয়েক বৎসর হইতে লণ্ডনে Indfan Trade Commissioner আখ্যায় ভারতগবর্ণমেণ্টের একটি বিশেষ কর্ম্মচারীর আফিস্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার ১৯২১—২২ সালের কার্য্য বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের গোচরার্থ এই বিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। স্থূলতঃ উক বিভাগের কার্য্য নিম্নরূপঃ—(১) ভারতজাত দ্রব্যাদি বিষয়ক ব্যবহারিক তথ্য সংগ্রহ করা; (২) ভারত হইতে যাঁহারা মাল রপ্তানি করেন ও বিলাতে যাঁহারা ভারতীয় মাল আমদানি করেন তাঁহাদিগের নাম ধাম সংগ্রহ ও প্রকাশ; (৩) যে সমুদয় শ্রম-শিল্প-অনুরাগী ভারতবাসী বিলাতে যান তাহাদিগকে উপযুক্ত বণিক দিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া; (৪) যে সমস্ত ব্যবসায়ী ভারতে কোন কলকারখানা খুলিতে চান তাঁহাদিগকে ভারতে কি পরিমাণে তাঁহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে সে বিষয়ে খবর দেওয়া; (৫) যে সমস্ত নূতন প্রণালী ভারতে কাজে লাগিতে পারে সে গুলি সম্বন্ধে ভারতবাসীকে খবর দেওয়া; (৬) কোন দ্রব্য সম্বন্ধে ব্যবসায়ী গণের মত সংগ্রহ ও প্রেরণ; (৭) যে সমস্ত আইন কানুন দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষতি হওয়া সম্ভব তৎসম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা; (৮) ভারতের শিল্প বিভাগ সমূহ দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন ও বিশেষ বিষয়াদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা; (৯) ভারতীয় বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যবসায়ীগণকে আবশ্যকীয় খবরাদি দিয়া সাহায্য করা।

বলা বাহুল্য যে উক্ত বিভাগের ভারতের Director General of Commercial Intelligence এর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বৎসরে সাত হাজারের উপর চিঠি সাধারণের সহিত আদান প্রদান হয়। সংগৃহীত তথ্যাদিও আবশ্যকমত ছাপাইয়া প্রকাশিত হয়। অন্যান্য দ্রব্যাদি অপেক্ষা খনিজ দ্রব্য উক্ত বিভাগের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজাত পদার্থের মধ্যে যেগুলি সম্বন্ধে বিলাতে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম বিভাগ কর্ত্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি অন্যতমঃ—ম্যাঙ্গানিজ, টিন, সোহাগা, অভ্র, শিসা, দস্তা, অ্যাসবেষ্টস, খনিজ রং, কাঁচ-তৈয়ারীর মসলা ও পটাশ লবণ সমূহ।

এতদ্দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় সম্বন্ধেও উক্ত বিভাগ যথেষ্ট সাহায্য

করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্চনদের কাঠ, ধাতু ও তন্ত শিল্পের অল্প বিস্তর দ্রব্য বিগত দুই বৎসর বিক্রয় হইয়াছে। সরকারী গোধুম, এবং চামড়া বিক্রয়েও Trade Commissioner ব্যাপৃত ছিলেন। আগামী ১৯২৪ সালের মহাপ্রদর্শনীতে বিভাগের কাজ অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের স্বার্থের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলে এই বিভাগ দ্বারা এতদ্দেশীয় বাণিজ্যের যে অনেক উপকার হইতে পারে, তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ, বোম্বাইবাসী মিঃ দালাল এখন High Commissioner হইলেন। আশা করা যায় যে তাঁহার পরিদর্শনে Trade Commissionerএর আফিস আরও কার্য্যকর হইয়া উঠিবে।

বস্ত্রাভাব ও তুলাজাত দ্রব্যোৎপাদন—ভারতের ৫৩১২টি বড় বড় কল কারখানার মধ্যে ১৯৪০টি অর্থাৎ শতকরা ৩৭ ভাগ তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত। কাপড়ের কল মোটে ২৮২; তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ১২টি কল বঙ্গদেশে অবস্থিত। তারপর সবগুলি কলে যে বস্ত্র হয় তাহা নহে। কতকগুলিতে সূতা, কতকগুলিতে বস্ত্র ও অবশিষ্ট কলে সূতা ও বস্ত্র উভয়ই প্রস্তুত হয়।

ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে ১১৬২,০১০,০০০ গজ পরিধেয় বস্ত্র বিদেশ হইতে আসিতেছে। আর ৩০, ৭৪০,০০০ পাউণ্ড সূক্ষ্ম সূতাও আসিতেছে। তাহাতে ১৮৪ ৪৪০,০০ গজ কাপড় তৈয়ারী হয়। সুতরাং এই হিসাবে ভারতবর্ষে মোট ১৩২৬, ৪৫০,০০০ গজ পরিধেয় বস্ত্র বিদেশ হইতে আসিতেছে। অন্যদিকে ভারতে প্রস্তুত ১৭৬, ৭৮০,০০০ গজ কাপড় বিদেশে চলিয়া যায়, এবং ১০২, ১৫০,০০০ পাউণ্ড সূতাও বিদেশে রপ্তানি হয়; তাহাতে ৪০৮,৬০০,০০০ গজ কাপড় হইতে পারে। এই কাপড় যদি ভারতের ব্যবহার জন্যই রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে আরও ৫৮৫, ৩৮০,০০০ গজ কাপড় অতিরিক্ত পাওয়া যায়। তাহা হইলে ভারতবর্ষের মোট অভাব থাকিয়া যায়:—১৩২৬, ৪৫০,০০০—৫৮৫, ৩৮০,০০০=৭৪১,০৭০,০০০ গজ কাপড়ের। তাহাতে মোটামোটী ১৮৫,২৭০,০০০ পাউণ্ড সূতার আবশ্যক। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে মোটামোটী হিসাবে আরও ৮০—১০০ কল আবশ্যক; তাহাতে বর্ত্তমানকালে ৬—২০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইতে পারে।

আধুনিকতম হিসাব হইতে দেখা যায় যে গতবৎসর এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর, নয় মাসে, ৪৪৩৯ লক্ষ টাকার তুলাজাত দ্রব্য ভারতীয় কলগুলিতে প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইহা ১৫৯ লক্ষ টাকা কম। পক্ষান্তরে উক্ত সময়ে বিদেশ হইতে ৪৪৬৯ লক্ষ টাকার বস্ত্রাদি আসিয়াছে। ১৯২১ সালে ঐ সময়ে মোটে ৩৪১৪ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদনের উপর কলওয়ালাগণকে যে শুল্ক দিতে হয় তাহার পরিমান পূর্ব্বোক্ত নয়মাসে ১৪৩ লক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৭ লক্ষ টাকা কম হইয়াছিল।

ব্যয় সংক্ষেপ কমিটি ও কৃষিবিভাগ :—কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির অনুমোদন নিম্নরূপ :—বিভাগের প্রধান কার্য্য,—মৌলিক গবেষণা, পরীক্ষা, কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শন ও প্রচার। বিশ্ববিদ্যালয়েও মৌলিক গবেষণা হইয়া থাকে ; তাহার সহিত কৃষিবিষয়ক গবেষণা যোগ করিয়া দিলে উত্তম ফল হইতে পারে। ঢাকা ও চুঁচুড়া লইয়া এই প্রদেশে ১২টি বড় কৃষিক্ষেত্র আছে। এতদ্ভিন্ন রঙ্গপুরে গো প্রজনন ও তামাকু ক্ষেত্র ও দুইটি বেসরকারী প্রদর্শন ক্ষেত্র আছে। ৫টির পরিবর্ত্তে ৩টি ডেপুটি ডাইরেক্টার থাকিলেই ইহাদের কার্য্য চলিতে পারে। ঢাকা ও চুঁচড়ায় এক একজন ক্ষেত্রাধ্যক্ষ রাখা অনাবশ্যক। কোন ক্ষেত্রে কৃষক শিক্ষা-নবিশ সমেত ৫ জনের অধিক কৃষিপ্রদর্শক রাখা অপ্রয়োজনীয়। এইরূপে ৬০জন প্রদর্শক রাখিলেই যথেষ্ট। বাকি যে ১৩৭জন ভ্রমণশীল প্রদর্শক আছেন তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কাজ হয় বলিয়া বোধ হয় না। কৃষি প্রচার কার্য্যে কৃষিবিভাগ অন্যান্য বিভাগের সহিত, বিশেষতঃ সমবায় বিভাগ, যোগদান করিলে ভাল হয়। কৃষিবিভাগের কার্য্য ক্ষেত্রেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে অধ্যক্ষ ও জেলা কর্ম্মচারীগণের পদ রহিত হওয়াও উচিত। পরীক্ষা ক্ষেত্র সমূহের contingent খরচ এখন ১,৮৫,০০০৲ ; সে স্থলে ১, ৫০,০০০ টাকা হইলেই চলিতে পারে। অস্থায়ী কর্ম্মচারীর জন্য আপাততঃ ৩৫০০০৲ টাকা দেওয়া হয়। তাহা অনাবশ্যক। বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় একটি ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র এখন আছে। যদি তাহা স্বাবলম্বী না হইতে পারে তবে উঠাইয়া দেওয়া ভাল। যে সমুদয় বাঙ্গলা সংবাদপত্র আছে তদ্দারাই কৃষি প্রচার কার্য্য চলিতে পারে। কৃষি, সমবায় ও ক্ষুদ্রশিল্প এই তিনটি বিভাগ একত্র করিয়া একজন কর্ত্তার অধিনে রাখা দরকার। এইরূপভাবে নিয়োযিত কর্ত্তার সাক্ষাৎ ভাবে সচিবের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহা হইলে ডাইরেক্টারের আর আবশ্যক নাই। কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান মৎস-বিভাগ দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। কমিটি সেজন্য অনুমোদন করেন যে উহা উঠাইয়া দেওয়া হউক।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন :—

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের পরিবর্ত্তনের জন্য আইনের পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। যথা—(১) বর্গাদার প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ; ৫ ধারা (এ) ; (২) প্রজা মালীকের সম্মতি ব্যতীত জোত হস্তান্তরিত করিতে পারিবে ; ২৮ ধারা (৩) কোর্ফা প্রজা জোতস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ; ২৮ ধারা। (৪) আধি বর্গাদার এবং শস্তকারী প্রজা ফসলের পরিবর্ত্তে খাজনা প্রদান করিতে পারিবে। ২৫ ধারা ; (৫) প্রজার পুকুর খনন করিবার অধিকার থাকিবে। ৪৮ ধারা ; (৬) প্রজা গাছ কাটিতে পারিবে। ২১ ধারা ; (৭) একাধিক ব্যক্তি সরিক (Co-sharer) হইলে সকলের

মধ্যে একজন এজেণ্ট বা গোমস্তা রাখিতে হইবে। (৯৩ ধারা) (৮) প্রজার ফসল ক্রোক করিবার প্রথা থাকিবে না। (৮৮ ধারা)।

ভাগচাষী ও চকদার। বঙ্গদেশের জমিদার ও প্রজা স্বত্ব নির্দ্ধারণ জন্য খাজনা আইনের বিধান ১৮৫৯ সালে প্রকৃত মূল উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরে ১৮৮৫ সালের আইন জমিদারের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নামে প্রস্তুত হয়। ফলতঃ জমিদারগণ যে সমস্ত বাজে বাব প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিতেন তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং জমিদারদিগকে খাজনা আদায়ের রীতিমত সেরেস্তা ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য বাধ্য করা হয়। ১৯০৭ সালের সংশোধিত খাজনা আইনে জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী middle man অধিকারচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টায় জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। গত জরিপের সময় চকদার ও ভাগচাষীর মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেশের কত পয়সা যে আইন আদালতে ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহার কেহ কি হিসাব রাখেন ? ব্যাবস্থাপক-সভার মনগড়া আইন করিলে হাইকোর্ট তাহা শুনিবে কেন ? এতদঞ্চলে চকদার ও প্রজার status লইয়া যে সমস্ত মামলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার দুই একটী বাদে বাকীগুলি চকদারের স্বপক্ষে হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। চকদার ও প্রজা উভয়েই সর্ব্বস্বান্ত ; কিন্তু প্রজাপক্ষ একবারেই জাহান্নমের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়াছে ; চকদারগণের প্রাণটী আছে মাত্র। যাহারা চকদারগণের ভাগচাষী তাহাদের নিজস্ব বলিতে কিছুই নাই। চকদারের জমি চাষ করিলে স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের ভরণপোষণ হয়। ভাগচাষীগণ কি লইয়া জমি চাষ করিবে তাহারও ভাবনা চকদারগণকে ভাবিতে হয়। কিন্তু এই খানে চকদারগণের ব্যবসাদারী বুদ্ধি অনেক স্থলে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায় ; প্রজাও চকদারের নিকট ধান্য বাএড় লইয়া সুদেমূলে পরিশোধ করিতে না পারিলে চকদারের ভাগচাষী হওয়া তাহাদের বিড়ম্বনা মাত্র। চকদার সুদেমূলে প্রজার পাওয়া ধান্যের মধ্যে সমস্ত চাষের খাজ একরূপ আদায় করিয়া লন। কাজেই প্রজা আর কিছুই পায় না। এ দোষ কাহার— প্রজার না ভাগচাষীর ? আমরা বলি উভয়ের। প্রজাকে বাঁচাইতে হইলে চকদারের যে সহৃদয়তা ও সহানুভূতি আবশ্যক তাহা প্রায় তাহাদের সকলের থাকে না এবং প্রজাগণ মিতব্যয়িতার সহিত তাহাদের সংসার চালাইলে তাহাদিগকেও এত বেশী সুদে ধান্য বাএড় লইতে হয় না। জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে middle man হইয়াছে—এই চকদার। সুন্দরবন অঞ্চলের ন্যায় এদেশও এক সময় ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পূর্ণ জঙ্গলময় ছিল। চকদারগণ কম সেলামী ও খাজনায় জমিদারগণের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া নিজ খরচায় জঙ্গল কাটাই, বাদবন্দী, পুস্করিণী খোদাই করতঃ জমি আবাদ যোগ্য করিলে ভাগচাষীগণের আবির্ভাব হয়। জমির এই অবস্থা পরিবর্ত্তনে চকদারের যে কষ্ট অর্থ, কত জীবন ব্যয়িত হয় আইনকর্ত্তাগণ

তাহা একবার আলোচনা করেন কি? চকদারগণের উক্ত প্রকার সাহায্য না পাইলে জমিদারের জমি আবাদ হইত কিনা সন্দেহ। সুন্দরবন অঞ্চলের জমি কিছুদিন গবর্ণমেন্ট লাটদারগণের সহিত বন্দোবস্ত বন্ধ করিয়া সাক্ষাৎ প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণীতলা বা ফ্রেজারগঞ্জ নামে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া কতক জঙ্গল পরিষ্কার ও বাঁদবাদী করেন এবং প্রজা বিলি আরম্ভ করেন। কিন্তু ফলে দেখা গেল যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মকানুনে প্রজা আর বন্দোবস্ত লয় না। কাজেই জঙ্গলকাটাই জমি আবার জঙ্গলে পরিণত হইতে আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্ট উপায়ান্তর না পাইয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সহিত লাটদারি স্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই নারায়ণীতলায় গবর্ণমেণ্টের যে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণ একবার দেখিতে পারেন। সেই খরচের তালিকা হইতেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে চকদারগণকে কি প্রভূত ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া জমিগুলি আবাদের উপযোগী করিতে হয়। তাই বলিতেছি বর্ত্তমান খাজনা আইন সংশোধন প্রস্তাবে middle tenure holder উঠাইয়া দিলে চলিবে না। ভাগচাষী কি রাইয়ত প্রজার এমন শক্তি নাই যে তাহারা জমিদারগণের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া আবাদযোগ্য করিতে পারে। জঙ্গলজমি আবাদযোগ্য করিতে হইলে দূরদেশান্তর হইতে কুলিমজুরের সরবরাহ করিতে হইবে ও জঙ্গলময় দেশে তাহাদের বাসোপযোগী খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ও বাসগৃহের নির্ম্মাণ ও কুলীমজুরকে হিংস্রজন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুলিবন্দুক সহ শিক্ষিত শিকারী নিযুক্ত করিতে হইবে। তবেই জঙ্গল কাটাইর কার্য্য চলিবে। এই সমস্ত কাজ কি ভাগচাষী, কি সামান্য দুই দশ বিঘা জমির রাইয়ত সম্পন্ন করিতে পারে? যাহাদিগকে চাষের সময় জমি আবাদ করিতে গিয়া পেট খোরাকীর জন্য ধান্য কি টাকা কর্জ্জ করিতে হয় তাহাদের দ্বারা এইরূপ বিরাট ব্যাপার কি কখন সম্ভবপর হয়? ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যগণের মধ্যে অনেক সভ্য জমিদার এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে চকদারগণের কি আবশ্যকতা তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাই বলিতেছি সংশোধন আইনের বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে middle man অধিকার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যেন আলোচনা হয়।

—হিজলী-হিতৈষী।

চা ও আর্সেনিক—বিলাতের চায় মহাজন সভা প্রকাশ করিয়াছে যে চা রং করিতে আর্সেনিক অর্থাৎ সেঁকো বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সর্ব্বনাশ! মহাজনেরা বলিতেছে ঐ রং করা গ্রিন্ চা অন্যান্য চাতে মিলাইয়া উহাকে তেজস্কর করা হইয়াছে। মহাজন সভা চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে বহু চা ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। আর্সেনিক মাত্রায় অল্প হইলেও প্রত্যহ ঐ চা পান করিলে ভয়ানক

পেটের গোলমাল হইবার সম্ভাবনা—চা পায়ীগণ সাবধান। বিলাতে এই চার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে —চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

উদ্ভিদ-অন্বেষণ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের একদল লোক গত ২৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নানা অরণ্যপ্রদেশে নূতন নূতন বৃক্ষ লতাদির সন্ধান করিয়াছেন। এই সন্ধানের ফলে আজ তাঁহারা৫১,০০০ নূতন রকমের তরিতরকারির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ৫১,০০০ আবিষ্কারের মধ্যে ফল মূল, তরিতরকারি,নানা প্রকার শস্য ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। এই সমস্ত অরণ্যচারিরা পরের দেশ হইতে এই সমস্ত নূতন খাদ্য তরুলতা আবিষ্কার করিয়া নিজের দেশে চালান করিয়াছেন—দেশের সম্পদ্ বাড়াইয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক বছর দু-এক রকম নূতন শস্য বা ফল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের খাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। রুষিয়াতে এক-প্রকার গম হয়। ১৯২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ নিজের দেশে তাহার চাষ করিতে আরম্ভ করেন। এখন প্রায় দশ কোটি টাকার এই গম উৎপন্ন হইতেছে। আমেরিকাতে ইজিপ্টের তুলার চাষ হইতেছে, তাহার দাম বছরে অন্ততঃ দুই কোটি টাকা। জাপানী চাল এবং সুডানী ঘাস হইতেও যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা বছরে প্রায় আট কোটি টাকা পাইয়া থাকে।

এই-সমস্ত তরুলতা শিকারীরা এমন সমস্ত ভীষণ জঙ্গলে একলা ভ্রমণ করেন, যে, আমরা তাহার কল্পনাও করিতে পারি না। আফ্রিকার যে-সমস্ত জঙ্গলে গত দুইহাজার বছরে কখনো সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে নাই, বাঘ ভালুক সিংহ ইত্যাদি জন্তুরা মানুষের জন্য দিবানিশি ওত পাতিয়া আছে, সেই-সমস্ত স্থানেও যুক্তরাষ্ট্রের এই-সমস্ত বীরগণ দেশের কল্যাণকে জীবনব্রত করিয়া প্রবেশ করেন। যদি প্রাণ যায়, তবে দেশের কাজেই প্রাণ যাইবে, এই তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ভীষণ জ্বরবীজে পূর্ণ জলাভূমিতে তাঁহারা ভ্রমণ করেন, যেখানে মানুষের বাঁচিবার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা এক; সেখানে মশার দলকে বর্ষাকালের আকাশে ঘন কালো মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। এই-সমস্ত স্থানে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এত কষ্ট সহ্য করিয়া যদি তাঁহারা মানুষের খাওয়া চলে, এমন একটা নূতন কিছু ফল, শাক শস্য, আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাহাতে দেশের কিঞ্চিৎ সম্পদ্ বাড়িবে এই আনন্দে সকল শ্রম সার্থক মনে করেন।

সমস্ত বিপদ্ জানিয়া শুনিয়া এই নূতন শিকারীদল আফ্রিকা, চীনা, মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং পৃথিবীর আর-সব জঙ্গলাবৃত স্থানে বছরের পর বছর নির্জ্জন-বাস করিতেছেন। একটা নূতন কিছু পাইলেই তাহা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-পরীক্ষাগারে আসে—সেখানে তাহার দোষ গুণ পরীক্ষা হয়। তাহাতে যদি তাহা খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহার চাষ আরম্ভ হইয়া যায়। বিশেষ বিশেষ জিনিষের চাষ কেমন

জমিতে হইবে, তাহা কি পদ্ধতিতেই বা হইবে, তাহা ঐ বিশেষ বৃক্ষ বা লতার জন্ম-স্থানের আবহাওয়া দেখিয়া স্থির করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর-একটি বিশেষ সুবিধা আছে। ঐ খানের এক প্রদেশের জল মাটি হওয়ার সহিত অন্ত আর এক প্রদেশের কোনই মিল নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে যে-সমস্ত জমি বেকার পড়িয়া-ছিল, সেই-সব জমিতে এখন নানাপ্রকার নূতন নূতন শস্যের আবাদ হইতেছে।

উত্তর প্রদেশের কৃষকেরা এখন বেশীর ভাগ রাশিয়া হইতে আনীত ঐ বিশেষ প্রকারের গমের চাষই করিতেছে। এই গমের নাম ইংরাজিতে durum wheat. এখন সর্ব্ব-সমেত প্রায় কোটি বিঘা জমিতে এই গমের চাষ হইতেছে।

ক্যালিফর্ণিয়াতে এক প্রকার নতন কমলা লেবুর চাষ হইতেছে। এই বিশেষ কমলালেবুর আমদানি ব্রেজিল হইতেই প্রথম হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জানা এবং অজানা অসংখ্য রকমের ফল মূল শস্য ইত্যাদির চাষ আবাদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হইতেছে।

এই কার্য্যে মিঃ বারবোর লাথরপই একরমকম প্রথম ব্রতী হন। তিনি এবং মিঃ ডেভিড্ ফেরাবচাইল্ড প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নানাস্থান-ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার নূতন ফলের গাছ এবং শস্য আমেরিকায় চালান করেন। তাঁহাদের কার্য্যই এক রকম বর্ত্তমান কৃষিবিভাগের এই বিরাট্ কার্য্যের মূল-ভিত্তি স্বরূপ।

ফ্রাঙ্ক এন লেয়ার এই কার্য্য করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ক্রমাগত নয় বৎসর চীন, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্থান, কোরিয়া প্রভৃতি স্থানে একলা নূতন নূতন খাদ্য-প্রদায়ক বৃক্ষের সন্ধান করিয়া বেড়ান। তিনি প্রায় দশ হাজার মাইল পায়ে হাঁটেন। সময় সময় চীনদস্যুদলের আক্রমণ তাঁহাকে একলাই সহ্য করিতে হইয়াছে। এমন কি, এক এক সময় কোন দ্বিতীয় মানুষের মুখ না দেখিয়া তাঁহাকে আট নয় মাস জঙ্গলে বাস করিতে হইয়াছে। তিনি নিজের দেশে হাজার হাজার নতন ফলবৃক্ষ আমদানী করিয়াছেন। এই-সমস্ত ফলের ব্যবসা করিয়া অনেকে লক্ষপতিও হইয়াছে এবং হইতেছে। তিনি হয়ত আরো অনেক কার্য্য করিতে পারি-তেন, কিন্তু দেশে ফিরিবার সময় হঠাৎ জাহাজ ডুবি হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নামে একটি পদক আছে। যে কৃষিসম্পর্কীয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে কৃষিবিভাগ হইতে সে-ই এই পদক পায়।

ডাঃ এইচ্ এল সানট্জ্ আর-একজন বিখ্যাত লোক। তিনি আফ্রিকার প্রায় সমস্ত বন জঙ্গলে একলা ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমনের পরিধি প্রায় ৯০০০ মাইল। তিনি ১৬০০ রকমের আফ্রিকার নানা রকম ফলমূল ইত্যাদি যুক্তরাজ্যে চালান করেন। কেপ কালোনীতে ডাঃ সান্টজ্ ঘোড়া-গোরুর সুখাদ্য এক প্রকার গাছড়া আবিষ্কার করেন। যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিম অঞ্চলে পতিত যে-সমস্ত জমি ছিল তাহাতে এখন ঐ

পঞ্চখাত গাছগাছড়ার আবাদ হইতেছে। পূর্ব্ব আফ্রিকাতে তিনি একপ্রকার লাউ আবিষ্কার করেন, তাহা প্রায় তিন ফুট লম্বা, তাহার মধ্যে যে বিচি থাকে তাহা খাইতে অনেকটা বাদামের মত এবং সুগন্ধযুক্ত। এই বিচি বেশ পুষ্টিকর।

ডাঃ জে এফ্ রক্ ব্রহ্মদেশে চালমুগ্রার সন্ধানে আসেন। চালমুগ্রার তেল কুষ্ঠের মহৌষধ। চালমুগ্রা বৃক্ষ নামে পরিচিত অনেক বৃক্ষ আছে। যথার্থ চালমুগ্রা খুব কম স্থানে পাওয়া যায়। অনেক অনুসন্ধান এবং কষ্টস্বীকারের পর তিনি যথার্থ চালমুগ্রা বৃক্ষের যথেষ্ট পরিমাণে বীজ সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রেরণ করেন। এখন আমেরিকাতে হাওয়াই প্রদেশে চালমুগ্রার আবাদ বেশ চলিতেছে।

নানা দেশ হইতে এই-সমস্ত নূতন নূতন বৃক্ষ লতা ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপরীক্ষাগারে আসিয়া জড়ো হয়। সেখানে তাহাদের দোষ-গুণ বিশেষ যত্ন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল ভাল হইলে পর তাহার চাষ আরম্ভ হয়।—প্রবাসী

মুষিকের অত্যাচার—ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার কারণের অন্ত নাই। সম্প্রতি তাহার দুর্দ্দশার আর-একটি কারণ ধরা পড়িয়াছে। ইন্দুর, ভারতবর্ষের যে ক্ষতিটা করিতেছে 'পাব্লিক্ হেলথ্ কমিশনার' তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে তাহার একটা পরিচয় দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশ—ব্রিটিশ ভারতে এক কালো ইন্দুরের সংখ্যাই নাকি প্রায় ৩৭,৫০,০০,০০০ এবং এই মুষিকদের দ্বারা শস্যের যে অপচয় হইতেছে তাহার পরিমাণ নাকি দশ লক্ষ টন। অর্থাৎ এই মুষিকের অত্যাচারে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ কোটি টাকার শস্য নষ্ট হয়।

কলিকাতার বাজার দর।

বিবিধ শস্য।

সরিসা কাজলা ঝুমকা (নূতন) ...	৭৸০—৮॥০
ঐ সেতি ঐ ...	৯৸০—১০॥০
ছোলা বা বুট, পাটনাই ...	৪৲—৪॥০
ছোলা সহরের ...	৩॥৵০—৩৸৵০
ছোলা দেশী ...	৩।০—৩॥০
মাস কলাই, দেশী ...	৪॥০
মুসুরী কলাই, দেশী ...	৪৲—৪।০
ঐ পাটনাই ...	৪॥০—৫।০
কালী কলাই ...	৪৸০—৫।০
মুগ সোনা নূতন ...	৭॥০—৮৲
মুগ কৃষ্ণ দেশী ...	৫৲
মুগ পশ্চিমে হালি ...	৪৸০—৫৲
মটর গুলি ...	৩॥০
অড়হর দেশী ...	৩৸০—৪।০
ঐ বৈদ্যনাথ (নূতন) ...	৪৸৴০—৫৸০
খেসারী পাটনাই ...	৪।০—৪॥০
ঐ দেশী ...	৪৲
যব পাটনাই ...	৩৵০—৪৸৵০
তিসী বাড়া (শতকরা ৫৲ বাদ) ...	৮।৵—৯৵০
গম জামালপুর (শতকরা ৭॥৹ বাদ) ...	১০৲
ঐ [illegible] (ঐ ঐ) ...	৭॥০—৮৲

পোস্তদানা ঝাড়া (শতকরা ৫৴ খাদ)	...	৯৷৷০—১১৲
তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫৴ খাদ)	...	১২৲
তিল কাট	...	১৩৲
তিল কৃষ্ণ	...	১২৷৷০
মৌড়ী দেশী	...	৬৲০
হরীতকী	...	২৷৷৵০—২৸৵০
মাট বাদাম বা চীনা বাদাম ৬৷০ খোসা ছাড়ান		৯৸৵০
তেঁতুল	...	৫৷০—৮৷০

চাল।

বালাম নূতন	...	৬৸০—৭৶০
ঐ পুরাতন	...	১০৷৷০—১২৵০
কাজলা বা কুলী	...	৫৲—৫৷০
রেঙ্গুন	...	৬৷৷০—৬৸০

ডাল।

অড়হরের ডাল কাণপুর	...	৫৸০—৭৷০
ঐ দেশী	...	৪৷৷০—৫৲
খেসারির ডাল	...	৪৷০—৪৷৷০
ছোলার ডাল	...	৬৲—৬৷০
মুসুর ডাল দেশী	...	৪৸০
ঐ পাটনাই	...	৫৷৷০
মুসুরের ডাল খাড়া	...	৬৷৷০—৭৲—৭৷০
মটরের ডাল ছোট	...	৪৷৵০—৪৸৵০
মুগের ডাল	...	৭৸০—৬৸০—৭৲

কালি কলাইয়ের	...	৬৷৷০—৭৲
মাষকলাই বিউলি	...	৬৷৷০—৭৲
মাষকলাই ডাল দেশী	...	৫৸০
ঐ পাটনাই	...	৭৲

চিনি।

কলে পিষিয়া স্বদেশী পিটী বলিয়া বিক্রী	...	১৩৷৷০—১৫৲
সাদা জাবা	...	১৭৲
পিটি আস্কা	...	১৮৲
জাবা চিনি লাল	...	১৫৷৷০
কাশীপুর কলের ১৷৷ নং হোয়াইট	...	১৭৷০

বেনে মশলা।

ছোট এলাচ রাবিন ১নং	...	৫০—৫৷৷০
ঐ ঐ ২নং	...	৫৲—৫৷০
বড় এলাচ	...	৩০৲—৪৬৲
লবঙ্গ	...	৬০৲—৬৪৲
জয়িত্রী	...	২৸০—৩৷৷০
জায়ফল	...	২৫৲—২৮৲
মরিচ রাবিন	...	২০৷০
লঙ্কা জরদ	...	১১৷৷০—২৫৲
লঙ্কা লাল	...	১৯৲—২০৲
হরিদ্রা	...	১৮৲—৩২৲
ধনে	...	১০৷০—১২৲
সুপারী জাহাজী	...	১৩৷৷০—১৪৲
দেশী সুপারী	...	১৯৷৷০—২১৲
খয়ের ২ নং ২১৲	... ১ নং	৩০৲

শুট ..	৩০৲
জিরা ..	৩৯৲—৪০৲—৪৪৲

মধু ও ময়দা।

মধু			১ নং	২৭৲	২ নং	২৩৲
ময়দা	১ নং	৮।০	২ নং	৭৸৵০	৩ নং	৭৵০
রোলের আটা ১নং বিঃ		৮।০	২নং	৬৲	৩ নং	৫৲
ভুষী						৩।০

তৈল ও ঘৃত।

মুন্নালাল			৭৫৲
পাতিরাম			৮১৲
মটকি বেলিয়া			৮৬৲
ক্যানেস্ত্রা			৭৫৲
শ্রী মার্কা			৮৮৲
নারিকেল তৈল	১ নং	কোচিন	২৪৲
রেড়ির তৈল	৪ নং	অর্ডিনারি	২১॥০
৩ নং ২ নং ২১॥০	১নং		২২॥০
সরিসার তৈল কলের			২১৲—২৫৲
সরিসার তৈল ঘানির			২৮৲
মসিনার তৈল			৩৩৲—৩৪৲
বাদাম তৈল ছিনা			২৫।০
তিল তৈল খাঁটী			৬০৲
কোঁচড়া			১৭৲—২০৲

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ ও মাঘ

সব্জীক্ষেত্র—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যেগুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুণ ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শসা, করলা তরমুজ, প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। গোময়, ছাই ও পাক মাটি আনারসের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থানে অন্ততঃ দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটী গুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পেয়ারা ও কুলের পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত; কুল খুব অধিক ছাঁটিতে হয়; পেয়ারা তত নহে।

কৃষিক্ষেত্র—সম্বৎসরের চাষ মাঘ মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এইমাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি আঙ্গুলি পরিমাণ তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উথলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেত্রে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন অষ্টার, হাটিজ, লর্কস্পুর, পিঙ্ক, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সজী যথা—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ, প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই, মল্লিকা, প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।
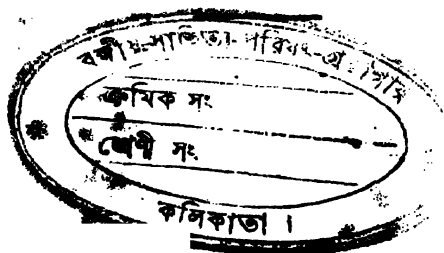
২৩শ খণ্ড { কৃষক—ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল } ১১শ সংখ্যা

ভারতীয় রঞ্জক পদার্থ।

প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থসমূহের উচ্ছেদ কি অবশ্যম্ভাবী?—যখন কুটীরের স্থান কারখানা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, হাতের বদলে কলে কাজ চলিতেছে, স্থায়ী সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সুলভ চাকচিক্য লোকে বিমুগ্ধ হইতেছে, তখন কৃত্রিমের প্রতিদ্বন্দীতায় প্রাকৃতিক রঞ্জক দ্রব্যের চলনের আশা খুবই কম। কিন্তু এখনও দক্ষিণ ইউরোপ, এসিয়া মাইনর, চীন ও ভারতে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান আছে যেখানে কাপড় সেই পুরাতন রং দ্বারাই রঞ্জিত হইয়া থাকে। এবং এখনও কার্পাস রেশম ও পশমী বস্ত্রে এমন কতকগুলি রং এর সূক্ষ্ম ছায়া স্বাভাবিক রংএর দ্বারা দেওয়া হয় যাহা কৃত্রিম রং দিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময়, যখন বিদেশী রং অত্যন্ত দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময় ভারতজাত অপরাপর দ্রব্যের ন্যায়, দেশীয় রঞ্জক দ্রব্যাদিরও পুনঃ প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল এবং অল্প বিস্তর মাত্রায় অনুসন্ধানও চলিয়াছিল। এখনও কোন কোন প্রাদেশিক শিল্পবিভাগের এ বিষয়ে ক্ষীণ চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু লুপ্তপ্রায় শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে যে পরিমাণ সতেজ কার্য্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দরকার তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় দেশীয় রঞ্জক পদার্থের বিষয় যদি আবার বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায় তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

চরকার আন্দোলনের সূত্রপাত না হইলে দেশীয় রং সমূহকে কাজে লাগানর চেষ্টায় বোধ হয় কেহই অনুপ্রাণিত হইত না। যদি দেশে ঘরে ঘরে ন্যূনাধিক মাত্রায়

বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত গৃহজাত বস্ত্র আমাদের সেই চির-পরিচিত রং সমূহ দ্বারা রাঙ্গাইতে পারা যাইবে না কেন? রঙের বাজারে অ্যানিলিণ রং সমুদয় আসার আগে যে পরিমাণ ও যে মূল্যের রং দেশে বিক্রীত ও বিদেশে রপ্তানি হইত, তাহার আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যকীয়। বর্ত্তমান অবস্থানুশীলন তদপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। দেশীয় রঞ্জক শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক দুইটি—যথেষ্ট মাত্রায় রঞ্জক দ্রব্যের অভাব ও রংওয়ালাগুণের বংশগত অভিজ্ঞতার বিলুপ্তি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও ব্যবসায়ের হিসাবে রং-উৎপাদক গাছ সমূহের চাষ ও সংগ্রহ করিয়া প্রথম প্রতিবন্ধকের এখনও প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু যে নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যবিধি দুই চারিটি সামান্য যন্ত্র পাতির সাহায্যে জগতের বিস্ময়োৎপাদক রং-সমূহের সৃষ্টি করিতে পারিত তাহা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। আবার সেই দক্ষতার স্তরে আসিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

বর্ত্তমান সময়ের রঞ্জকেরা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা কার্য্য কুশলতায় অনেক পরিমাণে হীন। তাহা স্বাভাবিক; কারণ তাহারা এখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরই আবশ্যক মত কাজ করে। অনেক মিশ্র রঙের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত সুলভ এক রংই চলিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও বাজারে যে সকল বহুবিধ রং দেখিতে পাওয়া যাইত তাহা এখন আর নাই। যে ২।৪টি আছে তাহাও অতি সামান্য মাত্রায় পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে দেশীয় রঞ্জন শিল্প কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। কিন্তু রঞ্জন শিল্পের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিতে হয় তাহা হইলে এই সামান্য কয়টিকেই কেন্দ্র করিয়া রীতিমত গবেষণার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

প্রাচ্যে পীতের যথেষ্ট আদর। কোন কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারে হলদে কাপড় না হইলেই চলেনা। সেইজন্য অপরাপর রং অপেক্ষা হলদে রঙের সংখ্যা কিছু অধিক। তায়তে ও ব্রহ্মদেশে যে কয়েকটি পীত রঙের এখনও চলন আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম:—

১।	কাঁঠাল কাঠ	৫।	হলুদ
২।	দারু হরিদ্রা কাঠ	৬।	মেদী পাতা
৩।	টুণ কাঠ	৭।	কমলাগুঁড়ি
৪।	জাফ্রান, কেশর	৮।	চাঁপা

৯। সিউলি ফুল।

উল্লিখিত দ্রব্যগুলির মধ্যে চাঁপা ও জাফরানের রঙের দর চিরকালই খুব বেশী এবং এই দুইটি কেবলমাত্র বিশেষ প্রকারের বস্ত্রের জন্যই ব্যবহৃত হইত। কাঁঠাল, দারুহরিদ্রা ও টুন কাঠের রংএর ব্যবহার কিছু অধিক, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে। কিন্তু

তাহা হইলেও ব্যবসায়ের হিসাবে এ গুলির অধিক প্রচলন নাই। এক সময় ছিল, যখন ভারতে ও ভারতের বাহিরে কমলাগুড়ি ও সিউলি অথবা হরসিঙ্গার ফুলের রঞ্জক দল বিচিত্র রঙ্গের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হইত। এখন প্রধানতঃ ঔষধার্থ অল্প পরিমাণই কমলাগুড়ি বাহিরে চালান যায়। সিউলি ফুলের রপ্তানি একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রেশমী বস্ত্রের পক্ষে কমলাগুড়ি কিন্তু উৎকৃষ্ট রং। দেশীয় প্রথায় অম্ল ও ক্ষার জলে ভিজানর পরিবর্ত্তে যদি শুধুই আগাগোড়া ক্ষারজল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে কমলাগুড়ির রং খুব পাকা হয়। ইহা ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা এই যে ইহাতে অনেক ভেজাল থাকে; এমন কি শুরকি ও রঙ্গিন মাটির গুঁড়াও পাওয়া যায়। সিউলি ফুল হইতে বাদামী হইতে আরম্ভ করিয়া কমলালেবুর মত রং পাওয়া যায়। পূর্ব্বকার রঞ্জকেরা এই সমুদয় বিভিন্ন ছায়ার রং অনেকটা পাকা করিতে পারিত। এখন সেরূপ আর দেখা যায় না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে মেদী পাতার রঞ্জক উপাদান—লসন্ (Lawsone). ইহা দানা বাঁধে এবং ইহার জলীয় দ্রাবণ পীতাভ। ফুটাইলে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। রেশম ও পশম সহজে এই রং শোষণ করে, কিন্তু চামড়ায় ইহা খুব পাকা হয়। পুরাকালের মিসরীয়েরা হেনার রঞ্জকগুণ অবগত ছিল। সংরক্ষিত শবের মেদিরঙ্গে রক্তরঞ্জিত নখ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এরূপ কয়েকটি শব (Mummy) পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মেদিপাতার রং সম্বন্ধে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজনীয়।

এখনও পর্য্যন্ত যে হলদে রঙ্গের যথেষ্ট প্রচলন আছে তাহা হলুদ। পূর্ণ পীত রং উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ বস্ত্র অথবা সূত্রকে গরম হলুদ ভিজান জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে শুকাইয়া আবার ফটকিরির জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে কাচিয়া ফেলা দরকার। ইহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে প্রক্রিয়ার বিভিন্নতায় অনেক হলদে রং হইতেই লাল রং পাইতে পারা যায়।

অনেক দেশীয় রঞ্জক পদার্থ রক্ত বর্ণ প্রস্তুতের উপযোগী; তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়;—

১। পলাশ ফুল।　　　৫। তাম্বা নাগকেশর।
২। লঙ্কা।　　　৬। দাড়িম ছাল।
৩। আল মূল।　　　৭। মঞ্জিষ্ঠা ছাল ও কাঠ।
৪। চে মূল　　　৮। লোধ ছাল ও মূল।

এক সময়ে মঞ্জিষ্ঠা বিশ্ববিখ্যাত রং ছিল এবং ইহার চাষ হইতে অনেক দেশেই প্রভূত ধনাগম হইত। এখন কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গের শিল্প অনেক পরিমাণে কম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে প্রকার সুন্দর রং ও আর দৃষ্টি গোচর হয় না। আল রং সম্বন্ধেও

এই কথা বলা যাইতে পারে। উত্তর পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের স্থানে স্থানে ডালিমের রং এখনও চলে কিন্তু ইহার ব্যবহার গরিব লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। ক্ষার সংযোগে পলাশ ফুল হইতে চমৎকার লাল রং পাওয়া যায়। যে স্থলে পলাশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ ইহা কাপড়, পাগড়ি, প্রভৃতি লাল রং করিবার জন্ত প্রয়োগ করে। সকলে বোধ হয় অবগত নহেন যে টাটকা পলাশ ফুলের রস অথবা শুষ্ক ফুলের কাথ হইতে ছবি আঁকিবার উত্তম জলীয় রং (water colour) পাওয়া যায়।

লোধের রং যে পরিমাণে মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযুক্ত তাহা এখনও পায় নাই। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে যথাক্রমে চে মূল ও তাম্বা নাগকেসরের যথেষ্ট চলন আছে। মঞ্জিষ্ঠার স্তায় চে মূল হইতেও পাকা লাল রং পাওয়া যায়। ইহাতে সামান্ত নীলের আভা আছে। যদিও পূর্ব্বের স্তায় অধিক চাষ হয় না, তবুও মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার উৎপাদন একবারেই বন্ধ হইয়া যায় নাই। চে মূলে রঞ্জক উপাদানের মাত্রা কম বলিয়াই বোধ হয়। কারণ মান্দ্রাজে কয়েকটি পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে ১০০ পাউণ্ড সুতা রং করিতে ৪০০ পাঃ মূল লাগে। এমনকি ফিকে Pink এর জন্তও ১০০ পাঃ দরকার হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে মূল তুলিবার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত চে মূলের রঙের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অল্প দিনের অথবা অত্যধিক দিনের মূলে রঞ্জক পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম। আবার চে মূলকে রঞ্জনের কাজে লাগাইতে হইলে এসম্বন্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাম্বা নাগকেশর প্রধানতঃ রেশম রঞ্জনেই ব্যবহৃত হয় এবং এই ক্ষেত্রেও তাহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। সর্ব্বশেষে লাক্ষার কথা। সমস্ত লাল রঙ্গের মধ্যে এতদ্দেশে কিম্বা বিদেশে ইহারই কাটতি এখনও সমধিক পরিমাণে আছে। অপরাপর রঞ্জক পদার্থের স্তায় লাক্ষারও ভেজালের অভাব নাই। অধিকন্তু সোডা, চূণ অথবা ফটকিরি সহযোগে লাক্ষা রং প্রস্তুত করার প্রথাও উৎকৃষ্ট রং উৎপাদনের উপযোগী নহে। কিন্তু ইহাই দেশীয় প্রথা। শুধু জল দ্বারা রং বাহির করা শ্রমসাধ্য বটে; তাহা হইলেও ইহা দ্বারা যেরূপ পরিষ্কার রক্তবর্ণ পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন প্রকারে হয় না। লাক্ষা রং সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইলে তাহা হইতে যে সুফল ফলিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

যে সমস্ত রঞ্জক পদার্থ হইতে রক্ত ও পীত রং পাওয়া যায় তন্মধ্যে কুসুম ফুল ও কটকানের স্তায় সুপরিচিত আর কোনটিই নাই। কুসুম ফুলের রং অতি প্রাচীন। মিশরদেশের শব দেহের বস্ত্র কুসুম ফুলের রঙ্গে রঞ্জিত দেখিয়া বোধ হয় যে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এই রং প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ইউরোপ, চীন, ভারত, নাইল নদের বেলাভূমি প্রভৃতি স্থানে এখনও কুসুম ফুল উৎপাদিত হইলেও রঙ্গের হিসাবে ইহার ব্যবহার

অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও ইহা দ্বারা মোটা ও পাতলা খদ্দর কাপড় বেশ রং হইতে পারে।

লটকানের বীজের গাত্রে যে রক্তাভ পদার্থ দেখা যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রং হয়। বস্ত্রাদিতে গাঢ় রক্তবর্ণ প্রদান করিতে ও রঙ্গের স্থায়ীত্বে ইহা অ্যানিলিণ রং অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। বিশেষতঃ ধোলাই কাপড়ে ইহার রং আরও খুলে। রং প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। তৎপরে জল দিয়া উক্ত রং বাহির করিয়া সামান্য পরিমানে সোডা অথবা পটাশ কার্ব্বনেট দিতে হয়। এই জল ইষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে সূতা ভিজাইয়া দেওয়া দরকার। তার পর ক্ষীণ অম্ল যুক্ত জলে ভিজাইয়া ধুইয়া লইলেই রং পাকা হইল।

সাড়ী প্রভৃতির পাড়ের জন্য নীল আভাযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রঙ্গের চাহিদা খুবই বেশী। ইহা হরিতকী জাতীয় ফল হইতে অর্থাৎ হরিতকী, ও বহেড়া হইতে পাওয়া যায়। জটিল দেশীয় প্রথায় এই রং কিন্তু তেমন সুন্দর হয় না। তদপেক্ষা সহজ ও উন্নত প্রথা হইতেছে—গরম হরিতকী ভিজান জলে সূতা ভিজাইয়া উত্তম রূপে নিঙড়াইয়া চুণের জলে দিয়া কষ রং পাকা করিয়া লওয়া। তৎপরে ঐ সূতা লৌহ সংযুক্ত জলে ভিজাইলেই গাঢ় কাল রং হইবে। যদি লৌহযুক্ত জলের পরিবর্ত্তে ফটকিরির জল দেওয়া যায় তাহা হইলে মলিন পীতাভ খাকি রং পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের বকম কাঠের ন্যায় বিলাতী এক রকম কাঠ আছে। উভয়ের রং কিন্তু সমান নয়। আমাদের বকম কাঠ হইতে সুন্দর ও উজ্জল নীলাভ কাল রং প্রস্তুত হয়; কিন্তু উহার দোষ এই যে কিছুদিন বাদে উহা ফিকে হইয়া যায়। ইহাপেক্ষা আর একটি গাছ হইতে সুন্দরতর রং পাওয়া যাইতে পারে—তাহা মান্দ্রাজের 'রক্ত পিত্ত' অথবা ভেম্বদান' ছাল। অন্যান্য রং সংযোগেই ইহার রং বেশ খোলে। দেখিতে পাওয়া যায় যে ভেম্বাদান ছাল হইতে রং প্রস্তুতের কাজ আজকাল অনেক পরিমাণে লয় পাইয়াছে। সম্প্রতি কতক গুলি পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এক সময় ইহা ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইতে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যৎ চেষ্টার ফলে এই রং প্রস্তুতের প্রণালী পুনরাবিষ্কৃত হইবে।

নীল প্রস্তুত ও প্রয়োগের প্রণালী সকলেই জানেন। এসম্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্যকীয়। Wrightia tinctoria নামক আর একটি গাছ হইতে নীলের মত রং পাওয়া যায়। অনেকে এক সময় আশা করিয়াছিলেন যে ইহা দ্বারা কতকটা নীলের কাজ হইবে। এসম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার। কতিপয় পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে উক্ত উদ্ভিদ জাত রঙ্গে নীলের মতই কাজ হয়, কিন্তু রং কিছু মলিন হয়। ব্যবসায় এই রং প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার হওয়ার প্রধান প্রতি বন্ধক হইতেছে যে ইহাতে রঞ্জক উপাদনের মাত্রা নীল গাছের প্রায় অর্দ্ধেক ও রং প্রস্তুত করার খরচ ও অধিক।

পূর্ব্বে ধূসর রঙের তেমন ব্যবহার ছিলনা। রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত ধূসর রঙের চলনও বাড়িয়াছে। এই শ্রেণীর রং সমূহের মধ্যে খদিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইউরোপেও কাপড়ে পাকা ধূসর রং করিতে খদির ব্যবহৃত হয়। কোটের ও রেখাযুক্ত কাপড়ে রং করিতে বিভিন্ন mordant সহযোগে খদির ব্যবহারের ভবিষ্যতে প্রচার হওয়া সম্ভবপর। ইহা বিশেষ বাঞ্ছনীয় যে আমাদের রঞ্জনশিল্পবিদেরা খদিরের উপর অধিকতর মনযোগ দেন। রক্ত চন্দণ ইউরোপে প্রধানতঃ পশমী বস্ত্র রক্তাভ ধূসরবর্ণে রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জন প্রথার পরিবর্ত্তনে ইহা কার্পাস সূত্র রং করিতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রধান দরকার অধিক পরিমাণে রং সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ। হরিতকী দ্বারা রঞ্জনেও তাহাই। সুতরাং হরিতকী রং প্রস্তুতের অনুরূপ কোন প্রথায় রক্ত চন্দনের উত্তম রং প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ অ্যানিলিণ রং আসে তাহার মূল্য প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা। অ্যানিলিণের স্থান যে দেশীয় রং দ্বারা অধিকৃত হইবে সে আশা করা বৃথা। তবে উপযুক্ত চেষ্টায় কুটীর শিল্পে ব্যবহৃত রং দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু সে পরিমাণ রং উৎপাদন করিতে হইলেও সাধারণ ও সরকারের সমবেত চেষ্টা দরকার। ('কৃষক'-সম্পাদক লিখিত ও সুবিখ্যাত Indian Scientific Agriculturist পত্রিকার বিগত নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত "Indian Dye Stuffs" প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।)

সরকারী কৃষি।

১৯২১-২২ সালের কৃষিকার্য্য বিবরণী সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সারমর্ম্ম এস্থলে সংকলিত হইল:—
বর্ত্তমান-গঠিত ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে হয়। এক এক করিয়া ক্রমশঃ প্রধান প্রধান ফসলগুলি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে ও অধিকাংশ স্থলে উত্তম ফলও পাওয়া গিয়াছে। চাষের জমি অথবা মূল্যের হিসাবে ধানই ভারতের সর্ব্বপ্রধান ফসল। বঙ্গদেশে এই ফসলের উপরই বিশেষ নজর দেওয়া হইতেছে। অধিক ফল প্রসবী ধান্য জাতি ২।৪টি ইহার মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে আরও উন্নত ফল পাইবার আশা আছে। অধিক জলের ধান সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে। আমন ধানের জন্য ধঞ্চের সবুজ সারই বিশেষ উপযুক্ত সার বলিয়া চুঁচুড়া ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। বিহারের স্থানে স্থানে সবুজ সারের সহিত ফসফরাস্ প্রধান সার প্রয়োগে অধিক কাজ হইয়াছে। অন্যত্রও সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আবশ্যক। দেশী সাধারণ গোধূমের পরিবর্ত্তে উন্নত জাতীয় গোধূম চাষ যুক্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রায় দশ লক্ষাধিক একরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পুষার উন্নত গম অষ্ট্রেলিয়াতেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

যে পরিমাণ জমিতে ভারতে ইক্ষু চাষ হয় তাহা বিবেচনা করিলে এতদ্দেশ শর্করা সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হওয়া দূরের কথা, কোটি কোটি টাকার চিনি প্রতি বৎসর ভারতে আমদানি হয়। ইহার প্রধান কারণ কম ফলন। এখন দেখা যাইতেছে উপযুক্ত জাতি ও সার নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ফলনের হার অনেক মাত্রায় বাড়িয়া যাইতে পারে। ইক্ষুতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বট্‌লারের গবেষণায় উন্নত জাতি উদ্ভাবনের অনেক সহায়তা হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিহারে উৎপাদিত একটি জলদী ও একটি অধিক ফলনশীল জাতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এইরূপ জাতির সাহায্যে শুধু যে শর্করা উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে; কারখানা গুলিও অধিক দিন ধরিয়া কাজ করিতে পারিবে।

তুলা উৎপাদনের জমির হিসাবে ভারতের স্থান মার্কিণের নিচেই। সম্প্রতি মার্কিণ তুলার ফলনের হার ও চাষের জমির পরিমাণ—উভয়ই কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সময়ই ভারতীয় তুলা চাষের উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট সময়। এসম্বন্ধে কতক কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও শঙ্কর প্রজনন দ্বারা আরও উন্নতির আশা আছে। তুলার ন্যায় পাটও ভারতের একটি প্রধান ফসল। সাধারণতঃ দুই জাতি পাট চাষ হয়।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ উভয় জাতীরই উন্নত উপজাতি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত বীজের বিতরণ আশানুরূপ পরিমাণে হইতে পারিতেছে না। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে পাটের ফলন ও চাষ উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

কৃষির জন্য গবাদি পশু একান্ত প্রয়োজনীয়। ফসলের উন্নতি হইলে খাদ্য পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চাষের গরুরও উন্নতি হইবে। দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকার ষাঁড়ের সাহায্যে দুধের ও চাষের উৎকৃষ্ট তর গোবংশ প্রজননের চেষ্টা হইতেছে। মেষ সম্বন্ধেও উক্ত প্রকার কতকগুলি পরীক্ষার অনুষ্ঠান হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ইতি মধ্যেই "মেরিনো' মেষের সাহায্যে উৎকৃষ্ট পশম উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মাণ হইয়াছে। নানা প্রকার পশু খাদ্য উৎপাদনেও সরকার মনোনিবেশ করিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য্য

(সংকলিত)

গত ২৭শে ফাল্গুন মহাসমারোহের সহিত কলিকাতা হইতে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নূতন কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে তথায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিষদের ইতিহাস সকলের নিকট ব্যক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও বক্তৃতা দেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় বেদ গান করেন এবং প্রথমে তিনি ভিত্তি স্থাপন করেন। নূতন বাড়ী হইলে উহাতে প্রায় এক হাজার ছাত্রের স্থান হইবে। পরিষদ বিজ্ঞান শিখিবার জন্য প্রতি বৎসর ইউরোপে কয়েকটী করিয়া ছাত্র প্রেরণ করিবেন এরূপও স্থির করিয়াছেন।

পরিষৎ নিজের বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। এখানে শিক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত থাকিবে, এবং ছাত্রদের বাসস্থানও থাকিবে। পরিষৎ একশত বিঘা জমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে মাসিক ২১০ টাকা খাজনায় ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়াছেন আরও ৫০ বিঘা পাইবার আশা আছে। পরিষৎ কাজ আরম্ভ করিবার সময় নিম্নলিখিত দান পাইয়াছিলেন। বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ, আয় বার্ষিক ২০,০০০; মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য আড়াই লক্ষ, আয় বার্ষিক ১০,০০০; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ, আয় বাৎসরিক ৩৬০০ টাকা। তাহার পর স্যার রাসবিহারী ঘোষ দেন ২ লক্ষ টাকার একটী বাড়ী এবং ৮;৯২,০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজের অংশ আদি, যাহার আয় এখন বৎসরে কুড়ি হাজার টাকা হয়, কিন্তু যাহা হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার পাইবার আশা করেন। ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ কৃষিশিক্ষা দানের জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি দিয়াছেন, যাহার আয় বৎসরে ৪৫০০ টাকা হইবে।

বর্ত্তমানে পরিষদের শিক্ষালয়-আদি মুরারিপুকুরে আছে। সেখানকার কাজ শিখাইবার কারখানার মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা, সরঞ্জামের মূল্য ত্রিশ হাজার, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মূল্য ষাট হাজার টাকা।

১৯২১ সালে ৩০০০ ছেলে ভর্ত্তি হইতে চাহিয়াছিল; ১৯২২এ ২০০০; কিন্তু স্থানাভাবে অধিকাংশ ছাত্র লওয়া হয় নাই। এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৬৫০। ছাত্রেরা

প্রত্যেকে মাসিক ছয় টাকা বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্র প্রতি গড়ে মাসিক ১৫ টাকা খরচ হয়। খরচ আরও অনেক বেশী হইত, যদি শিক্ষকগণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া খুব কম বেতনে কাজ না করিতেন। ইহাঁরা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষও বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

যাদবপুরে ইতিমধ্যে একটী ঝীল খনিত হইয়াছে, তাহা ৫০০ ফুট লম্বা ১০০ ফুট চৌড়া ও ২০ ফুট গভীর। পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ৮০,০০০ এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ৭০,০০০ টাকা খরচ পড়িবে। প্রধান কলেজ-অট্টালিকাটির খরচ হইবে দুই লক্ষ টাকা, কাজ শিখাইবার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা ৯০,০০০ ; আপাততঃ একশত জন ছাত্রের জন্য দুটি ছাত্রাবাস ৫০,০০০ টাকা। আরও পাঁচটি ছাত্রাবাস এবং একটি হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিতে হইবে। সরঞ্জামে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির জন্যও প্রায় দুই লক্ষ টাকা লাগিবে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, পরিষদের অনেক টাকার দরকার। এ পর্য্যন্ত দেশের কয়েকজন মাত্র ধনী লোক ইহাতে টাকা দিয়াছেন। আরো বিস্তর ধনী লোক আছেন যাঁহারা দিতে পারেন, এবং যাঁহাদের দেওয়া উচিত।

—

সর্পতত্ত্ব।

(প্রাপ্ত)

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ গিয়াছে যখন ভূমণ্ডলে, জল ও স্থলে, সরীসৃপের একাধিপত্য ছিল। তাহার কোটি কোটি বৎসর পরে মানুষের আবির্ভাব। বর্ত্তমান সর্পবংশ সেই বিশাল, ভূব্যাপী সর্পকুলের অবশিষ্টাংস মাত্র।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের উপখ্যানের মূলে যাহাই থাকুক, ইহা অনেকটা অনুমান করিতে পারা যায় যে এক সময়ে ভারতে সর্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল ও সর্পবংশ ধ্বংসের জন্য প্রভূত চেষ্টা হইয়াছিল। ভারতীয় সর্প সমূহের প্রসারের উপর উক্ত চেষ্টার ফলাফল কি হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এখনও সর্পজাতির সংখ্যা কম নয়। এখনও ৩২০ জাতীয় সর্প ভারতে বাস করে। এ সমুদয়ই যদি বিষধর হইত তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমান সর্পাঘাতে বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যা গড়ে ২০০০০ না হইয়া লক্ষে পরিণত হইত। সুখের বিষয় যে বিষধর জাতির সংখ্যা মোটে ৬৮ মাত্র; তাহার মধ্যে আবার ২৯টি সমুদ্রবাসী।

যদিও লোকে সাপ দেখিলে ভয়ে চমকাইয়া উঠে, তবু অধিকাংশ জাতীয় সাপ নিরীহ। বানরেরও সাপের ভয় কম নয়; তাহা হইতে বোধ হয় যে সর্পভীতিটা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি। পোষ মানাইলে সাপ সহজেই পোষ মানে। আর বাস্তবিক বলিতে গেলে অনেক সাপের বর্ণ বৈচিত্র্যতা একটা দেখিবার জিনিষ। যে অবস্থায় সাপ থাকে তাহার পক্ষেও সর্পাবয়ব সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহারা সমধিক দ্রুত বেগে চলিতে পারে এবং শরীর এত প্রকারে বাঁকাইতে পারে যে আর কোন প্রাণীর পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নয়। সর্পের এইরূপ অসাধারণ শরীর সঞ্চালনের সক্ষমতার মূলে ইহার অস্থি বিন্যাসের বিশেষত্ব। ইহার বহু সংখ্যক পঞ্জরাস্থি আছে এবং সেগুলি সম্মুখে আলগা, অর্থাৎ মানুষের ন্যায় সর্পের বক্ষাস্থি নাই। সর্পের ফণাও গ্রীবাদেশের আলগা চামড়া পঞ্জরাস্থি দ্বারা প্রসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকন্তু একটি পঞ্জরাস্থি তন্নিম্ন পঞ্জরাস্থির সহিত একাধিক স্থানে সংযুক্ত। সেই জন্যই নানাপ্রকারে শরীর বাঁকাইলেও ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় না। এই সমুদয় পঞ্জরাস্থি ও অনেক স্থলে গাত্রস্থ শল্ক সর্পের দ্রুতগতির সহায়তা করে। সর্পকে দ্বিজিহ্ব বলে; ইহার জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত। জিহ্বার দ্বারা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে।

অনেকেই দেখিয়াছেন যে সর্প তাহার মুখাপেক্ষা বৃহত্তর প্রাণী ভক্ষণ করিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ইহাদের প্রায় সকল জাতিরই নিম্ন চোয়ালের দুই অংশ

অস্থি দ্বারা জোড়া নয়, মাংস পেশী দ্বারা জোড়া। আবার অনেক জাতির উপরের চোয়ালের গড়ণও ঐরূপ। ইহাদের দন্ত অন্তর্দ্দিকে বক্র। সুতরাং একবার শীকার ধরিলে তাহার ছাড়াইয়া যাওয়া শক্ত। বস্তুতঃ সাপ ঠিক শাকার গলাধঃকরণ করে না বরং নিজেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিকারের উপর টানিয়া লয়। অজাগর প্রভৃতি সর্প ছোঁ মারিয়া শীকার ধরে এবং কুণ্ডলী দ্বারা তাহাকে নিষ্পেষণ করিয়া মাংস পিণ্ডবৎ করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমান লালা নিঃসরণ করিয়া উক্ত মাংস পিণ্ডকে পিচ্ছিল করিয়া ফেলে। তাহাতে গ্রাস করা অনেকটা সহজ হয়।

বিষধর সর্পের বিশেষত্ব এই যে ইহাদের উপরের চোয়ালের দুই দিকে দুইটী বড় দন্ত আছে। উক্ত দন্ত দ্বয় হয় ফাঁপা নলের ন্যায়, অথবা গভীর নালী-যুক্ত। বিষকোষ চক্ষুর পশ্চাতে ও নিম্ন দেশে অবস্থিত। দংশন করিলেই উক্ত নল কিম্বা নালী বাহিয়া বিষ আসিয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে। কোন কোন সর্পের বিষকোষ অত্যন্ত বৃহৎ। এমন কি হৃদ পিণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিষকোষ ও বিষ যথাক্রমে লালাকোষ ও লালার রূপান্তর মাত্র। পিঁপড়ে, বোলতা, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতির বিষের ন্যায় ফর্ম্মিক এসিড সর্প বিষেরও একটি উপাদান। কিন্তু অন্যান্য উপাদানও আছে, যাহার জন্য সর্পবিষ এত মারাত্মক।

সর্প সম্বন্ধে এই কয়েকটি সাধারণ কথা বলিয়া আমরা কতিপয় প্রধান বিষধর জাতির উল্লেখ করিব। বলা বাহুল্য যে ভারতের স্থল ভাগে ৩৯ জাতীয় বিষধর সর্প বাস করি-করিলেও উহাদের অধিকাংশেরই প্রসার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেক জাতির বিষের ক্রিয়া সম্বন্ধেও এখনও সমধিক গবেষনা হয় নাই।

বিষধর সর্প সমূহের নাম করিতে হইলে প্রথমেই গোক্ষুরার নাম করিতে পারা যায়। গোক্ষুরা ও কেউটিয়া একই জাতির 'প্রকার'ভেদ মাত্র। সাধারণতঃ ফনায় একটি নয়নতারা সদৃশ দাগ যুক্ত 'প্রকার'কে কেউটিয়া ও উক্তরূপ দুটি দাগ যুক্ত 'প্রকারকে' গোক্ষুরা বলে। গোক্ষুরা ভারতের উপদ্বীপাংশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউটিয়া বঙ্গদেশে ও তৎপূর্ব্ব অঞ্চলেই অধিক। প্রায়-শ্বেত, হরিৎ, পাটল, ধূম্র, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণভেদে অথবা এই সমুদয়ের সংমিশ্রন জনিত বর্ণের রূপান্তরে এই জাতীয় সর্পের নানা স্থানে নানা নাম করণ হইয়া থাকে। দৈর্ঘে ইহারা সাধারণতঃ তিন হাত, সাড়ে তিন হাত হয়। ৪ হাতের উপর নমুনাও কোন কোন স্থানে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা অসাধারণ। নয়নতারা সদৃশ চিহ্ন সকল সময়ে স্পষ্ট না হইলেও, এই জাতীয় সকল প্রকার সাপেরই ফনা আছে। ফেরার, ক্যানিংহাম রজার্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গোক্ষুরা বিষ সম্বন্ধে অনেক গবেষনা করিয়াছেন ও তাহার ফলে আজ কাল 'অ্যান্টিভেনিন্' নামক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব।

'পাতরাজ' অথবা 'শঙ্খচূড়' গোক্ষুরা শ্রেণীস্থ সর্পের অন্যতম। বিষধর সর্প সমূহের

মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ হাতের উপর পর্য্যন্তও হয়। পূর্ণ বয়স্ক সর্পের বর্ণের তারতম্য অত্যন্ত অধিক। তরুণ বয়সে সাপ সর্ব্বত্রই প্রায় কালো, কিন্তু স্থানভেদে বয়সে বর্ণ হরিৎ অথবা ধূসরের যে কোন আভাযুক্ত হইতে পারে। ইহারও ফনা আছে, যদিও শরীরের অণুপাতে ফনা স্বল্প-বিস্তৃত। বিষ গোক্ষুরার ন্যায়ই তীব্র। ব্রহ্মদেশে এই জাতীয় সর্প যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে—সুন্দর বন, উড়িষ্যা, কঙ্কন, আসাম ইত্যাদি অঞ্চলেও ইহার প্রাদুর্ভাব কম নহে। তবে সুখের বিষয় এই যে এরূপ বৃহদাকার বিষধর সর্প লোকালয়ে প্রায় থাকে না। জঙ্গলেই ইহার বসবাস। মালেরা সুন্দর বন হইতে এই জাতীয় সাপ ধরিয়া আনে। সাপরাজ অন্য জাতীয় সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা না পাইলে পক্ষী, ক্ষুদ্র প্রাণী, ভেক প্রভৃতিই ইহার জীবন ধারণের উপায়।

'ফুর্সা' বঙ্গদেশে কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু গঙ্গার দক্ষিণে বোম্বাই ও মাদ্রাজ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে রাজপুতানা, সিন্ধুদেশ, পঞ্চনদ, বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ শুষ্ক, জলহীন প্রদেশে ইহার সমধিক প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সামান্য জঙ্গলাবৃত স্থানেও ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বাইর রত্নগিরি অঞ্চলের উল্লেখ করিতে পারা যায়। ফুর্সা দৈর্ঘে এক হাত কিম্বা কিঞ্চিদধিক। ইহার বর্ণ বালির ন্যায়। স্থান ভেদে গাঢ় অথবা ফিকে। মস্তকে পক্ষীপদ সদৃশ একটি দাগ আছে। ইহার বিষ গোক্ষুরার ন্যায় তীব্র না হইলেও এই জাতীয় সর্পাঘাতে বৎসরে যে অনেক লোকের মৃত্যু হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই।

'চন্দ্রবোড়া'—দেশ ভেদে ইহার অনেক প্রকার নাম আছে। গঙ্গার দক্ষিণে ভারতের উপদ্বীপাংশে সর্ব্বত্র ও পশ্চিমে সিন্ধু নদের তটভূমি দিয়া হিমালয় পর্য্যন্ত ইহার বাসস্থান। ইহার বর্ণ ফিকে ধূসর; পৃষ্ঠে লম্বালম্বি তিনটি রেখায় গোলাকার কতকগুলি দাগ আছে ও মাথায় ভি V সদৃশ একটি দাগ আছে। ইহার দৈর্ঘ তিন হইতে সাড়ে তিন হাত। ইহার বিষ মারাত্মক।

"রাজসাপ"—অন্য নাম 'শাখিনি' ও 'রানা' সাপ। সমস্ত দেহে হলদে ও কালো বর্ণের বলয়াকার দাগ থাকায় ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। লম্বায় ইহা চারি হাতের উপরও হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, বঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিহারের কতিপয় স্থানে এই জাতীয় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিষ গোক্ষুরার ন্যায় তীব্র নয় ও ইহার দংশনে হঠাৎ মৃত্যু ঘটিবার ইতিহাসও বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে ফুলা যন্ত্রণা ও ঘা হইয়া অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকে।

"করেত"—বঙ্গদেশে ইহাকে 'কাল চিতি' ও 'ধামন চিতি' বলিয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রং চকচকে কালো ও তাহার উপর খিলান সদৃশ জোড়া জোড়া শ্বেত রেখা আছে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রজার্সের মতে ইহারি

বিষের তীব্রতা গোক্ষুরা বিষের দ্বিগুণ। লম্বায় ইহা তিন হাত পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতে অনেক সর্পাঘাতে মৃত্যু-সংখ্যা করেত-দংশন জনিত।

সর্প-বিষের তীব্রতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা এত শীঘ্র কার্য্য করে যে ঔষধ প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। তথাপি নানা দেশে কত প্রকার দ্রব্যই সর্প বিষের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহা হউক সর্প দংশনের পরে অব্যবহিত ব্যবস্থা, দষ্ট স্থানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দৃঢ়ভাবে ১টি বা ২টি বাঁধন দেওয়া। ব্রান্টন সাহেবের আবিষ্কৃত প্রতিকার—পটাশ পারম্যাঙ্গনেট, দষ্ট স্থান চিরিয়া অবিলম্বে ঘসিয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ইহার জন্য একপ্রকার বিশেষ রকমের ছুরীও আজকাল পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—'অ্যান্টিভেনিন'। প্রথমে প্যারি সহরের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিৎ কামেট্ দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয় এবং এক্ষণে এতদ্দেশেও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণের অবধারণে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা গৌণভাবে সর্প বিষ হইতেই প্রস্তুত। একটি অশ্বকে অতি সামান্য মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ উহার মাত্রা এত অধিক করিয়া লইতে পারা যায় যে সে পরিমাণ বিষ প্রয়োগে ২০টি অশ্বের মৃত্যু হইতে পারিত। এই বিষ-সহিষ্ণুতার কারণ এই যে ক্রমশঃ বিষ প্রয়োগে অশ্বের রক্তে এমন কতকগুলি উপাদান জন্মাইতে থাকে যে সমুদয় সমধিক পরিমাণে বিষের ক্রিয়াও রোধ করিতে পারে। এইরূপ বিষক্রিয়াসহ অশ্বের রক্ত হইতে 'অ্যান্টি-ভেনিন' প্রস্তুত। দষ্ট স্থানের উপরে কোন উপযুক্ত ধমনীতে ইহা সূচিকা দ্বারা চালিত করিয়া দিতে হয়। সূচিকাভরণ প্রক্রিয়া সাধারণ লোকেও অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে. কিন্তু সর্প-বহুল স্থানের ঔষধালয় সমুহে যে পরিমাণ 'অ্যান্টি-ভেনিন' থাকা উচিত, তাহার অনুপাতে এখন কিছুই নাই। ইহার ব্যবস্থা হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সর্প সম্বন্ধে ২।৪টি আবশ্যকীয় কথা বলা। মফঃস্বলের অনেক স্থানেই সর্পভীতি নিতান্ত কম নয়। যাহারা সম্যক ভাবে সর্পতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে চান তাঁহারা Fauna of British Indiaর সর্প-বিষয়ক ভাগ ও ফেয়ার, রসেল, গন্টার, নিকলসন, ওয়াল, রজার্স প্রভৃতির গ্রন্থ ও 'ল্যান্সেট' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সর্পতত্ত্ব এপর্য্যন্ত দেশীয় কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ সর্পের জীবন ইতিহাস, বিষের ক্রিয়া, বংশ বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যয়নে আমাদের যতটা স্বার্থ আছে সেরূপ আর কাহারও নাই।

—

সম্পাদকীয়।

খাদ্যের সদ্ব্যবহার :—বিগত লোকগণনার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে বঙ্গে লোক সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। উপরে উপরে দেখিলে ইহা ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতির ফল বলিয়া বোধ হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অবশ্য লোকে মরে। কিন্তু এত ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ও ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকার কারণ কি? অন্যান্য যে কারণই থাকুক, ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে উপযুক্ত প্রকারের ও পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যের অভাব। দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হইলে ব্যাধির আক্রমণ যে মাত্রায় প্রতিরোধ করিতে পারে অর্দ্ধপুষ্ট ও ক্ষীণ হইলে যে তাহা পারেনা সেটা স্বতঃসিদ্ধ। ঘৃত দুগ্ধ ও মৎস, যাহা বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর আহার্য্য সে সকলরই দাম আজকাল মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের কেন, সহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত লোকেও এ সমুদয় আর যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেনা। এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া অনেক সময় ও চেষ্টা সাপেক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমান সময় আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে যে কিছু খাদ্যের উপর বাঙ্গালীর প্রধান নির্ভর এবং যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সদ্ব্যবহার হয় কি না।

বলা বাহুল্য যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলিয়া আমাদের আহার্য্যের সহিত ইংরাজ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের লোকের আহার্য্যের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু কিছু কম পরিমাণে দরকার হইলেও শরীরের অনুপাতে পুষ্টিকর আহার্য্য যে যথেষ্ট পরিমানে দরকার তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাধারণ বাঙ্গালীর আহার্য্য নিম্নরূপ :—

চাউল—	৯ ছটাক।
ডাল—	১ „
মাছ—	১ „
মিষ্টি—	½ „
তরকারি—	১½ „
তৈল—	¼ „

এস্থলে বলা আবশ্যক যে আহার্য্য দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর অংশ নাইট্রোজনের যৌগিক বিশেষ, "প্রটীন" (protein)। আবার এই প্রটীন যে শুধু আহার্য্যে থাকিলেই হইল তাহা নহে ; উহা এরূপ অবস্থায় থাকা দরকার যেন তাহা পরিপাক হইতে পারে ; এবং খাদ্যও এরূপভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক যাহাতে দেহস্থিত যন্ত্রসমূহ প্রটীন সঞ্চয় করিবার সুযোগ পায়। পূর্ব্বোক্ত ধারার (standard) খাদ্যে প্রতিদিন একজন

পূর্ণবয়স্ক লোকের যে পরিমাণ প্রটীন দরকার তাহা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না। দাল মাছ ভাত হইতে আমরা যথা ক্রমে, শতকরা ৮০, ৯৮ ও ৫০ ভাগ প্রটীন পাইতে পারি। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটি কথা আছে। অধিক ভাতের সঙ্গে কম পরিমাণেই প্রটীনযুক্ত খাদ্য হজম হইয়া থাকে। যদি কেহ ৯½ ছটাক চালের ভাত খান তাহা হইতে উহার সহিত ৮½ গ্রাম্ (১গ্রাম = ১৫ গ্রেন্) প্রটীন পরিপাক করিতে পারেন। কিন্তু ১৫ ছটাক চালের ভাত খাইলে তাহার সহিত কেবল ৬½ গ্রাম প্রটীন হজম হইবে মাত্র। সুতরাং ভাতের মাত্রা যতই বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে, প্রটীন পরিপাকের শক্তি ততই কমিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে একেত আমাদের সাধারণ আহার্য্যে প্রটীনের অংশ কম, তারপর আমাদের খাওয়ার দরুণে যে পরিমাণ প্রটী পাওয়া যাইতে পারে তাহাও আমরা পাইনা।

ভাতই আমাদের আহার্য্যের কেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা হইতেও নানা কারণে আমরা শরীর পুষ্টির পূর্ণ মাত্রায় সহায়তা পাইনা। আজকাল সহরে ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে শুভ্র, চিক্কণ চাউলের উপর লোকের আগ্রহ দেখা যায়। পোষণ শক্তির হিসাবে এইরূপ চাউলকে চাউলের কঙ্কালাবশেষ বলিতে পারা যায়। কারণ ধানের কঠিন খোসা ও চাউলের মধ্যে যে একটি রক্তাভ আবরণ থাকে তাহাতে অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য থাকে। কলে মাঁজা চাউলে, অথবা অধিক ছাঁটা চাউলে সেই পর্দ্দাটি যে একবারেই চলিয়া যায় তাহা নহে, সেরূপ চাউলে 'Vitamine B' নামক উপাদান না থাকায় উহার অধিক ব্যবহারে 'বেরি বেরি' ব্যারাম গ্রস্ত হইতে হয়। এই ত গেল চাউলের পুষ্টিকর উপাদানের অসদ্ভাবের কথা। তারপর যে প্রথায় আমাদের ভাত প্রস্তুত হয় তাহাও অপচয়মূলক। ফেন্ বলিয়া যাহা আমরা ফেলিয়া দিই তাহাতে দ্রবণীয় শ্বেতসার অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ভাতে প্রকৃতপক্ষে সামান্য মাত্র পুষ্টিকর উপাদানই থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায় অপেক্ষা নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা ফেনের পুষ্টিকর শক্তি অধিক বোঝে এবং তাহাদের বালক বালিকাগণকে ফেন খাইতে দেয়।

ভাতের উপর অত্যধিক আগ্রহ বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ। আমাদের খাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সাধামত ভাত গলাধঃকরণ করা বলিয়াই বোধ হয়। ডাল তরকারি প্রভৃতি ভাতের উপকরণ মাত্র। এইরূপ ধারনা শোচনীয়। কারণ পেট-ফাটা মাত্রায় ভাত খাওয়া পুষ্টিকর দ্রব্য প্রাপ্তির হিসাবে শুধু যে বিফল হয় তাহা নহে, এত অধিক ভাত খাইতে গিয়া ডাল, মাছ প্রভৃতিরও যে টুকু প্রটীণ আছে তাহাও আমরা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। চাউলের মাত্রা কমাইয়া বরং দালের মাত্রা বাড়াইয়া দিলে অধিক কাজ হয়। কিন্তু ভাতের জন্য তাহার মাত্রা ২½ ছটাকের উপর বাড়ান বৃথা। কারণ দাল ও ভাত এক সঙ্গে খাইলে

দালের প্রটীনের কেবল অর্দ্ধেকাংশ হজম হইবে মাত্র। মাছের সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারা যায়। স্বতন্ত্র ভাবে খাইলে মাছের প্রায় সমস্ত প্রটীন অংশ পরিপাক হইতে পারে কিন্তু ভাতের সঙ্গে খাইলে তাহা হয় না। অত্যধিক মসলা ব্যবহারও আমাদের আর একটি দোষ। বাঙ্গলার ন্যায় দৈনন্দিন আহার প্রস্তুতে এত অধিক মসলা ব্যবহৃত হইতে ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ভাত অনেকটা স্বাদহীন দ্রব্য বলিয়া কিছু বেশী মসলা তরকারিতে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণ মসলা সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে ব্যবহৃত হয় তাহা অনাবশ্যকীয়।

রুচি অর্জ্জিত প্রকৃতি; ইচ্ছা করিলেই ইহা পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। আমাদের বর্ত্তমান-চলিত রুচিতে যে অনেক পরিমাণ আহার্য্যের অপচয় হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে আহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ এত বাড়িয়া চলিতেছে যে বাঙ্গালীর যে সামান্য আহার তাহাও সংকুলান করা সকলের পক্ষে সহজ হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য আমরা সচরাচর ব্যবহার না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিনা সেই গুলি হইতেও যাহাতে পূর্ণ মাত্রায় পুষ্টিকর উপাদান পাই, তাহা সকলেরই বিবেচনাযোগ্য। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে কেবল কতক পরিমাণে আহার্য্য উদরসাৎ করিলেই শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ হইল না। খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও আহারের ধরণের উপরেই পুষ্টি ও অপুষ্টি নির্ভর করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপই বঙ্গে লোকসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। কিন্তু ম্যালেরিয়ার কথা শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে চলিবে না। ইহার সহিত অন্যান্য বিষয়ও জড়িত রহিয়াছে। বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তা মিঃ বেণ্টলি সম্প্রতি এই বিষয়ে Indian Medical Gazette নামক সুবিখ্যাত চিকিৎসা পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে গত দশ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ৮৩ ভাগ ও মধ্য এবং উত্তর বঙ্গে যথাক্রমে ৬০ ও ৩৬ ভাগ স্থানে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা কমিয়া গেলেই বুঝিতে হইবে যে খাদ্যাভাবই ইহার প্রধান কারণ। বেণ্টলি সাহেবের মতে জলের অভাবের জন্যই বঙ্গদেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দাড়াইয়াছে।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে চাসের জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। জলের অভাব হইলেই উচ্চ ভূখণ্ড সমূহ যে অনাবাদী থাকিবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ এবং অনাবাদী থাকিলেই জঙ্গলের আধিক্য হইবে। কতকগুলি কৃষিজাত ফসলের আধিক্য ও স্বল্পতা হইতেও ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমন ধান অপেক্ষা আউস ধানে জল কম আবশ্যক এবং নীল অপেক্ষা তুঁত গাছে জলের প্রয়োজনীয়তা কম। এখন দেখা যায় যে আমন

ধানের জমি আউস দ্বারা অধিকৃত হইতেছে। নীল ত একেবারেই বঙ্গদেশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। জলের অসদ্ভাবের আরও একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে মাছের সরবরাহ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। জলের অভাব একদিকে যেমন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাত্রা কমাইয়া দিয়া লোকের সচ্ছন্দে জীবনধারণের পথ রুদ্ধ করিতেছে, তেমনিই অপরদিকে কৃষিকার্য্য কমাইয়া দিয়া ও ক্ষুদ্র জঙ্গলাদি প্রসারের সহায়তা করিয়া পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। কারণ জমি অনাবাদী ও জঙ্গলাবৃত হইলেই তাঁহাতে মশা মাছি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণির অবাধে বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ম্যালেরিয়ার আধিক্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

যে দেশেই অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয় সে দেশেই জলার সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশেও তাহাই। জলাতে অধিক পরিমাণ জল প্রবেশ করাইয়া ভাসাইয়া দিলে ম্যালেরিয়া কমিয়া যায়। সিসিলিতে সেলিনেস্ নামক স্থানে এই প্রথায় ম্যালেরিয়ার একবারেই উচ্ছেদ্ সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু জলাভূমি হইতে আংশিক পরিমাণে জল বাহির করিয়া দিলে কোন লাভ হয়না। বরং উক্ত অবস্থায় জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়-সমষ্টিতে পরিণত হইয়া মশার বংশ বৃদ্ধির আরও সহায়তা করে। ইংলণ্ডে হইটলিজ মিয়র নামক স্থানে তাহা দেখা গিয়াছে। জলা ভাসিয়া যাওয়ার প্রধান অন্তরায় হইতেছে রেল বাঁধ। পূর্ব্বে বর্ষাকালে নদী সমূহের উদ্বৃত্ত জল যেরূপভাবে প্রবাহিত হইয়া জলাজমি সমূহ ভাসাইয়া দিতে পারিত এখন তাহা পারেনা। তাহাতে শুধু যে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে তাহা নহে। একদিকে ভীষণ বন্যার প্রকোপে দেশে উৎসন্ন যাইতেছে ও অন্যদিকে জলাভাবের জন্য অধিক মাত্রায় জমি অনাবাদী থাকিয়া যাইতেছে।

দেশের ও দশের কথা।

বঙ্গে লোকক্ষয় :—গত ১৯২১ সালে বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিল মোট ১৩০১০০১ জন এবং মরিয়াছিল মোট ১৪০৩০৩০ জন। সুতরাং এক বৎসরেই বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মরিয়াছিল ১০২০২৯ জন বেশী। এবং ১৯১১ হইতে ১৯২১ এই দশ বৎসরে একমাত্র বর্দ্ধমান বিভাগে ৪১৬৮৬৪ জন, নদীয়া জেলায় ১২০৮৯০, মুর্শিদাবাদে ১০৯১৬০, যশোহরে ২১১৫২, পাবনায় ৩৯০৯২ এবং মালদহে ১৮৬৯৪ জন লোক হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে যে ১৪ লক্ষাধিক লোক কালের কবলে পতিত হইয়াছে তন্মধ্যে দশ লক্ষাধিক লোক শুধু ম্যালেরিয়ার কবলে পতিত হইয়াছে।

মানুষের গুপ্ত শত্রু :—আমাদের ঘরে ঘরে যে প্রাণীরা রোগের বাহন স্বরূপ বিরাজ করে, সকলে তাহাদিগকে চিনেন না, তাই তাহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য, সেই শত্রুগুলির তালিকা দিলাম :—

গরু—গোদুগ্ধ ও মাংস হইতে ক্ষয়কাশ হইতে পারে।

ঘোড়া—আস্তাবলে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ পাওয়া যায় এবং ঘোড়ার গ্লাণ্ডার্স রোগ মানুষেরও হয়।

বিড়াল—হইতে ডিফথিরিয়া (কণ্ঠনালীর) রোগ হইতে পারে।

কুকুর—কামড়াইলে জলাতঙ্ক হাইড্রোফোবিয়া হয়।

ভেড়াব—লোম পশম হইতে অ্যাকটিনোমাইকোসিস বা অ্যানথ্র্যাকস হয়।

ইন্দুর—গায়ের মাছি কর্ত্তৃক প্লেগ ছড়াইয়া পড়ে।

ছারপোকা—দ্বারা কালাজ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

মশক—দ্বারা ম্যালেরিয়া, বাত শিরার জ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ে।

মাছি—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

পিপিলিকা—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা টাইফয়েড রোগের বীজ ব্যপ্ত হয়।—স্বাস্থ্য

কলিকাতায় যক্ষ্মারোগ :—কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯২১ সালে কলিকাতায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া হাজারে চল্লিশ দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৭ সালে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু-সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালে যে ইনফ্লুয়েঞ্জায়

প্রবল প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হয় এবং সেই সময় হইতে সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য অনেকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্যই তাহারা যক্ষ্মরোগ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য :—স্থানান্তরে ভারতে ১৩২২ সালে যে সমুদয় প্রধান প্রধান দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছিল, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল। রপ্তানি, পুনঃ রপ্তানি ও আমদানি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩৬ কোটি টাকার পণ্যের কারবার গত বৎসর হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিলাতী পণ্যের আমদানি ২৪২ কোটি, রপ্তানি ২৭৮ কোটি ও পুনঃ রপ্তানি ১৫ কোটি টাকার। আমদানির মাত্রা শতকরা ১৩ ভাগ ও মূল্য ৩৭ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে উভয় প্রকারেরই রপ্তানি ৬৪ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতী পণ্য আমদানির হ্রাস সকল এদেশের পক্ষে সাধারণ। ইহার প্রধান কারণ চিনি, মদ্য, মোটরগাড়ী, পশমী ও রেশমী বস্ত্রের কম আমদানি। তুলাজাত দ্রব্যের পক্ষে কিন্তু এ মন্তব্য প্রযুয্য নয়। উক্ত শ্রেণীর মাল অধিক পরিমাণে আসিয়াছে। বঙ্গদেশে রপ্তানির মূল্যাধিক্য বেশী পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি, চাউল ও চামড়ার চালানজনিত। কৃষি অনুরাগী ব্যক্তির পক্ষে ইহা দ্রষ্টব্য যে গত বৎসর অধিক পরিমাণে গোধূম ও তামাক আমদানি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গোধূম ও আন্যর রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

যে সমস্ত দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ও বিদেশ বলিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৃটিশ সাম্রাষ্যভুক্ত দেশ সমূহ হইতে এতদ্দেশে ১৬৬ কোটি টাকার ও বিদেশ হইতে ৭৫ কোটি টাকার মাল আসে। পণ্যের মূল্য হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মার্কিণ হইতেই গত বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার মাল আসিয়াছিল। তন্নিম্নে যথাক্রমে জাপান, যবদ্বীপ, জর্ম্মণি, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। ভারতের উৎপাদিত মাল কিন্তু "বিদেশেই" অধিক কাটে। মোট রপ্তানির মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে ১১২ কোটি ও বিদেশে ১৬৫ কোটি টাকার মাল গত বৎসর গিয়াছিল। ইংলণ্ড অবশ্য বড় খরিদ্দার; কিন্তু তাহার পরই যথাক্রমে নিম্নলিখিত দেশগুলি ভারত হইতে প্রভূত পরিমাণে মাল গ্রহণ করে—জাপান, মার্কিণ, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, সিংহল, চীন ও বেলজিয়ম।

প্রস্তুতীকৃত খাদ্য :—আমাদের দেশে 'খাবার' বলিতে গেলে ময়রার দোকানের লুচি, কচুরী, মিষ্টি ইত্যাদি বুঝায়। তাহা খাইয়া লোকের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হয়। পাশ্চাত্য জগতে সাধারণের মধ্যে তৈয়ারী খাবারের চলন খুব বেশী বলিয়া অনেক সময়ে বাস্তবিক ভাল খাবার পাওয়া যায়। আজকাল এইরূপ একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাবারের কথা শুনা যাইতেছে। তাহার উপাদানের মধ্যে বিলাতি বেগুণ, ডিম্ব ও ময়দাই প্রধান। ৬ আঃ বিলাতী বেগুণের ঘন কাথ, ১ আঃ

ভিরলাল ও ১৪ আঃ ময়দা একসঙ্গে বেশ করিয়া কেটাইয়া পাক করিলে এই খাদ্য রুটির আকারে প্রস্তুত হইতে পারে। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শিক্ষার জন্য বৃত্তি ;—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের জামালপুর কারখানার শ্রীযুক্ত তারাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক শিক্ষানবিশকে বিলাতে ধাতু শিল্প শিক্ষার উদ্দেশে বাৎসরিক ৩৬০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষা করিতে পারিবেন।

আলুর ফসল :–রুশিয়া বাদ দিয়া অবশিষ্ট ইউরোপখণ্ডে ও উত্তর আমেরিকায় জগতের প্রায় শতকরা ৯২ ভাগ আলু উৎপাদিত হয়। ১৯২২ সালে এই সমুদয় দেশে মোট ১২৫০ লক্ষ টন আলু জন্মিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা শতকরা ৪৮ ভাগ অধিক এবং গড়পড়তায় ১৪ ভাগ অধিক। বৃদ্ধির প্রধান কারণ ফসলের মাত্রাধিক্য। কারণ চাষের জমি তেমন বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু ফসল অধিক হইলেও সমস্ত ফসল ব্যবহারে আসে কিনা সন্দেহ। আলু তুলিবার সময় জল বৃষ্টি অধিক হইলে উক্ত সময়ের তোলা আলু অধিক দিন ভাল থাকে না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জর্ম্মেণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে আলু তোলার সময় যথেষ্ট বর্ষা হইয়াছিল।
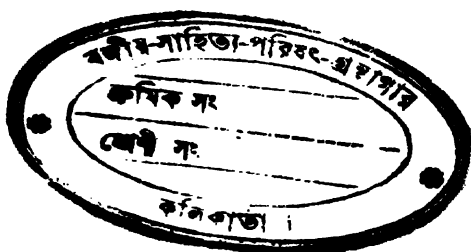
১৯২২ সালে ভারতে কৃষি-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির তালিকা।

আমদানি :—

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
দড়ির অন্ত ছোবড়া	১০৫ টন	১১,৯২০
ঐ প্রস্তুতীকৃত	২৫০ „	১,১৭,০৬৯
পাট ও তুলা ব্যতীত অন্য দ্রব্যের দড়ি	১৩,০১৯ হন্দর	৮,৬৮,৯৩৪
মাছ, সংরক্ষিত ব্যতীত	১২৫,২০৮ „	২৩,২৩,৮৫২
পশু খাদ্য	১১,৬২৯ „	৫৫,৩৬৮
নারিকেল	৬১,৩১,০৬৩টি	৫,৯৩,১৭৬
অন্যান্য ফল		২,৭৮,৮১৫
সবজী		৬৩,৫০৯
মেওয়া ফল, শুষ্ক, বাদাম, খেজুর, কিশমিশ ইঃ	৬১,২৫৫ টন	১৬৬,২০,৯৫৩
খাদ্য শষ্য, দাল আটা ইঃ	২৪৭,৮৮৮ „	৫০৫,২৮,২১৯
কলের লাঙ্গল		২,৪৭,৪৩৯
অন্যান্য কৃষি যন্ত্র		৩,৫১,৮৮১
তৈল ভাঙ্গার কলকজা		১৩,৬৩,৬৭৪
চাল ও আটার কলের যন্ত্রাদি		৪৬,০৫,১৬৬
চিণির কলের যন্ত্রাদি		২৯,২১,৯৮০
বস্ত্র কলের যন্ত্রাদি		৮৯৭,৪২,১৮৬
পাট কলের যন্ত্রাদি		২২৩,৮৪,২৪৫
খৈল	১৬৪ টন	৫,০৫০
মাখন, ঘি, চর্ব্বি, দুগ্ধ প্রভৃতি সংরক্ষিত খাদ্য	-	২৯৮,০২,০৬১
লবণ	৫ ৭,০৭৩ টন	১৫৭,৫৬,০৩৭
তৈলবীজ সর্ব্বপ্রকার	১০০৯ „	৫,১২,৫৬২
সুপারি	৯৬১,৮৬৭ হন্দর	১৮১,৭৭,৫১৭
লবঙ্গ	৭৯,৪২৭ „	৫৪,২৮,৮৫৩

দ্রব্যের নাম :	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
আদা	৬৭৯৫ „	১,৭৯,৮৪৪
গোলমরিচ	৭,৩৫৭ „	৩,৩২,০৬৯
অন্যান্য মসলা	৬,৬৪৬ „	৪,২৩,৬৯৬
খেজুর সার ইঃ	১৭২,৬০৭ „	২৪,৪৬,০৬৩
চিনি	৪৬০,৩১৮ টন	১৪,৮৪,০৫,৮৮৯
চিটা ও শর্করাযুক্ত দ্রব্য	৩৯ „	৩,৬৮,৭৯৫
কর্পাস	১২,২৮১ „	২,২৬,২৫০
শণ	২৫,২৯১ হন্দর	৬,২৬,২৫০
পাট	২০ „	৫,৯৮২
তামাক ও তজ্জাত দ্রব্য	৫৬,৩৩,২২৪ পাঃ	

রপ্তানি :—

সর্ব্বপ্রকার পশু	২১৯,২৭৯ টি	২৬,০৮,২৯৪
নারিকেল ছোবড়া	৫৩,০৮২ টন	১,১০,৪৮,৭৮৬
মাছ, শুষ্ক	২২৪,১৩৪ হন্দর	৫৪,৪৩,২১৮
পশু খাদ্য	১৯৭,৮৬৪ টন	১,১৭,২৬,৭৩১
ফল ও সবজী		৬২,১১,৫২৮
ধান্য, চাউল ও চূর্ণ চাউল	১৯,৬৪,৫৮৮ টন	৩৪,১৬,৭৪,৩০৬
গম ও আটা	১১২,৬৫৮ „	২,৯৭,১৪,৩৮৫
যব	৮০৬৭ „	১১,১০,২৪৩
জোয়ার ও বজরা	১১,১০৮ „	১৬,৬৮,৮৩১
ভূট্টা	৩৬৭১ „	৩,২৮,৭৪৪
যই	৫৫৩ „	১,০২,২০২
ছোলা, মুসুর ও অন্যান্য দাইল	১১০,৬২৫ „	১,৬২,৫২,৩০৭
হাড়, মাছ ইত্যাদির সার	১,০৭,৮৩৮ „	১,২৩,০৩,৩৩০
তৈল, রেড়ী	৪৯৫,০১৩ গ্যালন	১৬,৭৯,৮১২
„ নারিকেল	১২,০৯,৯২৩ „	২৯,০৬,১৬৭
„ তিসি	৩২,২০৬ „	১,২০,২০২
„ সরিষা	৩৮৪,৪২৪ „	১০,৮৫,৫৫৫
„ তিল	১০১,০৯৬ „	২৫৩,১২০
„ অন্যান্য	৫৬,৯১৩ „	১,৭৫,৮১৮

খৈল, রেড়ী, নারিকেল, কার্পাস,

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
চিনেবাদাম, তিসি, সরিষা ইঃ	১৩৯২৫৪ টন	১,৬১,৬৯,৩৬৭
সুত, থাথন চাটনি ইঃ	৯৪,৭৯৭ হন্দর	৬০,৩৫,৭৫৭
লবণ	৪০৭৮ টন	৮৯,৬৩৪
তৈলবীজ সর্ব্বপ্রকার	১১,৯৭,৬৩১ ,,	২৮,১৬,০৯,৮১৬
মশলা—এলাচ,লঙ্কা গোলমরিচ ইঃ	২৩৩৬৭৫২ হন্দর	১,০৯,৭১,৪০৮
চিনি, গুড়, চিটা ও শর্করাযুক্ত দ্রব্য	৬১৮৫ টন	১০,০৩,২০১
তিসির শণ	১৮৯২৮ পাঃ	১৪,০৮৫
শণ	৪২১,৪৭৪ হন্দর	৬১,৩৫,৭৮০
পাট	২৯,৯১,৮৫৩ টন	২২,৬৯,৪৭,৩৬৯
তামাক ও তজ্জাত দ্রব্য	২,০৬,৫৭,০৮২ পাঃ	৭২,২৮,৯৮০

সমসাময়িক জগত।

বিচালী চিহ্ন :—আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায় যে যাহারা কোন প্রকারে গরুর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে তাহারা মুখে কুটা করিয়া ভিক্ষা করিতে আসে। এতদ্ভিন্ন বিচালী চিহ্নের দ্বারা অন্য কোন ভাব প্রকাশের বিশেষ চলন নাই। বিলাতে কিন্তু খড়ের দ্বারা অনেক রূপ ভাব ব্যক্ত করা হয়। মুখে কুটা করিয়া কিম্বা টুপিতে লাগাইয়া কোন লোককে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে সে হয় চাষী কিম্বা সহিষ, চাকুরীর অনুসন্ধান করিতেছে। কৃষকের বাড়িতে কোন দ্রব্যাদিতে একগাছি বিচালি জড়ান থাকিলে তাহা গৃহস্বামী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন জানিতে হইবে। কুক্কুটাদি অথবা ডিম্ব বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বাড়ীর ফটকে এক আঁড়ি বিচালী বাঁধিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রের বেড়ায় ঐ প্রকার চিহ্ন থাকিলে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। কারণ তথায় দুষ্ট ষাঁড় আছে। যে ঘোড়া বেশী চাঁট ছোঁড়ে তাদের লেজেও একটি কুটা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ বিচালী যদি বুনিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহার অর্থ যে অশ্ব বিক্রয়ের জন্য। শিকারীর দল যাহাতে নূতন বীজ ছড়াণ ক্ষেত্রের উপর দিয়া না যায় সে জন্যও বেড়ার গায় আলগা ভাবে বিচালী ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

উদ্ভিদের দীর্ঘজীবন :—দীর্ঘ-জীবনের হিসাবে গাছের সহিত মানুষের কোন তুলনাই হয় না। গাছ ৪০০০ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরে মানব অপেক্ষা উদ্ভিদের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম লাভ করিতে শতকরা কেবলমাত্র ৫ ভাগ উদ্ভিদ সমর্থ হয়। সে স্থলে শতকরা ১৩ ভাগ মানুষ উক্ত বয়স লাভ করিতে পারে। ১০ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ মনুষ্য মারা যায় তদপেক্ষা অনেক অধিক গাছ মরিয়া যায়। সাধারণতঃ একটি জঙ্গল তৎস্থানে উৎপন্ন উদ্ভিদের শতকরা ৫ ভাগ মাত্রের প্রতিভূ। ১০০ বৎসরের পর কিন্তু গাছের দীর্ঘজীবন লাভ করায় সম্ভাবনা অনেক অধিক। একবার বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে তাহার পর আলোকের অভাব ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। মার্কিণে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে চিড় প্রভৃতি গাছের আলোকের অধিক দরকার। পক্ষান্তরে ভূর্জ্জপত্র অপেক্ষাকৃত কম আলোকে জীবনধারণ করিতে পারে।

আশ্চর্য্য তুলা গাছ:—মার্কিণে জর্জ্জিয়া অঞ্চলে টোক্কারা নগরের ডাকঘরের প্রাচির গাত্রে মাটি হইতে ৮ ফুট উর্দ্ধে একটি তুলা গাছ জন্মিতেছে। গাছটি ৮ ফুট

উচ্চ হইয়াছে ও বিস্তর শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। জল অথবা শৈত্য না পাইলে কোন গাছই হইতে পারেনা। এত বড় গাছ ত দূরের কথা। এতদিন অনেকে অনুমান করিতেন যে গাছের শিকড় মাটি স্পর্শ করিয়াছে এবং সেই স্থান হইতেই শৈত্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেওয়াল মেরামতের সময় দেখা যায় যে মূল কেবল ছয় ফুট পর্য্যন্ত নামিয়াছে। এখন সমস্যা এই যে জল না পাইয়া গাছ কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, কিম্বা কি উপায়ে উদ্ভিদ্ জল সংগ্রহ করিতেছে।

জগতের ইক্ষু শর্করা :—বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে ১৯২৮-২৩ সালে জগতে মোট ১২৬,৭৬,০০০ টণ ইক্ষু শর্করা উৎপাদিত হইবে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ইহা ১০,০০০ টণ অধিক। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শর্করা কেন্দ্রের উৎপাদন নিম্নরূপ :—

কিউবা	৪০,০০,০০০ টণ
যবদ্বীপ	১৮,০০,০০০ "
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ	৪,৬৭,০০০ "
পোর্টো রিকো	৩,৫১,০০০ "
ফিলিপাইনস্	২,৮৫,০০০ "
মরিচ দ্বীপ	২,২৫,০০০ "
ব্রেজিল	৪,২৫,০০০ "
পেরু ও আর্জেনটাইন	৫,৪০,০০০ "

ফল ও জলের গুণ ঃ—বিলাতের জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সম্প্রতি লণ্ডন সহরে একটি বক্তৃতা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে ফলের গুণ তিন প্রকার :—ফলে যে শর্করা ও অম্ল আছে তদ্দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়; শর্করা দ্বারা পরিপুষ্টির সহায়তা হয়, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ফলেরই আবরণ বীজ প্রভৃতি স্বরূপ যে অপাচ্য অংশ থাকে তাহা পাকস্থলীর মাংসপেসী সংকুচনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরূপ সঙ্কোচনের ফলে পাকস্থলী হইতে সমস্ত উৎসেচনশীল পদার্থ বহির্গত হইয়া গিয়া পাকস্থলীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখে। জলের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নগরবাসীরা সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ জলপান করে। সুসভ্য জীবনের ইহা একটি দোষ। জলের পরিবর্ত্তে সভ্য সমাজে মদ্য, চা ও নানাবিধ পানীয় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সকালে ও রাত্রে অবস্থা অনুসারে এক গ্লাস ঠাণ্ডা অথবা গরম জল পান করিলে যথেষ্ট পরিমাণে উপকার হইয়া থাকে।

সার সংগ্রহ।

জম্বির দ্রাবক :—

অম্লরস যুক্ত যে কোনও প্রকার লেবুর রস হইতে জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়। ভারতের প্রতি প্রদেশে, অরণ্যে ও উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে লেবু জন্মে। বড় সহর বা সহরের উপকণ্ঠে লেবু কিছু মহার্ঘ বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামসমূহে ইহা অতি অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। পাতি, কাগজী, গোঁড়া, চীনা গোঁড়া, কমরাল, রংপুরী টাবা, আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের লেবু বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব প্রদেশে গলগল বা কর্ণ নামে একপ্রকার লেবু হয়। ইহার এক-একটির ওজন ১০ ছটাক হইতে পাঁচপোয়া পর্য্যন্ত হয়। ইহার খোসা খুব পুরু। অপরিপক্ক অবস্থায় ইহার রস বেশ অম্ল। এই লেবুর শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ রস ও সেই রসে শতকরা ৬ হইতে ৭ ভাগ জম্বীর দ্রাবক থাকে। শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা, লাহোর, জলন্ধর, পাতিয়ালা, কুমায়ুন, সাহারাণপুর ও নেপালের পাদদেশে এই লেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জলন্ধর সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ও পাতিয়ালা ষ্টেটের অন্তর্গত সিরহিন্দ নামক স্থানে এই লেবু এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে যে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেখানে উহা ২॥০-৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। স্থানীয় আচার ব্যবসায়িগণ এই সকল লেবু ক্রয় করিয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত এটোয়া, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস প্রভৃতি সহরের নিকট ও পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা অঞ্চলে খাটাই বা বেহারী খাটাই নামে এক প্রকার তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট লেবু পাওয়া যায়। এই লেবু দেখিতে ঠিক কমলালেবু বা গোঁড়া লেবুর ন্যায়। সম্ভবতঃ ইহা গোঁড়া লেবুর প্রকারভেদ মাত্র। ইহার খোসা পাতলা হয়। ইহাতে শতকরা ৫০—৫৫ ভাগ রস থাকে এবং ঐ রস হইতে শতকরা ৭·৩ হইতে ৮·৬ ভাগ জম্বীর দ্রাবক পাওয়া যায়। লুধিয়ানার নিকট এই লেবু ২॥০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। বাংলা দেশের গোঁড়া লেবুর রসে শতকরা ৬·২ হইতে ৬·৮ ভাগ ও পাতি লেবুর রসে ৫·৮ ভাগ হইতে ৬·৩ ভাগ জম্বীর দ্রাবক থাকে। এখন দেখা যাক্ কি উপায়ে লেবুর রস হইতে দ্রাবক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ছুরির সাহায্যে লেবুর খোসা ছাড়াইয়া, উহাকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া, কোনও কাঠের টবে রাখিতে হয়; খোসাগুলিও পৃথক পাত্রে সঞ্চয় করিতে হয়। কারণ, এই খোসা হইতে লেবুর গন্ধসার বা তৈল প্রস্তুত হইবে। অতঃপর আরক-চাপযন্ত্র

(Tincture Press) বা সেই প্রকারের কোনও যন্ত্র-সাহায্যে চাপ দিয়া লেবুর রস বাহির করিতে হয়। সাধারণতঃ লেবুর তাজা রসে উহার মিষ্টতা হিসাবে শতকরা ৭ হইতে ৯ ভাগ দ্রাক্ষা-শর্করা (Glucose), ০·২ হইতে ০·৪ ভাগ ইক্ষুশর্করা (Cane Sugar), ৪·৬ হইতে ৯ ভাগ জম্বীর দ্রাবক ও ০·৫ হইতে ০·৭ ভাগ বিবিধ অজৈব বা ধাতব লবণ (Inorganic Salts) পাওয়া যায়। ধাতব লবণ ও শর্করাদি থাকার জন্য লেবুর রস গাঢ় করিয়া জম্বীর দ্রাবকের দানা (Crystals) জমান যায় না, এজন্য লেবুর রস হইতে এই সকল দ্রব্য পৃথক করিতে হয়।

যেখানে লেবু খুব সস্তা অথচ জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুতের উপকরণের বিশেষ অভাব, সেখানে লেবুর রস আগুনের তাপে জ্বাল দিয়া ১·২৪ হইতে ১·২৮ আপেক্ষিক গুরুত্ব পর্য্যন্ত গাঢ় করিয়া মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া কাঠের পিপায় ভরিয়া সুবিধামত স্থানে প্রেরণ করা যায়। এরূপ অবস্থায় ইহার রং ঝোলা গুড়ের মত কাল হয় ও ইহার প্রতি গ্যালনে প্রায় ৮।৯ পাউণ্ড জম্বীর দ্রাবক থাকে। এই গাঢ় রস বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। সিসিলি, ক্যালেব্রিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে এই প্রকার গাঢ় রস প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয় ও সেখানে উহা হইতে জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত হয়; ইহাকে agrocotto বলে। দ্রাবকের অনুপাতে agrocottoর মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যেখানে লেবু সুলভ ও দ্রাবক প্রস্তুত করিবার আসবাবের অভাব নাই, সেখানে লেবুর রস অত গাঢ় করিবার প্রয়োজন হয় না। রসটা আধঘণ্টা কাল ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলে। এই প্রক্রিয়ার শ্বেতসার প্রভৃতি কয়েকটা পদার্থ পৃথক হয়।

একটী কাঠের টবের মধ্যে ২০ গ্যালন পরিষ্কার জল রাখিয়া উহার সহিত ৪ গ্যালন গাঢ় রস প্রায় আধঘণ্টা কাল মিশাইয়া ৭।৮ ঘণ্টা রাখিতে হয়। রসস্থ শর্করা পচিয়া (fermented) সুরায় পরিণত হয় ও রসের অন্যান্য ময়লা কাটিয়া গিয়া বেশ পরিষ্কার হয়। এখন ঐ টবের মধ্যে একটা কুণ্ডলাকার সীসার নালী (lead coil) রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া শীতল জল চালিয়া দ্রব্যটীকে সেন্টিগ্রেডের ৫% ডিগ্রি তাপ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিতে হয়। এই অবস্থায় রসের মধ্যস্থ অধিকাংশ আটাবৎ পদার্থ (Mucilaginous Matter) পৃথক হয়। অতঃপর উহার সহিত সামান্য ট্যানিক্ দ্রাবক অথবা হরিতকী ভিজান জল মিশাইলে এই আটাবৎ পদার্থ ঘনীভূত হয় ও আর দ্রাবকে দ্রব হয় না। পরে এই দ্রবটী চাপছাঁকন্ যন্ত্র (Filter Press) অথবা মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া অপর একটী কাঠের টবের মধ্যে ঢালা হয়। এই টবের মধ্যে একটী সচ্ছিদ্র কুণ্ডলাকার সীসার নালীর (Perforated lead coil) থাকে ও সেই নালীর মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প (Steam) চালিত করিয়া দ্রব্যটীকে উত্তপ্ত করা হয়। উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে এই দ্রব্য হইতে সুরাসার বাহির করিয়া লওয়া যায়। বাষ্প সহযোগে দ্রব্যের সুরাসার

বাষ্পে পরিণত করিয়া বাষ্প ঘনীকরণ যন্ত্রের (condenser) মধ্য দিয়া চালিত করিতে হয়। এই বাষ্প ঘনীকরণ যন্ত্রটী সর্ব্বদা শীতল জল দ্বারা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। সুরাসারের বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয় ও উপযুক্ত আধারে সঞ্চিত হয়।

এখন ঐ ফুটন্ত দ্রব্যের সহিত গাঢ় চুণ গোলা (milk of lime) অথবা চা খড়ির মিহি গুঁড়া মিশাইয়া ঠিক ঠিক ভাবে উহার অম্লত্ব নষ্ট করিতে হইবে। চা খড়ির সাহায্যে অম্লনাশ (Neutral) করিলে অধিক ফেনা হয় ও উপচিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু এই প্রকারে যে জম্বীর চূর্ণক (calcium citrate) পাওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। অন্যদিকে চুণের গোলা বা আহক (Quick lime) দিয়া অম্লনাশ (Neutral) করিলে উহার সহিত অন্যান্য ধাতব পদার্থ থাকায় জম্বীরচূর্ণকের বর্ণ ময়লা হয় ও অনেক অসুবিধা উৎপন্ন হয়। কখন-কখনও ১ ভাগ চা-খড়ি ও ২ ভাগ চুণের গোলা মিশাইয়া তদ্দ্বারা অম্লনাশ (Neutral) করা হয়। প্রতি একশত ভাগ জম্বীর দ্রাবকে ৪৫ ভাগ পাথুরে চুণ অথবা ৫৭ ভাগ আহক বা ফোটান চুণ অথবা ৮০ ভাগ চা-খড়ি মিশাইবার প্রয়োজন হয়। চুণ বা খড়ি মিশাইয়া কিয়ৎকাল উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করিয়া উহা থিতাইতে দিলে অদ্রবনীয় (insoluble) জম্বীর চূর্ণক টবের তলায় জমে। এখন এই জম্বীর চূর্ণক চাপ ছাঁকন যন্ত্র অথবা মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া ১০ মিনিট ফুটন্ত জলে, ১০ মিনিট ঈষদুষ্ণ ও ১০ মিনিট শীতল জলে ধুইতে হইবে। ধৌতজল যেন বর্ণহীন হয়; নতুবা পুনরায় উহা শীতল জলে ধৌত করিতে হয়। অতঃপর একটি সীসার চাদরে মোড়া কাটের টবের মধ্যে জম্বীর চূর্ণক রাখিয়া উহার সহিত প্রায় ১২ গ্যালন শীতল জল মিশাইতে হয়। অপর একটি সীসার চাদরে মোড়া টবে এক ভাগ গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও ৪ ভাগ জল মিশাইয়া ১৬ গ্যালন করিতে হইবে। এই তরলিত দ্রাবক ধীরে ধীরে জম্বীর চূর্ণক দ্রাবকের সহিত মিশাইতে হয়। প্রতি মিনিটে পাঁচ পাউণ্ডের অধিক দ্রাবক মিশান উচিত নয়। এইরূপে গন্ধক দ্রাবক মিশাইতে মিশাইতে জম্বীর চূর্ণক হইতে সমস্ত চূর্ণ দ্রাবকের সহিত মিশিয়া অধঃনিক্ষিপ্ত হয় ও জম্বীর দ্রাবক জলের সহিত মিশিয়া থাকে। সাধারণতঃ ৪ গ্যালন গাঢ় দ্রাবকরসে অথবা ৩৫ গ্যালন অল্প ফুটান পাতলা রসে প্রায় ১৪ হইতে ১৬ গ্যালন গন্ধক দ্রাবক দ্রব প্রয়োজন হয়। গন্ধক দ্রাবক কিছু বেশী মিশান বাঞ্ছনীয়। কম হইলে অপরিবর্ত্তিত জম্বীর চূর্ণক দানা জমিবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয়। গন্ধদ্রাবক মিশাইবার সময় দ্রবটী বাষ্প দ্বারা গরম করিতে ও নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়। প্রায় ১৫ মিনিটকাল ফুটাইবার পর চাপ ছাকনযন্ত্র বা কাপড় দিয়া ছাকিয়া কাপড়ের উপরস্থ চূর্ণকগন্ধকাম্ল (Calcium Sulphate) গরম জলে ধুইতে হয়। এই ধোয়ানী জল জম্বীর দ্রাবক দ্রবের সহিত মিশাইতে হয়। চূর্ণকগন্ধকাম্লটী পুনরায় ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ধোয়ানী জলটী পৃথক পাত্রে রাখিতে হয়। এই ধোয়ানী জলে জম্বীরচূর্ণক দ্রব করা হয়। ৪ ফুট লম্বা ২॥০ ফুট প্রস্থ

ও ১০ ইঞ্চি গভীর একটী সীসার কড়ায় জম্বীর দ্রাবক দ্রবটী বাষ্পতাপে শুখাইতে হয়। শুখাইবার কালে দুইটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ উহার তাপ যেন সেন্টিগ্রেডের ৭% ডিগ্রীর অধিক না হয়। দ্বিতীয়তঃ এই শুকান কার্য্য সত্বর শেষ করিতে হয়। এইরূপে জল শুকাইয়া যখন ঐ দ্রবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩ হয় তখন আরও চূর্ণকগন্ধায় Calcium Sulphate) পৃথক হইয়া তলায় পড়ে। অতঃপর পরিষ্কার দ্রবটী বকনল (syphon) সাহায্যে পৃথক করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আর একটা সীসার কড়ায় গাঢ় করিতে হয়। গাঢ় করিতে করিতে যখন দ্রবের উপরে সর পড়িবে, তখন দ্রবটী একটী কাঠের চৌকষ পাত্রে ঢালিয়া দানা বাঁধিতে দেওয়া হয়। এই কাঠের পাত্রটির ভিতর দিকটা সীসার চাদরে মোড়া থাকে; অথবা কালসীসা (Graphete বা Plumbago) দ্বারা মাজা বা পালিশ করা হয়। প্রায় ২।৩ দিন পরে জম্বীর দ্রাবকের দানাগুলি পাটকিলে রংএর দ্রব হইতে উঠাইয়া লইয়া কেন্দ্রাপসারিণী-জল নিষ্কাষণ যন্ত্র (Centrifugal Hydroextraetor) দ্বারা শুকাইয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট দ্রব হইতে দ্রবীভূত লৌহ পৃথক্ করিতে হইলে, ঐ দ্রবের সহিত কিঞ্চিৎ পীত লোহাঙ্গার (potassium Ferocyanide বা yellow prussiate of Potash) মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। দুই-তিনবার দানা বাঁধাইবার পর অবশিষ্ট দ্রবটী তাজা লেবুর রসের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। অধুনা ইয়োরোপের প্রায় সকল জম্বীর দ্রাবকের কারখানাতে ও আমেরিকায় চূর্ণক-গন্ধায় পৃথক করিবার পর দ্রবটী বায়ুহীন কটাহে (vacuum pan) গাঢ় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অতি অল্প তাপে সত্বর গাঢ় করা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে দানা পাওয়া যায়, উহার রং পাটকিলে। সুতরাং উহা বাজারে চলে না। এই পাটকিলে রংএর দানা বর্ণহীন করিতে হয়। এজন্য হাড়ের কয়লা দরকার। খানিকটা হাড়ের কয়লা লবণ-দ্রাবক (Hydrochloric acid) দিয়া ধুইয়া, পরে পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইতে হয়। এক জম্বীর দ্রাবকের দানার সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া, উহার সহিত এই হাড়ের কয়লা মিশাইয়া কুটাইয়া ছাঁকিতে হয়। পরে পরিষ্কার দ্রবটী অতি অল্প বাষ্পতাপে অথবা বায়ুহীন কটাহে গাঢ় করিয়া দানা বাঁধান হয়।

রঞ্জন-শিল্প (Dyeing). ঔষধ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সরবৎ প্রভৃতি স্নিগ্ধকর পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্য জম্বীর দ্রাবক ব্যবহৃত হয়।

১০ মণ লেবু হইতে প্রায় ৫।০ মণ রস ও উহার শতকরা ৬ ভাগ দ্রাবক হিসাবে মোট ১২ সের দ্রাবক পাওয়া যায়। এই দ্রাবক প্রতি সের ৫৲ হিসাবে বিক্রয় করা যায়। সুতরাং ১২ সের দ্রাবক হইতে ৬০৲ পাওয়া যাইবে।

লেবুর খোসাতে শতকরা ০·২৬ হইতে ০·৩৫ ভাগ গন্ধ তৈল আছে। খোসাগুলি চাপযন্ত্র দ্বারা নিংড়াইয়া উহার তৈল বাহির করা হয়। ১০ মণ লেবু হইতে প্রায় এক

পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায় ও উহা প্রায় ৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

আমেরিকা ব্যতীত সকল দেশেই সিসিলি ও স্পেন হইতে জম্বীর চূর্ণক ও agro-cotto আমদানী করিয়া দ্রাবক প্রস্তুত করে। কেবল সিসি'ল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৯০০০ টন জম্বীর চূর্ণক প্রতি টন ৫০০০৲ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল।

১৯২০ খৃঃ এপ্রিল হইতে ১৯২১ খৃঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ মাসে ভারতে ৩৫৪ হন্দর জম্বীর দ্রাবক ১২৩৯৫৫৲ টাকার বিনিময়ে আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল ও মে এই দুই মাসে ৬২৩৪ টাকায় মাত্র ২৬ হন্দর জম্বীর দ্রাবক ভারতে আমদানী হইয়াছে। ভারতবর্ষ—ফাল্গুন।

জল হাওয়া ও ফসল।

ভারতীয় কৃষি—সমস্ত বৃটিশ শাসিত ভারতের কৃষি ১৯২১—২২ সালের কৃষিজাত ফসল সমূহ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত বৎসর মোট ২২৩০ লক্ষ একর জমি চাষ হয়। ইহার মধ্যে ৩৪০ একর দোফসলী জমি। কেবল পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশেই জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা কম, মোটে ৪৮০ একর। আবাদী জমিকে খাদ্য ফসল উৎপাদক ও অন্যান্য ফসল উৎপদক এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে প্রথমোক্তের পরিমাণ ২১৬০ লক্ষ ও শেষোক্তের পরিমাণ ৪১০ লক্ষ একর। রাগী এবং জোয়ার ব্যতীত অন্য সমস্ত খাদ্য ফসলই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইরাছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ফসলের জমি ১০ লক্ষ একর হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারে নীলচাষ সাধারণতঃ বিহারে ৮টী জেলায় নীলের চাষ হয়। তন্মধ্যে সাহাবাদ জেলায় এবার চাষ হয় নাই। জলবায়ুর অবস্থা ভাল না থাকায় ও বন্যার জন্য এবার নীল উৎপাদন আদৌ সুবিধাজনক হয় নাই। এবার নীলের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৫,৪০০ একর। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা ৪,৫০০ কম। নীলও এবৎসর আনুমানিক ৬১৩৫ মন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৭১ মণ কম হইবে। জমির আধিক্যের হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলা নীলচাসের প্রধান কেন্দ্র :—মজঃফরপুর চাম্পারন, দ্বারবঙ্গ, সারন, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের ও ভাগলপুর।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান।—ফাল্গুন মাসের জল পড়িলেই উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের ঐ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন শেষে করিলেই ভাল হয়। সেইগুলিতে জল সেচন একটা প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোসাস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র।—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁক মাটী ও সার দিতে হয়। বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে পারা যায়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—এখন বেল, জুঁই মল্লিকা ফুটিতেছে; এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট ক্যাণ্ডিটাফ্ট পপি, অ্যাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।
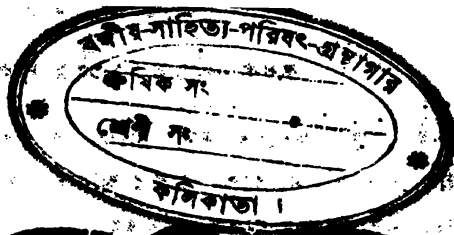
২৩শ খণ্ড { কৃষক—চৈত্র, ১৩২৯ সাল। } ১২শ সংখ্যা

বাংলার কৃষি ১৯২১-২২।

১৯২১-২২ সালে বঙ্গদেশে উৎপাদিত ফসলাদি সম্বন্ধে যে বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংকলিত হইল:—

কুচবিহার, স্বাধীন ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য বাদ দিয়া বঙ্গদেশের মোট বর্গফল ৫০৩ লক্ষ একারের কিছু অধিক। ইহার অর্দ্ধাংশের কম জমিতে অর্থাৎ ২৩৭ লক্ষ একারে চাষ হয়। জলাভাব যে এতদ্দেশে চাষের একটি প্রধান অন্তরায় তাহা সকলেই জানেন। বৃষ্টির জল ব্যতীত কূপ, তড়াগ ও খালই জলসেচনের অন্যতম উপায়। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত চাষের জমির মধ্যে কেবলমাত্র কিছু কম ২০ লক্ষ একারে জলসেচনের ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে ধানের জমি ১৫ লক্ষ একার। লক্ষাধিক একারে জল সেচনের ব্যবস্থা শুধু মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও জলপাইগুড়িতেই আছে।

বাংলার ফসলের মধ্যে ধানই অবশ্য সর্ব্বপ্রধান। ইহার আবাদের জমি ২১৮ লক্ষ একারের উপর। তাহার নিচেই পাট—১৩ লক্ষ একার ও সরিষা ৮ লক্ষ একার। গোধূম, ছোলা, তিসি, তিল, ইক্ষু, চা, তামাক, প্রত্যেকই লক্ষাধিক একারে উৎপাদিত হইয়া থাকে বটে কিন্তু তামাক ব্যতীত কোনটিরই চাষের জমির পরিমাণ ২½ লক্ষ

টাকা। সুতরাং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে বাংলার জন্যই প্রধানতঃ বিলাতী লবণের আমদানি। কারন শতকরা ৮৫ ভাগ বিলাতী লবণের খরিদ্দার বাঙ্গালী।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিলাতী লবণের কাটতি অতি সামান্য। দেশীয় লবণই এই সব প্রদেশে অধিক চলে। এক্ষণে দেখা যাক্ দেশী লবণ কোন্ কোন্ স্থানে এবং কি প্রথায় প্রস্তুত হয়। দেশীয় লবণের উৎপত্তি ত্রিবিধ :—(১) সমুদ্র জল সূর্য্যোত্তাপে ঘনীভূত করণ; মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই উপায়ে লবণ প্রস্তুত হয় এবং বাংলায়ও পূর্ব্বে হইত; (২) লবণ হ্রদ অথবা ভূগর্ভস্থ লবণাক্ত জল হইতে প্রাপ্ত লবণ। রাজপুতানা, সিন্ধুদেশ ও সিন্ধু নদের ব-দ্বীপাংশে এইরূপ লবণাক্ত জল দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে জয়পুর ও যোধপুরের সীমান্তবর্ত্তী সম্ভর হ্রদই সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। ইহার আয়তন প্রায় ৯০ বর্গ মাইল। বহু পুরাকাল হইতে এখানে লবণ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। (৩) পঞ্চনদ, কোহাট ও মান্দি রাজ্যের লবণ খনি সমূহ; এই খনিজ লবণ সৈন্ধব নামে পরিচিত।

ভারতের উপকূলে অনেক স্থানেই লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। পশ্চিমাংশে লবণ জল পূর্ণ ছোট বড় জলাশয়ের অভাব নাই। পঞ্চনদে ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে লবণের এত আধিক্য যে উক্ত অঞ্চলে একটি পর্ব্বত মালার নামই Salt Range অর্থাৎ লবণ পর্ব্বত হইয়াছে। লবণ প্রস্তুতের এত সুযোগ সত্বেও বিদেশ হইতে ভারতে লবণ আমদানি বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া অনেকেরই মনে হয়। কিন্তু একদল লোকের মত এই যে লবণের মত দ্রব্য উৎপত্তি স্থান হইতে ৩০০ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেলে খরচে পোষায় না। কিন্তু বিদেশীয় লবণ আমদানির পূর্ব্বে কিরূপে ভারতীয় লবণই দেশের অভাব মোচন করিতে পারিত এবং বর্ত্তমান পথঘাটের সুবিধায় লবণ অপেক্ষা কম মূল্যের দ্রব্যও রপ্তানি করিয়া সওদাগরেরা কিরূপে লাভ করিতেছেন— এই সমুদয় কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর উক্ত দলের লোকেরা দিতে পারেন না। ঐরূপ লোকেই আবার বলিয়া থাকেন যে বাংলায় লবণ প্রস্তুত আদৌ লাভ জনক হইতে পারে না। কারণ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া এত অধিক পরিমাণ স্বাদু জল বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়ে যে তাহাতে সমুদ্র জলের লবণের মাত্রা খুবই কমিয়া যায়। কাজেই বঙ্গদেশে বিলাতী লবণ ব্যবহার ভিন্ন আর কোন গতিই নাই। বলা বাহুল্য যে বৈজ্ঞানিক বিচারে পূর্ব্বোক্ত কোন অসার যুক্তিই টেকে না। সমুদ্র ও লবণাক্ত জলাশয়ের জল হইতে লবণ প্রস্তুতের আজকাল এত উন্নত প্রথা হইয়াছে যে যৎসামান্য মূল্যে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে এবং যেরূপ জাহাজে লবণের মাশুল অতি সামান্য, রেলেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অনায়াসে দেশীয় লবণ লইয়া যাইতে পারা যায়। আর ইহাও নিঃসন্দেহ যে ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি যদি ভারতবাসীর উন্নতি কল্পে গঠিত হইত তাহা হইলে লবণ সম্বন্ধে ভারত অচিরেই স্বাবলম্বী হইতে পারিত।

কিন্তু বাস্তবিকই লবণ শুল্কের সহিত রাজনীতির হিসাবে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার কমই সম্বন্ধ আছে। রাজকীয় অর্থকোষের প্রয়োজন হিসাবে এই শুল্ক কম বেশী করা হইয়া থাকে। সাধারণের যে কি সুবিধা অসুবিধা হইবে তাহা দেখা হয় না। ১৮৮৮ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত লবণ শুল্ক মন প্রতি ২॥০ টাকা ছিল। ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া ১৯০৭ সালে উহা ১৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর আবার শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়া ১।০ করা হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ হইল। সরকার পক্ষ যাহাই বলুন, ইহা কিন্তু প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে লবণ-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। শুল্ক বাড়িলেই লবণের কাটতি কমিয়া যায় এবং কমিলেই লবণ অধিক পরিমাণে খরচ হয়। ১৯০৩ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত লবণের শুল্ক হ্রাস হওয়ায় শতকরা ২৫ ভাগ কাটতি বাড়িয়াছিল। সুতরাং ইহা গুরুতর সন্দেহের বিষয় যে যে উদ্দেশ্যে অর্থসচিব লবণ-শুল্ক বৃদ্ধির জন্য এত জিদ্ দেখাইয়াছেন তাহা সফল হয় কি না।

লবণ যে কেবল আহার্য্য রূপেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। অন্যান্য শিল্পের সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। সোডা সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কষ্টিক সোডা, ক্লোরিণ প্রভৃতি রাসায়ণিক শিল্পের ভিত্তি লবণ। সংরক্ষিত মৎস শিল্পেও লবণের যথেষ্ট আবশ্যক। অবশ্য এই কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে, সরকার কিছু কম দরে লবণ দেন। কিন্তু যতদিন না সুলভ লবণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে ততদিন সংরক্ষিত মৎসের সমধিক প্রসার হইতে পারিতেছে না। আমরা সেই জন্য আশা করি যে এক বৎসরের জন্য বসাইলেও সরকার লবণ-করের অযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।
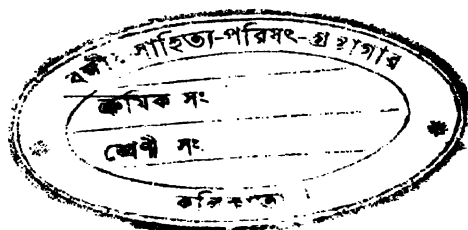
দেশের ও দশের কথা।

বাংলায় কৃষি শিক্ষা :—উচ্চ কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই বঙ্গদেশে নাই তাহা অনেকেই জানেন। পার্শ্ববর্ত্তী বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গালী ছাত্রগণ শিক্ষার জন্য যাইতেন, কিন্তু উক্ত প্রদেশের সবর কলেজেও শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। এখন বাংলার থাকিবার মধ্যে আছে বর্দ্ধমান জেলার অনরপুরে মধ্য কৃষি স্কুল ও চট্টগ্রাম জেলার দুর্গাপুর উচ্চ কৃষি স্কুল। দুটিই স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন ঢাকা ও চুঁচুড়া সরকারী পরীক্ষা ক্ষেত্র সংলগ্ন দুইটি মধ্য কৃষি স্কুল আছে। উভয় স্কুলেই ছাত্র দিগকে মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বৃত্তির উদ্দেশ্য যাহাতে শিক্ষাকালে ছাত্রেরা নিজ নিজ খাদ্যাদির খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা অতি সামান্য।

উন্নত ফসল প্রবর্ত্তন :—কৃষি বিভাগের চেষ্টায় ও সরকারী ক্ষেত্র সমূহে উৎপাদিত বীজের সাহায্যে যে সমুদয় উন্নত জাতীয় ফসল বঙ্গে সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলি উল্লেখ যোগ্য :—কটকতারা, ইন্দ্র শাল ও নাগরা ধান; ইহাদের ফসল সাধারণ ধান হইতে বিঘা প্রতি ১-৩-মণ অধিক। ৫৬, ২৮৬ একরে ইহাদের আপাততঃ চাষ হইতেছে। চিনার বাদামের চাষের পরিসর ১৪০০ একর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যাকিয়া বোম্বাই ও সবুজ বীজ ওলিটরিয়স্ পাটের চাষ ১ লক্ষ একরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থানীয় পাট অপেক্ষা ইহাদের তন্তু ভাল এবং পরিমাণও অধিক হয়। 'পুষা ১২' গোধুম ও টানা আখ্ যথা ক্রমে ২৫৬ ও ৯১৮ একরে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের চাষের জমির অনুপাতে নব প্রবর্ত্তিত ফসল সমূহের জমি কম হইলেও ইহাদের ভবিষ্যত আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

নারিকেলের গুড় :—এতদঞ্চলে খেজুর ও সামান্য পরিমাণে তালের গুড়ের প্রচলন আছে। কিন্তু নারিকেলের গুড় এক রকম নাই বলিলেই চলে। মাদ্রাজে কিন্তু সাধারণতঃ নারিকেল গাছ হইতে তাড়ি ও গুড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। যে পাত্রে নারিকেল রস সংগ্রহ করা হয় তাহার ভিতরে চুণ মাখান থাকে। তাহাতে গাঁজান অনেকটা বন্ধ হয় বটে কিন্তু অন্য প্রকারে রস খারাপ হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সামান্য ফটকিরি মিশ্রিত করিলে ও বালির ভিতর দিয়া রস পরিষ্কৃত করিয়া লইলে উক্ত রস হইতে যে গুড় উৎপাদিত হয় তাহার বর্ণ ও গুণ সাধারণ-প্রস্তুত গুড় অপেক্ষা অনেক ভাল। আমাদের দেশে খেজুর রসও এই উপায়ে শোধিত করিয়া লইতে পারা যায়।

লবণাক্ত জমির পুনরুদ্ধার :—পঞ্চনদ প্রদেশে বারি বিরল স্থানে লবণাক্ত জমির অভাব নাই। লবণের আধিক্যের জন্য অনেক জেলাতেই সহস্র সহস্র বিঘা অনাবাদী জমি পড়িয়া আছে। কি উপায়ে এই সমুদয় জমির পুনরুদ্ধার হইতে পারে তাহা পঞ্চনদের কৃষির একটি প্রধান সমস্যা। মন্টগোমরী জেলায় তিনটি প্রথা সম্প্রতি অবলম্বিত হইয়াছিল ;—(১) জমির উপর হইতে লবণের স্তর চাঁছিয়া ফেলা ও পরে আবাদ করা; (২) অধিক পরিমানে জল সেচন এবং চাষের অনতিপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জমিতে জল জমাইয়া রাখা ; (৩) জমি চাঁছিয়া ফেলা ও একবৎসর অনাবাদী রাখা। ফলে দেখা যায় যে জল জমাইয়া রাখা অপেক্ষা উপরের লবণ স্তর চাঁছিয়া ফেলিলে ফসলের মাত্রা অধিক হয়। যে জমি হইতে লবণ স্তর অপসৃত হইয়াছে তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে আর লবণ উঠিতে প্রায় দেখা যায় না।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম :—বাইশ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারে রামকৃষ্ণ মিসন কর্তৃক একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশী, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের সেবাশ্রম গুলির ন্যায় হিমালয়ের পাদদেশে এই সেবাশ্রম দ্বারা সাধারণের প্রভূত উপকার সাধি তইহতেছে। এই সেবাশ্রমের ১৯২১ সালের বার্ষিক বিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে আশ্রম সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতালে ১৫০০০ এরও অধিক রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীর মধ্যে সাধু সন্নাসী, ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়। ব্যারামের মধ্যে ম্যালেরিয়ার রোগীর সংখ্যা দুই হাজারের উপর। বাত, প্লীহা বৃদ্ধি, উদরাময়, অজীর্ণ; পাঁচড়া দাদ, চক্ষু ও কর্ণের রোগ, সর্দ্দি কাসি, ক্ষত, প্রভৃতি ব্যারামের প্রত্যেকটিতে তিন শতের অধিক রোগী চিকিসিত হইয়াছে। আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে ১৯২১ সালে আশ্রমের তহবিলে জমা ছিল ২২১৫১৮৶১০ ; তন্মধ্যে খরচ হইয়াছে ১৬,৫৩২৷১০ ও উদ্বৃত্ত আছে ৫৬১৯৷৷৶০। আশ্রমের কিন্তু যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন। বাহিরের রোগীর জন্য একটি ঔষধালয়, রাত্রি স্কুলের জন্য বাটী, রোগীগণের আত্মীয় স্বজনের জন্য বিশ্রামাগার, স্থায়ী তহবিল ও সাধারণ খরচের তহবিল এই সমস্ত উদ্দেশ্যে আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। হরিদ্বার হিন্দুর অন্যতম তীর্থ; কিন্তু এখানে যেরূপ লোক সমাগম হয় সেই অনুপাতে দুঃস্থ ও আতুর জনগণকে সাহায্য করিবার চেষ্টা কম। আমরা আশা করি সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কনখল সেবাশ্রমের সাহায্য করিয়া স্বামি বিবেকানন্দের একটি মহৎ কীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিবেন।

কার্পাস কীট —কার্পাসে অনেক সময় ভয়ানক কীট লাগে। কার্পাস ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে বন্য সিঙ্কিগাছ লাগাইলে তাহার তীব্র গন্ধে কীট সকল পলায়ন করে। ক্ষেত্রে তামাক ও গন্ধকের ধূম দিতে হয়। প্রবাহমান বাতাসের দিকে ম পাত্রটি

বসাইয়া দিলে কীটাদি মরিয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে ক্ষেত্রে মশালাদি জ্বালিলে তাহাতে পড়িয়া অনেক কীট মারা যায়। (উদ্ধৃত)

নিম গাছে মিষ্ট রস।—রাজসাহী জেলার তাতর থানার অধীন আভোল গ্রামের শীতল সরকারের বাড়ীর সন্নিকটে একটী নিম বৃক্ষ আছে। অদ্য কয়েক মাস যাবত ঐ বৃক্ষ মূলের আন্দাজ দুই হাত উপরে ছোট ছোট তিনটী ছিদ্র হইয়া তাহা হইতে রস গড়াইতে থাকে। কয়েক দিন পর ঐ বৃক্ষের মালিক টের পান এবং উহার রস পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ঐ নিমের রস খেজুরের রসের মত মিষ্ট। বৃক্ষের মালিক ঐ ছিদ্রের নিয়ে নিয়ে একটী পাতাড়ী লাগাইয়া তাহাতে একটি পাতিল স্থাপন করেন; এবং রস পাক করিয়া গুড় তৈয়ার করেন। আজকাল ঐ গাছ হইতে ছয় সাত সের রস দিবা রাত্রিতে সঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার গুড় টাকায় দুই সের দরে বিক্রয় হইতেছে। সম্মিলনী।

কৃষির জন্য সরকারী ব্যয়ঃ—এতদ্দেশে প্রতিবৎসর কি পরিমাণ অর্থ কৃষির উন্নতি কল্পে খরচ হয় তাহার ১৯২১-২২ সালের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভারত গবর্ণমেণ্ট :—

পুষা কৃষি গবেষণাগারের সাধারণ খরচ (কৃষি বিষয়ক পরামর্শ দাতার আফিস সমেত)	২,৮৮,৭০৭
উদ্ভিদ্ তত্ত্ব বিভাগ	৫৯,৭৫৯
রসায়ন তত্ত্ব "	৫২,৭৪৪
শরীরতত্ত্ব রসায়ণ "	২৪,৮১৮
জীবাণু তত্ত্ব "	৫৩,৪৫০
ছত্রক তত্ত্ব "	৪৮,৭২৩
কীটতত্ত্ব "	৫৭,০১২
রেশম উৎপাদক কীটতত্ত্ব "	১৬,১৩৫
কৃষিতত্ত্ব "	১,১৯,১৮১
প্রোটো জুলজি "	১৯,২১৭
নীলতত্ত্ব "	৪১,২৩০
দুগ্ধতত্ত্ব বিৎ	২২,১৩৮
শর্করা বোর্ড	৩৩,১৬৩
তুলা কমিটি	১,২৯,৫৯১
মোট ব্যয়	১,২১,৫০,৯৮৮

মুক্তেশ্বরে অবস্থিত	
জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ক পরীক্ষাগার	৭,০৬,৩৩১৲
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ :—	
বাংলা	৯,৮১,৯১১৲
বিহার ও উড়িষ্যা	৪,৭১,৫২৯৲
যুক্তপ্রদেশ	২১,৩৩,০০১৲
পঞ্চনদ	১৬,৭২,০৭২৲
বোম্বাই	১৯,৫০,২৫৪৲
মান্দ্রাজ	১৩,৮৬,০০৫৲
মধ্য প্রদেশ	৯,৫৫,৮০০৲
ব্রহ্ম	৫,২২,৬১৫৲
আসাম	৩,২১,০০৯৲
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫৫,৯৫৪৲
বেলুচিস্থান	২৮,৪৬১৲
	১,০৪,৭৮,৭০১৲
সর্ব্বসমেত ব্যয়	১,২১,৫০,৯৮৮৲

সমসাময়িক জগত।

ইক্ষু পরিপক্ক হওয়ার সময়:—যবদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে ইক্ষুচাষের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে ইক্ষুচাষের বিস্তৃতি যেরূপ, চাষ পদ্ধতিও সেইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিচালিত। সম্প্রতি ইক্ষুতে শর্করার মাত্রার সহিত ইক্ষু ছেদনের সময়ের সম্বন্ধ বিষয়ক কয়েকটী পরীক্ষা যবদ্বীপে হইয়াছে। তাহার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আখ্ পাকিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা করে—আলোকশক্তি। এই জন্য আখের সারির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকা দরকার। আখ্ বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথাও সর্ব্বস্থলে ঠিক কিনা সন্দেহ। রোপণ করার মাস ও আখের বয়সের উপর আখের শর্করার মাত্রা ও পরিপক্কতা নির্ভর করে। জল হাওয়ার অবস্থা ভাল হইলে পরে পরে রোপিত আখ্ এক সময়ে পরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে আগেকার বসান আখ হইতেই উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যায়। আরও দেখা গিয়াছে যে আখ্ কাটার সময় যত জল বৃষ্টি কম হয় ততই ভাল। সে সময়ে ঠিক আখ্ বাঁচিয়া থাকার মত জমিতে শৈত্য থাকিলেই আখ সুপরিপক্ক হয়।

রুশিয়ায় কার্পাস চাষ:—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অশান্তিময় বর্ত্তমান রুশিয়ায় কার্পাস চাষের জমি কমিয়া আসিতেছে। তুর্কিস্থান ও ককেশস পর্ব্বতের কোন কোন স্থান রুশিয়ার তুলা চাষের প্রধান কেন্দ্র। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ২২২০০০ টন তুলা রুশে উৎপাদিত হইয়াছিল। তুর্কিস্থানে বারিহীন মরুময় প্রান্তরকে কার্পাস-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্বকার গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বর্ত্তমান যুগান্তরের সময় রুশিয়াকে তুলার জন্য ততটা কষ্ট পাইতে হইতেছে না। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে সভায়েট তুলা চাষের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই; বরং ক্ষতিই করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৯২২ সালে তুলার জমির পরিমাণ মোটে ১৮৯০০০ একর হইবে। ১৯১৩ সালে যে পরিমাণ জমিতে তুলা চাষ হইত ইহা তাহার এক দশমাংশ মাত্র। এইরূপ হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে সোভায়েট বিশেষ বিশেষ সমিতির উপর তুলার মূল্য স্থির করিবার ভার দিয়াছেন; তাহাতে যে দর স্থির হয় সে দরে চাষীদের আদৌ পোষায় না। লোকসান দেওয়া অপেক্ষা চাষ না করাই ভাল—এই মতলবে অনেক তুলা-চাষীই কার্পাস উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইতালীতে চা'র চাষ:—কতিপয় বৎসর হইতে পরীক্ষা করিয়া ইতালীর কৃষি বিভাগের কর্ত্তাগণ দেখিয়াছেন যে ইতালীর স্থানে স্থানে চা উৎপাদন হইতে

পারে। ফ্লোরেন্স, পিসা, নেপলস্ প্রভৃতি অঞ্চলে চা-চাষ অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। পিসার নিকটবর্ত্তী যে দুই একটী স্থানে চা হইয়াছে সেখানে গাছগুলি বেশ ভাল হইয়াছে ও পাতায়ও সদ্‌গন্ধ-যুক্ত চা হয় দেখা গিয়াছে। এই কয়েকটি পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া সরকারি ও বেসরকারি কয়েকজন ব্যক্তি ইতালীতে চা-উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে আমাদের দেশের চা-করগণের বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। কারণ ইতালীতে চা উৎপাদিত হইলেও অতি সামান্য স্থানে হইতে পারিবে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহ আদৌ চা উৎপাদনের যোগ্য নয়।

ডিম্ব-চূর্ণ:—ডিম সকলে ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু ইহা একটি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর আহার্য্য। হাঁস, মুরগীর ডিমের ব্যবসায় প্রত্যেক সহরাঞ্চলেই অল্পবিস্তর পরিমাণে আছে। ইহাদের আমদানি রপ্তানির কাজও নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু এই ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় এই যে ডিম অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে না। সেই জন্য সংরক্ষিত ডিমের প্রচলন ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। যে কয় প্রকার ডিম-সংরক্ষণের প্রথা আছে তন্মধ্যে ডিমের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ বাহির করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জল ও সামান্য পরিমাণ সোডা বাইকার্ব্বোনেট সহযোগে অণ্ডলাল বেশ করিয়া ফেটাইয়া লওয়া হয়; তৎপরে একটি ঘূর্ণায়মান, তপ্ত Cylinder-এর (বৃহদাকার নল) উপর উক্ত মিশ্রণ সমভাবে ছিটাইয়া দিলে নলের উপর এক স্তর ডিম্বলাল আবরণ জমিয়া শুকাইয়া যায়। ঐ আবরণ চাঁছিয়া লইয়া গুঁড়া করিলেই ডিম্বচূর্ণ হইল। উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে অথবা বায়ুরুদ্ধ কটাহেও ডিম্বলাল শুষ্ক করা যাইতে পারে। গুঁড়া করিবার সময় কেহ কেহ লবণ অথবা চিনি সামান্য মাত্রায় ডিমের সহিত মিশাইয়া দেন। ডিম চূর্ণ প্রস্তুতের কলের মূল্য আয়তন হিসাবে ১৫০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা।

আখ হইতে মোম্:—ইক্ষুদণ্ডের প্রধান উপাদান শর্করাযুক্ত রস ও তন্তুময় অংশ বলিয়া অনেকেই জানেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে ইহাতে মোমের মাত্রাও নিতান্ত কম নয়। ১ লক্ষ টন আখে প্রায় ২৫০ টন মোম পাওয়া যায়। রস ফুটাইবার সময় যে 'গাদ' অপসৃত করা হয় তাহার সঙ্গেই এই মোম থাকিয়া যায়। আপাততঃ মোম বাহির করিবার একমাত্র উপায় শুষ্কীকৃত গাদে বেনজিন্ প্রয়োগ। এই প্রকারে যে মোম পাওয়া যায় তাহা স্বাভাবিক মোমের ন্যায় পীতাভ ও কঠিন।

মশার উদ্ভিদ্ শত্রু:—ইতালীর বারসিলোনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে জলে Chara foetida জন্মায় তাহার সংস্পর্শে মশক-কীড়া আসিলে মরিয়া যায়। 'কারা' গাছের চারিদিকে জলের উপর সরের মত

একটি আবরণ পড়িয়া থাকে। প্রথমতঃ অনুমাণ করা হইয়াছিল যে উক্ত আবরনই মশক কীড়ার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে আবরণ অপসৃত করিয়া দিলেও মশক কীড়া বাঁচে না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে 'কারা' উদ্ভিদ্ হইতে এমন কোন পদার্থ নিঃসৃত হয় যাহা মশক কীড়ার শরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করে। এতদ্দেশেও ঝিল প্রভৃতিতে 'কারা' জাতীয় গাছের অভাব নাই। সাধারণতঃ ইহাদিগকে 'ঝাঁজ' বলে। ভারতীয় 'কারা' গাছের মশক-কীড়া-নাশক গুণ আছে কিনা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের জন্ত যে চিকিৎসক মণ্ডলী বদ্ধপরিকর হইয়াচেন তাঁহারা ম্যালেরিয়া নিবারণের সহায় মাছের সহিত ঝাঁজেরও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বৃক্ষরাজ :—অষ্ট্রেলিয়ার নব জিলণ্ডে কৌড়ী (Kauri) নামক এক প্রকার চিড় জাতীয় (Pine) গাছ জন্মায়। সাধারণতঃ কৌড়ী গাছ খুব বড় হয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি অতিকায় কৌড়ীর খবর পাওয়া গিয়াছে। উহার গুঁড়ির ব্যাস ২২ ফুট ও পরিধি ৬৬ ফুট ও উপর হইতে মাপিয়া গুঁড়িতে ১২৫০০০ ফুট কাঠ আছে দেখা যায়। এই গাছটির বয়স অনুমান ২০০০ বৎসর হইবে। এইরূপ বিশালকায় বৃক্ষ নবজিলণ্ডে বিরল নহে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভূমিকম্প অথবা অন্ত কোন কারণে নবজিলণ্ডের একটি অঞ্চল নামিয়া যায়। সে স্থানে এখনও প্রকাণ্ড কৌড়ি গাছসমূহের গুঁড়ি পড়িয়া আছে দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শত শত বৎসর পূর্ব্বে উৎপাটিত হইলেও কাঠের কোন বিকৃতি হয় নাই। এখনও উক্ত কাঠ টাটকা কাঠেরই মত। এমন কি স্থানে স্থানে কাঠের ছাল ও তৎসংলগ্ন ফলও বিচ্যুত হয় নাই।

ব্রেজিলে পাট চাষ :—বহুদিন হইতে ব্রেজিলে পাট চাষ সম্বন্ধে যে একটা গুজব শোনা যাইতেছিল তাহা আজকাল সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। অবশ্য উক্ত দেশে পাট প্রবর্ত্তনের অনেক চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে বিফল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু Dr. Gabriel Lessa নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি কয়েকটা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ব্রেজিলে পাট উৎপাদন অসম্ভব নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎ পরিমাণ পাটও উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে ভাবিবার বিষয় বটে। আপাততঃ পাট বঙ্গদেশের একরকম একচেটিয়া ফসল। অন্ত দেশে তাহা উৎপাদিত হইলে শুধু যে আমাদের পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমিয়া যাইবে তাহা নয়, আমাদের একটা বিশেষ ফসলের চাষসীমাবদ্ধ হইয়া অনেকচাষীরইঅন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। পাট চাষের উন্নতির উপায় অবলম্বনই এইরূপ ভবিষ্যৎ ক্ষতি প্রতিকারের প্রধান উপায়।

মার্কিণ তুলা :—এ বৎসর মার্কিণে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হইবে। ১৯২২-২৩ সালের ফসল হইতে ৫০০ পাঃ গাঁটের ৮৯,৬৪০০০ গাঁট তুলা

হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেও ১৯২০ সালের তুলনায় অনেক কম। শেষোক্ত বৎসরে ১৩৪,৪০,০০০ গাঁট তুলা উৎপাদিত হইয়াছিল। মার্কিণ তুলার অসদ্ভাবের জন্য লাঙ্কেশায়রে ইতিপূর্ব্বেই চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল। এখন নূতন ফসলও যে আশাজনক হইবে না তাহা ভাবিয়া বিলাতী তাঁতিকুল আরও আকুল হইবেন।
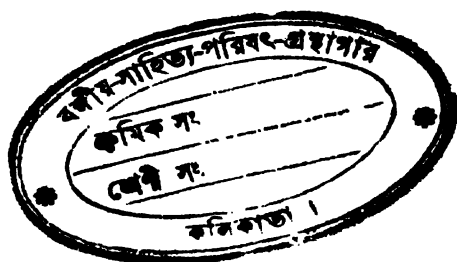
জল হাওয়া ও ফসল।

নীলচাষ :—১৯২০-২১ সালে ভারতে মোট নীল চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৪০,০০০ একর। ১৯২১-২২ সালে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩১৬,৬০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। উৎপাদিত নীলের পরিমাণও ৪১,২০০ হন্দর হইতে ৬০,৯০০ হন্দরে উঠিয়াছে। চাষের জমি প্রধানতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশেই বাড়িয়াছে। এখানে নীলের চাষ ছোট ছোট চাষীর হাতে; তাহারা ভাল নীল প্রস্তুত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বিহার অঞ্চলে বড় বড় নীলকরগণ উৎকৃষ্ট নীল তাঁহাদের কারখানায় উৎপাদিত করেন, কিন্তু উক্ত অঞ্চলে ক্রমশঃ নীল চাষের জমি কমিয়া যাইতেছে। নীলের জন্য এ একজন বিশেষজ্ঞ বিলাত হইতে আমদানি করা হইয়াছিল, তাঁহার চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে কিন্তু জানা গিয়াছে যে নীল উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইলে শুধু যে উন্নত জাতীয় নীল গাছ দরকার তাহা নহে; যে উৎসেচন ক্রিয়ার ফলে নীল প্রস্তুত হয় তাহারও পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দরকার। উৎসেচন ক্রিয়ায় দুই শ্রেণীর জীবাণু লিপ্ত। একশ্রেণী নীল প্রস্তুতের সহায়তা ও অন্য শ্রেণী তাহার বিপক্ষতাচরণ করে। শেষোক্ত শ্রেণীর জীবাণু যত অধিক পরিমানে অপসৃত করিতে পারা যায় ততই অধিক পরিমানে উৎকৃষ্ট নীল পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে বোরোধান ও রবিশস্য :—বপনের সময় জলহাওয়ার অবস্থা অনুকুল ছিল, কিন্তু তৎপরে বৃষ্টির অভাবে কোন কোন জেলায় ফসলের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। মাঘের বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় ফসলের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারনতঃ নাবী ফসল ও বোরোধানের কতকটা সুবিধা হইয়াছে। বাংলার রবিশষ্যের মধ্যে যব, বোরোধান, ছোলা, গোধুম, গাঁজা, শন ও মশলার ফসলাদিই প্রধান। সাধারণতঃ ২৯,৯৮, ২০০ একারে রবিশস্য উৎপাদিত হয়। এবার ২৭, ৮৭, ২০০ একারে উক্ত ফসলসমূহ বোনা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ একারের অধিক জমিতে বোরোধান চাষ হইয়াছে। বোরোধান হইতে এবৎসর ১৬৫৯০০ টণ অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৯ ভাগ অধিক চাল হইবে আশাকরা যায়। মৈমনসিংহ জেলায় বোরোধানের জমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তন্নিম্নেই ঢাকা, মালদহ ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ।

কলিকাতার বাজার দর।

বিবিধ শস্য।

সরিষা কাজলা ঝুমকা (নূতন)	৭৲—৭৷০
ছোলা বুট পাটনাই	৩৷৵০—৩৸০
ছোলা দেশী	৩৷০—৩৷৴০
মাস কলাই, দেশী	৪॥০
ঐ পাটনাই	৫৲—৫॥০
মুসুরী কলাই, দেশী	৪৲—৪৷০
ঐ পাটনাই	৪৷০—৫৷০
কালী কলাই	৪৸০—৫৷০
মুগ সোনা নূতন	৭॥০—৮॥০
মুগ কৃষ্ণ দেশী	৫৲
মুগ পশ্চিমে হালি	৪৸০—৫৲
সিঙ্গাপুর মুগ	৬॥০—৭৲
মটর সাদা	৫৷০—৫৸০
মটর সবুজ	৫৷০—৫॥০
মটর গুলি	৩৸০
অড়হর দেশী	৩৸০—৪৷০
ঐ বৈদ্যনাথ (নূতন)	৪৸৵০—৫৸০
খেসারি ঐ পাটনাই	৪৷০—৪৷০
ঐ দেশী	৪৲
যব পাটনাই	৩৸৵০—৪॥৴০
তিসী ঝাড়া (শতকরা ৫৲ খাদ)	৯৸৲১০—৯৸৵০
গম জামালপুর (শতকরা ৭॥০ খাদ)	১০৲
ঐ কানপুর দুধে (৫৲০ খাদ)	৬॥০
ঐ বক্সার দুধে (ঐ ঐ)	৮৸০
ঐ গঙ্গাজলি (ঐ ঐ)	৭॥০—৮৲
পোস্তদানা ঝাড়া (শতকরা ৫৲০ খাদ)	৯॥০—১১৲

তিল নাগপুরে সাকি (শতকরা ৫/ খাদ)	১২৲
তিল সফেদ	১৯৲—২০৲
তিল কাট	১০৲
তিল কৃষ্ণ	১২।০
রেড়ী দেশী ৮।০ মান্দ্রাজ	১০/
হরীতকী	২॥৵০—২৸৵০
ঐ ভাঙ্গা	৩৵০—৪৸০
মাট বাদাম বা চীনা বাদাম ৬।০, খোসা ছাড়ান	৯৸৵০
তেঁতুল	৫।০—৮।০

চাল।

বালাম নুতন	৬৸০—৬৸৵০
ঐ পুরাতন	৯৲—৯।০
সীতা	৭।৵০—৭৸৵০
কাজলা বা কুলী	৫৲—৫।০
রেঙ্গুন	৬॥০—৬৸০

ডাল।

অড়হরের ডাল কাণপুর	৫৸০—৭।০
ঐ দেশী	৪॥০—৫৲
খেসারির ডাল	৩৸০—৪৲
ছোলার ডাল	৫॥০—৬৲
মুসুর ডাল দেশী	৪।০—৪৸০
ঐ পাটনাই	৫।০
মুসুরের ডাল থাড়ী	৬।০—৭৲
মটরের ডাল ছোট	৪৲—৪।৵০
ঐ সাদা	৫৲
মুগের ডাল	৭৸০—৬৸০—৭৲
ঐ ভাঙ্গা নহে	৮৲
কালি কলাইয়ের	৬।০—৭৲
মাসকলাই বিউলি	৬॥০—৭৲
মাসকলাইডাল দেশী	৬৸০
ঐ পাটনাই	৭৲

চিনি।

কলে পিষিয়া স্বদেশী পিটী বলিয়া বিক্রী	১৬৲
সাদা জাবা	১৯৲
পিটি আৰ্কা	২১৲
জাবা চিনি লাল	৩৮৲
কাশীপুর কলের ॥ নং হোয়াইট	২০॥০

বেনে মশলা।

ছোট এলাচ রাবিন ১ নং	৪॥০ — ৫।০
ঐ ঐ ২ নং	৫৲—৫।০
বড় এলাচ	৪৬৲—৪৮৲
লবঙ্গ	৬৬৲—৭০৲
জৈত্রী	৩৲—৩॥০
জায়ফল	২৭৲—৩০৲
মরিচ রাবিন	২১৲—২২৲
লঙ্কা জরদ	২২৲—২৩৲
লঙ্কা লাল	২০৲—২১৲
হরিদ্রা	১৯৲—৩৮৲
ধনে	৭॥০—১১৲
সুপারী জাহাজী	১৪৲—১৫৲
দেশী সুপারী	২৩৲—২৪৲
খয়ের ১ নং ৩২৲ ২ নং	৩১৲
সুট	৩০৲—৩৪৲
জিরা	৩৮৲—৪১৲—৪৪৲

মধু ও ময়দা।

মধু ১ নং	২৭৲	২ নং	২২৲		
ময়দা ১ নং	৮।০	২ নং	৭৸/০	৩ নং	৭৶০
জোনার আটা ১ নং বিঃ	৮।০	২ নং	৭৸০	৩ নং	৫৲
ভুষী					৩০৲

তৈল ও ঘৃত।

মন্নালাল		৭৬॥০
পাতিরাম		৮১৲
ঘৃত (মহিষের) মটকি বেলিয়া		৮৯৲
ক্যামেল্রা		৭৫৲
শ্রী মার্কা		৬৭৲
নারিকেল তৈল	১ নং কোচিন	২৬॥০
রেড়ির তৈল	৪ নং অর্ডিনারি	২২।০
	২ নং ২৩৲ ১ নং	২৩।০
সরিসার তৈল কলের		২৯৲—২৫॥০
সরিসার তৈল ঘানির		২৮৲
মসিনার তৈল	গৌরীপুরে	৩৩৲—৩৫৲
বাদাম তৈল চিনা		২৭৲
তিল তৈল খাটী		৩১৲
কোঁচড়া		২১॥০—২২৲
কেরোসিন গোল্ড মোহর বর্ম্মা		৪।১০

খদ্দর

ফেণী খদ্দর—

প্রমাণ খদ্দর ধুতি ১০ × ৪৫	৪॥০
প্রমাণ খদ্দর শাড়ী ১০ × ৪৫	৫৲—৬৲
ঢাকাই খদ্দর শাড়ী ১১ × ৪৮ কোরা	৭॥০
ধোয়া	৮৲—১০।০
রঙ্গিন ঢাকাই জামদানী ১১ × ৪৮	১১৲—১২৲
ঢাকাই বুটিদার ৬ × ৩	৫।০

বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড়

১০৮৫ নং ১৩গজ ধুতি	৩।৶০
২০৮৫ নং ১০ গজ ধুতি	৩॥৶০
৯৯৫ নং ১০ গজ শাড়ী	৫৶০
২০৯৫ নং ১০ গজ শাড়ী	৩৸৶০—৪৲

মোহিনী মিলের

৪৮ নং ১০ গজ ধুতি	৪।৫'০—৪।/০
৭৫ নং ১০ গজ ধুতি	৩।/০
৬ নং ১০ শাড়ী	৪৸০
১৮০ নং ১০ গজ শাড়ী	৪৸/০

রামকৃষ্ণ মিলের

১১২১নং ১০ গজ ধুতি	৪৸৶০
১১৫১নং ১০ গজ ধুতি	
১১৬১নং ১০ গজ শাড়ী	৯৸৶০
৭৬১নং ৯ গজ ধুতি	৩।৵০
৮৬ নং ৯॥০ গজ ধুতি	
নিরেস মাঠা	২।৶০
৩বিঃ ৯২॥০ মারকিন	৬৲
৩বিঃ ৯৩॥০নং মারকিন	১৭৲
৩৬৫১নং মারকিন	৭॥৶০

পত্রাদি।

মাননীয় 'কৃষক'—সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

কয়েকটী বিষয় জানিবার জন্য আবেদন করিতেছি।

১। "কৃষকে" মধ্যে মধ্যে "বাগানের মাসিক কার্য্য" বাহির হয়। ঐরূপ উপদেশ সম্বলিত কোন ছোট বই আছে কিনা, দাম কত।

২। এমন কোন লতা আছে কিনা যাহায় পাতা ঝরে না, সুন্দর ফুল হয়, এবং যাহা দ্বারা ৭।৮ ফুট উচ্চ বেড়ার কাজ চলিতে পারে, এমন ঘন পাতা হয় যে বাহির হইতে ভিতরের কিছু দেখা যায় না।—প্রতি ১০০ ফিট লম্বা বেড়া দিতে কয়টী চারার আবশ্যক, দাম কত। উচ্চ wire fencing দিলে উহা দাঁড়াইবে কিনা।

৩। এমন কোন গাছ আছে কিনা যাহা খুব শীঘ্র বড় হইয়া উঠে এবং বেশ ছায়া দেয়। প্রতি চারার দাম কত।

আমার জমিতে কোন গাছ পালা নাই, নূতন বাড়ী হইতেছে। সত্বর ছায়ার দরকার। মাটী উচ্চ, লাল। তবে উপরের খানিকটাতে চাষ আবাদ হইত বলিয়া রং অনেকটা কাল্‌চে সাদা হইয়া আসিয়াছে। খুব শক্ত।

বিনীত

কাজি ইমদাদুল হক্

(১) [ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং অ্যাসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত 'সব্জী চাষে' সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যাইবে। উহার নূতন সংস্করণ আপাততঃ যন্ত্রস্থ। ইংরাজি Monthly Hints for Indian Amateur Gardners, মূল্য ১৲, উক্ত সমিতিই সরবরাহ করিতে পারেন।

(২) Ipomoea pulchella নামক লতাকে রেলওয়ে লতাও বলিয়া থাকে। জাফ্রি বাঁধিয়া দিলে ইহা খুব ঘন হইয়া জন্মায়। তাহার দ্বারা কাজ চলিতে পারে। কোন কোন জাতীয় ঝুমকা ফুলেও সুন্দর বেড়া হয়। ১০০ ফুট লম্বা বেড়ায় প্রায় ১ পাউণ্ড বীজ আবশ্যক হইবে।

(৩) কাঠ করঞ্জা, (Pongamia glabra) ও Pithecolobium Saman

কিম্বা Rain tree প্রভৃতি গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে ও বেশ ছাওয়া হয়। জমির উপযুক্ততা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমতঃ সামান্য পরিমাণ বীজ অথবা চারা লইয়া পরীক্ষা করাই ভাল। বর্ষার প্রারম্ভে চারা বসান শ্রেয়ঃ। মূল্যাদি সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি সমিতি সঠিক খবর দিতে পারিবেন। কৃঃ সঃ]

সার সংগ্রহ।

সর্প দংশনের ঔষধ :—এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিঃ কে সি ইপন্ এম,এ,সম্প্রতি সর্পদংশনের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। নকুলের (বেজী) লালা অথবা পিত্ত সর্প-বিষ নিবারক ঔষধ। প্রথম একদিন তিনি একটী গাভীর উপর ইহা পরীক্ষা করিলেন। গাভীটীকে সাপে কামড়াইয়াছিল। তিনি বেজীর পিত্ত, পটাশিয়ম পারমেঙ্গেনেট, তামাকের আরক এবং কলাগাছের রস একত্র করিয়া এক ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। ঔষধটী তৎপর গাভীর মুখ দিয়া পেটের ভিতর পুরিয়া দিলেন। ইহাতে গাভী রক্ষা পাইল। ২।১ দিনের মধ্যেই গাভী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। সর্পদষ্ট এক ব্যক্তি এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। মিঃ ইপেন্ ঔষধটী পরীক্ষা করিবার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বেজীর পিত্ত খানিকটা গায়ের চামড়া ভেদ করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। তৎপর আধ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঔষধটী খাওয়াইয়া দিতে হইবে। সঞ্জীবনী

দেশীয় শ্রমিকের আয় ব্যয়।—বোম্বাই প্রদেশে বিশেষরূপ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে সাধারণতঃ একটি শ্রমিক পরিবারে ছোট বড় করিয়া অন্যূন ১০ জন ব্যক্তি থাকে এবং উহাদের মোট মাসিক আয় ৫২।১০ অর্থাৎ লোক পিছু পাঁচ টাকার কিছু উপর। ২৪৭৩টি পরিবারের বাৎসরিক ব্যয়ের বজেট পরীক্ষায় দেখা যায় যে বিভিন্ন খাতে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত নিম্নরূপ :—

আহার্য্য	শতকরা	৫৬'৮	ভাগ।
জ্বালানি কাঠ ও আলোক	"	৭'৪	"
পরিধেয়	"	৯'৬	"
বাটি ভাড়া	"	৭'৪	"
বিবিধ	"	১৮'৫	"

দেখিতে পাওয়া যায় যে আয় বেশী হইলে তদনুপাতে আহার্য্যের খরচ বাড়ে না। বরং কম হয়। অপরাপর দেশের সহিত তুলনা করিলে বোম্বাইর শ্রমিকের আহার্য্যের ব্যয় ইতালীর ও আর্জ্জেন্টিনার শ্রমিকের ব্যয়ের সমান, কিন্তু বিলাত, মার্কিণ, মিশর ও চীন অপেক্ষা কম।

ভারতগবর্ণমেণ্টের নূতন সদস্য :—ভারতেশ্বরের অনুমতিক্রমে মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জ্জি ভারতগবর্ণমেণ্টের এক্‌জিকিউটিভ কৌন্সিলের ব্যাণিজ্য ও শ্রম

বিভাগের সদস্য নিযুক্ত হইলেন। শ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও আইন. পেটেণ্ট, ভাণ্ডার, ভূ ও খনিতত্ত্ব, বায়ুপথ আবহাওয়া, শিল্প, ডাক ও তার, জল সেচন, পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতি তাঁহার অধীনে থাকিবে।

লবণ-শুল্ক:—লবণকর বৃদ্ধির প্রভাব হাতে হাতেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। হাওড়ার লবণগোলায় প্রচুর পরিমাণে লবণ জমিয়া আছে। কার্য্যতঃ গত পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া আদৌ কেহ মাল খালাস করে নাই, অনেকের ধারণা, গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের আমদানীতে বাজার এখনও ভর্ত্তি রহিয়াছে, সেই জন্য কেহ মাল উপস্থিত খালাস করিতেছে না। কিন্তু কর বৃদ্ধির সহিত মাল ছাড়ান না লওয়ার যে অল্প বিস্তর সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

"সোনার বাংলা" ঃ—আমরা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি যে আমাদের নূতন সহযোগী, "সোনার বাংলা" বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। লোক শিক্ষার জন্য এরূপ সংবাদ পত্রের বিশেষ প্রয়োজন। শ্যামসুন্দর বাবুর ন্যায় সম্পাদকের কর্তৃত্বে ইহা অচিরেই যে বাংলা সংবাদ পত্র মহলে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এরূপ পত্রিকায় কৃষি, শিল্প ও বাণিয্য বিষয়ক আলোচনা আরও অধিক পরিমাণে হইলে আমরা সুখী হইব।

দাক্ষিনাত্যের আম :—দাক্ষিনাত্যের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি, মালবন, গোয়া, সালসিট ও গুজরাট অঞ্চলে এবং সালেম, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট জাতীর আম জন্মায় ও ভারতের নানাস্থানে চালান যায়। জল বায়ুর অহিতকর প্রভাবে, বিশেষতঃ ফল ধরিবার মুখেই অধিক বৃষ্টি হওয়ায় এবার আমের ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ সময়ে বোম্বাইর বাজারে গড়ে প্রতিদিন ৩।৪ হাজার টুকরি আম আসিত; সে স্থলে মোটে ২।৩ শত টুকরি আসিতেছে। কলিকাতায় এই সব অঞ্চলের আম বেশ দরে বিক্রয় হয় এবং সাহেব মহলেও দাক্ষিনাত্যের আমের বিশেষ আদর আছে। এবার কিন্তু অনেকেই সহ্যাদ্রির পরপারের নধর আম্র ফলের আস্বাদনে বঞ্চিত হইবেন।

ভাসমান বাণিজ্য প্রদর্শনী—ইংরাজ জাতি সম্প্রতি বাণিজ্য বিস্তারের এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা একখানি বড় জাহাজ ভাড়া করিয়া উহাতে ইংলণ্ডে উৎপন্ন নানারূপ জিনিষ পত্র বোঝাই করিয়া বিভিন্ন দেশে জাহাজখানি ঘুরাইয়া আনিবে। প্রতি বৎসর জুন মাসে বিলাত হইতে জাহাজ ছাড়িবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান বন্দরে জাহাজখানি যাইবে, উহাতে সাজান জিনিষপত্র হইতে কলকব্জা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রিটিশ পণ্য বোঝাই থাকিবে। যে সব

বন্দরে জাহাজ লাগিবে পূর্ব্বেই একখানি সমুদ্রগামী এরোপ্লেন যাইয়া খবর দিবে। প্রতি বৎসর এই ভাসমান প্রদর্শনী দেখান হইবে। এখন একখানি জাহাজেই কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে দুইখানি জাহাজ এই কাজে লাগান হইবে। জাহাজখানি ২৮০ দিন নানা স্থানে ঘুরিবে—১৩০ দিন বিভিন্ন বন্দরে থাকিবে। এই জন্য বৎসরে ২৮৫০০০ টাকা খরচ হইবে। (উদ্ধৃত)

কৃত্রিম বারিপাত:—বৃষ্টি করাইবার জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ প্রভৃতি নানারূপ অনুষ্ঠানের বিধি যে এদেশে আছে তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু মন্ত্র প্রভাবে অথবা অন্যান্য উপায়ে যে বারিপাত করান যায় এরূপ ধারণা ভারতের একচেটিয়া নয়। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার 'বৃষ্টির ডাক্তার' তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সম্প্রতি আর এক দলের লোকও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মার্কিণে হ্যাটফিল্ড নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছামত বারিপাত করিতে পারেন বলিতেছেন দুই এক স্থানে বারিপাত করাইয়াই নাকি তিনি বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার প্রথা তিনি গোপন রাখিয়াছেন, কিন্তু অনেকে আন্দাজ করেন যে, বায়ুর সহিত রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ যোগ করাই তাঁহার প্রথা। কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় হাওয়া জাহাজের সাহায্যে মেঘমালার মধ্যে তরল বায়ু বিকীরণ করিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় বেলুণ দ্বারা মেঘে তড়িৎ সংযুক্ত করিয়া বারিপাত করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা ফলবতী হয় নাই। আবার এখন শোনা যাইতেছে যে, মার্কিণে মেঘস্তরের ৫০০ ফিট উপর হইতে তড়িৎ যুক্ত বালুকা মেঘ মধ্যে বর্ষণ করিয়া জলকণা ধরাপৃষ্ঠে নিপাতিত করিবার অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ না প্রভূত পরিমাণ মেঘরাশির উপর পরীক্ষা করিয়া স্বাভাবিক বৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি তাহা জানা যায় ততক্ষণ কৃত্রিম বৃষ্টিপাত করাইবার সম্ভাবনা খুবই কম।

সংরক্ষিত খাদ্যে বিষ:—প্রতীচ্যে মৎস, মাংস, ও উদ্ভিজ্জ্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বায়ুরুদ্ধ টিনে সংরক্ষিত হইয়া বিক্রীত হয় ও তৎসমুদয় অনেকেই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ সংরক্ষণ ব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বিত হয় ও যাহাতে কোন প্রকারে মানব দেহের পক্ষে অনিষ্টকর রাসায়ণিক অথবা জৈব পদার্থ খাদ্যে না থাকে অথবা জন্মিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে। এত সাবধানতা সত্বেও কোন কোন সময়ে সংরক্ষিত খাদ্য ভক্ষণে মারাত্মক ফল ঘটিয়া থাকে। কিছু দিবস পূর্ব্বে বিলাতে কয়েকজন লোক এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যে জীবাণু দ্বারা মনুষ্যের দেহে বিষ ক্রিয়া উৎপাদিত হয় তাহার নামানুসারে উক্ত রোগের নাম বটুলিজম্। মৎস, মাংস, শীষ ভূট্টা, পনির প্রভৃতির টিনে ইহা পাওয়া গিয়াছে। ১৮৯৬ সালে একজন বেলজিয়মবাসী বৈজ্ঞানিক ইহা প্রথমে

আবিষ্কার করেন ও তৎপরে ২২ বৎসরের মধ্যে ১৫০ ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। রোগে মৃত্যুর হার অত্যধিক, অর্থাৎ ১৫০এর মধ্যে ১১১, হইলেও এই ব্যারাম অথবা জীবাণু অত্যন্ত বিরল। ইহার ক্রিয়া প্রসিদ্ধ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড বিষ অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত এসিডের ন্যায় ইহা ক্ষিপ্রগতিতে কার্য্য করে না। অনেক সময়ে উক্ত জীবাণু-দূষিত খাদ্য আহারের ১৬।১৮ ঘণ্টার মধ্যেই বিষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু ৩৬ ঘণ্টা পরেও উহা প্রকাশ পাইতে পারে। মাথা ঘোরা, দুর্ব্বলতা, বমনেচ্ছা, প্রথমে দেখা দেয়। তৎপরে যথাক্রমে দৃষ্টিহীনতা, গলাধঃকরণে অক্ষমতা ও স্বর বদ্ধতা প্রকাশ পায় ও সর্ব্বশেষে ফুসফুসের পক্ষাঘাত হইয়া মৃত্যু হয়। সুখের বিষয় যে, যে বহু লক্ষ পরিমিত সংরক্ষিত খাদ্যের টিন বাজারে বিক্রীত হয় তার মধ্যে কোন সময়ে কেবল ২।১টি টিনেই বটুলাস জীবাণু পাওয়া যায়।

ভেক পালন:—কৃষির হিসাবে ভেক ঠিক নিরীহ না হইলেও ইহার দ্বারা শস্যের বিশেষ অপচয় হয় না। কিন্তু এতদ্দেশে ভেক কোন উপকারেই আসে না। ফ্রান্সে কোন কোন জাতীয় ভেক খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাদের চামড়ায় অনেক সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মার্কিণে ব্যবসার জন্য ভেক পালন করা হয়। সম্প্রতি জাপানেও ভেক শিল্পের উন্নতি কল্পে মার্কিণ হইতে কতকগুলি বৃহৎ জাতীয় ভেক আমদানি করা হইয়াছে। তথাকার কর্ত্তৃবর্গ আশা করেন যে এতদ্বারা জাপানী ভেক বংশের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

বঙ্গের ভূমিবিধি—প্রচলিত ভূমিবিধির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের জন্য নূতন খসড়া আইন অর্থাৎ বিল প্রস্তুত হইয়াছে। এদেশে সকল শ্রেণীর রাষ্টনীতির ও সমাজ-নীতির সমস্যা অপেক্ষা ভূমি বিধির সমস্যা গুরুতর; ভূমি বিধির ব্যবস্থায় ত্রুটি ঘটিলে, আমরা ধনে প্রাণে মরিব। এই খসড়ার ভূমিকা পড়িলে বোঝা যায় না যে প্রাচীন বিধি পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে; প্রস্তাবিত সংস্কারে এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যাহাতে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত কোন শ্রেণীর লোকের কোন উপকার হইতে পারে; বরং মনে হইয়াছে, যে এই বিলের বিধানগুলি পাশ হইলে অনেক অবস্থা জটিলতর হইবে, ও অনেকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। এবারে কেবল একটি প্রস্তাবিত বিধানের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব।

বিলের প্রথম চারিটি ধারা মামুলি মুখবন্ধ মাত্র; ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে পঞ্চম ধারা হইতে। এই পঞ্চম ধারাটি এমন ভাষায় রচিত, যে উহার অর্থ বোধে গোল ঘটে, ও অনুবাদ সহজ হয় না। ব্যবস্থাটিতে আছে,—যদি কোন জমির কোন মালিক (proprietor), প্রজা (tenant) অথবা occupant. কোন ব্যক্তিকে সেই জমী চষি

করিতে অনুমতি দেয় (permits), আর তাহাতে এই বন্দোবস্ত থাকে, যে সেই জমির উৎপন্ন শস্য সেই চাষ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ও অনুমতি দাতা ভাগ করিয়া লইবে, তাহা হইলেও সেই চাষ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই জমির tenant হইবে,—যদি ঐ চাষ করিতে নিযুক্ত ব্যক্তি চাষের জন্য নিজের লাঙ্গল, বলদ এবং ঐরূপ অন্য উপকরণ ব্যবহার করিয়া থাকে ; ১৯২২ সনের ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে যদি এমন সর্ত্ত হইয়া থাকে যে, অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি টেনাণ্ট (tenant) বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না, কেবল তাহা হইলেই সে ব্যক্তি টেনাণ্ট হইতে পারিবে না।

"প্রথম কথা occupant শব্দের অর্থ লইয়া। প্রচলিত ভূমি বিধিতে ঐ শব্দ নাই, নূতন বিলেও উহার ব্যাখ্যা নাই। occupant নামে যে জীব মালিকও নয়, এবং কোন শ্রেণীর প্রজাও নয়, সে কি অধিকারে ভূমি দখল করে, আর কি স্বত্বেই বা একজনকে চাষ করিবার অনুমতি দিয়া তাহাকে (যে অর্থেই হউক) টেনাণ্ট করিতে পারে, তাহা বোঝা যাইতেছে না। একজন অনধিকারী (trespasser) জমী দখল করিয়া অভিধানের অর্থে occupant হইতে পারে ; সে ব্যক্তি কি জমির স্বত্ব বদলাইতে অধিকারী হইবে ? একজন ব্যক্তি বন্ধকে জমী লইয়া যদি দখল করে, তবে সে, যাহার নিকট হইতে বন্ধক লইয়াছে, অস্থায়ীরূপে তাহার স্বলাভিষিক্ত মাত্র, সে স্থলে সেই বন্ধকী দখলকার মালিকের অথবা প্রজার প্রতিনিধি মালিক বা প্রতিনিধি প্রজা মাত্র,—তাহার নামের নূতন কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না। বন্ধকদাতা তাহার যে স্বত্ব যতটুকু পরিমাণে বন্ধকদারকে দেয়, বন্ধকদার ততটুকু সত্বই পায় ; সে যখন বন্ধকী সম্পত্তির কোন হানি করিতে অথবা সত্বে রূপান্তর করিতে অধিকারী নয়, তখন বন্ধকী সত্বের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারে না ; যাহার নিজের যে সত্ব নাই, সে তাহা অন্যকে দিতে পারে না। তবে কে সেই occupant, যে নিজের সুবিধায় ভাগের নিয়মে চাষের ব্যবস্থা করিয়া মালিক অথবা প্রজার সত্ব উল্টাইয়া দিতে পারিবে ? বিনা সংজ্ঞায় ও বিনা ব্যাখ্যায় কোন আইনে কোন শব্দের ব্যবহার আইন বিরুদ্ধ। তাহার পর তর্ক tenant শব্দ লইয়া। বিলের ৬ষ্ঠ ধারায় tenant-এর যে শ্রেণী বিভাগ ও ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে নিতান্ত অস্থায়ী অর্থাৎ ইচ্ছা মতে বেদখলযোগ্য প্রজার নামও আছে। এ শ্রেণীর অস্থায়ী দখলকারেরাও কি, ভাগে চাষের বন্দোবস্ত করিয়া স্থায়ী দখলকারের সত্বে বাধা ঘটাইতে পারিবে ? মালিক অথবা স্থায়ী প্রজা যাহাকে টেনান্ট করিতে চায় না, তাহাকে কি যে কেহ টেনান্টরূপে বসাইয়া দিতে পারিবে ? ইহা হইতে ত ভূমিবিধির এমন দুয়েকটি ধারা রদ হইয়া যায়, যাহা এই বিলে রদ করিবার ব্যবস্থা নাই। তাহার পর কথা এই, যে ব্যক্তি ভাগে চাষ করিতে আসিয়া টেনান্ট হইল, সে কিরূপ অধিকারে কোন্ শ্রেণীর টেনান্ট হইবে ? ইহার কোন কথারই নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা নাই। এ কিরূপ আইন ?

তাহার পর জিজ্ঞাস্য এই,—১৯২২ সালের নবেম্বরের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ফসলের ভাগ পাইবার অধিকারে ভূমি চাষ করিবার অনুমতি পাইয়াছিল, তাহার সঙ্গে মালিকের "সর্ত্তের" কথা আদৌ উল্লিখিত হইল কেন? ফসলের ভাগ পাইয়া চাষের কাজে লাগিলে জমিতে যে অধিকার হয় না, তাহা সুনিশ্চিত বলিয়াইত প্রস্তাবিত বিলে নূতন বিধান করিতে হইতেছে। তবে আর একথার অনুসন্ধানের কি প্রয়োজন যে, কোন মালিক তাহার ভূমিতে প্রজাস্বত্ত জন্মিতে না দিয়া ভাগে চাষের বন্দোবস্ত করিয়াছিল কিনা? এইটুকু বলিলেই ত যথেষ্ট হইত যে, ১৯২২-এর নবেম্বরের পরে যদি ভাগে চাষ করার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, তবে মালিক আপনার সত্ত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না।

এবারে নূতন বিধানটির অহিতকর উদ্দেশ্যের আলোচনা করিতেছি। যে ব্যক্তি নিজে যে কাজ করিবার কৌশল জানে না, সেকাজ চালাইতে হইলেই তাহাকে কর্ম্মকুশল লোক নিযুক্ত করিতে হয়। আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ জানিনা এবং ঘর গড়িবার পরিশ্রমও করিতে পারি না। কাজেই রাজমিস্ত্রী লাগাই, আর সেই রাজমিস্ত্রী তাহার কর্ণিক, বাঁশুলি ও ওলন প্রভৃতি লইয়া কাজ করে। এ অবস্থায় যদি রাজমিস্ত্রীকে বাড়ীর দখলি সত্ত্ব দিতে হয়, তবে আর বাড়ী করিতে পারা যায় না। কর স্বরূপে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে পেট চলে না বলিয়াই লোকে খোদ খাস্ত বা খামার জমি রাখে; যে জমি রাখিবে ও চাষের ব্যবসা করিবে, তাহাকে নিজে হাতে লাঙ্গল ধরিতেই হইবে, অথবা চাষ করিবার সকল যন্ত্রাদি কিনিয়া নিজের ঘরে রাখিতেই হইবে, এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা কোন দেশেই চালাইতে পারা যায় না। চাষের কাজে পটু বলিয়া যে লোকের সাহায্য ও শ্রমের প্রয়োজন হয়, সে তাহার চাষের উপকরণ ব্যবহার করিলে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় বলিয়াই সেগুলি ব্যবহার করে; অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাহার উপকরণের ভাড়া পায়; ভাড়া দিয়া জিনিস সংগ্রহ যাহা, জিনিস কিনিয়া ব্যবহার করাও তাহাই। এরূপ স্থলে, এমন অন্যায় বিধান করা কেন, যাহাতে চাষে অপটু ব্যক্তিরা চাষের কাজ চালাইয়া কিছু রোজগার করিতে বঞ্চিত হয়?

এমন অনেক ভদ্র লোক আছেন, যাহাদের অল্প কিছু চাষের জমি আছে, আর সেই জমির উৎপন্ন হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ ভরণ পোষণ হয় না; চাষের লাভ ছাড়া-ও কিছু টাকার প্রয়োজন বলিয়া, বিদেশে থাকিয়া চাকুরী করিতে হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা কোনও উপায়ে নিজেদের ঘরে বলদ পুষিতে পারে না অথবা লাঙ্গল প্রভৃতি রাখিতে পারে না। ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, চাষ করিতে হইলে চাষের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিবার অধিকার থাকিবে না. এবং গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করা চলিবেনা? একালের অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও বড় চাকুরী পায় না; তাহারা ছোট খাট চাকুরী লইয়া চাকুরীর আয়ের সঙ্গে চাষের আয় মিলাইয়া যে একটু সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারিবে, তাহার আর উপায় রহিল না। অনেক অনাথা বিধবা

আছে, যাহাদের পক্ষে নিজে বলদ ও চাষের উপকরণ রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অথচ তাহাদিগকে খামার জমীর ধানেই প্রতিপালিত হইতে হয়। যাহার চাষের খামার জমী আছে, তাহার বলদ কিনিবার টাকা না থাকিতে পারে, কিন্তু সে ফসল বাটোয়ারার সময় বলদের ভাড়া শোধ করিতে পারে; অথবা বলদ কিনিবার টাকা থাকিলেও বলদ পুষিয়া উপযুক্ত ভাবে বলদের যত্ন করিবার সময় ও সুবিধা না থাকিতে পারে। এ সকল অবস্থার কোনটিই মহাপাতক নয়; তবে বলদ লাঙ্গল না রাখিলেই নিজের খামার জমির সত্ব, ভাগের বন্দোবস্তে ধ্বংশ হইবে কেন? এবারে একটি ধারার সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেই অনেক কথা বলিতে হইল। এই অহিতকর বিলের বিরুদ্ধে সকলকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। বঙ্গবাণী—চৈত্র।

কুমায়ুণ-কাহিনী।

ভারতের উত্তর সীমা ব্যাপিয়া অবস্থিত নগাধিরাজ হিমালয়কে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা হয়; উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব হিমালয়। মধ্যাংশে স্বাধীন নেপাল রাজ্য। আজকাল যুক্ত প্রদেশের যে বিভাগ কুমায়ুণ নামে পরিচিত উহা পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮১৬ সালে নেপালের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধিসূত্রে উহা শেষোক্তের হস্তগত হয়। যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস, নৈনিতাল, কুমায়ুণে অবস্থিত বলিয়া এতদঞ্চলে অনেকে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সাধারণ কিম্বদন্তী আছে যে ইহা গিরিরাজের দেশ—শিবের শ্বশুরালয়। সে যাহা হউক ফলতঃ এখানে শিব উপাসকের সংখ্যা যে অধিক তাহা দেখিলেই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে হিমালয়ের পাদদেশের এই অংশ নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। এখনও যে বন ও বন্য পশু নাই তাহা নহে। তবে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বিবেচনাহীন জঙ্গল কাটাইর ফলে কোন কোন স্থান এত অধিক মাত্রায় পাদপশূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে আজকাল কৃত্রিম উপায়ে উক্ত স্থান সমূহে অরণ্য বিস্তার করা হইতেছে। বারিহীণতাও উদ্ভিদাভাবের অন্যতম কারণ। যাঁহারা নৈনিতাল ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন যে বেরিলি হইতে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলে যাইতে হয়। এই পথেই নিম্ন কুমায়ুণের সমস্ত প্রাকৃতিক গঠন নয়নগোচর হয়।

বেরিলি হইতে কাঠগুদাম ৬৬ মাইল। এই পথে বাগেরি' গ্রাম ছাড়াইলেই বেরিলি জেলা শেষ হইল। তৎপরবর্ত্তী দেশ সাধারণতঃ তরাই নামে খ্যাত। তরাই হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রায় এক শত মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সাধারণতঃ কুমায়ুণের তরাই সংলগ্ন নিম্ন প্রদেশকে লোকে ভাবর বলিয়াই জানে। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল পাষাণ রাজি, হিমালয়ের খরস্রোতা নদী সমূহ বাহিত বালুকা ও মৃত্তিকা স্তূপ, প্রায়-বারিহীন মৃত্তিকায় ঘাস ও অনুচ্চ তরু শ্রেণী—এই সমুদয়ই পর্য্যটকের মনযোগ প্রথমেই আকর্ষণ করে। জলের এত অভাব যে এমন কি পানীয় জল খাল অথবা অন্ততঃ ৬০ ফুট গভীর কূপ ব্যতীত অন্য স্থানে পাওয়া দুষ্কর। ভাবরের বিস্তৃতি স্থান বিশেষে ৩—১৫ মাইল। জমি তরঙ্গায়িত হইয়া দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ ভাবর অঞ্চলে তিন প্রকার ভূমি দৃষ্ট হয়:—(১) বনভূমি, ইহাই অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে; (২) অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও বন

নিকাশের অসুবিধাযুক্ত জমি, ইহাতে ঘাসের জঙ্গল ; এবং (৬) কর্ষিত অথবা অনাবৃত জমি ; টনকপুর, হলদ্বানী, কালাডুঙ্গি প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রামে এইরূপ জমি দেখা যায়। সচরাচর খালের ধারেই এরূপ জমি অধিক।

ভাবর অঞ্চলে ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তে তিনটি ঋতুই অধিক প্রাবল্যে । কার্ত্তিকের শেষে শীত আরম্ভ হয়। গ্রীষ্ম বৈশাখে ও আষাঢ়ে যথাক্রমে গ্রীষ্ম ও বর্ষা দেখা দেয়। অগ্রহায়ণ পৌষে সাধারণতঃ বৃষ্টি হওয়ায় ও জ্যৈষ্ঠমাসে ঝড়ের প্রাবল্যে বর্ষা ঋতুরই অধিক প্রাদুর্ভাব বলিতে পারা যায়। হাওয়াতে অধিক পরিমাণে শৈত্য ও অত্যধিক উত্তাপের সম্মিলনে গ্রীষ্মের সহিত ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হয় ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হলদ্বানীর পশ্চিমদিকস্থ স্থান সমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাস্থ্যকর। এই সমস্ত কারণে যে সমুদয় পার্ব্বত্য লোক শীতকালে তাহাদের পশ্বাদি লইয়া ভাবরে আসে তাহারা গরম পড়িলেই আবার চলিয়া যায়। যেখানে জলের সুবিধা আছে সেখানে ইহারা চষি আবাদ করে ; অনেক লোকে জঙ্গল কাটাই ইত্যাদি কাজেও নিযুক্ত থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে ভাবর প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। এই সকল অস্থায়ী অধিবাসীগণ তাহাদের গরুবাছুর ছাগল ভেড়া অশ্ব ইত্যাদি লইয়া যে যাহার পাহাড়ের উপরিস্থিত গ্রামে চলিয়া যায়।

দেশের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে এইকয়েকটি কথা বলিয়াই আমরা এস্থলে ভাবরের বিশিষ্ট তরু লতাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এতদঞ্চলে চারি প্রকারের জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পরস্পরের সহিত ঔদ্ভিদিক পর্য্যায়ে সম্বন্ধ, অর্থাৎ এক প্রকারের জঙ্গল হইতে আর এক প্রকারের জঙ্গলের উৎপত্তি হয়। জমির নব্যাবস্থায় শিশুগাছই প্রথমে দেখা দেয় ; যেখানে মৃত্তিকার অভাব, স্থান উপল খণ্ডময় এবং জলের জন্য নিকটবর্ত্তী নদীর উপর একান্ত নির্ভর; সেখানে শিশু ভিন্ন অন্য কোন বড় জাতীয় গাছ জন্মিতে পারে না। কালক্রমে নগ্ন প্রস্তরখণ্ড সমূহ মোটা বালির দ্বারা ঢাকা পড়িয়া যায়। তখন জমি 'কাঞ্জু' গাছ জন্মিবার উপযুক্ত হয়। আরও কতিপয় বৎসর হইলে মোটা বালির উপর ক্রমে ক্রমে দোয়াশ মাটি জমিতে থাকে। উক্ত মাটি ২।৩ ফুট পুরু হইলে উহা অত্যধিক মাত্রায় বৃষ্টিবারি সঞ্চয় করিতে পারে। সেরূপ সময় আসিলে জারুল ও তৎসম্পর্কীয় গাছের আবির্ভাব হয়। ইহার পরও দুইএক শতাব্দী অতীত হইয়া গেলে উর্ব্বর মৃত্তিকার স্তর প্রস্তুত হয় এবং জমি সেই স্তরে উপনীত হইলে তাহাতে বড় বড় বৃক্ষ যথা, শাল, শিরাশাল প্রভৃতি জন্মিতে আরম্ভ করে এবং বিশাল পাদপমণ্ডিত বনভূমির সৃষ্টি হয়।

শিশু একটি উৎকৃষ্ট আয়কর বৃক্ষ। ভাবরে ইহা শুষ্ক নদী গর্ভেই জন্মিয়া থাকে। শিশুগাছের তলায় বীজ পড়িয়া গাছ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। জল অথবা বায়ু দ্বারা বীজ বাহিত হইয়া নদীকূলে অথবা দ্বীপে উদ্ভিদ-বিহীন স্থানে গিয়া পড়িলে একযোগে

[illegible] শিশুরা [illegible]। [illegible] যুক্ত বেলে মাটিই শিশুর উপযুক্ত জমি বলিয়া বোধ হয়। কৃত্রিম উপায়ে মূলের অথবা ডালের কলম হইতে শিশুগাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। কাণ্ডের তিন ফুট পরিধি পর্য্যন্ত ইহা সত্বরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার পর বৃদ্ধির মাত্রা বড়ই কম। যেখানে জমির উপরিভাগে যথেষ্ট পরিমাণে শৈত্য থাকে সেখানেই শিশু ভালরূপ জন্মায়।

খয়ের শিশুর ন্যায়ই গুচ্ছ বাঁধিয়া একত্র বহুসংখ্যায় শুষ্ক নদীগর্ভে জন্মায়, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ঘন ঘাসের জঙ্গলেও যথেষ্ট পরিমাণে খয়ের গাছ দেখা যায়। পশ্চাদ্দিকাপেক্ষা অপরা জঙ্গল পোড়াই দ্বারা খয়েরের তত ক্ষতি হয় না। যদিও ভাবর অঞ্চলে ৫ফুটের অধিক পরিধির খদির কচিৎ দৃষ্ট হয়, তবুও ২৩ ফুট পরিধির গাছও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারে আসে বলিয়া খয়ের ব্যবহারিক হিসাবে কম আয়কর গাছ নয়। বিঘাতে ৫০টির কম বড় খয়ের গাছ হয়না। খয়েরের কোমলকাঠ (sapwood) ফিকে পীত-বর্ণ ও দৃঢ়কাঠ (heart wood) ইষ্টক সদৃশবর্ণযুক্ত। দৃঢ়কাঠ গৃহসজ্জা, কৃষিযন্ত্র, খুঁটিপ্রভৃতি কাজে যথেষ্টপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে উই লাগেনা। অবশ্য খয়ের গাছ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে খদিরই সর্ব্বপ্রধান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কাঠ সিদ্ধ করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে হলদুবৃক্ষের আধিক্য বশতঃ ভাবর অঞ্চলে একটি ষ্টেসনের নাম হলদুয়ানী হইয়াছে। হলদুবৃক্ষ খুব বড় হয় ও ইহার কাঠ হলদে রঙ্গের। গৃহসজ্জা চিরুণি, প্যাকিং বাক্স, খেলানা প্রভৃতি প্রস্তুত কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। বনবিভাগের কর্ত্তারা বলেন যে ভাবরে হলদুগাছ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তাহার অন্যতম কারণ এই যে ইহার বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও কচি চারাও কষ্টসহ নহে। অধিক পরিমাণ জলে জলে অথবা ও ঘণ উদ্ভিদ্ সমষ্টির মধ্যে হলদু সহজে জন্মিতে পারেনা।

জারুলের স্বভাব হলদুর ঠিক বিপরীত। ইহার চারা খুব দৃঢ় এবং চারণে ও আগুনে ইহাদের সহজে অনিষ্ট হয়না। ৫ ফুট পরিধির গাছ ভাবরে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। গৃহ এবং গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় লোক জারুলের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ ময়দানের ন্যায় ঘাসযুক্ত স্থানে জারুল বহুসংখ্যায় জন্মিতে দেখা যায়।

কুমায়ুনের ভাবর অংশ সম্বন্ধে মোটামুটি যে দুই চারিটি কথা এস্থলে বলা হইল তাহা হইতে পাঠকবর্গেরা উক্ত স্থানের তরুলতার অনেকটা আভাস পাইবেন। কিন্তু ভাবরে প্রবেশ করিয়া উহার পশ্চাতে ও উর্দ্ধে যে হিমালয়ের বিচিত্র শোভা আছে তাহা ধারণা করা যায় না। ভাবরের পর অবশ্য অনেকটা বারিযুক্ত ও পাদপমণ্ডিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক হিমালয়ের বিশেষ উদ্ভিদ্ সমষ্টির সহিত সাক্ষাত কাঠগুদাম হইতে নৈনিতাল ক্রমারোহী পথে কিছুদূর অগ্রসর না হইলে হয়না। আমরা বারান্তরে গিরিরাজের দেশের কতিপয় চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী বিবৃত করিব।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী বুনিবার এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে বুনিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভূট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্ত গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশুক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার জন্ত ইতিপুর্ব্বেই বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এ মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটি ও সার দিতে হয়। একনে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের ঝরা পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালে বিলাতী মরস্থমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশুক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট ক্যাণ্ডিটাফট, পপি, ক্লাইাসম, কুক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্ত কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি কিছু এই সময় পাকিতে পারে, সেই কিছু গাছ জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।